কার্ল মার্কস
ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

রচনা-সংকলন

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় অংশ

ভারবি

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০০

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : দীপঙ্কর ধর।
রাজেন্দ্র অফসেট। ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন। কলকাতা-৯।

সূচি

পৃঃ

কার্ল মার্কস

ভারতে বৃটিশ শাসন

লণ্ডন, শুক্রবার, ১০ই জুন, ১৮৫৩

...হিন্দুস্তান যেন এশীয় আয়তনের এক ইতালি, হিমালয় তার আল্প্স্, বাংলার সমভূমি যেন তার লম্বার্দি সমভূমি, দাক্ষিণাত্য তার অ্যাপেনাইঞ্জ এবং সিংহল তার সিসিলি দ্বীপ। জমির উৎপন্নের সেই একই সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য এবং রাজনৈতিক চেহারায় সেই একই খণ্ড খণ্ড ভাব। বিজয়ীর তরবারির চাপে ইতালি যেমন মাঝেমাঝে বিভিন্ন জাতির সমষ্টিতে সংহত হয়েছে, তেমনি দেখা যায় হিন্দুস্তানেও মুসলমান বা মোগল বা বৃটনদের চাপ যখন থাকেনি, তখন হিন্দুস্তানও যতগুলি বিবদমান স্বাধীন রাষ্ট্রে ভেঙে গেছে তার সংখ্যা হিন্দুস্তানের নগর এমন কি গ্রামগুলির সংখ্যার মতো। তবু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, হিন্দুস্তান ইতালি নয়, প্রাচ্যের আয়র্ল্যাণ্ড। এবং ইতালি ও আয়র্ল্যাণ্ড — ভোগবিলাসী এক জগতের সঙ্গে দুর্দশার এক জগতের এই বিচিত্র মিলন — তা হিন্দুস্তানের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই সূচিত। এ ধর্ম যুগপৎ ইন্দ্রিয়াতিশয্য ও আত্মনিগ্রহী কৃচ্ছ্রসাধনের ধর্ম, লিঙ্গম্ আর জগন্নাথদেবের ধর্ম, সন্ন্যাসী ও বায়াদেরের (দেবদাসীর) ধর্ম।

যাঁরা হিন্দুস্তানের স্বর্ণযুগে বিশ্বাস করেন তাদের সঙ্গে আমি একমত নই, তবে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে আমি স্যার চার্লস উডের মতো কুলিখাঁর নজির দেব না। কিন্তু দৃষ্টান্তস্বরূপ আওরঙ্গজেবের সময়টা ধরা যাক, অথবা উত্তরে যখন মোগল এবং দক্ষিণে পোর্তুগীজদের উদয় হল সেই যুগটা, অথবা মুসলিম অভিযান ও দাক্ষিণাত্যের হেপ্তার্কির যুগই*। কিংবা চাই কি, আরো পুরাকালে গিয়ে খাস ব্রাহ্মণদের পৌরাণিক

* হেপ্তার্কি (সপ্তরাজ্য) — ইংলণ্ড যখন সাতটি এঙ্গলো-স্যাক্সন রাজ্যে বিভক্ত ছিল (৬ষ্ঠ—৮ম শতক) তখনকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনায় ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ব্যবহৃত একটি শব্দ। উপমা হিসাবে মার্কস এই শব্দটি ব্যবহার করছেন মুসলিম অভিযানের পূর্বে দাক্ষিণাত্যের (মধ্য ও দক্ষিণ ভারত) সামন্ত বিখণ্ডীকরণ নির্দেশের জন্য। — সম্পাঃ

ইতিবৃত্তটাকেই নেওয়া যাক — তাতে ভারতীয় দুর্দশার প্রারম্ভ বলে যে কাল-নির্দেশ হয়েছে, সেটা খৃষ্টীয় ধারণানুসারে বিশ্বসৃষ্টিরও আগে।

অবশ্য এতে কোনো সন্দেহই নেই যে বৃটিশেরা হিন্দুস্তানের উপর যে দুর্দশা চাপিয়েছে তা হিন্দুস্তানের আগের সমস্ত দুর্দশার চাইতে মূলগতভাবে পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র। বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া* কোম্পানি এশীয় স্বৈরাচারের ওপর ইউরোপীয় স্বৈরাচারের পত্তন ঘটিয়ে সালসেট মন্দিরের রোমহর্ষক স্বর্গীয় দানবদের চাইতেও বেশি যে দানবীয় এক জরাসন্ধ সৃষ্টি করেছে, তার কথা আমি বলছি না। বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের কোনো বৈশিষ্ট্যসূচক দিক এটা নয় — এ হল শুধুই ওলন্দাজদের অনুকরণ এবং এতখানি অনুকরণ যে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্রিয়াকলাপের সংজ্ঞা দিতে হলে জাভার **ইংরেজ** লাট স্যার স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফলস অতীতের ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তার আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি করলেই যথেষ্ট:

'ওলন্দাজ কোম্পানি শুধুমাত্র লাভের লালসায় প্ররোচিত হয়েছিল এবং আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ার বাগান-মালিক বাগানের কুলিবাহিনীকে যে দৃষ্টিতে দেখত তার চেয়েও কম শ্রদ্ধা ও কম বিবেচনার সঙ্গে তারা দেখত তাদের প্রজাদের, কারণ বাগান-মালিককে মনুষ্যসম্পদ ক্রয় করার জন্যে টাকা দিতে হয়েছিল, এদের দিতে হয়নি। এ কোম্পানি স্বেচ্ছাতন্ত্রের সবখানি প্রচলিত যন্ত্র প্রয়োগ করেছিল লোকগুলোর কাছ থেকে যত বেশি পারা যায় আদায় করার জন্যে, নিংড়ে নেবার জন্যে তাদের মেহনতের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত এবং এই ভাবে খামখেয়ালী ও অর্ধবর্বর এক সরকারজনিত কুফল বাড়িয়ে তুলত রাজনীতিকদের অভ্যস্ত সবখানি ধূর্ততা ও ব্যবসায়ীদের সবখানি একচেটিয়া স্বার্থপরতার সঙ্গে সে যন্ত্রকে পরিচালিত করে।'

হিন্দুস্তানের সমস্ত ঘটনা পরম্পরা যতই বিচিত্র রকমের জটিল, দ্রুত ও বিধ্বংসকারী বলে মনে হোক না কেন, এই সবকিছু গৃহযুদ্ধ, অভিযান, উৎপ্লব, দিগ্বিজয় ও দুর্ভিক্ষ তার উপরিভাগের নিচে নামেনি। ইংলণ্ডই ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটাই ভেঙে দিয়েছে, পুনর্গঠনের কোনো লক্ষণ এখনো অদৃশ্য। পুরনো জগতের অপহৃতি অথচ নতুন কোনো জগতের এই অপ্রাপ্তির ফলে হিন্দুদের বর্তমান দুর্দশার ওপর একটা বিশেষ রকমের বিষাদের আবির্ভাব ঘটেছে ও বৃটেন-শাসিত হিন্দুস্তান তার সমস্ত অতীত ঐতিহ্য, তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।

* বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি — ভারতের সঙ্গে একচেটিয়া বাণিজ্যের জন্য এটি গঠিত হয় ১৬০০ সালে। 'বাণিজ্য' কারবারের আড়ালে ইংরেজ পুঁজিপতিরা ভারত জয় করতে থাকে ও কয়েক দশকের মধ্যে তার শাসক হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৫৭—১৮৫৯ সালের ভারতীয় অভ্যুত্থানের সময় কোম্পানি তুলে দেওয়া হয় ও ইংরেজ সরকার ভারত শাসন সরাসরি নিজেদের হাতে তুলে নেয়। — সম্পাঃ

এশিয়ায় স্মরণাতীত কাল থেকে সরকারের সাধারণত শুধু তিনটি বিভাগ বর্তমান ছিল: অর্থবিভাগ অর্থাৎ অভ্যন্তর লুণ্ঠনের বিভাগ, যুদ্ধ অর্থাৎ বহির্দেশ লুণ্ঠনের বিভাগ, এবং পরিশেষে পূর্তকর্মের বিভাগ। আবহাওয়া ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে, বিশেষ করে সাহারা থেকে শুরু করে আরব, পারস্য, ভারত ও তাতারিয়ার মধ্যে দিয়ে সমুন্নত এশীয় মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ বৃহৎ মরু-অঞ্চলের অস্তিত্বের ফলে খাল ও জলাশয় দিয়ে কৃত্রিম সেচ ছিল প্রাচ্য কৃষির ভিত্তি। যেমন মিশর ও ভারতে, তেমনি মেসোপটেমিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশেও বন্যার জল দিয়ে ভূমির উর্বরতা সাধন করা হয়; জলের স্ফীতির সুবিধা নিয়ে সেচের খালগুলিতে জলের জোগান দেওয়া হয়। বিনা অপচয়ে, সমবেতভাবে জল-ব্যবহারের এই প্রাথমিক যে প্রয়োজন থেকে প্রতীচ্যে যেমন, ফ্ল্যাণ্ডার্স ও ইতালির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলি স্বেচ্ছামূলক সমিতিতে আবদ্ধ হতে এগিয়েছিল, তার জন্যে প্রাচ্যে দরকার হয়েছিল সরকারের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হস্তক্ষেপ — এ প্রাচ্যে সভ্যতা ছিল অতি নিচের স্তরে এবং অঞ্চলের ব্যাপ্তি এত বিপুল যে স্বেচ্ছামূলক সমিতি সম্ভব ছিল না। সুতরাং সমস্ত এশীয় সরকারগুলির ওপরেই এসে বর্তায় একটি অর্থনৈতিক দায়িত্ব — পূর্তকর্ম সংগঠনের কাজ। ভূমির এই যে কৃত্রিম উর্বরীকরণ কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল এবং সেচ ও জল-নিঃসরণ ব্যবস্থার অবহেলার সঙ্গে সঙ্গেই যা ক্ষয় পেতে থাকে, তা থেকেই আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এই অন্যথা-বিচিত্র ঘটনাটির -- কেন আমরা পালমিরা ও পেত্রায়, ইয়েমেনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এবং মিশর, পারস্য ও হিন্দুস্তানের বড়ো বড়ো প্রদেশে দেখি, একদা অতি উত্তমরূপে কর্ষিত গোটাগুটি এক একটা এলাকা আজ বন্ধ্যা ও মরুভূমি হয়ে পড়ে আছে। এ থেকেও ব্যাখ্যা করা যায় কেমন করে একটি মাত্র বিধ্বংসী যুদ্ধেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটি দেশ জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকে, তার সমস্ত সভ্যতা লোপ পায়।

পূর্ব ভারতে বৃটিশ তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে অর্থ ও যুদ্ধের বিভাগটি গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু পূর্তকর্মটা একেবারেই অবহেলা করেছে। সেই জন্যেই কৃষির এ অবনতি, অবাধ প্রতিযোগিতার বৃটিশ নীতি — laissez faire, laissez aller* এই নীতিতে এ কৃষি পরিচালিত হতে পারে না। কিন্তু এশীয় সাম্রাজ্যগুলিতে কৃষি এক সরকারের আমলে অবনত হচ্ছে আবার অন্য সরকারের আমলে উন্নত হচ্ছে, এ দেখতে আমরা বেশ অভ্যস্ত। ইউরোপে যেমন ভালো মন্দ ঋতু অনুসারে ফসলের অবস্থা বদলায়, ওখানে তেমনি বদলায় ভালো মন্দ সরকার অনুসারে। সুতরাং কৃষির পীড়ন ও অবহেলা খারাপ জিনিস হলেও ভারতীয় সমাজের ওপর সেইটা বৃটিশ অভিযানকারীদের চূড়ান্ত

* Laissez faire, laissez-aller (কার্যকলাপের স্বাধীনতা দাও) — অবাধ বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় না-হস্তক্ষেপের মতাবলম্বী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের ধ্বনি। — সম্পাঃ

আঘাত বলে গণ্য না করা সম্ভব হত, যদি এর সঙ্গে একেবারে অন্য রকম গুরুত্বের একটি পরিস্থিতি, সমগ্র এশীয় জগতের ইতিহাসের পক্ষেই যা অভিনব, তার সংযোগ না ঘটত। ভারতীয় অতীতের রাজনৈতিক চেহারাটা যতই পরিবর্তনশীল বলে মনে হোক না কেন, সুদূর পুরাকাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তার সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত থেকেছে। সে সমাজ-কাঠামোর খুঁটি হল হস্তচালিত তাঁত আর চরকা, যা থেকে নিয়মিতভাবে তাঁতী আর সুতোকাটুনির অক্ষৌহিণী সৃষ্টি হয়ে চলেছে। স্মরণাতীত কাল থেকে ইউরোপ ভারতীয় শ্রমের অপূর্ব বস্ত্র পেয়ে এসেছে এবং তার বদলে পাঠিয়েছে তার বহুমূল্য ধাতু। সে ধাতু পেঁছিয়েছে ভারতের স্বর্ণকারের কাছে, ভারতীয় সমাজের এক আবশ্যিক সদস্য সে — এ সমাজে অলংকার-প্রিয়তা এত বেশি যে নিম্নতম শ্রেণীর লোকেরা পর্যন্ত, যারা প্রায় নগ্নগায়ে ঘোরে তারাও সাধারণত এক জোড়া সোনার মাকড়ি আর গলায় কোনো না কোনো রকমের সোনার গহনা পরে। হাত-পায়ের আঙুলে আংটি পরাও খুব চল। নারী ও ছেলেমেয়েরা প্রায়ই পরে ভারি ভারি কঙ্কণ আর সোনারুপোর মল, এবং ঘরে দেখতে পাওয়া যায় সোনারুপোর তৈরি দেবদেবীর মূর্তি। বৃটিশ হামলাদাররাই এসে ভারতীয় তাঁত ভেঙে ফেলে, ধ্বংস করে চরকা। ইংলণ্ড শুরু করে ইউরোপের বাজার থেকে ভারতীয় তুলাবস্ত্রকে বিতাড়ন করে; অতঃপর সে হিন্দুস্তানে সুতা পাঠাতে থাকে এবং পরিশেষে তুলার মাতৃভূমিকেই কার্পাস বস্ত্র চালান দিয়ে ভাসিয়ে দেয়। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত গ্রেট বৃটেন থেকে ভারতে সুতা চালানের অনুপাত বেড়ে ওঠে ১ থেকে ৫,২০০ গুণ। ১৮২৪ সালে ভারতে বৃটিশ মসলিনের চালান ১০,০০,০০০ গজও প্রায় নয়, অথচ ১৮৩৭ সালে তা ৬,৪০,০০,০০০ গজও ছাড়িয়ে যায়। অথচ একই সময়ে ঢাকার জনসংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে ২০,০০০-এ নেমে আসে। শিল্পের জন্যে বিখ্যাত এই সব ভারতীয় শহরগুলির অবক্ষয়টুকুই কিন্তু সর্বনিকৃষ্ট ফলাফল নয়। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কৃষি ও হস্তচালিত শিল্পের যে ঐক্য ছিল বৃটিশ বাষ্প ও বিজ্ঞান তাকে উন্মূলিত করে দিয়েছে।

এই দুটি অবস্থা — একদিকে সকল প্রাচ্যবাসীর মতো হিন্দু কর্তৃক তার কৃষি ও বাণিজ্যের প্রাথমিক সর্তস্বরূপ বড়ো বড়ো পূর্তকর্মের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর অর্পণ, এবং অন্যদিকে সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এবং কৃষি ও শিল্পোদ্যোগের ঘরোয়া বন্ধনে তাদের ছোটো ছোটো কেন্দ্রে জোট বন্ধন — এই দুইটি অবস্থায় প্রাচীনতম কাল থেকে একটা বিশেষ চরিত্রের সমাজ-ব্যবস্থা — তথাকথিত **গ্রাম-ব্যবস্থার** সৃষ্টি করেছে, তাতে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি সম্মিলন পেয়েছে স্বাধীন সংগঠন ও বিশিষ্ট জীবনধারা। এই ব্যবস্থার বিশিষ্ট চরিত্র বোঝা যাবে ভারত বিষয়ে বৃটিশ কমন্স সভার একটি পুরনো সরকারী দলিলের নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে:

'ভৌগোলিকভাবে দেখলে একটি গ্রাম হল কয়েক শত বা কয়েক হাজার একর আবাদী বা পতিত জমির এক একটি অঞ্চল; রাজনৈতিকভাবে দেখলে তার ধরনটা কর্পোরেশন বা পৌর গোষ্ঠীর মতো। তার পরিচালক ও সেবকদের ব্যবস্থাপনা নিম্নোক্ত ধরনের: **পটেল** [potail] অথবা প্রধান মণ্ডল, তার ওপর সাধারণত গ্রামের অবস্থা-ব্যবস্থার তদারক করার ভার, অধিবাসীদের মধ্যেকার ঝগড়ার সে মীমাংসা করে, পুলিসের কাজ দেখে, এবং স্ব-গ্রামের অভ্যন্তর থেকে রাজস্ব-সংগ্রহের কাজ চালায়—ব্যক্তিগত প্রভাব এবং গ্রামবাসীদের অবস্থা ও স্বার্থের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে এ দায়িত্বের পক্ষে সে হয় সবচেয়ে উপযোগী। **কার্নম** [kurnum] চাষের হিসাব রাখে এবং চাষ সংক্রান্ত সবকিছু নথিবদ্ধ করে। তৈল্যার [tallier] আর তোত্তী [totie] — প্রথম জনের কাজ অপরাধাদির সংবাদ সংগ্রহ এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তর গমনাগমনে লোকজনকে পেঁছে দেওয়া ও রক্ষা করা; অপর জনের এখতিয়ার গ্রামেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়, অন্যান্য কাজ ছাড়াও তার কাজ হল শস্য পাহারা দেওয়া এবং তার পরিমাপে সাহায্য করা। **সীমানাদার** — তার কাজ গ্রামের সীমানা রক্ষা এবং কলহ উপস্থিত হলে সীমানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া। জলাশয় ও জলপ্রণালীর তত্ত্বাবধায়ক কৃষির জন্যে জলের বিলি ব্যবস্থা করে। ব্রাহ্মণ করে গ্রামের পুজো-অর্চনা। গুরু মশায়কে দেখা যায় গ্রামের ছেলেপিলেদের বালির উপর লিখতে পড়তে শেখাচ্ছেন। পঞ্জিকা-ব্রাহ্মণ অথবা জ্যোতিষী ইত্যাদি। এই সব পরিচালক ও সেবকদের নিয়েই সাধারণত গ্রামের ব্যবস্থাপনা; কিন্তু দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে সে ব্যবস্থাপনা এত প্রসারিত নয়, উপরিকথিত দায়-দায়িত্বের কতকগুলি একই ব্যক্তি পালন করে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে উপরিকথিত লোক ছাড়াও অনেক বেশি লোক দেখা যায়। এই প্রাথমিক ধরনের পৌরশাসনের আওতায় স্মরণাতীত কাল থেকে এ দেশবাসী বাস করে আসছে। গ্রামের সীমানা বদল হয়েছে ক্বচিৎ; এবং যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা মারীমড়কে গ্রামগুলি ক্ষতিগ্রস্ত এমন কি বিধ্বস্ত হলেও সেই একই নাম, একই সীমানা, একই স্বার্থ, এমন কি একই পরিবারসমূহ চলে এসেছে যুগের পর যুগ। রাজ্যের ভাঙাভাঙি ভাগবিভাগ নিয়ে অধিবাসীরা মাথা ঘামায় না; গ্রামটি অখণ্ড হয়ে থাকলেই হল, কোন শক্তির কাছে তা গেল, কোন সম্রাটের তা করায়ত্ত হল এ নিয়ে তারা ভাবে না—গ্রামের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি অপরিবর্তিতই থাকে। সেই একই পটেল থাকে প্রধান মণ্ডল তথা ক্ষুদে বিচারপতি বা শাসনকর্তা এবং গ্রামের কর আদায়ের কাজ সে তখনো চালিয়ে যায়।'

এই সব ছোটো ছোটো বাঁধিগৎ ধরনের সামাজিক সত্তাগুলি বহুলাংশে ভেঙে গেছে ও অদৃশ্য হয়ে চলেছে, সেটা বৃটিশ ট্যাক্স-সংগ্রাহক ও বৃটিশ সৈন্যের বর্বর হস্তক্ষেপের ফলে তত নয় যতটা ইংরেজের বাষ্প ও ইংরেজের অবাধ বাণিজ্যের ক্রিয়ায়। ঐ সব পারিবারিক গোষ্ঠীগুলির ভিত্তি ছিল কুটির শিল্প — হাতে কাটা সুতা, হাতে বোনা

কাপড় ও হাতে করা চাষের এমন এক বিশিষ্ট সমন্বয়, যা থেকে তারা পেত আত্মনির্ভর শক্তি। ইংরেজের হস্তক্ষেপ সুতাকাটুনির স্থান করেছে ল্যাংকাশায়ারে এবং তাঁতীর স্থান রেখেছে বাংলায়, অথবা হিন্দু সুতাকাটুনি ও তাঁতী উভয়কেই নিশ্চিহ্ন করে এই সব ছোটো ছোটো অর্ধবর্বর, অর্ধসভ্য গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়েছে তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে উড়িয়ে দিয়ে এবং এই ভাবে যে **সামাজিক** বিপ্লব সংঘটিত করেছে সেটা এশিয়ায় যা শোনা গেছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ, সত্যি কথা বললে একমাত্র বিপ্লব।

ঐ সব লক্ষ লক্ষ শ্রমপরায়ণ পিতৃতান্ত্রিক ও নিরীহ সামাজিক সংগঠনগুলি অসংগঠিত হয়ে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ডুবছে দুর্দশার এক সমুদ্রে, সে সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে যুগপৎ তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জীবিকার্জনের বংশানুক্রমিক উপায় — দেখতে এটা মানবিক অনুভূতির কাছে যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, এ কথা যেন না ভুলি যে এই সব শান্ত-সরল [idyllic] গ্রাম-গোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই দৃঢ় ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, মনুষ্য-মানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত কিছু মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা। যে বর্বর আত্মপরতা কোনো একটা শোচনীয় ভূমিখণ্ড আঁকড়ে শান্তভাবে প্রত্যক্ষ করে গেছে সাম্রাজ্যের পতন, অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান, বড়ো শহরের অধিবাসীগণের হত্যাকাণ্ড, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর চাইতে বেশি কিছু ভাবেনি এদের; এবং দৈবাৎ আক্রমণকারীর লক্ষ্যপথে পড়লে যা নিজেও হয়ে উঠেছে আক্রমণকারীর এক অসহায় শিকার, সে আত্মপরতার কথা যেন না ভুলি। যেন না ভুলি যে এই হীন, অচল ও উদ্ভিদ্-সুলভ জীবন, এই নিষ্ক্রিয় ধরনের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে, তার পাল্টা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য লক্ষ্যহীন এক অপরিসীম ধ্বংসশক্তি এবং হত্যাব্যাপারটিকেই হিন্দুস্তানে পরিণত করেছে এক ধর্মীয় প্রথায়। যেন না ভুলি যে ছোটো ছোটো এই সব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদপ্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের অবস্থার পদানত, স্বয়ং-বিকশিত একটি সমাজ-ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এই ভাবে আমদানি করেছে প্রকৃতির এমন পূজা যা পশু করে তোলে লোককে, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানদেব রূপী বানর এবং শবলাদেবী রূপী গরুর অর্চনায় ভূলুণ্ঠিত করে অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে।

এ কথা সত্য যে, ইংলণ্ড হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং সে স্বার্থসাধনে তার আচরণ ছিল

নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল: এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংলণ্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলণ্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।

তাহলে, আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির কাছে প্রাচীন এক জগতের ভেঙে পড়ার দৃশ্য যত কটু লাগুক, ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের অধিকার রয়েছে গ্যেটের সঙ্গে ঘোষণা করার:

'Sollte diese Qüal uns quälen,
Da sie unsre Lust vermehrt,
Hat nicht Myriaden Seelen
Timur's Herrschaft aufgezehrt?'*

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৩ সালের
১০ই জুন লিখিত
New-York Daily Tribune পত্রিকায়
১৮৫৩ সালের ২৫শে জুন প্রকাশিত

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
ইংরেজী থেকে ভাষান্তর

* 'এ নির্যাতন থেকে যদি পাই এক বৃহত্তম সুখ, তবে কেন সেজন্যে মনঃপীড়া? তৈমুরের শাসনের মাধ্যমে কি হয়নি আত্মার অশেষ নির্বাণ?' গ্যেটের Westöstlicher Diwan, *An Suleika* থেকে। — সম্পাঃ

কার্ল মার্কস

ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল

লণ্ডন, শুক্রবার, ২২শে জুলাই, ১৮৫৩

...ইংরেজ প্রভুত্ব ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল কী করে? মহা মোগলের একচ্ছত্র ক্ষমতা ভেঙে ফেলেছিল মোগল শাসনকর্তারা। শাসনকর্তাদের ক্ষমতা চূর্ণ করল মারাঠারা। মারাঠাদের ক্ষমতা ভাঙল আফগানরা; এবং সবাই যখন সবার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত, তখন প্রবেশ করল বৃটেন এবং সকলকেই অধীন করতে সক্ষম হল। দেশটা শুধু হিন্দু আর মুসলমানেই বিভক্ত নয়, বিভক্ত উপজাতিতে, বর্ণাশ্রমজাতিভেদে; এমন একটা স্থিতিসাম্যের ভিত্তিতে সমাজটার কাঠামো গড়ে উঠেছিল যা এসেছে সমাজের সকল সভ্যদের মধ্যস্থ একটা সাধারণ বিরাগ ও প্রথাবদ্ধ পরস্পর বিচ্ছিন্নতা থেকে; — এমন একটা দেশ ও এমন একটা সমাজ, সে কি বিজয়ের এক অবধারিত শিকার হয়েই ছিল না? হিন্দুস্তানের অতীত ইতিহাস না জানলেও অন্তত এই একটি মস্ত ও অবিসংবাদী তথ্য তো রয়েছে যে এমন কি এই মুহূর্তেও ভারত ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়ে আছে ভারতেরই খরচে পোষিত এক ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারাই! বিজিত হবার নিয়তি ভারত তাই এড়াতে পারত না; এবং তার অতীত ইতিহাস বলতে যদি কিছু থাকে তো তার সবখানি হল পরপর বিজিত হবার ইতিহাস। ভারত সমাজের কোনো ইতিহাসই নেই — অন্তত জানা কোনো ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস বলে যা বলি, সে শুধু একের পর এক বহিরাক্রমণকারীর ইতিহাস, যারা ঐ অপ্রতিরোধী ও অপরিবর্তমান সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিত্তিতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছে। ভারত বিজয়ের অধিকার ইংরেজের ছিল কিনা, এটা তাই প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন এই, তুর্কী, পারসীক কি রুশদের দ্বারা ভারত বিজয় কি বৃটেনদের দ্বারা ভারত বিজয়ের চেয়ে শ্রেয় বলে ভাবব?

ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলণ্ডকে; একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক — পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা।

আরবী, তুর্কী, তাতার, মোগল যারা একের পর এক ভারত প্লাবিত করেছে তারা অচিরেই **হিন্দুভূত হয়ে গেছে;** ইতিহাসের এক চিরন্তন নিয়ম অনুসারে বর্বর বিজয়ীরা নিজেরাই বিজিত হয়েছে তাদের প্রজাদের উন্নততর সভ্যতায়। ব্রিটিশেরাই হল প্রথম বিজয়ী যারা হিন্দু সভ্যতার চেয়ে উন্নত এবং সেই হেতু তার কাছে অনধিগম্য। দেশীয় গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়ে, দেশীয় শিল্পকে উন্মূলিত করে এবং দেশীয় সমাজে যা কিছু মহৎ ও উন্নত ছিল তাকে সমতল করে দিয়ে ব্রিটিশেরা সে সভ্যতাকে চূর্ণ করে। তাদের ভারত শাসনের ঐতিহাসিক পাতাগুলো থেকে এই ধ্বংসের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় না বললেই হয়। স্তূপাকৃতি ধ্বংসের মধ্য থেকে উজ্জীবনের ক্রিয়া প্রায় লক্ষ্যেই পড়ে না। তা সত্ত্বেও সে ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

এ উজ্জীবনের প্রথম সর্ত হল ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য — মোগল-ই-আজম আমলের চেয়েও তা বেশি সংহত ও দূরপ্রসারিত। ব্রিটিশ তরবারি দ্বারা আরোপিত সেই ঐক্য এখন বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ দ্বারা দৃঢ়ীভূত ও স্থায়ী হবে। দেশীয় যে সৈন্যবাহিনী ব্রিটিশ ড্রিল-সার্জেণ্টদের দ্বারা সংগঠিত ও সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছে তা ভারতীয় আত্মমুক্তির এবং বহিরাগত যে কোনো আক্রমণকারীর শিকার হওয়া থেকে অব্যাহতির *sine qua non**। এশীয় সমাজে এই প্রথম প্রবর্তিত এবং হিন্দু ইউরোপীয়ের সাধারণ যুগ্ম সন্তানদের দ্বারা যা প্রধানত পরিচালিত সেই স্বাধীন সংবাদপত্র হল পুনর্নির্মাণের এক নূতন ও শক্তিশালী কারিকা। জমিদার ও রায়তোয়ার যত ঘৃণ্যই হোক জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার দুটি বিশেষ রূপের সঙ্গে তারা জড়িত, যা হল এশীয় সমাজের মহান disideratum**। কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছাভরে ও কার্পণ্য সহকারে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠছে যারা শাসন পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত। ইউরোপের সঙ্গে ভারতের দ্রুত ও নিয়মিত যোগাযোগ এনে দিয়েছে বাষ্প, ভারতের প্রধান প্রধান বন্দরগুলিকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব মহাসমুদ্রের বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং ভারতের অচলায়তনের যা প্রাথমিক কারণ, সেই বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে তাকে পুনরুত্থিত করেছে। সেদিন দূরে নয়, যখন রেলওয়ে ও বাষ্পীয় পোতের সমন্বয়ে ভারত ও ইংলণ্ডে মধ্যেকার দূরত্ব সময়ের পরিমাপে কমে আসবে আট দিনে এবং এই একদা-রূপকথার দেশটা এই ভাবে সত্য করেই পাশ্চাত্য জগতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ভারতের প্রগতিতে এতদিন পর্যন্ত গ্রেট ব্রেটেনের শাসক শ্রেণীগুলির যা স্বার্থ ছিল

* অপরিহার্য সর্ত। — সম্পাঃ

** অপেক্ষিত আবশ্যিকতা। — সম্পাঃ

সেটা নিতান্ত আকস্মিক, অস্থায়ী ও ব্যতিরেকমূলক। অভিজাত শ্রেণী চেয়েছিল জয়, ধনপতিরা চেয়েছিল লুণ্ঠন, এবং মিল-তন্ত্রীরা চেয়েছিল শস্তায় বেচে বাজার দখল। কিন্তু এখন দান উল্টে গেছে। মিলতন্ত্রীরা আবিষ্কার করেছে যে উৎপাদনশীল দেশরূপে ভারতের রূপান্তর তাদের কাছে একান্ত জরুরী এবং সেই জন্যে সর্বাগ্রে সেচ ও আভ্যন্তরীণ পরিবহন-ব্যবস্থা তাকে দিতে হবে। এখন তাদের অভিপ্রায় ভারতের ওপর রেলওয়ের এক জাল বিস্তার করা। এবং সে কাজ তারা করবেই। তার ফল অপরিমেয় হতে বাধ্য।

এ কথা অতি সুবিদিত যে, ভারতের উৎপাদন-শক্তি পঙ্গু হয়ে আছে তার বিভিন্ন উৎপাদন-দ্রব্যের পরিবহন ও বিনিময় ব্যবস্থার একান্ত অভাবে। বিনিময় ব্যবস্থার অভাবের জন্যে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের মাঝখানে এমন সামাজিক নিঃস্বতা ভারতের চেয়ে বেশি আর কোথাও দেখা যায় না। বৃটিশ কমন্স সভার ১৮৪৮ সালে গঠিত একটি কমিটির কাছে প্রমাণিত হয়েছিল যে, 'খান্দেশে যখন এক কোয়ার্টার শস্য বিক্রি হচ্ছিল ৬ থেকে ৮ শিলিং মূল্যে তখন পুনায় তা বিক্রি হচ্ছিল ৬৪ থেকে ৭০ শিলিং দামে — সেখানে লোকে দুর্ভিক্ষে মরে পড়ে থাকছিল রাস্তায়, খান্দেশ থেকে সরবরাহ আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কেননা কাঁচা রাস্তায় গাড়ি অচল।'

যেখানে রেলপথ-বাঁধের প্রয়োজনে মাটি দরকার সেখানে পুকুর খুঁড়ে এবং বিভিন্ন লাইন বরাবর জল সরবরাহ করে রেলওয়ের প্রবর্তনকে সহজেই কৃষি-উদ্দেশ্যের সহায়ক করে তোলা সম্ভব। এই ভাবে প্রাচ্যের চাষ ব্যবস্থার যা অপরিহার্য সর্ত সেই সেচ ব্যবস্থা প্রভূত পরিমাণে বিস্তৃত করা যেতে পারে এবং জলাভাবে বারবার দেখা-দেওয়া স্থানীয় দুর্ভিক্ষগুলিকে রোধ করা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রেলওয়ের অসাধারণ গুরুত্ব স্পষ্ট হবে যদি মনে রাখি এমন কি ঘাটের নিকটবর্তী জেলাগুলিতে সেচহীন জমিগুলির তুলনায় সেচ-দেওয়া জমিগুলির কর তিন গুণ, কর্মসংস্থান দশ-বারো গুণ এবং মুনাফা বারো থেকে পনেরো গুণ বেশি।

রেলওয়ের ফলে সামরিক ব্যবস্থার আয়তন ও ব্যয় কমানোর উপায় হবে। ফোর্ট সেণ্ট উইলিয়মের টাউন মেজর কর্ণেল ওয়ারেন কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটির নিকট বলেন:

'বর্তমানে যত দিন এমন কি যত সপ্তাহ দরকার হয়, মাত্র তত ঘণ্টার মধ্যেই দেশের দূর অঞ্চল থেকে সংবাদ পেয়ে যাওয়া এবং আরো কম সময়ের মধ্যে সৈন্য ও রসদসহ নির্দেশ প্রেরণের সম্ভাব্যতা, এ বিবেচনা একটুও ছোট করে দেখা চলে না। বর্তমান অপেক্ষা আরো দূরবর্তী ও স্বাস্থ্যকর অঞ্চলগুলিতে সৈন্যদের রাখা যাবে এবং এতে করে রোগজনিত জীবনহানি বহু পরিমাণে কমানো যাবে। বিভিন্ন ডিপোতে রসদের এত বেশি প্রয়োজন থাকবে না, এবং জলবায়ুর কারণে রসদের ক্ষয়ক্ষতি ও নাশ পরিহার

করা সম্ভব হবে। সৈন্যবাহিনীর কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ অনুপাতে কমানো যাবে সৈন্যসংখ্যা।'

আমরা জানি, গ্রাম-গোষ্ঠীগুলির পৌর সংগঠন ও অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙে গেছে, কিন্তু এগুলির যা সর্বমন্দ দিক — বাঁধিগৎ ও বিচ্ছিন্ন কণিকায় সমাজের বিচূর্ণীভবন, সেটার প্রাণশক্তি এখনো বজায়। গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা থেকে সৃষ্টি ভারতে পথঘাটের অভাব এবং পথঘাটের অভাবের ফলে গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা হয়েছে চিরস্থায়ী। নিম্নতম মাত্রার সুযোগসুবিধার ওপর, গ্রাম গ্রামান্তরের সঙ্গে প্রায় কোনো যোগাযোগ ছাড়াই এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্যে যা অপরিহার্য তেমন আকাংক্ষা ও প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই এক একটি গোষ্ঠী বেঁচে এসেছে এই ছকের ওপর। গ্রামগুলির এই স্বপর্যাপ্ত **জাড্য** ভেঙে দিয়েছিল বৃটিশেরা, রেলপথ মেটাবে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের নতুন অভাববোধ। তাছাড়া, 'রেলপথ ব্যবস্থার অন্যতম ফল হবে — রেলপথ-প্রভাবিত প্রত্যেকটি গ্রামে অন্যান্য দেশের যন্ত্রপাতি ও কারিগরির জ্ঞান, এবং সে জ্ঞান লাভের উপায় সুলভ হবে, তার ফলে প্রথমত ভারতের বংশানুক্রমিক ও বৃত্তিভোগী গ্রাম্য কারিগরের পুরো যোগ্যতার পরখ হবে এবং অতঃপর তার ত্রুটি দূরীকরণের সাহায্য হবে' (চ্যাপম্যান, 'ভারতের তুলা ও বাণিজ্য')।

আমি জানি যে ইংরেজ মিলতন্ত্রীরা ভারতকে রেলপথ বিভূষিত করতে ইচ্ছুক শুধু এই লক্ষ্য নিয়ে যাতে তাদের কলকারখানার জন্যে কম দামে তুলা ও অন্যান্য কাঁচামাল নিষ্কাশিত করা যায়। কিন্তু যে দেশটায় লোহা আর কয়লা বর্তমান সে দেশের যাত্রায় (locomotion) যদি একবার যন্ত্রের প্রবর্তন করা যায় তাহলে সে যন্ত্র তৈরির ব্যবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। রেল চলাচলের আশু ও চলতি প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যা দরকার সে সব শিল্প ব্যবস্থা না করে বিপুল এক দেশের ওপর রেলপথের জাল-বিস্তার চালু রাখা যাবে না এবং তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে শিল্পের এমন সব শাখায় যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগ, রেলপথের সঙ্গে যার আশু সম্পর্ক নেই। তাই এই রেলপথই হবে ভারতে সত্যকার আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত। এ যে নিশ্চয় তা আরো স্পষ্ট এই কারণে যে *বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই স্বীকার করছে, একেবারে নতুন ধরনের শ্রম-ব্যবস্থার* সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং যন্ত্র সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করার মতো বিশেষ যোগ্যতা হিন্দুদের আছে। কলকাতা টাঁকশালে যে দেশীয় ইঞ্জিনিয়াররা অনেক বছর ধরে বাষ্পীয় যন্ত্রে কাজ করছেন তাঁদের সামর্থ্য ও নৈপুণ্য, হরিদ্বার কয়লা অঞ্চলে কতকগুলি বাষ্পীয় যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশীয়গণ এবং অন্যান্য দৃষ্টান্ত থেকে এ ঘটনার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুসংস্কারে ভয়ানক প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও মিঃ ক্যামবেল স্বয়ং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, 'ভারতের বিপুল জনগণের মধ্যে প্রভূত **শিল্প-ক্ষমতা** বর্তমান, পুঁজি সঞ্চয়ের মতো যোগ্যতা তাঁদের বেশ

আছে, গাণিতিকভাবে তাঁদের মাথা পরিচ্ছন্ন এবং অঙ্ক ও গাণিতিক বিজ্ঞানাদিতে তাঁদের প্রতিভা অতি উল্লেখযোগ্য।' উনি বলছেন, 'এঁদের মেধা চমৎকার।' রেল ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত আধুনিক শিল্পের ফলে শ্রমের বংশানুক্রমিক যে ভাগাভাগির ওপর ভারতের জাতিভেদপ্রথার ভিত্তি, ভারতীয় প্রগতি ও ভারতীয় ক্ষমতার সেই চূড়ান্ত প্রতিবন্ধক ভেঙে পড়বে।

ইংরেজ বুর্জোয়ারা বাধ্য হয়ে যা কিছুই করুক তাতে ব্যাপক জনগণের মুক্তি অথবা তাদের সামাজিক অবস্থার বাস্তব সংশোধন ঘটবে না — এগুলি শুধু উৎপাদন-শক্তির বিকাশের ওপরেই নয়, জনগণ কর্তৃক তাদের স্বত্ব-গ্রহণের ওপরেও নির্ভরশীল। কিন্তু এ দুটি জিনিসের জন্যেই বৈষয়িক পূর্বসর্ত স্থাপনের কাজ ইংরেজ বুর্জোয়ারা না করে পারবে না। তার বেশি কি বুর্জোয়ারা কখনো কিছু করেছে? রক্ত আর কাদা, দুর্দশা ও দীনতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবর্গ ও জাতিকে টেনে না নিয়ে বুর্জোয়ারা কি কখনো কোনো অগ্রগতি ঘটিয়েছে?

খাস গ্রেট বৃটেনেই যতদিন না শিল্পকারখানার প্রলেতারিয়েত কর্তৃক তার বর্তমান শাসক শ্রেণী স্থানচ্যুত হচ্ছে অথবা হিন্দুরা নিজেরাই ইংরেজের জোয়াল একেবারে ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয়দের মধ্যে বৃটিশ বুর্জোয়া কর্তৃক ছড়িয়ে দেওয়া এই সব নতুন সমাজ-উপাদানের ফল ভারতীয়রা পাবে না। যাই হোক নিঃসন্দেহে আশা করতে পারি, ন্যূনাধিক সুদূর ভবিষ্যতে দেখব এই মহান ও চিত্তাকর্ষক দেশটির পুনরুজ্জীবন, সেই দেশ যেখানকার শিষ্ট দেশবাসীরা — প্রিন্স সালতিকভের ভাষায় — এমন কি হীনতম শ্রেণীগুলির ক্ষেত্রেও 'plus fins et plus adroits que les Italiens',* যাদের পরাধীনতাও এক ধরনের শান্ত মহত্ত্ব দ্বারা প্রতিতুলিত (counterbalanced), স্বাভাবিক অনীহা সত্ত্বেও যারা বৃটিশ অফিসারদের চমৎকৃত করেছে তাদের সাহস দেখিয়ে, যাদের দেশটা হল আমাদের ভাষা ও আমাদের ধর্মের উৎসভূমি, এবং যাদের জাটদের মধ্যে আমরা পাই প্রাচীন জার্মান ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীকদের প্রতিরূপ।

উপসংহারের কিছু মন্তব্য না দিয়ে ভারত প্রসঙ্গে ছেদ টানতে পারছি না।

স্বদেশে যা ভদ্ররূপ নেয় এবং উপনিবেশে গেলেই যা নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেই বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগাঢ় কপটতা এবং অঙ্গাঙ্গি বর্বরতা আমাদের সামনে অনাবৃত। ওরা সম্পত্তির সমর্থক, কিন্তু বাংলায়, মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ে যে রকম কৃষি বিপ্লব হল তেমন কৃষি বিপ্লব কি কোনো বৈপ্লবিক দল কখনো সৃষ্টি করেছে? দস্যুচূড়ামণি স্বয়ং

* 'ইতালীয়দের চেয়ে মার্জিত ও পারদর্শী।' আ. দ. সালতিকভের বই Lettres sur l'Inde, Paris, 1848, p. 61 থেকে মার্কসের উদ্ধৃতি। — সম্পাঃ

লর্ড ক্লাইভের ভাষায়, ভারতবর্ষে যখন কেবল দুর্নীতি দিয়ে লালসার তাল ধরা যাচ্ছিল না, তখন কি ওরা নৃশংস জবরদস্তির পথ নেয়নি? জাতীয় ঋণের অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতার কথা নিয়ে ওরা যখন ইউরোপে বাগাড়ম্বর করছে তখন ভারতে কি তারা রাজাদের ডিভিডেন্ট বাজেয়াপ্ত করেনি — কোম্পানির নিজস্ব তহবিলেই যারা তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ঢেলেছিল? 'আমাদের পবিত্র ধর্ম' রক্ষার অছিলায় ওরা যখন ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়ছিল তখন একই সময়ে কি তারা ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করে দেয়নি, এবং উড়িষ্যা ও বাংলার মন্দিরগুলিতে ধাবমান তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে টাকা তোলার জন্যে জগন্নাথের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হত্যা ও গণিকাবৃত্তির ব্যবসায় চালায়নি? 'সম্পত্তি, শৃঙ্খলা, পরিবার ও ধর্মের' ধ্বজাধারী হল এরাই।

ইউরোপ-সদৃশ বিপুল, ১৫ কোটি একর এক ভূখণ্ডের দেশ ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে দেখলে বৃটিশ শিল্পের বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট এবং হতভম্ব করার মতো। কিন্তু ভোলা উচিত নয়, বর্তমানে যে-ভাবে সমগ্র উৎপাদন-পদ্ধতি সংগঠিত, ও হল তারই অঙ্গাঙ্গি ফলাফল। এ উৎপাদন দাঁড়িয়ে আছে পুঁজির চূড়ান্ত প্রভুত্বের ওপর। স্বাধীন শক্তি হিসাবে পুঁজির অস্তিত্বের জন্যে পুঁজির কেন্দ্রীভবন অত্যাবশ্যক। বর্তমানে প্রতিটি সুসভ্য শহরে অর্থনীতিশাস্ত্রের যে অন্তর্নিহিত অঙ্গাঙ্গি নিয়মগুলি কাজ করছে, বিশ্বের বাজারের ওপর এ কেন্দ্রীভবনের বিধ্বংসী প্রভাব শুধু সেই নিয়মগুলিকেই উদ্‌ঘাটিত করছে বিপুলতম আকারে। ইতিহাসের বুর্জোয়া যুগটার দায়িত্ব নতুন জগতের বৈষয়িক ভিত্তি সৃষ্টি করা -- একদিকে মানবজাতির পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বময় যোগাযোগ, এবং সে যোগাযোগের উপায়; অন্যদিকে মানুষের উৎপাদন-শক্তির বিকাশ এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ওপর বৈজ্ঞানিক আধিপত্যরূপে বৈষয়িক উৎপাদনের রূপান্তর। ভূতাত্ত্বিক বিপ্লবে যেমন পৃথিবীর উপরিতল গঠিত হয়েছে, তেমনি বুর্জোয়া শিল্প ও বাণিজ্যে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন জগতের এই সব বৈষয়িক সর্ত। বুর্জোয়া যুগের ফলাফল, বিশ্বের বাজার এবং আধুনিক উৎপাদন-শক্তিকে যখন এক মহান সামাজিক বিপ্লব কব্জা করে নেবে এবং সর্বোচ্চ প্রগতিসম্পন্ন জাতিগুলির জনগণের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে সেগুলো টেনে আনবে, কেবল তখনই মানব-প্রগতিকে সেই বিকটাকৃতি আদিম দেবমূর্তির মতো দেখাবে না যে নিহতের মাথার খুলিতে ছাড়া সুধা পান করতে চায় না।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৩ সালের
২২শে জুলাই লিখিত
New-York Daily Tribune পত্রিকায়
১৮৫৩ সালের ৮ই আগস্ট প্রকাশিত

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
ইংরেজী থেকে ভাষান্তর

কার্ল মার্কস

'জনগণের সংবাদপত্রের'* বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা

১৮৪৮-এর তথাকথিত বিপ্লবগুলি হচ্ছে নগণ্য ঘটনামাত্র — এগুলি ছিল ইউরোপীয় সমাজের শুষ্ক আবরণে ছোট ছোট ভাঙ্গন ও ফাটল। অবশ্য তা পাতালের আভাস দিয়েছিল। সমাজের আপাত-কঠিন উপরিভাগের নিচে তরল বস্তু-সমুদ্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ে তাতে, যা স্ফীত হয়ে উঠলেই উপরের প্রস্তর কঠিন মহাদেশগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বিভ্রান্তভাবে এবং হৈচৈ করে এই বিপ্লবগুলি ঘোষণা করল প্রলেতারিয়েতের মুক্তিবার্তা, যা হল ঊনিশ শতকের এবং সে শতকের বিপ্লবের গূঢ় কথা। অবশ্য, এই সামাজিক বিপ্লবটি ১৮৪৮ সালে উদ্ভাবিত কোনো অভিনব সামগ্রী নয়। বাষ্প, বিদ্যুৎ ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নাগরিক বার্বে, রাস্পাই এবং ব্লাঙ্কির চেয়ে অনেক বেশী বিপজ্জনক চরিত্রের বিপ্লবী। কিন্তু, যে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আমরা আছি তা যে প্রত্যেকের উপর ২০,০০০ পাউণ্ড ওজনের চাপ দিচ্ছে, তা কি আপনারা অনুভব করেন? ১৮৪৮-এর পূর্বেকার ইউরোপীয় সমাজও অনুভব করেনি যে বৈপ্লবিক বায়ুমণ্ডল তাকে পরিবেষ্টিত করে চতুর্দিক থেকে তাকে চাপ দিচ্ছিল। আমাদের এই ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব হিসাবে একটি বিরাট সত্য রয়েছে, যাকে কোনো পার্টিই অস্বীকার করতে সাহস পায় না। একদিকে শুরু হয়েছে এমন শিল্প ও বৈজ্ঞানিক শক্তি যা মানুষের পূর্ববর্তী ইতিহাসের কোনো যুগেই কোনোদিন কল্পনাও করা যায়নি। অপরদিকে দেখা দিল ক্ষয়ের লক্ষণ, যা রোম সাম্রাজ্যের শেষাংশে অনুষ্ঠিত লিপিবদ্ধ বিভীষিকাকে অনেক ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের এ যুগে যেন সবকিছুর গর্ভেই তার

* 'জনগণের সংবাদপত্র' *(People's Paper)* — চার্টিস্টদের একটি সংবাদপত্র, ১৮৫২ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। — সম্পাঃ

বিপরীতের অস্তিত্ব। মানব-শ্রম লাঘবের ও তাকে ফলবান করার আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী যে যন্ত্র, সে যন্ত্রকে আমরা দেখছি মানব-শ্রমকেই উপবাসী রাখছে, তাকে অতিরিক্ত খাটাচ্ছে। সম্পদের নূতন উদ্ভাবিত উৎসগুলি যেন কোনো অদ্ভুত অপ্রাকৃত মায়ায় অভাবের কারণে পরিণত হচ্ছে। শিল্পকলার জয়যাত্রার মূল্য দিতে হচ্ছে যেন চরিত্রহীনতা দিয়ে। যে গতিতে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করছে, সেই গতিতেই যেন মানুষ অন্য মানুষের বা তার নিজেরই কলঙ্কের দাস হয়ে পড়ছে। এমন কি, বিজ্ঞানের পবিত্র আলোকও যেন অজ্ঞতার কৃষ্ণ পটভূমি ছাড়া দীপ্তি পায় না। আমাদের সমস্ত আবিষ্কার ও প্রগতির ফল যেন দাঁড়াচ্ছে বৈষয়িক শক্তিসমূহকে মানসক্রিয়ায় ভূষিত করা এবং মানব-জীবনকে বৈষয়িক শক্তির স্তরে নামিয়ে আনা। একদিকে আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞান এবং অপরদিকে বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা ও অবক্ষয়ের এই যে বিরোধ, আমাদের যুগে উৎপাদন-শক্তি ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যকার এই বিরোধ এমন এক সত্য যা জাজ্বল্যমান, সর্বগ্রাসী, অবিসংবাদী। কোনো কোনো পার্টি এর জন্য বিলাপ করতে পারে; অন্যেরা হয়তো বর্তমান বিরোধের হাত থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে আধুনিক শিল্পের হাত থেকেই মুক্তি চায়। অথবা তারা এমন কল্পনাও করতে পারে যে, শিল্পক্ষেত্রের এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি রাজনীতি ক্ষেত্রের একইরকম উল্লেখযোগ্য পশ্চাদগতি দিয়েই সম্পূর্ণ করতে হবে। আমাদের পক্ষ থেকে বলতে গেলে, এই সমস্ত বিরোধের মধ্যে যে সুচতুর চেতনার প্রকাশ বরাবর দেখা যাচ্ছে, তার রূপনির্ধারণে আমরা ভুল করি না। আমরা জানি, সমাজের এই নবোদিত শক্তিসমূহ যথোচিতভাবে কার্যকরী হবার জন্য দরকার শুধু নবোদিত মানুষের কর্তৃত্ব আর তেমন মানুষ হল শ্রমিক মানুষ। যন্ত্র যেমন আধুনিক যুগের আবিষ্কার, এরাও ঠিক তেমনই। মধ্য শ্রেণী, অভিজাত শ্রেণী এবং পশ্চাদগতির শোচনীয় পয়গম্বরেরা যে সংকেত দেখে বিভ্রান্ত বোধ করে তারই মধ্যে আমরা চিনে নিই আমাদের সেই বীর বন্ধু রবিন গুডফেলো-কে*, সেই বুড়ো ছুঁচোকে যে অতি দ্রুত মাটির মধ্যে কাজ করে, সেই যোগ্য পথিকৃৎ -- বিপ্লবকে। আধুনিক যন্ত্রশিল্পের অগ্রজ সন্তান হচ্ছে ইংরেজ শ্রমিকেরা। তাই তারা নিশ্চয়ই সে বিপ্লবকে সাহায্য করতে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকবে না, যে সামাজিক বিপ্লব জন্ম লাভ করছে এই শিল্প থেকেই; যে বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তাদেরই নিজস্ব শ্রেণীর মুক্তি; যে বিপ্লব পুঁজির শাসন ও মজুরি দাসত্বের মতোই সর্বজনীন। আমি জানি, গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইংরেজ

---

* রবিন গুডফেলো — বিদেহী আত্মা জনসাধারণকে সাহায্য করত বলে ষোলো ও সতেরো শতাব্দীতে ইংলন্ডে লোকের বিশ্বাস ছিল। শেক্সপিয়রের 'গ্রীষ্মকালীন রাত্রের এক স্বপ্ন' *(A Midsummer Night's Dream)* এই কৌতুক নাট্যের অন্যতম প্রধান চরিত্র এটি। — সম্পাঃ

শ্রমিক শ্রেণী চলেছে, যদিও মধ্য শ্রেণীর ঐতিহাসিকের দ্বারা বিস্মৃতির অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত ও উপেক্ষিত হওয়ার দরুণ সে সংগ্রামগুলি অপেক্ষাকৃত কম গৌরব অর্জন করতে পেরেছে। শাসক শ্রেণীর দুষ্কৃতির প্রতিশোধ নেবার জন্য মধ্যযুগে জার্মানিতে 'ভেমগেরিখট' নামে একটি গুপ্ত বিচারমঞ্চ ছিল। যদি কোনো বাড়িতে লাল-ক্রস চিহ্ন দেখা যেত তবে লোকে বুঝত যে, এই 'ভেম' সে বাড়ির মালিককে দোষী সাব্যস্ত করেছে। আজ ইউরোপের প্রতিটি সৌধই রহস্যজনক সেই লাল-ক্রসে চিহ্নিত। ইতিহাস এখানে বিচারক, আর দণ্ডদাতা হল প্রলেতারিয়েত।

১৮৫৬ সালের ১৪ই এপ্রিলে
ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত মার্কসের বক্তৃতা
People's Paper পত্রিকায়
১৯শে এপ্রিল, ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত

সংবাদপত্রটির মূল পাঠ অনুযায়ী
ইংরেজী থেকে ভাষান্তর

কার্ল মার্কস

'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' গ্রন্থের ভূমিকা

বুর্জোয়া অর্থনীতির মতবাদকে আমি বিচার করেছি নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে: **পুঁজি, ভূসম্পত্তি, মজুরি শ্রম; রাষ্ট্র, বৈদেশিক বাণিজ্য, বিশ্ব-বাজার।** যে তিনটি বৃহৎ শ্রেণীতে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ বিভক্ত, প্রথম তিনটি শিরোনামায় আমি সেই শ্রেণী-তিনটির জীবনের অর্থনৈতিক শর্ত সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছি; বাকি তিনটি শিরোনামার মধ্যে যে একটা পারস্পরিক যোগাযোগ আছে সেটা একনজরেই প্রত্যক্ষ। প্রথম বইয়ের প্রথম অংশে, যাতে পুঁজি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদগুলি আছে: ১। পণ্য, ২। মুদ্রা অথবা সরল সঞ্চালন, ৩। সাধারণ পুঁজি। প্রথম পরিচ্ছেদ দুটি হল বর্তমান অংশের বিষয়বস্তু। গোটা বিষয়টি আমার কাছে রয়েছে খণ্ড খণ্ড রচনা হিসাবে, এগুলি লেখা হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে, দীর্ঘ ব্যবধানে, নিজের ধারণা স্পষ্ট করার জন্য, প্রকাশনার জন্য নয়। উপরিলিখিত পরিকল্পনা অনুযায়ী এগুলির সুসংবদ্ধ পরিব্যাখ্যান নির্ভর করবে বাইরেকার অবস্থার উপরে।

যে সাধারণ ভূমিকাটি আমি খসড়া করে রেখেছিলাম সেটি আমি বাদ দিচ্ছি; কেননা, আরো ভাল করে ভেবে দেখার পর আমার মনে হচ্ছে যে এখনো যেসব ফলাফল সপ্রমাণ হয়নি সেগুলি আগে থেকে অনুমান করে নেওয়া অস্বস্তিকর আর তাছাড়া যে পাঠক মোটামুটিভাবে আমাকে অনুসরণ করতে চান তাঁকে বিশেষ বিষয় থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে আরোহণের জন্য তৈরী থাকতে হবে। অন্যদিকে অর্থশাস্ত্রের বিষয়ে আমার অধ্যয়নের ধারা সম্বন্ধে এখানে কিছু বললে হয়তো তা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে।

আমি আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করেছিলাম, অবশ্য দর্শন ও ইতিহাস পাঠের সঙ্গে সঙ্গে একটি গৌণ বিষয় হিসাবেই আমি তার চর্চা করতাম। ১৮৪২-৪৩ সালে *Rheinische*

*Zeitung** পত্রিকার সম্পাদকরূপে তথাকথিত বৈষয়িক স্বার্থের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার বিড়ম্বনা আমার এই প্রথম হল। কাঠচুরি ও ভূসম্পত্তির বিখণ্ডীকরণ সম্বন্ধে রাইন প্রাদেশিক সভায় (***Rheinish Landtag***) কার্যবিবরণী; মোসেল অঞ্চলে কৃষকদের অবস্থা নিয়ে *Rheinische Zeitung*-এর বিরুদ্ধে রাইন প্রদেশের তদানীন্তন সর্বাধ্যক্ষ হের ফন শাপার কর্তৃক আরব্ধ সরকারী তর্কযুদ্ধ; এবং সর্বশেষে অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ শুল্ক বিষয়ক বিতর্কাবলী থেকে অর্থনৈতিক বিষয়ে আমার মনোনিবেশ করার প্রথম সুযোগ এনে দেয়। অন্যদিকে, যে-সময় বিষয়ের জ্ঞানের চেয়ে 'এগিয়ে যাবার' সদিচ্ছা ছিল অনেক বেশি, সেই সময়ে *Rheinische Zeitung*-এ শোনা যেত ফরাসী সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের দার্শনিকভাবে সামান্য ছোপলাগা প্রতিধ্বনি। এই অপেশাদারিপনার বিরুদ্ধে আমি দাঁড়ালাম, কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে *Allgemeine Augsburger Zeitung*-এর** সঙ্গে এক বিতর্কে একথাও আমি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছিলাম যে, আমার পূর্বকার পড়াশুনা এমন নয় যাতে ফরাসী ঝোঁকগুলির অন্তর্বস্তু সম্বন্ধে কোনো মতামত দিতে আমি সাহসী হতে পারি। বরঞ্চ, *Rheinische Zeitung*-এর পরিচালকরা যে মোহের বশবর্তী হয়ে ভাবছিলেন যে কাগজটিতে দুর্বলতর মনোভাব প্রকাশ করলে তার প্রতি প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের হাত এড়ানো যাবে, সাগ্রহে সেই মোহের সুযোগ নিয়ে আমি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে পাঠাগারে আশ্রয় নিলাম।

যে সন্দেহে আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম, তার সমাধানের জন্য প্রথম যে কাজটি আমি হাতে নিলাম তা হল অধিকার সম্বন্ধে হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনামূলক পর্যালোচনা। এই লেখার ভূমিকাটি মুদ্রিত হয়েছিল ১৮৪৪-এ প্যারিসে প্রকাশিত *Deutsch-Französische Jahrbücher**** পত্রিকায়। আমার অনুসন্ধান থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে বিভিন্ন আইনগত সম্পর্কের তথা বিভিন্ন রাষ্ট্র রূপের অনুধাবন করতে হলে, সেই সম্পর্ক ও রূপ দেখেই বা মানব-মনের তথাকথিত সাধারণ বিকাশ

* *Rheinische Zeitung* — ১৮৪২-৪৩-এ কলোনে প্রকাশিত একটি র‍্যাডিকেল দৈনিক সংবাদপত্র; ১৫ই অক্টোবর, ১৮৪২ থেকে ১৮ই মার্চ, ১৮৪৩ পর্যন্ত মার্কস এর সম্পাদক ছিলেন। — সম্পাঃ

** *Allgemeine Augsburger Zeitung* ('সাধারণ পত্রিকা') — জার্মান প্রতিক্রিয়াশীল দৈনিক পত্রিকা, ১৭৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। ১৮১০ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত আউগসবুর্গে প্রকাশিত হয়। ১৮৪২ সালে ইউটোপীয় কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের ধারণা বিকৃত করে পত্রিকাটি আক্রমণ শুরু করে। মার্কস তার জবাব দেন 'কমিউনিজম ও আউগসবার্গী *Allgemeine Zeitung*' নামক প্রবন্ধে যেটা প্রকাশিত হয় ১৮৪২ সালের অক্টোবর মাসে *Rheinische Zeitung* পত্রিকায়। — সম্পাঃ

*** *Deutsch-Französische Jahrbücher* — বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট প্রচারের মুখপত্র, ১৮৪৪-এ প্যারিসে মার্কস কর্তৃক প্রকাশিত। — সম্পাঃ

দেখেই তা করা সম্ভব হয় না; এদের মূল রয়েছে বরং মানব-জীবনের বৈষয়িক অবস্থার মধ্যে, যার সমস্তটাকে একত্র করে হেগেল আঠারো শতকের ইংরেজ ও ফরাসীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে নাম দিয়েছেন 'পৌরসমাজ' ('Civil Society'), কিন্তু এই পৌরসমাজের শারীর-সংস্থান খুঁজে বার করতে হবে আবার অর্থশাস্ত্রে। শেষোক্ত ব্যাপারে অধ্যয়ন আমি শুরু করি প্যারিসে, ও তারপর অনুসন্ধান চালিয়ে যাই ব্রাসেলস-এ: মসিয়ে গিজোর বহিষ্কার আদেশের ফলে সেখানেই আমাকে দেশান্তরিত হতে হয়। অনুসন্ধানের ফলে যে সাধারণ সিদ্ধান্তে আমি পেঁছিলাম, এবং ধরতে পারার পর থেকে যাকে আমি আমার অধ্যয়নের পথ-নির্দেশিকা সূত্র হিসাবে কাজে লাগিয়েছি, সংক্ষেপে তাকে এইভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে: মানব-জীবনের সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে মানুষ জড়িত হয় কতগুলি অনিবার্য ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ নির্দিষ্ট সম্পর্কে, উৎপাদন-সম্পর্কে, যা মানুষের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের অনুরূপ। এই উৎপাদন-সম্পর্কগুলির সমষ্টি হল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, সেই আসল বনিয়াদ, যার উপর গড়ে ওঠে আইনগত আর রাজনৈতিক উপরিকাঠামো এবং সামাজিক চেতনার নির্দিষ্ট রূপগুলি হয় তারই অনুরূপ। বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধতিই সাধারণভাবে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন-প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। মানুষের সত্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং ঠিক বিপরীতভাবে, মানুষের সামাজিক সত্তাই নির্ধারিত করে তার চেতনাকে। সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তি বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে এলে তার সঙ্গে সংঘাত লাগে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের, অর্থাৎ, আইনানুগ ভাষা ব্যবহার করলে বলতে হয়, সংঘাত লাগে এতদিন যে সম্পত্তি-সম্পর্কের মধ্যে থেকে উৎপাদন-শক্তি সক্রিয় ছিল তারই সঙ্গে। সে সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের রূপ থেকে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় উৎপাদন-শক্তির শৃঙ্খলে। তারপর শুরু হয় সামাজিক বিপ্লবের এক যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদ পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিরাট উপরিকাঠামোও কম-বেশী দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই রূপান্তরগুলি বিচার করতে গেলে, উৎপাদনের অর্থনৈতিক যে পরিস্থিতির বৈষয়িক রূপান্তর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসুলভ সূক্ষ্মতার সঙ্গেই নিরূপণ করা যায় তা থেকে পৃথক করে দেখতে হবে আইনগত, রাজনীতিগত, ধর্মগত, নন্দনতত্ত্বগত বা দর্শনগত, সংক্ষেপে বলতে গেলে ভাবাদর্শগত রূপগুলিকে, যার মাধ্যমে মানুষ এ সংঘাত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে ও লড়াই করে তার নিষ্পত্তি করে। যেমন ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নির্ভর করে না সে ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে কী ভাবে তার উপর, তেমনি কোনো রূপান্তরের সময়কালকে সে যুগের স্বকীয় চেতনা দিয়ে আমরা বিচার করতে পারি না; বিপরীত-পক্ষে, সেই চেতনাকেই ব্যাখ্যা করতে হবে বৈষয়িক জীবনের বিরোধিতা দিয়ে, সামাজিক উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যকার সংঘর্ষ দিয়ে। কোনো সামাজিক ব্যবস্থার

মধ্যে যতটা উৎপাদন-শক্তির স্থান হতে পারে তার সমস্ত কিছুর বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত সে সামাজিক ব্যবস্থার কখনও বিলুপ্তি ঘটে না; আর নতুন উন্নততর উৎপাদন-সম্পর্কের আবির্ভাবও আসতে পারে না যতক্ষণ না পুরনো সমাজের গর্ভের মধ্যেই তেমন সম্পর্কের অস্তিত্বের বৈষয়িক শর্ত পরিপক্ক হয়ে উঠছে। সুতরাং, মানবজাতি সর্বদা সেই কর্তব্যেই প্রবৃত্ত হয় যার সমাধান সম্ভব; কেননা, বিষয়টির প্রতি আরো গভীর দৃষ্টি দিলে সর্বদাই দেখা যাবে যে, কর্তব্যটাই দেখা দেয় শুধু তখন যখন তা সমাধানের বৈষয়িক শর্তগুলো ইতিমধ্যেই বর্তমান কিংবা অন্তত গড়ে উঠতে শুরু করেছে। সাধারণ রূপরেখা হিসাবে এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততন্ত্রীয় ও আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতিগুলিকে সমাজের অর্থনৈতিক রূপগঠনের ক্রমাগ্রসর পর্যায় বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কগুলি হচ্ছে সামাজিক উৎপাদন-প্রণালীর শেষ বৈরভাবাপন্ন রূপ, ব্যক্তিমানুষের বিরোধের অর্থে বৈরভাব নয়, ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার সামাজিক অবস্থার মধ্য থেকে উদ্ভূত বৈরভাব; এর সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়া সমাজের গর্ভে বিকাশমান উৎপাদন-শক্তিসমূহ সেই বৈরভাবের সমাধানের বৈষয়িক অবস্থাও সৃষ্টি করে। সুতরাং, এই সমাজ-গঠন তাই মানব-সমাজের প্রাকইতিহাসের সমাপ্তি ঘটাচ্ছে।

অর্থনৈতিক সংজ্ঞা-বিভাগের (economic categories) সমালোচনা প্রসঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর চমৎকার স্কেচটি (*Deutsch Französische Jahrbücher* পত্রিকায়) প্রকাশের পর থেকে পত্রালাপের মাধ্যমে আমি সর্বদাই তাঁর সঙ্গে ভাব-বিনিময় রক্ষা করেছি, তিনিও অন্য পথ দিয়ে (তাঁর *The Condition of the Working Class in England in 1844* মিলিয়ে দেখুন) আমার মতো একই ফলাফলে উপনীত হয়েছিলেন। তাই ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে যখন তিনিও ব্রাসেল্স-এ এসে বসবাস করতে লাগলেন, তখন আমরা স্থির করলাম যে, জার্মান দর্শনের ভাবাদর্শগত মতামতের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্যটি আমরা যুক্তভাবে প্রস্তুত করব, বস্তুতপক্ষে, আমাদের এতদিনকার দার্শনিক বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে হিসাব নিকাশ মিটিয়ে নেব। আমাদের এই সংকল্প কাজে পরিণত হল হেগেল-পরবর্তী দর্শনের সমালোচনা-রূপে। অক্টাভো-আকারের দুই বৃহৎ খণ্ডে এই পাণ্ডুলিপিটি* ভেস্তফালিয়ায় প্রকাশকেন্দ্রে পেঁৗছে যাওয়ার অনেকদিন পরে আমরা খবর পেলাম যে, পরিবর্তিত অবস্থার দরুন লেখাটির মুদ্রণ সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপিটিকে মূষিকের দন্তুর সমালোচনার কবলেই ছেড়ে দেওয়া গেল সাগ্রহেই কারণ আমাদের প্রধান যে উদ্দেশ্য, নিজেদের ধারণাকে স্বচ্ছ করা, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। সে সময়ে যে সব বিক্ষিপ্ত রচনার মধ্য দিয়ে, কখনো একদিক থেকে, কখনো বা আর একদিক থেকে, আমাদের মতামত জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেছিলাম, তারমধ্যে আমি শুধু উল্লেখ কবব এঙ্গেল্স ও আমার মিলিত লেখা

* 'জার্মান ভাবাদর্শ' (*The German Ideology*) গ্রন্থের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' ও মৎ-প্রকাশিত 'অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা' *(Discours sur le libre échange)*। শুধুমাত্র তর্কযুদ্ধ হলেও সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমাদের মতামতের চূড়ান্ত বিষয়গুলির ইঙ্গিত দেওয়া হল ১৮৪৭-এ প্রকাশিত এবং প্রুধোঁর বিরুদ্ধে লিখিত আমার 'দর্শনের দারিদ্র্য' *(Misère de la Philosophie)* গ্রন্থে। 'মজুরি-শ্রমের' বিষয়ে জার্মান ভাষায় লিখিত যে নিবন্ধটিতে আমি ব্রাসেল্‌স জার্মান শ্রমিক সমিতিতে* প্রদত্ত উক্ত বিষয়ে আমার বক্তৃতাবলী সন্নিবিষ্ট করেছি, ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও তৎকারণে বেলজিয়ম থেকে আমার জবরদস্তি অপসারণের ফলে তার মুদ্রণ ব্যাহত হয়েছিল।

১৮৪৮-এ ও ১৮৪৯-এ *Neue Rheinische Zeitung* পত্রিকার** সম্পাদনা ও পরবর্তী ঘটনাসমূহের ফলে আমার অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক গবেষণায় বাধা হয়। আবার আমি তা শুরু করতে পারি কেবল ১৮৫০-এ লন্ডনে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস সংক্রান্ত যে বিপুল মালমসলা পুঞ্জীভূত রয়েছে, বুর্জোয়া সমাজ পর্যবেক্ষণ করার পক্ষে লন্ডনে যে সুবিধা আছে, এবং সর্বশেষে ক্যালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশের যে নব পর্যায়ে বুর্জোয়া সমাজের যেন প্রবেশ ঘটল তাতে করে স্থির করতে হল যে একেবারে গোড়া থেকে আবার শুরু করব, নতুন মালমসলা নিয়ে কাজ চালাব বিচার করে। অংশত এই চর্চাই আমাকে এমন সমস্ত বিষয়ে নিয়ে ফেলল, যেগুলি বাহ্যত বহুদূরবর্তী বিষয় আর তার জন্য আমাকে কম বেশী সময় ব্যয় করতে হয়েছে। অবশ্য, আমার হাতে যে সময় ছিল তা বিশেষ করে কমে গিয়েছিল রুজি উপার্জনের অনিবার্য প্রয়োজনের চাপে। আজ আট বৎসর ধরে প্রথম ইঙ্গ-মার্কিন সংবাদপত্র *The New York Tribune****-এ আমি যে সব প্রবন্ধ

* ব্রাসেল্‌সের জার্মান শ্রমিক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৪৭ সালের আগস্টের শেষে, লক্ষ্য ছিল বেলজিয়মবাসী জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে জাগরণ ঘটানো ও তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রচার। মার্কস, এঙ্গেলস ও তাদের সহকর্মীদের নেতৃত্বে এ সমিতি বেলজিয়মবাসী জার্মান বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতদের সংঘবদ্ধ করার একটি আইনসঙ্গত কেন্দ্রে পরিণত হয় ও ফ্লেমিশ ও ভালুন শ্রমিক ক্লাবগুলির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে। সমিতির সেরা লোকগুলি ব্রাসেল্‌স কমিউনিস্ট সংঘে যোগ দেন। ব্রাসেল্‌সের জার্মান শ্রমিক সমিতির সভ্যদের গ্রেপ্তার ও বেলজিয়ম থেকে নির্বাসনের ফলে এ সমিতির কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায় ফ্রান্সের ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কিছু পরে। — সম্পাঃ

** *Neue Rheinische Zeitung* পত্রিকা কলোনে ১লা জুনের, ১৮৪৮ থেকে ১৯শে মে, ১৮৪৯ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রধান সম্পাদক ছিলেন মার্কস। — সম্পাঃ

*** *The New York Daily Tribune* — গণতান্ত্রিক দৈনিক সংবাদপত্র, যা ১৮৪১ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৫১ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত এই সংবাদপত্রে মার্কস প্রবন্ধ লিখতেন। — সম্পাঃ

লিখে আসছি তার জন্য আমার অধ্যয়ন অসম্ভব রকম বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য হয়; কারণ ঠিক কাগজে সাংবাদিকতা নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকি খুব ব্যতিরেকী ক্ষেত্রেই। যাই হোক, ইংলণ্ড ও ইউরোপ মহাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ঘটনাবলী বিষয়ে প্রবন্ধগুলি ছিল আমার প্রেরিত লেখার এত বেশী অংশ যে, প্রকৃত অর্থশাস্ত্রের পরিধির বাইরেও অনেক ব্যবহারিক খুঁটিনাটির সঙ্গে পরিচিত হতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম।

অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে আমার গবেষণা ধারার এই রূপরেখাটি উপস্থিত করার উদ্দেশ্য শুধু এটাই দেখানো যে আমার মতামত সম্পর্কে যাই ভাবা হোক ও শাসক শ্রেণীগুলির স্বার্থবদ্ধ কুসংস্কারের সঙ্গে তার যত কম মিলই থাকুক না কেন, তা বহুবর্ষব্যাপী সবিবেকী অনুসন্ধানের ফল। কিন্তু, বিজ্ঞানের প্রবেশ-দ্বারে নরকের প্রবেশ-দ্বারের মতোই এই দাবি নিশ্চয়ই লিখিত থাকা দরকার:

Qui si convien lasciare ogni sospetto;
Ogni viltà convien che qui sia morta*

কার্ল মার্কস

লণ্ডন, জানুয়ারি, ১৮৫৯
'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা
প্রসঙ্গে' মার্কসের
এই গ্রন্থে মুদ্রিত, বার্লিন ১৮৫৯

গ্রন্থের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান ভাষা থেকে অনূদিত
ইংরেজী ভাষাব ভাষান্তব

---

* এখানে ছাড়তে হবে সকল অবিশ্বাস; এখানে ধ্বংস হবে সমস্ত ভীরু ভাবনার। (দান্তে, 'ডিভাইন কমেডি') — সম্পাঃ

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

কার্ল মার্কস, 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে'

১

বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে জার্মানরা যে অন্যান্য সভ্য জাতিগুলির সমপর্যায়ে, এমন কি অধিকাংশ বিষয়ে উন্নততর পর্যায়ে উঠেছে, বহুদিন আগেই তার পরিচয় তারা দিয়েছে। শুধুমাত্র একটি বিজ্ঞানের অগ্রবর্তীদের মধ্যে কোনো জার্মানকে পাওয়া যেত না, সে বিজ্ঞান হল অর্থশাস্ত্র। এর কারণ সুস্পষ্ট। অর্থশাস্ত্র হচ্ছে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের তত্ত্বগত বিশ্লেষণ, সুতরাং, তার পূর্ব শর্ত হল বিকশিত বুর্জোয়া ব্যবস্থার অস্তিত্ব। কিন্তু জার্মানিতে, ধর্মসংস্কার যুগের যুদ্ধ বিগ্রহ এবং কৃষক সমরগুলির পরে, বিশেষত ত্রিশ বছরের যুদ্ধের পর,* কয়েক শতাব্দীর মধ্যেও তেমন অবস্থার উদ্ভব হতে পারেনি। জার্মান সাম্রাজ্য থেকে হল্যান্ড বেরিয়ে যাবার ফলে** জার্মানি বাধ্য হয়ে বিশ্ব বাণিজ্যের আওতার বাইরে পড়ে যায় ও গোড়া থেকেই তার শিল্প বিকাশ ন্যূনতম আকারে নেমে আসে। আর জার্মানরা যখন অতি ধীরে ও অতি পরিশ্রমে গৃহ যুদ্ধের

* ত্রিশ বছরের যুদ্ধ (১৬১৮—১৬৪৮) — জার্মানির প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক প্রিন্সদের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ যা শুরু হয় পরস্পরের মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব ও সম্রাটের সঙ্গে সংঘাত থেকে; এতে সেই সঙ্গে জার্মানির ব্যাপারে বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের উপলক্ষ ঘটে (স্পেন, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফ্রান্স); যুদ্ধের ফলে জার্মানি একেবারে নিঃস্ব ও মার্কসের কথায় 'বর্বর অবস্থায়' উপনীত হয়। ১৬৪৮ সালে ভেস্তফাল শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ফলে জার্মানির রাজনৈতিক বিখণ্ডীকরণ আরো জোরদার হয়, আলাদা আলাদা প্রিন্সরা বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে স্বাধীন চুক্তির অধিকার পায় ও একদল ইউরোপীয় রাষ্ট্র কর্তৃক জার্মান ভূমি দখল মঞ্জুর হয়। — সম্পাঃ

** ১৪৭৭ সাল থেকে ১৫৫৫ সাল পর্যন্ত হল্যান্ড ছিল জার্মান জাতির পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, তারপর সাম্রাজ্য বিভাগের পর চলে যায় স্পেনের অধিকারে। ষোলো শতকের বুর্জোয়া বিপ্লবের শেষাশেষি হল্যান্ড স্পেনীয় প্রভুত্ব থেকে মুক্তি পায় ও স্বাধীন বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র হয়ে ওঠে।

পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য থেকে হল্যান্ডের বিচ্ছেদের ফলে জার্মানি একটা জরুরী সামুদ্রিক বাণিজ্য পথ হারায় ও মধ্যস্থরূপে হল্যান্ডের বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এটা তার অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। — সম্পাঃ

ধ্বংস থেকে নিজেদের পুনরুদ্ধার করছিল, প্রতিটি ক্ষুদে রাজা ও সাম্রাজ্যের ব্যারনরা তাদের প্রজাদের শিল্পের উপর যে শুল্ক বেষ্টনী ও নির্বোধ বাণিজ্যবিধি আরোপ করত তার বিরুদ্ধে ব্যর্থ সংগ্রামে যখন জার্মানদের যে নাগরিক শক্তি কোনোদিনই খুব বেশী ছিল না তার সমস্তটুকুকেই তারা ক্ষয় করে ফেলছিল, যখন সরাসরি সম্রাটের অধীনস্থ শহরগুলি তাদের গিল্ডসুলভ গোঁড়ামি ও প্যাট্রিশিয়ানসুলভ বিধিব্যবস্থা সমেত ক্ষয় পাচ্ছিল, সেই সময় বিশ্ব বাণিজ্যের নেতৃস্থানীয় অবস্থানগুলি অধিকার করে বসল হল্যান্ড, ইংলন্ড ও ফ্রান্স; উপনিবেশের পর উপনিবেশ স্থাপন করতে লাগল তারা, হস্তশিল্প-কারখানাকে উৎকর্ষের উচ্চতম শিখরে বিকশিত করল, এবং শেষ পর্যন্ত যে বাষ্পশক্তি সবেমাত্র ইংলন্ডের কয়লা ও লৌহ আকরকে মূল্যবান করে তুলতে শুরু করেছিল তার কল্যাণে ইংলন্ড আধুনিক বুর্জোয়া বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে ফেলল। মধ্যযুগের যে সব হাস্যকর প্রাচীন জের ১৮৩০ সাল পর্যন্ত জার্মানির বৈষয়িক বুর্জোয়া বিকাশকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল, তার বিরুদ্ধে যতদিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে ততদিন অবশ্য কোনো জার্মান অর্থশাস্ত্র গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। শুধুমাত্র শুল্ক-ইউনিয়ন* প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানরা এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছল যাতে তারা অর্থশাস্ত্রের বিষয়টা অন্তত **বুঝতে** পারল। বস্তুত এই সময় থেকেই জার্মান বুর্জোয়াদের উপকারার্থে ইংরেজী ও ফরাসী অর্থশাস্ত্রের আমদানি শুরু হয়। অনতিবিলম্বে বিদগ্ধমণ্ডলী ও আমলাতন্ত্রীরা এসে এই আমদানী বস্তুটি দখল করে নিয়ে এমন কায়দায় তাকে গড়ে তুলল যা 'জার্মান ভাবধারার' দিক থেকে মোটেই গৌরবজনক নয়। রচনাকার্যের অনধিকার চর্চায় যে-সব উচ্চ শ্রেণীর প্রতারক, বণিক, শিক্ষক ও আমলা এসে জড়ো হল তাদের পাঁচমিশালী দঙ্গল থেকে উদ্ভব হয় এক জার্মান অর্থতাত্ত্বিক সাহিত্য, নীরসতা, অগভীরতা, চিন্তাশূন্যতা, বাগবাহুল্য এবং চুরি বিদ্যার দিক দিয়ে যার সঙ্গে শুধু জার্মান উপন্যাসেরই তুলনা চলে। ব্যবহারিক বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের মধ্যে প্রথমে শিল্পপতিদের সংরক্ষণ-নীতিবাদী গোষ্ঠীটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের প্রামাণিক মুখপাত্র লিস্ত, এখনও পর্যন্ত জার্মান বুর্জোয়া-অর্থতাত্ত্বিক সাহিত্যের জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, — যদিও তাঁর গৌরবমণ্ডিত রচনা সমস্তটাই হচ্ছে মহাদেশীয় পদ্ধতির** তত্ত্বগত প্রবর্তক ফরাসী ফেরিয়ে থেকে নকল করা।

* ১৮৩৪-এর ১লা জানুয়ারি প্রাশিয়া ও অন্যান্য জার্মান রাজ্যগুলির মধ্যে একটি জার্মান শুল্ক-ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। অস্ট্রিয়া এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। — সম্পাঃ

** মহাদেশীয় পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম নেপোলিয়ন-প্রবর্তিত ইউরোপীয় মহাদেশে ইংরেজ দ্রব্যাদি আমদানি বন্ধ করার নীতি। এই নীতি বিধিবদ্ধ হয় ১৮০৬ সালে এবং স্পেন, নেপ্‌ল্‌স্‌ ও হল্যান্ড এই নীতি মেনে চলে, পরে প্রাশিয়া, ডেনমার্ক, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং অন্যান্য দেশও এই দলে যোগ দেয়। — সম্পাঃ

এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে পঞ্চম দশকে বল্টিক প্রদেশসমূহের বণিকদের অবাধ-বাণিজ্য-মতবাদী দলের উদ্ভব হয়; এরা শিশুসুলভ অথচ স্বার্থপ্রণোদিত বিশ্বাস নিয়ে ইংরেজ অবাধ-বাণিজ্যবাদীদেরই যুক্তিগুলি প্রতিধ্বনিত করতে লাগল। সর্বশেষে, বিষয়টির তত্ত্বগত দিক নিয়ে যাদের কাজ করতে হয়েছিল সেই শিক্ষক ও আমলাদের মধ্যে দেখা গেল হের রাউ-এর মতো শুষ্ক, দোষগুণ বিচার-অক্ষম ওষধি-সংগ্রাহকদের, অনায়ত্ত হেগেলীয় ভাষায় বিদেশী প্রকল্পসমূহের তর্জমাকারী হের স্তাইনের মতো জল্পনাবাজ পণ্ডিতমূর্খদের, অথবা হের রিল-এর মতো 'সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক' ক্ষেত্রের সাহিত্যিক উঞ্ছজীবীদের। এ-সবের শেষ পরিণতি হল ক্যামেরালিস্টিকস্* (Cameralistics) বিদ্যা। এটি হল নানা রকম অবান্তর পদার্থে পূর্ণ খিচুড়ি বিশেষ, তার সঙ্গে যেন একলেকটিক অর্থশাস্ত্রের একটু চাট্‌নি ছিটানো। সে জ্ঞানটা রাষ্ট্র-নিযুক্ত একজন আইন স্কুল স্নাতকের পক্ষে রাষ্ট্র পর্ষদের শেষ পরীক্ষার জন্য তৈরী হবার দিক দিয়ে কাজে লাগবে।

এইভাবে যখন জার্মানির বুর্জোয়া শ্রেণী, শিক্ষক সম্প্রদায় এবং আমলাতন্ত্র ইংরেজী-ফরাসী অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক কথাগুলিকে অখণ্ডনীয় আপ্তবাক্য হিসাবে কণ্ঠস্থ ও সে-বিষয়ে কিছু পরিমাণ স্পষ্ট ধারণা করার জন্য পরিশ্রম করে চলেছে, তখন দৃশ্যপটে আবির্ভূত হল জার্মান প্রলেতারীয় পার্টি। এই পার্টির সামগ্রিক তত্ত্বগত ভিত্তিটাই এসেছে অর্থশাস্ত্রের বিচার থেকে; এবং ঠিক এই পার্টির আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকেই বিজ্ঞানসম্মত স্বাধীন **জার্মান অর্থশাস্ত্রের** উদয় হয়। এই জার্মান অর্থশাস্ত্র মূলত প্রতিষ্ঠিত **ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার** ভিত্তির উপর, যার মূল দিকগুলি উপরোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় সংক্ষেপে উপস্থিত করা হয়েছে। এই ভূমিকার** প্রধান প্রধান কথাগুলি 'Das Volk' পত্রিকায়*** ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হয়েছে এবং সেইজন্যই ভূমিকাটির কথা উল্লেখ করলাম। শুধু অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত ইতিহাসগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই (প্রকৃতি-বিজ্ঞান বাদ দিলে সব বিজ্ঞানই হল ইতিহাসগত বিজ্ঞান) এক বিপ্লবাত্মক আবিষ্কার হল এই প্রতিজ্ঞা যে, 'বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধতিই সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন-প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে'; ইতিহাসে যে-সব সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের, যে-সব ধর্মীয় ও আইনগত ব্যবস্থার, যে-সব তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব হয়, তা সমস্ত কিছু অনুধাবন করতে হলে আগে সেই যুগের

* ক্যামেরালিস্টিক্‌স্ — বুর্জোয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রশাসনিক ও অর্থতাত্ত্বিক বিষয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার পাঠ্যক্রম। — সম্পাঃ

** এই খণ্ডেরই ২৩-২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

*** Das Volk (জনসমাজ) — একটি জার্মান সংবাদপত্র। মার্কসের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এই পত্রিকা ১৮৫৯-এর মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত লণ্ডনে প্রকাশিত হয়েছিল। — সম্পাঃ

মানুষের বৈষয়িক অবস্থাকে বুঝতে হবে, সেই বৈষয়িক অবস্থা থেকেই এদের উৎপত্তি। 'মানুষের সত্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং ঠিক বিপরীতভাবে, মানুষের সামাজিক সত্তাই নির্ধারিত করে তার চেতনাকে।' সূত্রটি এত সহজ-সরল যে, ভাববাদী মোহে আচ্ছন্ন নয় এরকম যে কোনো ব্যক্তির কাছে এটি স্বতঃসিদ্ধ মনে হবে। কিন্তু বিরাট বৈপ্লবিক পরিণাম এর মধ্যে নিহিত, শুধু তত্ত্বের দিক দিয়েই নয়, ব্যবহারিক দিক দিয়েও: 'সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তি বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে এলে সংঘাত লাগে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে অর্থাৎ আইনানুগ ভাষা ব্যবহার করলে বলতে হয়, সংঘাত লাগে এতদিন যে সম্পত্তি-সম্পর্কের মধ্যে থেকে উৎপাদন-শক্তি সক্রিয় ছিল তারই সঙ্গে। সে সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের রূপ থেকে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় উৎপাদন-শক্তির শৃঙ্খলে। তারপর শুরু হয় **সামাজিক বিপ্লবের** এক যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদ পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিরাট উপরিকাঠামোও কম-বেশী দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে যায়... বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কগুলি হচ্ছে সামাজিক উৎপাদন-প্রণালীর শেষ বৈরভাবাপন্ন রূপ, ব্যক্তিমানুষের বিরোধের অর্থে বৈরভাব নয়, ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার সামাজিক অবস্থার মধ্য থেকে উদ্ভূত বৈরভাব; এর সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়া সমাজের গর্ভে বিকাশমান উৎপাদন-শক্তিসমূহ সেই বৈরভাবের সমাধানের বৈষয়িক শর্তাবলীও সৃষ্টি করে।' আমাদের এই বস্তুবাদী থিসিস যদি আরো এগিয়ে নিই ও বর্তমানের অবস্থায় এর প্রয়োগ করি, তাহলে এক বিরাট বিপ্লবের, বস্তুত সর্বকালের সর্ববৃহৎ বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতটাই আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

আরো গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখলে কিন্তু অবিলম্বে উপলব্ধি হবে যে, মানুষের চেতনা তার সত্তার উপর নির্ভরশীল, তার উল্টোটা নয়, এই আপাত সরল সূত্রটি অবিলম্বেই এবং তার প্রথম পরিণতিতেই সমস্ত ভাববাদের, এমন কি সবচেয়ে প্রচ্ছন্ন ভাববাদেরও প্রত্যক্ষ বিরোধী। সকল ঐতিহাসিক ব্যাপারে সমস্ত রকম ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি নাকচ হয়ে পড়ে তাতে। রাজনৈতিক যুক্তিতর্কের সমস্ত চিরাচরিত পদ্ধতি ধূলিসাৎ হয়ে যায়; এহেন নীতিবিগর্হিত ধারণার বিরুদ্ধে সক্রোধে সংগ্রামে নামে দেশপ্রেমিক মহাত্মাপনা। সুতরাং, দৃষ্টিভঙ্গির এই নতুন পদ্ধতির সঙ্গে শুধু যে বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদেরই অনিবার্য সংঘাত লাগল তা নয়; **মুক্তি-সাম্য-ভ্রাতৃত্ব** এই যাদুমন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর ভিত্তিমূল পর্যন্ত নড়িয়ে দিতে চায় যে গোটা ফরাসী সমাজতন্ত্রী মহল, সংঘাত লাগে তাদেরও সঙ্গে। তবে জার্মানির ইতর-গণতন্ত্রবাদী হৈচৈকারীদের মধ্যেই তা সবচাইতে প্রবল ক্রোধের উদ্রেক করল। তাহলেও তারা সাগ্রহেই এই নতুন চিন্তাকে চুরি করে নিজেদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করে যদিও অসাধারণ ভুল বুঝে।

ঐতিহাসিক একটিমাত্র দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রেও বস্তুবাদী ধারণার বিকাশ ঘটানো এমন

এক বৈজ্ঞানিক কীর্তি যার জন্য বৎসরের পর বৎসর নির্বিঘ্ন অনুশীলন দরকার; কেননা, এ কথা তো সহজবোধ্য যে, এক্ষেত্রে কেবল বুলি দিয়ে কাজ হবে না। এ কাজ সম্পন্ন করা যায় শুধু রাশীকৃত ঐতিহাসিক মালমসলাকে সবিচারে বাছাই করে, পরিপূর্ণ আয়ত্ত করে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব আমাদের পার্টিকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ঠেলে দিল এবং ফলে তার পক্ষে নিছক বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য অনুসরণ করে চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু তাসত্ত্বেও মূল দৃষ্টিভঙ্গিটি পার্টি-রচিত সমস্ত সাহিত্যের মধ্যেই একটি অন্তর্লীন সূত্রের মতোই গ্রথিত আছে। এই সমস্ত লেখাতেই প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট বিষয়কে উপলক্ষ্য করে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে, প্রতিক্ষেত্রেই কর্মোদ্যমের উদ্ভব হয়েছে সরাসরি বৈষয়িক প্রণোদনা থেকেই, সংশ্লিষ্ট বাক্যাবলী থেকে নয়; দেখানো হয়েছে যেমন রাজনৈতিক কর্মোদ্যম ও তার ফলাফল তেমনই রাজনৈতিক ও আইনগত বাক্যাবলীও বরং বৈষয়িক প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত।

১৮৪৮-৪৯-এর বিপ্লবের পরাজয়ের পর এমন একটা সময় এল যখন বাহির থেকে জার্মানিকে প্রভাবিত করা ক্রমশই বেশী অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমাদের পার্টি তখন প্রবাসী কোন্দলের ক্ষেত্রটা — কেননা, সেটাই তখন একমাত্র সম্ভাব্য কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল — ছেড়ে দেয় ইতর গণতন্ত্রবাদীদের হাতে। শেষোক্তরা যখন প্রাণভরে ঘোঁট পাকিয়ে চলল, একদিন ঝগড়া-বিবাদ করে পরের দিন মিটমাট করতে লাগল, এবং তার পরের দিন আবার নিজেদের ভেতরকার কেলেঙ্কারির প্রকাশ্য প্রচার চালাচ্ছিল; যখন সমগ্র আমেরিকা জুড়ে ইতর গণতন্ত্রবাদীরা ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়াচ্ছিল শুধু জুটানো পয়সাকটি নিয়ে পরের মুহূর্তেই গণ্ডগোল পাকাতে, সেই সময়টা আমাদের পার্টি ফেব খানিকটা অধ্যয়নের অবসর পেয়ে খুশিই হয়। তার খুব বড় একটা সুবিধা এই যে, তত্ত্বগত ভিত্তি হিসাবে একটা নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পার্টির আয়ত্তে ছিল; তাকে সংরচিত করে তোলার কাজেই পার্টিকে পুরোপুরি ব্যস্ত থাকতে হয়। অন্তত এই এক কারণেই দেশান্তরীদের মধ্যকার 'মহৎ ব্যক্তিদের' মতো অধঃপতন আমাদের পার্টির পক্ষে কখনো সম্ভব হয়নি।

সেই অধ্যয়নের প্রথম ফল হল আলোচ্য গ্রন্থখানি।

২

আমাদের সামনে যে গ্রন্থটি রয়েছে তার ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র থেকে নেওয়া স্বতন্ত্র কতগুলি পরিচ্ছেদের শুধুমাত্র একটা অসংবদ্ধ সমালোচনার অথবা কোনো কোনো বিতর্কমূলক অর্থতত্ত্বগত প্রশ্নের বিচ্ছিন্ন আলোচনার প্রশ্ন উঠতে পারে না। বরং শুরু থেকেই গ্রন্থটির রচনা-বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যাতে অর্থশাস্ত্রের সমগ্র বিষয়টিকে

একটা প্রণালীবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া যায়, যাতে বুর্জোয়া উৎপাদন ও বুর্জোয়া বিনিময়ের নিয়মগুলির একটা পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত বিকাশ দেখানো যায়। যেহেতু অর্থতত্ত্ববিদরা এইসব নিয়মের ব্যাখ্যাকার বা পক্ষসমর্থনকারী ছাড়া আর কিছুই নন, সেইজন্য বিকাশের চিত্রটি একইসঙ্গে সমগ্র অর্থতাত্ত্বিক সাহিত্যের সমালোচনা হয়ে দাঁড়ায়।

কোনো বিজ্ঞানকে তার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ পরস্পর-সংযোগের ভিত্তিতে বিকশিত করার চেষ্টা হেগেলের মৃত্যুর পর থেকে আর হয়নি বললেই হয়। হেগেলের সরকারী শিষ্যসম্প্রদায় গুরুর দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি থেকে সবচেয়ে সহজ কৌশলটির কায়দা শুধু আয়ত্ত করে নেয়; সে কায়দা যে-কোনো বিষয়ের উপর, এবং প্রায়ই হাস্যকর অপটুভাবে তারা প্রয়োগ করতে থাকে। এই গোষ্ঠীর কাছে হেগেলের সমগ্র উত্তরাধিকারটি সীমিত হয়ে পড়ল শুধুমাত্র একটি ছকে, যার সাহায্যে যে-কোনো প্রশ্ন তারা উদ্ভাবন করতে লাগল, সীমিত হয়ে পড়ল কতগুলি শব্দ ও বাক্য-রীতির সংকলনে, — চিন্তা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবের ক্ষেত্রে সময় মত হাতের কাছে পাওয়া ছাড়া যার আর কোনো উদ্দেশ্য রইল না। এর ফলে, বন-এর জনৈক অধ্যাপকের কথায় বলতে গেলে, ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, এই সমস্ত হেগেলপন্থীরা কোনো বিষয় কিছুই বুঝত না, অথচ সব বিষয়ে লিখতে পারত। বাস্তবিকই তাদের কাজের প্রকৃতি এইরকমই হয়ে উঠেছিল। এদিকে তাদের দম্ভ সত্ত্বেও এই ভদ্রলোকেরা নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন যে, বড় সমস্যা থেকে তাঁরা যতদূর সম্ভব তফাৎ থাকতেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচীন পণ্ডিতী বিজ্ঞানের প্রাধান্যটাই বজায় রইল; যখন ফয়েরবাখ অনুমানভিত্তিক প্রত্যয়কে অচল বলে ঘোষণা করলেন, তখনই মাত্র হেগেলবাদ ধীরে ধীরে হল নিদ্রামগ্ন; মনে হতে লাগল যেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবার নতুন করে প্রাচীন অধিবিদ্যার ও তার অনড় সংজ্ঞাগুলির রাজত্ব শুরু হয়েছে।

ব্যাপারটির একটা স্বাভাবিক কারণ ছিল। নিছক বাক্য-বিন্যাসে হেগেলবাদী ডিয়াডোচির* (Diadochi) রাজত্বের পরিসমাপ্তি হবার পর স্বভাবতই যে-যুগটি এল, তাতে বিজ্ঞানের ইতিবাচক অন্তর্বস্তুটি তার বাহ্যরূপের চেয়ে আবার বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে এক অসাধারণ উৎসাহ নিয়ে জার্মানি ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রকৃতি-বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে, যা ছিল ১৮৪৮-এর পরেকার শক্তিশালী বুর্জোয়া বিকাশের সহগামী। এবং এই যেসব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে জল্পনা-প্রবণতা কখনই বিশেষ গুরুত্বলাভ

* ডিয়াডোচি — ম্যাসিডোনের আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারীরা। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর এদের অন্তর্যুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যটি খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। এখানে এঙ্গেলস শ্লেষসহকারে এই শব্দটি প্রয়োগ করেছেন জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের হেগেলবাদী গোষ্ঠীর সরকারী প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে। — সম্পাঃ

করতে পারেনি, সেগুলি ফ্যাশন হয়ে পড়ার ফলে প্রাচীন অধিবিদ্যক কায়দায় চিন্তাপ্রণালীর, এমন কি ভলফ-এর চূড়ান্ত রকমের অসার মামুলিয়ানারও পুনরাবির্ভাব দেখা দেয়। হেগেল বিস্মৃতির অতলে গেলেন, এবং গড়ে উঠল নতুন প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ, তত্ত্বগত দিক দিয়ে এই বস্তুবাদের সঙ্গে আঠারো শতকের বস্তুবাদের কোনো প্রভেদ নেই; এর সুবিধাটা প্রধানত ছিল এই যে এর হাতে ছিল প্রকৃতি বিজ্ঞানের, বিশেষত রসায়ন ও শারীরবৃত্তের সমৃদ্ধতর মালমসলা। বুখনার ও ফগ্ৎ-এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই এই ক্যাণ্ট-পূর্বযুগের সংকীর্ণ-চিত্ত অর্বাচীন চিন্তাপ্রণালীর পুনঃপ্রকাশ, যার মধ্যে অতি-তুচ্ছ অসারতাও বাদ পড়ে না। এমন কি, যে মলেশৎ ফয়েরবাখের নামে শপথ নেন তিনি পর্যন্ত অতি হাস্যকর ভাবে বারবার বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন সরলতম সংজ্ঞার মধ্যে। অন্তর্বস্তু ও বাহ্যরূপের মধ্যকার, কারণ ও ফলাফলের মধ্যকার খাদের সামনে এসে বুর্জোয়া সাংসারিক বোধের গেঁতো ছ্যাকরা ঘোড়া স্বভাবতই থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু অমূর্ত চিন্তার জংলী জমির উপর দিয়ে ফূর্তি করে শিকার-যাত্রা করতে হলে ছ্যাকরা ঘোড়ায় না চাপাই উচিত।

সুতরাং, এখানে এমন আর একটি সমস্যার সমাধান দরকার যার সঙ্গে নিছক অর্থশাস্ত্রের কোনো সম্বন্ধ নেই। বিজ্ঞানকে কী ভাবে বিকশিত করতে হবে? একদিকে ছিল হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব, যাকে হেগেল এক সম্পূর্ণ অমূর্ত ও 'জল্পনামূলক' রূপে রেখে গিয়েছিলেন; অপরদিকে রইল সাধারণ এবং মূলত ভলফ-নির্দিষ্ট অধিবিদ্যক পদ্ধতি, যা পুনরায় একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং যে-পদ্ধতিতে লেখা হয়েছিল বুর্জোয়া অর্থতত্ত্ববিদদেরও বৃহদায়তন অসংলগ্ন গ্রন্থখন্ডসমূহ। শেষোক্ত পদ্ধতিটিকে ক্যাণ্ট এবং বিশেষ করে হেগেল তত্ত্বগতভাবে এমন করে বিধ্বস্ত করেছিলেন যে, শুধুমাত্র আলস্যবশে এবং অন্য একটা **সহজ** বিকল্প, পদ্ধতির অভাবের দরুন এই পদ্ধতিটির ব্যবহার অব্যাহত থাকাটা সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে, হেগেলীয় পদ্ধতিটি তার **লব্ধ** রূপে একেবারেই অব্যবহার্য। সে পদ্ধতি ছিল মূলত ভাববাদী, অথচ আগেকার সমস্ত কিছুর চেয়ে বেশী বস্তুবাদী এক বিশ্ব-দৃষ্টি বিকাশের সমস্যাটাই তখন প্রশ্ন। সে পদ্ধতি শুরু হত বিশুদ্ধ চিন্তা থেকে, অথচ এক্ষেত্রে শুরু করা চাই কঠোর বাস্তব তথ্য থেকে। নিজস্ব স্বীকৃতি অনুযায়ীই যে পদ্ধতি 'শূন্য থেকে শূন্যের মাধ্যমে শূন্যতে পেঁছিয়ে এসেছে.' সে-পদ্ধতি সেই আকারে এক্ষেত্রে কোনক্রমেই উপযোগী নয়। তবুও যুক্তিবিদ্যার সমস্ত মালমসলার মধ্যে শুধুমাত্র একেই অন্তত আরম্ভ-বিন্দু হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব। এর সমালোচনাও হয়নি, তাকে ছাড়িয়ে যাওয়াও হয়নি। এই মহান দ্বান্দ্বিকতত্ত্ববিদের যারা বিরোধী তাদের কোনো একজন ব্যক্তিও তাঁর চিন্তার গৌরবজনক কাঠামোর মধ্যে কোনো ভাঙ্গন ধরাতে পারেনি; সে চিন্তা শুধু বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গিয়েছিল কারণ, তাকে নিয়ে কী করতে হবে তার সামান্যতম ধারণাও হেগেলপন্থী গোষ্ঠীর ছিল না।

সুতরাং, সর্বোপরি দরকার হয়েছিল হেগেলীয় পদ্ধতিকেই একটা আমূল সমালোচনার লক্ষ্যীভূত করা।

অন্যান্য সমস্ত দার্শনিকদের চিন্তাপদ্ধতি থেকে হেগেলের চিন্তাপদ্ধতির পার্থক্য তার প্রচণ্ড ইতিহাস বোধে, এর ওপরেই তার ভিত্তি। গঠনরূপের দিক থেকে এ পদ্ধতি যদিও অমূর্ত ও ভাববাদী, তবু তার চিন্তাবিকাশ ধারাটি সর্বদাই চলেছে বিশ্ব-ইতিহাসের বিকাশধারার সঙ্গে সমান্তরালভাবে এবং এই শেষোক্তকে ধরা হত আসলে কেবল প্রথমের কষ্ঠিপাথর হিসাবে। তাতে করে যদিও আসল সম্পর্কটি উল্টে দিয়ে মাথার ওপর দাঁড় করানো হয়েছিল, তাহলেও দর্শনের মধ্যে আসল সারবস্তু প্রতি পদেই প্রবেশলাভ করেছে, আরো বেশি করেছে কারণ হেগেল তাঁর শিষ্যদের মতো অজ্ঞতা জাহির করেননি, বরং তিনি ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের অন্যতম। ইতিহাসের মধ্যে যে একটা ক্রমবিকাশ, একটা আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি আছে তা তিনিই সর্বপ্রথম দেখাবার চেষ্টা করেন; এবং তাঁর ইতিহাস সম্পর্কিত দর্শনের অনেক কিছুই আজ আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হলেও, তাঁর মূল দৃষ্টিভঙ্গির মহিমা আজও শ্রদ্ধেয়, সেটা তাঁর পূর্বগামীদের সঙ্গে, অথবা বিশেষ করে তাঁর সময়কালের পর থেকে ইতিহাস নিয়ে সাধারণ ভাবনা করেছেন এরকম যে-কারুর সঙ্গেই তাঁর তুলনা করি না কেন। তাঁর 'চেতনাবাদ', 'নন্দনতত্ত্ব', 'ইতিহাসের দর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থে সর্বত্রই তাঁর এই অপূর্ব ইতিহাসবোধের প্রাধান্য, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুকে তিনি বিচার করেছেন ইতিহাসগত-ভাবে, ইতিহাসের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট, যদিও বিমূর্ত বিকৃত অন্তঃসম্পর্কে।

ইতিহাস সম্বন্ধে এই যুগান্তকারী ধারণাই হল নতুন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ তত্ত্বগত ভিত্তি এবং যুক্তি পদ্ধতির জন্যও একটা যোগসূত্র পাওয়া গেল এই থেকেই। যেহেতু, এমন কি 'বিশুদ্ধ চিন্তার' দিক দিয়ে দেখলেও, এই বিস্মৃতপ্রায় দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব থেকে যে এমন ফল পাওয়া গিয়েছে, এবং অধিকন্তু, এত সহজে যে পূর্বগামী সমস্ত যুক্তি-বিদ্যা ও অধিবিদ্যার নিকাশ করেছে, তাতে এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে, আর যাই হোক, এর মধ্যে কূটতর্ক (Sophistry) ও চুলচেরা ব্যাপার স্যাপারের চেয়ে বড় জিনিস ছিল। কিন্তু পদ্ধতির সমালোচনা সহজ ব্যাপার ছিল না, সমস্ত সরকারী দর্শন তা এড়িয়ে গিয়েছে এবং এখনও এড়িয়ে যাচ্ছে।

যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে হেগেলের যা আসল আবিষ্কার হেগেলীয় যুক্তিবিদ্যা থেকে সেই অন্তর্বস্তুটিকে উদ্ধার করে, ভাববাদী আবরণ থেকে মুক্ত করে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে সেই সহজ আকারে পুনর্গঠিত করা যাতে তা চিন্তা বিকাশের একমাত্র যথার্থ রূপ হয়ে দাঁড়ায় — এ কর্তব্য যে একটি মাত্র লোক গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তিনি হলেন মার্কস এবং আজো তিনিই একক। যে-পদ্ধতিটি অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে মার্কসের

সমালোচনার ভিত্তিভূমিস্বরূপ, তার সংরচনের কাজটাকে আমরা খোদ মূল বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটার চেয়ে মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ ফল বলে মনে করি না।

এই যে-পদ্ধতি আমরা পেলাম সেই পদ্ধতি অনুসারেও, অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা করা যেত দুভাবে: ইতিহাসগতভাবে অথবা যুক্তিগতভাবে। যেহেতু ইতিহাসে এবং তার সাহিত্যিক প্রতিফলনেও, সমগ্রভাবে বিকাশের ধারাটি অত্যন্ত সহজ সম্পর্ক থেকে অপেক্ষাকৃত জটিলতর সম্পর্কের দিকে এগিয়ে চলে, সেইহেতু অর্থশাস্ত্রের সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্যেও এমন একটি স্বাভাবিক নির্দেশক সূত্র পাওয়া গেল যার সঙ্গে সমালোচনাকেও সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং অর্থনৈতিক সংজ্ঞা বিভাগগুলিও সার্মাগ্রকভাবে ঠিক যুক্তিগত বিকাশের মতোই একই অনুক্রমে প্রতিভাত হয়। এই ধরনটির বাহ্যিক সুবিধা হচ্ছে এই যে, এটা অধিকতর স্বচ্ছ, কেননা, প্রকৃতই এখানে অনুসরণ করা হচ্ছে **বাস্তব** বিকাশটাকেই, কিন্তু আসলে এর ফলে সেটা দাঁড়াত বড়ো জোর একটা জনবোধ্য প্রণালী। অনেক সময় ইতিহাস এগিয়ে চলে লাফ দিয়ে ও আঁকাবাঁকা পথে; এবং এতে প্রত্যেক স্থলেই ইতিহাসকেই অনুসরণ করে যেতে হত। তার ফলে শুধু যে অনেক গৌণ গুরুত্বের মালমসলা অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হত তাই নয়, ভাবনাধারাও অনেক ব্যাহত হত। অধিকন্তু, বুর্জোয়া সমাজের ইতিহাস না লিখে অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস লেখা যায় না এবং তার ফলে কর্তব্যটা অপরিসীম হয়ে দাঁড়ায়, কেননা এর জন্য যে প্রাথমিক কাজ দরকার তার কিছুই করা হয়নি। সুতরাং, আলোচনায় যুক্তিগত বিশ্লেষণই দাঁড়ায় একমাত্র উপযোগী পদ্ধতি। কিন্তু বস্তুত এই পদ্ধতি ইতিহাসগত বিচার ছাড়া আর কিছু নয়, শুধু তার ঐতিহাসিক আকার ও আপতিক বিক্ষেপগুলিকে বর্জন করা হয়েছে। যা দিয়ে এ ইতিহাসের শুরু, চিন্তা-শৃঙ্খলের শুরুও হবে সেই একই জিনিস থেকে আর চিন্তার পরবর্তী ধারাটিও হবে আর কিছুই নয়, ইতিহাসের ধারারই অমূর্ত এবং তত্ত্বের দিক থেকে সুসঙ্গত আকারের একটি প্রতিফলন; সংশোধিত প্রতিফলন, কিন্তু সেই নিয়মেই সংশোধিত, যে নিয়ম পাওয়া যাচ্ছে ইতিহাসেরই প্রকৃত ধারা থেকে, যাতে প্রত্যেক উপাদানকে তার পরিপূর্ণ পরিপক্কতার বিকাশ মুহূর্তে, তার চিরায়তরূপে বিবেচনা করতে পারা যায়।

এই পদ্ধতিতে আমরা শুরু করি সেই সর্বপ্রথম ও সহজতম সম্পর্কটি থেকে, যা ইতিহাসগতভাবে ও কার্যক্ষেত্রে আমাদের সামনে দেখা দেয়; সুতরাং এ ক্ষেত্রে তা হল সর্বপ্রথম পাওয়া অর্থনৈতিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ককে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি। কিন্তু এটি যেহেতু একটা **সম্পর্ক**, সেইহেতু এর দুটি দিক আছে যা **পরস্পর সংশ্লিষ্ট।** প্রত্যেকটি দিককে আলাদাভাবে বিবেচনা করে দেখা হয়, তা থেকে তাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় গিয়ে পেঁছাই। বিরোধ দেখা যাবে যার সমাধান দরকার। কিন্তু যেহেতু আমরা এখানে শুধুমাত্র আমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো

অমূর্ত চিন্তাপ্রণালীকে বিচার করছি না, বিচার করছি বিশেষ সময়ে সংঘটিত অথবা এখনও সংঘটমান এক প্রকৃত ঘটনা-প্রবাহকে, সেইহেতু এই বিরোধগুলোও নিশ্চয় বাস্তবরূপে দেখা দিয়ে থাকবে এবং সেগুলির সম্ভবত সমাধানও মিলে থাকবে। সে সমাধানের প্রকৃতি অনুসরণ করে গিয়ে আমরা দেখতে পাব যে তা সম্পন্ন হয়েছে একটি নতুন সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠার মধ্যে; সে সম্পর্কের দুই বিপরীত দিককে আবার আমাদের বিকশিত করে তুলতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্থশাস্ত্রের শুরু হচ্ছে **পণ্য দিয়ে,** এর শুরু উৎপন্ন দ্রব্যের পরস্পরের বিনিময় আরম্ভের মুহূর্ত থেকে, তা সে বিনিময় ব্যক্তি বিশেষ অথবা আদিম গোষ্ঠী যারাই করুক না কেন। বিনিময়ের মধ্যে যে-দ্রব্যটি এসে পড়ছে সেটাই হল পণ্য। পণ্য হল অবশ্য একমাত্র এই কারণেই যে, **বস্তুতে,** উৎপন্ন দ্রব্যে এসে যুক্ত হচ্ছে দুটি মানুষের বা দুটি গোষ্ঠীর মধ্যেকার **সম্পর্ক**, উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যেকার সম্পর্ক, যারা এক্ষেত্রে আর একই ব্যক্তিতে মিলিত নয়। এ ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপারের দৃষ্টান্ত পাই, যা সমগ্র অর্থশাস্ত্রের মধ্যে প্রবাহিত এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মনে যা প্রচণ্ড বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে: অর্থশাস্ত্রের বিচার্য বস্তু নয় মানুষে মানুষে সম্পর্ক, এবং শেষপর্যন্ত শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্ক; অথচ এই সম্পর্ক সর্বদাই **বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বস্তুরূপেই প্রতিভাত হয়।** বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের কাছে এই অন্তঃসম্পর্কের আভাস ধরা পড়েছে সত্যি, কিন্তু এটা যে সমগ্র অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করলেন মার্কস্; এর ফলে অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নগুলিকেও তিনি এত সহজ ও স্বচ্ছ করে দিলেন যে, এখন এমনকি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরাও তা আয়ত্ত করতে পারবে।

এখন যদি আমরা পণ্যের বিভিন্ন দিকের বিচার করি, দুই আদিম গোষ্ঠীর মধ্যকার আদিম দ্রব্য-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম অতি কষ্টে যে-পণ্য গড়ে উঠেছিল সে-হিসাবে নয়, পণ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের অবস্থায় তাকে যদি বিচার করি, তাহলে ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা আমাদের কাছে দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এসে পড়ি অর্থতত্ত্বগত বিতর্কের ক্ষেত্রে। মধ্যযুগীয় যানবাহনের তুলনায় রেলওয়ে যতটা উন্নত, বর্তমান রূপে সংরচিত জার্মান দ্বান্দ্বিক তত্ত্বও যে প্রাচীন অগভীর অতি-ভাষী আধিবিদ্যক পদ্ধতির তুলনায় অন্তত ততটা উন্নত, তার উজ্জ্বল উদাহরণ পেতে চাইলে অ্যাডাম স্মিথ বা খ্যাতনামা অন্য কোনো সরকারী অর্থতাত্ত্বিকের লেখা পড়ে দেখুন, বিনিময়-মূল্য ও ব্যবহার-মূল্য এই ভদ্রলোকদের কাছে কী যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল, এদুটি জিনিসকে যথাযুক্ত পৃথক করে রাখা ও স্বকীয় নির্দিষ্টতায় আলাদা আলাদাভাবে তাদের প্রত্যেকটিকে অনুধাবন করা তাঁদের পক্ষে হয়েছিল কত কঠিন; তারপর এর সঙ্গে মার্কসের লেখার স্বচ্ছ ও সহজ ব্যাখ্যার তুলনা করে দেখুন।

ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের ব্যাখ্যা করার পর পণ্যকে উপস্থিত করা হয়েছে এই দুই মূল্যের আশু ঐক্যের রূপ হিসাবে, **বিনিময়-প্রণালীতে** এইরূপেই পণ্যের আবির্ভাব হয়। এর ফলে কী কী বিরোধ দেখা দেয় তা পরে জানতে পারা যাবে ২০ ও ২১ পৃষ্ঠা পড়লে। আমরা শুধু এটুকু উল্লেখ করি যে এই বিরোধগুলির তাৎপর্য শুধু তত্ত্বগত ও অমূর্ত ক্ষেত্রেই নয়; সেই সঙ্গে এগুলি সাক্ষাৎ বিনিময়-সম্পর্কের, সরল দ্রব্য-বিনিময়-সম্পর্কের প্রকৃতির মধ্য থেকে উদ্ভূত অসুবিধাও প্রতিফলিত করছে; যে-অসম্ভাব্যতার মধ্যে বিনিময়ের এই প্রথম স্থূল রূপটির অবসান হতে বাধ্য, তাকে প্রতিফলিত করছে। সেই অসম্ভাব্যতাগুলির সমাধান হচ্ছে এই ঘটনায় যে, সমস্ত পণ্যেরই বিনিময়-মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করার ধর্মটি স্থানান্তরিত হল একটি বিশেষ পণ্যের মধ্যে -- **মুদ্রায়।** মুদ্রা, অথবা সরল সঞ্চালন সম্বন্ধে তারপর ব্যাখ্যা করা হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, যথা: ১। **মূল্যের পরিমাপ** হিসাবে মুদ্রা, এই প্রসঙ্গে মুদ্রায় মাপা মূল্য, অর্থাৎ **দামের** সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে; ২। **সঞ্চালনের মাধ্যম** হিসাবে ও ৩। এই দুই সংজ্ঞার ঐক্য **আসল মুদ্রা** হিসাবে, বৈষয়িক বুর্জোয়া সম্পদের প্রতীক স্বরূপ মুদ্রা। এতেই প্রথম খণ্ডের শেষ হয়েছে। মুদ্রা কী করে পুঁজিতে পরিণত হল, তা রাখা হয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য।

দেখা গেল যে, এই পদ্ধতিতে যুক্তিবিদ্যাসম্মত ধারা কোনোক্রমেই নিছক অমূর্ত ক্ষেত্রের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য নয়। বিপরীতপক্ষে, এই পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন হয় ইতিহাস থেকে উদাহরণ এবং বাস্তবের সঙ্গে নিয়ত সংযোগ। তাই তেমন প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে বিপুল বৈচিত্র্যে, যথা সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে ইতিহাসের প্রকৃত ধারাটির এবং অর্থতাত্ত্বিক সাহিত্যের উভয়েরই নজির দেওয়া হয়েছে যাতে অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিষ্কার সজ্ঞা-নির্ধারণ গোড়া থেকেই অনুসৃত হয়েছে। তাই এক একটা নির্দিষ্ট, কম-বেশী একতরফা বা বিভ্রান্তিপূর্ণ ধারণাগুলির সমালোচনা যুক্তিগত বিকাশ ধারার মধ্যেই মূলত দেওয়া হয়ে যাচ্ছে, ও তাদের সংক্ষেপে সূত্রাকারে উপস্থিত করাও সম্ভব।

তৃতীয় প্রবন্ধে* খাস গ্রন্থটির অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব।

১৮৫৯-এর আগস্টের প্রথমার্ধে এঙ্গেলস
কর্তৃক লিখিত
৬ই ও ২০শে আগস্ট, ১৮৫৯ তারিখের
Das Volk সংবাদপত্রে বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে অনূদিত ইংরেজি ভাষ্যের
ভাষান্তর

* এই তৃতীয় প্রবন্ধটি কোনোদিন মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়নি, এর পাণ্ডুলিপিটিও পাওয়া যায়নি। — সম্পাঃ

কার্ল মার্কস

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির উদ্বোধনী ভাষণ

১৮৬৪, ২৮শে সেপ্টেম্বরে লণ্ডনের লং-একরস্থ সেণ্ট মার্টিন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিষ্ঠিত

শ্রমজীবী মানুষেরা,

একটি বিরাট সত্য হল এই যে, ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে শ্রমজীবী জনসমষ্টির দুর্দশার কোনো লাঘব হয়নি, তবু এই সময়টাই শিল্প-বিকাশ ও বাণিজ্য-বৃদ্ধির দিক দিয়ে অতুলনীয়। ১৮৫০ সালে ব্রিটিশ মধ্য শ্রেণীর একটি নরমপন্থী ওয়াকিবহাল মুখপত্র এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ইংলণ্ডের রপ্তানি ও আমদানি যদি শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায় তাহলে ইংরেজদের দারিদ্র্য একেবারে শূন্যের স্তরে নেমে যাবে। কিন্তু হায়! ১৮৬৪ সালে ৭ই এপ্রিল ইংলণ্ডের অর্থসচিব পার্লামেণ্টে তাঁর শ্রোতাদের এই বিবৃতি দিয়ে আনন্দ দান করলেন যে, ইংলণ্ডের মোট আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য ১৮৬৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে '৪৪,৩৯,৫৫,০০০ পাউণ্ডে উঠেছে। এই আশ্চর্য সংখ্যাটা ১৮৪৩-এর অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক যুগের বাণিজ্যের প্রায় তিনগুণ!' এই সব বলেও তিনি 'দারিদ্র্য' সম্বন্ধে মুখর হয়ে ওঠেন। তিনি বলে ওঠেন, 'সেইসব লোকের কথা ভাবুন, যারা এই এলাকার সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবুন সেই মজুরির কথা যা বৃদ্ধি পায়নি,' সেই মানবজীবন যা 'প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জনের ক্ষেত্রেই শুধু বেঁচে থাকার জন্য একটি সংগ্রাম মাত্র!' তিনি আয়র্ল্যাণ্ডের লোকদের কথা বলেননি, সেখানে উত্তরে ধীরে ধীরে মানুষের জায়গা দখল করছে যন্ত্র আর দক্ষিণে মেষ-চারণ যদিও ভাগ্যহত সেই দেশটিতে এমন কি মেষের সংখ্যাও কমে আসছে, অবশ্য মানুষের মতো অত দ্রুত নয়। এর ঠিক আগেই একটা আকস্মিক আতঙ্কের ঝোঁকে ঊর্ধ্বতন দশ হাজারের উচ্চতম প্রতিনিধিরা যা ফাঁস করে বসেছিল তার পুনরাবৃত্তি তিনি করেননি। যখন লণ্ডনে গ্যারোট* (garotters) আতঙ্ক খানিকটা জোরালো হয়ে ওঠে, তখন

* গ্যারোট — লোকের টুঁটি টিপে ধরে লুটপাট করত বলে এদের এই নাম জোটে। সপ্তম দশকের প্রথমভাগে লণ্ডনে এই ধরনের হামলা খুব বেশী বেড়ে যায় ও পার্লামেণ্টের আলোচ্য বস্তুতে পরিণত হয়। — সম্পাঃ

লর্ড-সভা নির্বাসন দণ্ড ও কয়েদ খাটুনি সম্বন্ধে একটা তদন্ত ও রিপোর্ট প্রকাশের ব্যবস্থা করে। বিরাট আকারের ব্লু বুকে এক ভয়াবহ সত্য ফাঁস হয়ে গেল, সরকারী তথ্য ও সংখ্যা দিয়ে প্রমাণিত হল যে দণ্ডপ্রাপ্ত জঘন্যতম অপরাধীরা, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের কয়েদী গোলামরাও ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের কৃষি-শ্রমিকদের চেয়ে কম খাটে ও ভালোভাবে থাকে। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। যখন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে ল্যাংকাশায়ার ও চেশায়ারের শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পথে দাঁড়াল, তখন সেই একই লর্ড-সভা থেকে শিল্পাঞ্চলে একজন চিকিৎসককে পাঠান হল এই দায়িত্ব দিয়ে যে, তিনি অনুসন্ধান করবেন, গড়পড়তা হিসাবে স্বল্পতম ব্যয়ে ও সহজতম রূপে কত কম পরিমাণ কার্বন ও নাইট্রোজেন ব্যবহার করেই 'অনাহারজনিত রোগ এড়ান যায়।' মেডিকাল ডেপুটি ডাঃ স্মিথ নির্ধারণ করলেন যে, অনাহারজনিত রোগের ঠিক উপরের স্তরে থাকতে হলে... একজন সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সাপ্তাহিক প্রয়োজন হল ২৮,০০০ গ্রেন কার্বন ও ১,৩৩০ গ্রেন নাইট্রোজেন। তিনি এটাও নির্ধারণ করলেন যে, প্রচণ্ড দারিদ্র্যের চাপে সুতো কলের কর্মীদের পথ্য কমে গিয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছে, এ পরিমাণটা প্রায় তার সমান।* কিন্তু তারপর দেখুন! সেই একই বিজ্ঞ চিকিৎসককে প্রিভি কাউন্সিলের মেডিকাল অফিসার পরে আর একবার পাঠিয়েছিলেন দরিদ্রতর শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির পুষ্টি সমন্ধে অনুসন্ধান করতে। সেই অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ আছে 'জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে ষষ্ঠ রিপোর্টে,' যা এই বছরে পার্লামেণ্টের আদেশানুসারে প্রকাশিত হয়েছে। কী আবিষ্কার করলেন ডাক্তার? যারা রেশম বোনে, যেসব মেয়েরা সূচের কাজ করে, যারা চামড়ার দস্তানা বানায়, মোজা তৈরি করে ইত্যাদি, তাদের গড়পড়তা যে আয় তা সুতাকল কর্মীদের দুর্দশাকালীন রুজিটুকুর চেয়েও কম, 'অনাহারজনিত রোগ এড়ানর জন্য ঠিক যতটুকু কার্বন ও নাইট্রোজেনও 'দরকার' সেটুকুও নয়।

এই রিপোর্ট থেকেই উদ্ধৃত করছি: 'তাছাড়া, কৃষক-জনসাধারণের মধ্য থেকে যে-সমস্ত পরিবারকে পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের সম্বন্ধে এটাই দেখা গেল যে, তাদের এক-পঞ্চমাংশেরও বেশীর ক্ষেত্রে কার্বনঘটিত খাদ্য জুটছে প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কম; নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে কম জুটছে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী ক্ষেত্রে এবং তিনটি জেলাতে (বার্কশায়ার, অকসফোর্ডশায়ার এবং সামারসেটশায়ার)

* পাঠককে একথা মনে করিয়ে দেওয়া বাহুল্য যে, জল এবং কিছু অজৈব উপাদান ছাড়া, মানুষের খাদ্যের কাঁচামাল হল কার্বন ও নাইট্রোজেন। অবশ্য, মানব-দেহকে পরিপুষ্ট করতে হলে এই সহজ রাসায়নিক উপাদানগুলিকে শাকশব্জি ও প্রাণীজাত খাদ্যবস্তু রূপেই সরবরাহ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আলুতে প্রধানত থাকে শুধু কার্বন, আর গমের রুটিতে যথাযথ অনুপাতে থাকে কার্বনজাত ও নাইট্রোজেনজাত বস্তু। (মার্কসের টীকা।)

লোকের গড়পড়তা স্থানীয় আহার্যেই নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্য প্রয়োজনের চেয়ে কম'। সরকারী রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, 'এ কথা মনে রাখা উচিত যে, নিতান্ত নিরুপায় হলেই তবে লোকেরা খাদ্যের অনটন স্বীকার করে এবং তাই সাধারণত অন্যান্য ব্যাপারে চরম কৃচ্ছ্রতার পরই তবে খাদ্যের কৃচ্ছ্রতা আসে... এমন কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাটাও এদের কাছে ব্যয়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য, এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার আত্মসম্মানী প্রচেষ্টা এখনও চোখে পড়লেও প্রতি ক্ষেত্রেই সে চেষ্টা মানে অধিকতর ক্ষুধার জ্বালা।' 'এ ভাবনা বেদনাদায়ক, বিশেষ করে যদি এ কথা মনে রাখি যে উপরোক্ত দারিদ্র্য অলসতার সঙ্গত দারিদ্র্য নয়, সে দারিদ্র্য সবক্ষেত্রেই শ্রমজীবী মানুষেরই দারিদ্র্য। বস্তুতপক্ষে যে কাজ করে এই সামান্য ভিক্ষান্ন মিলছে, সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যধিক দীর্ঘ।' রিপোর্টে এই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত সত্যও উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, ইংলণ্ড, ওয়েলস, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ড — 'ইউনাইটেড কিংডমের এই বিভাগগুলির মধ্যে' যে বিভাগ সবচেয়ে অবস্থাপন্ন সেই 'ইংলণ্ডের কৃষিজীবী জনসাধারণই সবচেয়ে কম খাদ্য খেয়ে থাকছে'; কিন্তু, এমন কি বার্কশায়ার, অকসফোর্ডশায়ার ও সামারসেটশায়ারের কৃষি-শ্রমিকরাও পূর্ব-লণ্ডনের দক্ষ গৃহ-কারিগরদের অনেকের চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকে।

এই হচ্ছে সরকারী বিবৃতি, যা ১৮৬৪ সালে পার্লামেণ্টের আদেশেই প্রকাশিত হয়েছে অবাধ-বাণিজ্যের স্বর্ণ যুগে, যখন অর্থসচিব কমন্স-সভার কাছে এই কথা জানান যে, 'গড় হিসাবে ব্রিটিশ শ্রমিকের অবস্থার যে পরিমাণ উন্নতি হয়েছে তা যে কোনো দেশের বা যে কোনো যুগের ইতিহাসে অসাধারণ ও অতুলনীয় বলে আমাদের বিশ্বাস।' এই সরকারী অভিনন্দনের তাল কাটছে জনস্বাস্থ্য বিভাগের সরকারী রিপোর্টের এই শুষ্ক মন্তব্যে: 'কোনো দেশের জনস্বাস্থ্য বলতে বোঝায় জনগণের স্বাস্থ্য, এবং জনগণও ততক্ষণ স্বাস্থ্যবান হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না একেবারে তলার দিকে তারা অন্তত কিছুটা সমৃদ্ধ হয়।'

'জাতির প্রগতিসূচক' পরিসংখ্যানগুলির নৃত্যে অর্থসচিবের চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে, তিনি উদ্দাম আনন্দে চীৎকার করে ওঠেন, '১৮৪২ থেকে ১৮৫২-এর মধ্যে দেশের ট্যাক্স-যোগ্য আয় শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল: আর ১৮৫৩ থেকে ১৮৬১ — এই ৮ বৎসরে এই আয় ১৮৫৩-এর তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে! ব্যাপারটি এত আশ্চর্য যে প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়...' মিঃ গ্ল্যাডস্টোন যোগ করেন, 'সম্পদ ও শক্তির এই চাঞ্চল্যকর বৃদ্ধি পুরোপুরি সম্পত্তিবান শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ!'

আপনারা যদি জানতে চান, স্বাস্থ্যহানি নৈতিক অধঃপাত ও মানসিক ধ্বংসের কোন অবস্থার মধ্যে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি 'পুরোপুরি সম্পত্তিবান শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সম্পদ ও শক্তির এই চাঞ্চল্যকর বৃদ্ধি' ঘটিয়েছে এবং এখনও ঘটাচ্ছে, তাহলে

ছাপাখানা ও দরজিদের কর্মশালার উপর বিগত 'জনস্বাস্থ্য রিপোর্টে' প্রদত্ত ছবিটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। ১৮৬৩ সালের 'শিশু নিয়োগ কমিশনের রিপোর্ট'এর সঙ্গে তুলনা করে দেখুন। সেখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে: 'শ্রেণী হিসাবে কুম্ভকাররা সকলেই, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই হল এক অতি অধঃপতিত জনসংখ্যা'; বলা হয়েছে যে, 'স্বাস্থ্যহীন শিশুরাই আবার স্বাস্থ্যহীন পিতা-মাতা হয়ে দাঁড়ায়'; 'ক্রমান্বয়ে জাতির অবনতি এগিয়েই চলবে'; আবার, 'পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে অনবরত লোক সংগ্রহ করা যদি না হত এবং যদি অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবান বংশে বিবাহাদি না চলত, তাহলে স্ট্যাফোর্ডশায়ারের জনসংখ্যার অবনতি হত আরও অনেক বেশী।' ঠিকা রুটি-কারিগরদের অভাব-অভিযোগ সংক্রান্ত মিঃ ট্রেমেনহিরের ব্লু বুকের দিকে নজর দিন। তাছাড়া, কারখানাসমূহের ইন্সপেক্টররা যে আপাত-বিরোধী বিবৃতি দিয়েছিল এবং যা রেজিস্ট্রার জেনারেল কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে, সে বিবৃতি পড়ে কে না শিউরে উঠেছে? সে বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, তুলার দুর্ভিক্ষে সাময়িকভাবে সুতাকল থেকে ছাড়া পাওয়ার ফলে বরাদ্দ দুঃস্থ খাদ্য মাত্রায় ল্যাংকাশায়ারের শ্রমিকদের স্বাস্থ্যোন্নতিই হচ্ছিল, আর তাদের শিশুসন্তানদের মৃত্যুহার কমছিল কারণ শিশুদের মায়েরা এতদিনে গডফ্রের আরকের (Godfrey's cordial) বদলে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াবার অবকাশ পাচ্ছিল।

আরেকবার উল্টো দিকটা দেখুন! ১৮৬৪-র ২০শে জুলাই কমন্স-সভার সামনে যে আয় ও সম্পত্তিগত ট্যাক্সের বিবরণ দাখিল করা হয় তা থেকে আমরা এই কথাই জানতে পারি যে, তহসিলদারদের হিসাব অনুযায়ী যেসব লোকের বাৎসরিক আয় ৫০,০০০ পাউন্ড ও তদূর্ধ্ব, তাদের দলে ১৮৬২-র ৫ই এপ্রিল থেকে ১৮৬৩-র ৫ই এপ্রিলের মধ্যে আরও তেরজন যোগ দিয়েছে, অর্থাৎ এই এক বছরে তাদের সংখ্যা ৬৭ থেকে ৮০-তে পৌঁছেছে। সেই একই বিবরণ থেকে এ কথাও প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, প্রায় ২,৫০,০০,০০০ পাউন্ড পরিমাণ বাৎসরিক আয় ভাগাভাগি হয়ে যায় ৩,০০০ লোকের মধ্যে অর্থাৎ ইংলন্ড ও ওয়েল্স-এর সমগ্র কৃষি শ্রমিকগণ আয় হিসাবে যে মুষ্টি ভিক্ষা লাভ করে তার মোট পরিমাণ থেকেও এ আয় কিছুটা বেশী। ১৮৬১ সালের লোকগণনার হিসাবটি খুলে দেখলে জানতে পারবেন যে, ইংলন্ড ও ওয়েল্স্-এর ভূমিসম্পত্তির পুরুষ মালিকের সংখ্যা ১৮৫১-তে যেখানে ছিল ১৬,৯৩৪, সেখানে তা ১৮৬১-তে কমে দাঁড়িয়েছে ১৫,০৬৬। অর্থাৎ, ১০ বছরে ভূমিসম্পত্তির কেন্দ্রীভবন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১১ ভাগ। এই হারে যদি অল্প কয়েকজনের হাতে দেশের জমির কেন্দ্রীভবন এগিয়ে যায়, তাহলে ভূমি সমস্যাটি অত্যন্ত সরল হয়ে যাবে, যেমন হয়েছিল রোম সাম্রাজ্যে, যখন অর্ধেক আফ্রিকা প্রদেশটির মালিক হয়েছে ছয়জন ভদ্রলোক এ কথা শুনে হেসেছিলেন নেরো।

'এত আশ্চর্য যে প্রায় অবিশ্বাস্য এইসব তথ্য নিয়ে' আমরা যে এত বেশী আলোচনা করলাম তার কারণ এই যে, শিল্প বাণিজ্যে ইউরোপের শীর্ষে রয়েছে ইংলণ্ড। একথা স্মরণ করা যেতে পারে যে, কয়েকমাস পূর্বে লুই ফিলিপের এক উদ্বাস্তু পুত্র প্রকাশ্যে ইংরেজ কৃষি-শ্রমিকদের এই বলে অভিনন্দিত করেন যে চ্যানেলের অপর পারে এদের অল্পতর সঙ্গতিসম্পন্ন সাথীদের তুলনায় এদের ভাগ্য ভাল। বাস্তবিকই, স্থানীয় রং বদলে ও কিছুটা সংকুচিত আকারে ইংলণ্ডের তথ্যগুলি ইউরোপের সমস্ত শিল্পোন্নত ও প্রগতিশীল দেশেই পুনরুদিত। এই সমস্ত দেশেই ১৮৪৮ সাল থেকে এক অশ্রুতপূর্ব শিল্প বিকাশ ও আমদানি রপ্তানির অকল্পনীয় প্রসার ঘটেছে। এই সমস্ত দেশেই 'পুরোপুরি সম্পত্তিবান শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সম্পদ ও শক্তির বৃদ্ধি' সত্যই 'চাঞ্চল্যকর'। ইংলণ্ডের মতো এইসব দেশেই শ্রমিক শ্রেণীর অল্প এক অংশের আসল মজুরির কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশের ক্ষেত্রেই আর্থিক মজুরির সামান্য বৃদ্ধি সুখসুবিধার যেটুকু আসল লাভ বোঝায় তা দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির খরচ ১৮৫২ সালে ৭ পাউণ্ড ৭ শিলিং ৪ পেন্সের জায়গায় ১৮৬১-তে ৯ পাউণ্ড ১৫ শিলিং ৮ পেন্সে উঠে যাওয়াতে শহরের দুঃস্থ আবাস বা অনাথালয়ের বাসিন্দাদের যেটুকু উপকার সম্ভব তার বেশী কিছু নয়। প্রত্যেক জায়গাতেই শ্রমজীবী জনগণের অধিকাংশ নিচে নেমে যাচ্ছে, অন্তত সেই হারেই যে হারে তাদের উপরতলার লোকদের সামাজিক জীবনে উন্নতি হচ্ছে। যন্ত্রের উন্নতি, উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, নতুন উপনিবেশ সৃষ্টি, দেশান্তর গমন, নতুন বাজার প্রতিষ্ঠা, অবাধ-বাণিজ্য — এসব কোনো কিছুই, এমন কি সব-কটি একত্র করেও মেহনতী জনগণের দুর্দশা যে দূর হবে না, বরং বর্তমানের মিথ্যা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে শ্রমের উৎপাদন-শক্তির প্রতিটি নতুন বিকাশের প্রবণতাই যে সামাজিক বৈষম্য গভীরতর করার ও সামাজিক বৈরভাব তীক্ষ্ণতর করার দিকেই -- এই সত্য আজ ইউরোপের সকল দেশের প্রত্যেকটি সংস্কারমুক্ত লোকের কাছেই প্রমাণিত হয়ে উঠেছে, এই সত্যকে অস্বীকার করে শুধু তারাই যারা অপরকে মূর্খের স্বর্গে ঠেলে দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে আর্থিক প্রগতির এই চাঞ্চল্যকর যুগে অনাহারজনিত মৃত্যু প্রায় একটা প্রথার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই যুগ শিল্প ও বাণিজ্যের সংকটরূপে সামাজিক মহামারীর আরো ঘন ঘন পুনরাগমন, অধিকতর বিস্তার এবং ক্রমবর্ধমান মারাত্মক ফলাফলের দ্বারা চিহ্নিত।

১৮৪৮-এর বিপ্লবগুলো ব্যর্থ হবার পর, ইউরোপীয় ভূখণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর যত পার্টি সংগঠন ও পার্টি পত্রিকা ছিল সবকিছুই শক্তির লৌহ হস্তে নিষ্পেষিত করা হল, শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রণী সন্তানরা হতাশ হয়ে আশ্রয় নিলেন আটলাণ্টিক

মহাসাগরের পরপারের প্রজাতন্ত্রে, আর শিল্পোন্মাদনা, নৈতিক অবক্ষয় ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার এক যুগের সামনে মিলিয়ে গেল মুক্তির স্বল্পস্থায়ী স্বপ্ন। ইউরোপখণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর পরাজয়ের জন্য অংশত দায়ী ছিল ইংরেজ সরকারের কূটনীতি; এখনকার মতোই তখনও ইংরেজ সরকার সেণ্ট পিটার্সবুর্গের মন্ত্রিসভার সঙ্গে ভ্রাতৃত্বসুলভ সৌহার্দ্য রেখে কাজ করছিল। এই পরাজয়ের সংক্রামক ফলাফল শীঘ্রই চ্যানেলের এপারেও এসে পেঁছিল। ইউরোপখণ্ডের ভাইদের বিপর্যয়ে একদিকে যেমন ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর মনোবল কমে গেল ও নিজ আদর্শের সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস ভেঙে পড়ল, তেমনি অপরদিকে এর ফলে ভূমিপতি ও ধনপতিদের কিছুটা বিচলিত আত্মপ্রত্যয় আবার ফিরে এল। যে-সব সুবিধা দেবার কথা তারা আগেই বিজ্ঞাপিত করেছিল, ঔদ্ধত্যভরে সে সব তারা প্রত্যাহার করে নিল। নতুন নতুন স্বর্ণ-অঞ্চল আবিষ্কৃত হওয়ায় দলে দলে লোক দেশত্যাগ করতে লাগল এবং তার ফলে ব্রিটিশ প্রলেতারীয়দের মধ্যে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় ফাঁক। তাদের আগেকার দিনের সক্রিয় অন্য কর্মীরা বেশী কাজ ও বেশী মজুরির সাময়িক ঘুষের মায়ায় 'রাজনৈতিক দালালে' পরিণত হল। চার্টিস্ট আন্দোলনকে* জীবিত রাখার বা পুনর্গঠিত করার সমস্ত প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হল, শ্রমিক শ্রেণীর মুখপাত্র কাগজগুলি জনসাধারণের উদাসীনতায় একে একে বিলুপ্ত হয়ে গেল; এবং সত্য কথা বলতে গেলে এমন এক রাজনৈতিক অবলুপ্তির অবস্থার সঙ্গে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণী পরিপূর্ণ মাত্রায় নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে বলে মনে হল যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। সুতরাং, ব্রিটেন ও ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের সাযুজ্য না থাকলেও অন্তত পরাজয়ের সাযুজ্য ঘটল।

তাসত্ত্বেও, ১৮৪৮-এর বিপ্লবগুলির পরবর্তী যুগটা ক্ষতিপূরণের চিহ্ন বর্জিত নয়। এখানে আমরা শুধু দুটি বিরাট ঘটনার উল্লেখ করব।

ত্রিশ বৎসর ধরে প্রশংসনীয় ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই করার পর ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণী ভূমিপতি ও ধনপতিদের মধ্যে এক সাময়িক ভাঙন কাজে লাগিয়ে দশ ঘণ্টার আইনটি পাশ করাতে সক্ষম হল। এর ফলে কারখানার শ্রমিকদের প্রভূত শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক যে উপকারের কথা কারখানা পরিদর্শকদের অর্ধ বাৎসরিক রিপোর্টে লিপিবদ্ধ হয় তা এখন সর্বত্রই স্বীকৃত। ইউরোপে অধিকাংশ সরকারকেই ইংলণ্ডের ফ্যাক্টরি

* চার্টিস্ট (ইংরাজি চার্টার বা সনদ থেকে) আন্দোলন — দুঃসহ আর্থিক অবস্থা ও রাজনৈতিক অধিকারহীনতার ফলে উদ্ভূত ইংরেজ শ্রমিকদের গণ বিপ্লবী আন্দোলন। বিরাট বিরাট সভা শোভাযাত্রা সহকারে আন্দোলন শুরু হয় গত শতকের তিরিশের শেষদিকে ও থেমে থেমে তা চলে পঞ্চাশের দশকের গোড়া পর্যন্ত।

চার্টিস্ট আন্দোলনের অসাফল্যের প্রধান কারণ সুসঙ্গত বিপ্লবী প্রলেতারীয় নেতৃত্ব ও পরিষ্কার কর্মসূচির অভাব। — সম্পাঃ

আইন কম বেশী সংশোধিত রূপে গ্রহণ করতে হয়েছে এবং ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টকেও প্রতিবৎসর এর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করতে হচ্ছে। কিন্তু ব্যবহারিক সুবিধাটুকু ছাড়াও, শ্রমজীবী মানুষের এই বিধানটির বিস্ময়কর সাফল্যকে গৌরবজনক মনে করার অন্য কারণও ছিল। ডাঃ ইউর, অধ্যাপক সিনিয়র ও এই জাতের অন্যান্য মহাপণ্ডিতদের মতো তাদের বিজ্ঞানের অতি কুখ্যাত মুখপাত্রদের মাধ্যমে মধ্য শ্রেণী এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল এবং প্রাণভরে প্রমাণ করেছিল যে, শ্রমের ঘণ্টা যদি আইনগত ভাবে সীমাবদ্ধ হয়, তাহলে তাতে ব্রিটিশ শিল্পের মৃত্যু পরোয়ানাই জারী করা হবে; এ শিল্প বাঁচতে পারে কেবল পিশাচের মতো রক্ত চুষে, তদুপরি শিশুর রক্ত চুষেই। পুরাকালে শিশুহত্যা ছিল মোলখ (Moloch) পূজার্চনার এক রহস্যময় অনুষ্ঠান কিন্তু সে অনুষ্ঠান পালন করা হত শুধু অতি গাম্ভীর্যপূর্ণ উপলক্ষে, বৎসরে হয়ত বা একবার, এবং তা ছাড়া, শুধুমাত্র গরিব শিশুদের ওপরেই একমাত্র পক্ষপাত মোলখের ছিল না। শ্রমিকের কাজের ঘণ্টা আইনত সীমাবদ্ধ রাখার এই সংগ্রাম আরও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে এই কারণে যে আতঙ্কিত লালসার কথা ছাড়াও এর প্রভাব পড়েছিল এক বিরাট প্রতিদন্দ্বিতার উপর, একদিকে মধ্য শ্রেণীর অর্থশাস্ত্রের যা ভিত্তি, সেই চাহিদা ও সরবরাহের নিয়মের অন্ধ প্রভুত্বের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর যা অর্থশাস্ত্র সেই সামাজিক দূরদৃষ্টি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত সামাজিক উৎপাদনের দ্বন্দ্ব। সুতরাং, দশ ঘণ্টার আইনটি শুধু যে এক বৃহৎ ব্যবহারিক সাফল্য তাই নয়; এ হল একটা নীতিরও জয়; এই সর্বপ্রথম প্রকাশ্য দিবালোকে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থশাস্ত্রের কাছে মধ্য শ্রেণীর অর্থশাস্ত্র পরাজিত হল।

কিন্তু সম্পত্তির অর্থশাস্ত্রের উপর শ্রমের অর্থশাস্ত্রের আরো বড় একটি বিজয় বাকি ছিল। আমরা সমবায় আন্দোলনের কথা বলছি, বিশেষত কোনোরকম সহায়তা না পেয়েও কিছু সাহসী 'মজুরের' ('hands') চেষ্টায় যে সব সমবায়মূলক কারখানা প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার কথা। এই ধরনের বিরাট সামাজিক পরীক্ষার মূল্য অসীম বিপুল। যুক্তি তর্কের বদলে কাজ দিয়েই এই সমবায়গুলি দেখিয়ে দিয়েছে যে, শ্রমিক শ্রেণীর নিয়োগকারী মালিক শ্রেণী না থাকলেও বৃহৎ আকারে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের নির্দেশানুযায়ী উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া যায়; দেখিয়ে দিয়েছে যে, সার্থক হতে হলে শ্রমজীবীর ওপর আধিপত্য ও তাকে লুণ্ঠিত করাব মাধ্যমরূপে শ্রমের উপায়কে একচেটিয়াধীন করার প্রয়োজন পড়ে না; দেখিয়ে দিয়েছে যে, ঠিকা শ্রম হচ্ছে দাসশ্রম ও ভূমি দাসশ্রমের মতোই শ্রমের এক নিকৃষ্ট ও স্বল্পস্থায়ী রূপমাত্র, উৎসুক হাতে প্রস্তুত মনে প্রফুল্ল চিত্তে চালানো সংঘবদ্ধ শ্রমের সামনে যা অদৃশ্য হতে বাধ্য। ইংলণ্ডে রবার্ট ওয়েন সমবায় পদ্ধতির বীজ বপন করেন; ইউরোপখণ্ডে শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে যে সব পরীক্ষা করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা উদ্ভাবিত নয়, ১৮৪৮ সালে সরবে ঘোষিত তত্ত্বাদির ব্যবহারিক পরিণতি।

সেইসঙ্গে ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৪ পর্যন্ত সময়কালের অভিজ্ঞতা থেকে এটাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে, নীতির দিক থেকে যতই উৎকৃষ্ট ও ব্যবহারের দিক থেকে যতই উপযোগী হোক না কেন, সমবায় শ্রমকে ব্যক্তিগত শ্রমিকদের অনিয়মিত প্রচেষ্টার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখলে, একচেটিয়া মালিকানার জ্যামিতিক হারের ক্রমবৃদ্ধিকে বাধা দেওয়া বা জনসাধারণকে মুক্ত করা অথবা তাদের দুর্দশার বোঝাটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লাঘব করাও কখনও সম্ভব হবে না। বোধহয় ঠিক এই কারণেই, মধুভাষী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা, মধ্য শ্রেণীর মানব হিতৈষী বাক্যবাগিশরা এবং এমন কি উৎসাহী অর্থতাত্ত্বিকেরা পর্যন্ত সকলেই হঠাৎ এই সমবায় শ্রম পদ্ধতির ঘিনঘিনে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন, যদিও ঠিক এই পদ্ধতিকেই তাঁরা স্বপ্নচারীর ইউটোপিয়া বলে উপহাস অথবা সমাজবাদীর অনাচার বলে নিন্দিত করে অংকুরেই বিনষ্ট করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। মেহনতী জনসাধারণকে উদ্ধার করতে হলে সমবায় শ্রমকে দেশজোড়া আয়তনে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং কাজেই তাকে সারা জাতির সম্পদ দিয়ে পরিপোষণ করতে হবে। কিন্তু ভূমিপতি ও পুঁজিপতিরা তাদের অর্থনৈতিক একচেটিয়া রক্ষা ও চিরস্থায়ী করার জন্য নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধা সর্বদাই ব্যবহার করবে। সুতরাং, শ্রমের মুক্তির পথে সাহায্য করা দূরে থাক, সে পথে সর্বপ্রকার বাধা সৃষ্টির কাজই তারা করে যাবে। মনে করে দেখুন, গত অধিবেশনে লর্ড পামারস্টোন আইরিশ প্রজাস্বত্ব বিলের প্রবক্তাদের অপদস্থ করার জন্য কী রকম বিদ্রূপ করেছিলেন। তিনি বলে দিলেন, 'কমন্স-সভা হচ্ছে ভূস্বামীদের সভা।'

অতএব রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে এক মহান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা তারা উপলব্ধি করেছে বলেই মনে হয়, কেননা ইংলণ্ড, জার্মানি, ইতালি এবং ফ্রান্সে একই সঙ্গে নবজাগরণ শুরু হয়েছে এবং সর্বত্র একসঙ্গেই শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির রাজনৈতিক পুনর্গঠনের চেষ্টাও চলছে।

সাফল্যের একটা উপাদান শ্রমিক শ্রেণীর আছে -- সংখ্যা; কিন্তু সঙ্ঘের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ এবং জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হতে পারলে তবেই সংখ্যায় পাল্লা ভারী হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, ভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের মধ্যে থাকা উচিত ও তাদের মুক্তি সংগ্রামে পরস্পরের জন্য একযোগে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করা উচিত সেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রতি অবহেলা তাদের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলিকে কী রকম সাধারণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে ফেলে। এই চিন্তাই ১৮৬৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরে সেণ্ট মার্টিন হলে এক সভায় সমবেত বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবী মানুষকে তাদের আন্তর্জাতিক সমিতি প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

আর একটি প্রত্যয়ও এই সভাকে প্রভাবান্বিত করেছে।

শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য যদি তাদের ভ্রাতৃত্বসূচক ঐক্য প্রয়োজন হয়, তাহলে অপরাধমূলক মতলব হাসিল করার জন্য অনুসৃত যে পররাষ্ট্র নীতি জাতিগত কুসংস্কার ব্যবহার করছে, দস্যু-যুদ্ধে জনগণের রক্ত ও সম্পদ অপচয় করছে, সেই নীতি বজায় থাকলে এ মহান ব্রতটি কী করে পূর্ণ করা যাবে? আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারে দাসত্বকে কায়েম রাখার ও প্রচারিত করার কলঙ্কময় জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে পশ্চিম ইউরোপকে বাঁচিয়েছিল শাসক শ্রেণীর বিজ্ঞ মনোভাব নয়, বাঁচিয়েছিল সেই অপরাধসূচক মূর্খামির বিরুদ্ধে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীরই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ। ককেশাসের পার্বত্য দুর্গটি যখন রাশিয়ার শিকারে পরিণত হচ্ছিল এবং বীর পোল্যাণ্ডকে রাশিয়া যখন হত্যা করছিল তখন ইউরোপের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যে নির্লজ্জ সমর্থন, ভণ্ড সহানুভূতি বা আহাম্মকসুলভ উদাসীনতাই দেখিয়েছিল, যে বর্বর শক্তির মাথা রয়েছে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এবং যার হাত রয়েছে ইউরোপের প্রত্যেকটি মন্ত্রিসভায়, সেই রাশিয়ার যে ব্যাপক ও অপ্রতিহত অনধিকার হস্তক্ষেপ ঘটছে: তা থেকে শ্রমিক শ্রেণী শিখেছে যে, তার কর্তব্য হল আন্তর্জাতিক রাজনীতির রহস্য আয়ত্ত করা; নিজ নিজ সরকারের কূটনৈতিক কার্যকলাপের উপর নজর রাখা; প্রয়োজন হলে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে সে কার্যকলাপের প্রতিরোধ করা, তাকে ব্যর্থ করতে অক্ষম হলে অন্তত সকলে একসঙ্গে তার প্রকাশ্য নিন্দা করা এবং নীতি ও ন্যায়ের যে সব সহজ নিয়ম দিয়ে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক শাসিত হওয়া উচিত, তাদেরই প্রতিষ্ঠা করা জাতিসমূহের মধ্যেকার যোগাযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম হিসাবে।

এই রকমের পররাষ্ট্র নীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হল শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সাধারণ সংগ্রামের একাংশ।

দুনিয়ার মজুর এক হও!

১৮৬৯ সালের অক্টোবর ২১-২৭ তারিখে মার্কস কর্তৃক লিখিত
ইংরেজীতে স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসাবে লণ্ডনে, ১৮৬৪ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত এবং একই সঙ্গে জার্মান ভাষায় *Social-Demokrat* পত্রিকায়, ১৮৬৪ সালের ২১শে ও ৩০শে ডিসেম্বর প্রকাশিত

ইংরেজী পুস্তিকার পাঠ অনুসারে অনূদিত

কার্ল মার্কস

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলী*

যেহেতু

শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি শ্রমিক শ্রেণীকেই জয় করে নিতে হবে; শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম, তার অর্থ শ্রেণীগত সুবিধা ও একচেটিয়া অধিকারের জন্য সংগ্রাম নয়, সমান অধিকার ও কর্তব্যের জন্য এবং সমস্ত শ্রেণী আধিপত্যের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম;

শ্রম করে যে মানুষ, শ্রম উপায়ের অর্থাৎ জীবনধারণের বিভিন্ন উৎসের একচেটিয়া মালিকের কাছে সেই মানুষের অর্থনৈতিক অধীনতাই রয়েছে সকল রকম দাসত্বের, সব ধরনের সামাজিক দুর্গতি, মানসিক অধঃপতন ও রাজনৈতিক পরাধীনতার মূলে;

সুতরাং, শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তিই হচ্ছে সেই মহান লক্ষ্য, যা সাধনের উপায় হিসেবে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনকেই তার অধীনস্থ হতে হবে;

সেই মহান লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে আজ পর্যন্ত যত প্রচেষ্টা হয়েছে তা সবই ব্যর্থ হয়েছে, প্রত্যেক দেশের শ্রমিকদের মধ্যকার বহুবিধ শাখার মধ্যে সংহতির অভাবে এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বসূচক ঐক্যবন্ধন না থাকায়;

শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির সমস্যাটি কোনো স্থানীয় বা জাতীয় সমস্যা নয়, এ সমস্যা হচ্ছে একটি সামাজিক সমস্যা, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাধীন সমস্ত দেশকে নিয়ে, আর এ সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে সবচেয়ে অগ্রণী দেশগুলির ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক সহযোগের উপর;

ইউরোপের সর্বাধিক শিল্পোন্নত দেশসমূহে শ্রমিক শ্রেণীর বর্তমান পুনরুজ্জীবন যেমন এক নতুন আশার সঞ্চার করছে, তেমনি এক গুরুত্বপূর্ণ সাবধান বাণীও জানিয়ে

* ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বরে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির লণ্ডন সম্মেলনে এই নিয়মাবলী গৃহীত হয়েছিল। ১৮৬৪ সালে যখন প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময় মার্কস যে 'সাময়িক নিয়মাবলী' রচনা করেছিলেন এদের ভিত্তি তার উপরেই। — সম্পাঃ

দিচ্ছে যেন পুরানো ভুল আর না করা হয়, এবং আহবান জানাচ্ছে আজ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলির আশু একত্রীকরণের;

তাই, এই সব কারণের জন্য --

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল। এই সংস্থা ঘোষণা করছে যে:

যে সমস্ত সংঘ ও ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন তাঁরা বর্ণ, ধর্মবিশ্বাস ও জাতীয়তা নির্বিশেষে পরস্পরের প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি তাঁদের আচরণের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করবেন সত্য, ন্যায় ও নৈতিকতা;

কর্তব্য ব্যতিরেকে অধিকার এবং অধিকার ব্যতিরেকে কর্তব্য এই সমিতি স্বীকার করে না।

এই মনোভাব নিয়েই নিম্নলিখিত নিয়মাবলী রচনা করা হল:

১। শ্রমিক শ্রেণীর রক্ষা, অগ্রগতি ও পূর্ণমুক্তি — এই এক লক্ষ্য নিয়ে গঠিত বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সংঘ আছে, সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার একটি কেন্দ্রীয় মাধ্যম সৃষ্টি করার জন্যই এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল।

২। এই সমিতির নাম হবে 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি'।

৩। সমিতির শাখাগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতি বৎসর শ্রমজীবী মানুষের একটি সাধারণ কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। কংগ্রেস শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষা ঘোষণা করবে, আন্তর্জাতিক সমিতির কাজকে সফলভাবে চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সংস্থার সাধারণ পরিষদ নিয়োগ করবে।

৪। প্রত্যেক কংগ্রেস পরবর্তী কংগ্রেসের সময় ও স্থান নির্ধারণ করবে। নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে প্রতিনিধিরা সমবেত হবেন এবং এর জন্য তাদের কোনো বিশেষ আমন্ত্রণ জানান হবে না। প্রয়োজন হলে, সাধারণ পরিষদ অধিবেশনের স্থান পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু অধিবেশনের সময় স্থগিত রাখার ক্ষমতা এই পরিষদের নেই। প্রতি বৎসর কংগ্রেস সাধারণ পরিষদের কর্মকেন্দ্র স্থির করে দেবে ও সভ্যদের নির্বাচিত করবে। এইভাবে নির্বাচিত সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা থাকবে নিজেদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার।

সাধারণ কংগ্রেসের বাৎসরিক সভায় সাধারণ পরিষদের বৎসরের কাজকর্মের একটি প্রকাশ্য হিসাব উপস্থিত করা হবে। জরুরি অবস্থায় সাধারণ পরিষদ নিয়মিত বাৎসরিক অধিবেশনের আগেও সাধারণ কংগ্রেস আহবান করতে পারবে।

৫। আন্তর্জাতিক সমিতিতে যে সব দেশের প্রতিনিধিত্ব আছে তাদেরই শ্রমিক সদস্য নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। কাজকর্ম চালাবার জন্য সাধারণ পরিষদ তার

সদস্যদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা নির্বাচিত করবে: যেমন, একজন কোষাধ্যক্ষ, একজন সাধারণ সম্পাদক, বিভিন্ন দেশের জন্য এক একজন করেস্পণ্ডিং সম্পাদক ইত্যাদি।

৬। যাতে একদেশের শ্রমজীবী মানুষ অন্য প্রত্যেকটি দেশের স্বশ্রেণীর আন্দোলনের খবরাখবর সদা সর্বদাই পেতে পারে; যাতে একই সঙ্গে একই সাধারণ পরিচালনায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান চলতে পারে; একটি সঙ্ঘের মধ্যে সাধারণ স্বার্থের যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছে সেগুলি যাতে সমস্ত সঙ্ঘ দ্বারাই আলোচিত হতে পারে; এবং যখন কোনো আশু কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় — উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে তখন যাতে সংযুক্ত সঙ্ঘগুলির কার্যক্রম একযোগে একইরকম হতে পারে, তার জন্য সমিতির বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় শাখাগুলির পক্ষে সাধারণ পরিষদ একটি আন্তর্জাতিক এজেন্সি হিসেবে কাজ করবে। যখনই প্রয়োজন হবে তখনই বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় সঙ্ঘগুলির সামনে প্রস্তাব উপস্থিত করার উদ্যোগ সাধারণ পরিষদ গ্রহণ করবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য সাধারণ পরিষদ কিছুকাল পর পর বিবরণী প্রকাশ করবে।

৭। যে হেতু ঐক্য ও সংহতির শক্তি ছাড়া কোনো দেশের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে সফলতা আনা সম্ভব না, এবং যেহেতু অন্যদিকে, শ্রমজীবী মানুষের সঙ্ঘের অল্প কয়েকটি জাতীয় কেন্দ্রকে নিয়ে, নাকি অনেকগুলি ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন স্থানীয় সঙ্ঘ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে তার উপরই আন্তর্জাতিক সাধারণ পরিষদের উপযোগিতা নির্ভর করছে, সেইজন্য আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্যদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যাতে নিজ নিজ দেশের শ্রমজীবী মানুষের বিচ্ছিন্ন সঙ্ঘগুলিকে যুক্ত করে এক একটি জাতীয় সংগঠনে পরিণত করতে পারা যায়, যার প্রতিনিধিত্ব করবে এক একটি কেন্দ্রীয় জাতীয় সংস্থা। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, এই নিয়মের প্রয়োগ নির্ভর করবে প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিশেষ আইনের উপর, এবং আইনগত প্রতিবন্ধকতার কথা বাদ দিলে কোনো স্বাধীন স্থানীয় সঙ্ঘের পক্ষে সরাসরি সাধারণ পরিষদের সঙ্গে পত্রালাপ করারও কোনো বাধা থাকবে না।

৭। ক॥ মালিক শ্রেণীর যৌথ ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হিসাবে সক্রিয় হতে পারে শুধুমাত্র তখনই, যখন তারা নিজেদের এমন একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টিতে গঠিত করে, যে পার্টি মালিক শ্রেণী দ্বারা গঠিত সমস্ত পুরনো পার্টির বিরোধী।

সামাজিক বিপ্লব ও তার শেষ লক্ষ্য — শ্রেণীর বিলোপ সাধনকে জয়যুক্ত করতে হলে একটি রাজনৈতিক পার্টিতে প্রলেতারিয়েতের এই সংগঠন অপরিহার্য।

অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিগুলির যে জোট ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে, তাকে এই শ্রেণী তাদের শোষণকারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামেও হাতল হিসাবে অবশ্য ব্যবহার করবে।

ভূমি ও পুঁজির মালিকেরা যেহেতু তাদের অর্থনৈতিক একচেটিয়া রক্ষা ও চিরস্থায়ী করার জন্য ও শ্রমকে দাস করে রাখার জন্য নিজেদের রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগুলিকে সর্বদাই কাজে লাগায়, সেইহেতু রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করে নেওয়ার কাজটি প্রলেতারিয়েতের একটি বিরাট কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।*

৮। সাধারণ পরিষদের সঙ্গে পত্রালাপের জন্য সমিতির প্রত্যেক শাখার নিজ নিজ করেস্পণ্ডিং সম্পাদক নিয়োগ করার অধিকার থাকবে।

৯। যারাই শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির নীতিসমূহ স্বীকার ও সমর্থন করে তাদের প্রত্যেকেই এর সদস্য হবার যোগ্য। প্রত্যেক শাখা সেই শাখা কর্তৃক গৃহীত সদস্যদের সততার জন্য দায়ী থাকবে।

১০। আন্তর্জাতিক সমিতির কোনো সদস্য একদেশ থেকে আর একদেশে তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন করলে, তিনি সংস্থাভুক্ত শ্রমজীবী মানুষদের ভ্রাতৃত্বসুলভ সাহায্য পাবেন।

১১। শ্রমজীবী মানুষের যে সঙ্ঘগুলি আন্তর্জাতিক সমিতিতে যোগ দিচ্ছে সেগুলি ভ্রাতৃসূচক সহযোগিতার চিরস্থায়ী বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হলেও, তাদের বর্তমান সংগঠনকে অক্ষুণ্ণ রাখবে।

১২। প্রত্যেক কংগ্রেসে এই নিয়মাবলী সংশোধন করা যেতে পারে, তবে সেরূপ সংশোধনের পক্ষে উপস্থিত প্রতিনিধিদের তিনভাগের দুভাগের সমর্থন থাকা চাই।

১৩। বর্তমান নিয়মাবলীতে সন্নিবিষ্ট হয়নি এরূপ প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য বিশেষ বিধান করা যাবে, সেগুলি হবে প্রত্যেক কংগ্রেসের সংশোধন সাপেক্ষ।

এই নিয়মাবলীর মূলপাঠ
মার্কস কর্তৃক ১৮৬৪ সালে
২১শে থেকে ২৭শে অক্টোবর
তারিখের মধ্যে রচিত হয়
শেষ পাঠটি একটি স্বতন্ত্র
পুস্তিকা রূপে ১৮৭১-এ
লণ্ডনে প্রকাশিত

ইংরেজী ভাষায় লিখিত
১৮৭১-এর পুস্তিকা অনুযায়ী অনূদিত
৭। ক॥ ধারাটি
ফরাসী ভাষা থেকে অনূদিত
ইংরেজী ভাষ্যের ভাষান্তর

---

* ৭। ক॥ ধারাটি হচ্ছে ১৮৭১-এর লণ্ডন সম্মেলনের প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। প্রথম আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসে (সেপ্টেম্বর, ১৮৭২-এর) গৃহীত সংশোধন দ্বারা এই ধারাটি সাধারণ নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। — সম্পাঃ

কার্ল মার্কস

প্রুধোঁ প্রসঙ্গে

(জে. বি. শ্‌ভাইৎসার-এর নিকট লিখিত পত্র)

লণ্ডন, ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৬৫

প্রিয় মহাশয়!

গতকাল আমি একটি চিঠি পেয়েছি, তাতে **প্রুধোঁ** সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে একটি বিস্তারিত অভিমত আপনি চেয়েছেন। আপনার ইচ্ছা পূরণের অন্তরায় হয়েছে আমার সময়াভাব। উপরন্তু তাঁর **কোনো** রচনাও আমার কাছে নেই। যাই হোক, আপনাকে আমার সম্প্রীতি জানাবার জন্য তাড়াতাড়ি একটা সংক্ষিপ্ত খসড়া খাড়া করেছি। আপনি তারপর এর সম্পূরণ, সংযোজন, বিয়োজন এক কথায় এটিকে নিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারেন।

প্রুধোঁর আদি প্রয়াসের কথা এখন আর আমার মনে পড়ে না। **'সর্বজনীন ভাষা'** সম্বন্ধে তাঁর স্কুল জীবনের একটি লেখা থেকে বোঝা যায় যে, যে সব সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর সামান্যতম জ্ঞানেরও অভাব ছিল তাতে হাত দিতে তিনি কত কম ইতস্তত করেছিলেন।

তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'সম্পত্তি কী?' সর্বতোভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিষয়বস্তুর নতুনত্বের জন্য না হলেও, অন্তত যে নতুন এবং উদ্ধত ভঙ্গিতে পুরনো বক্তব্য বলা হয়েছে তার জন্য বইখানা যুগান্তকারী। যেসব ফরাসী সমাজতন্ত্রী এবং কমিউনিস্টদের রচনা তিনি জানতেন সেখানে অবশ্য 'সম্পত্তি' শুধু নানাভাবে সমালোচিতই হয়নি, ইউটোপীয় কায়দায় **'নির্মূলও'** হয়েছে। এই বইতে সাঁ-সিমোঁ ও ফুরিয়েরের সঙ্গে প্রুধোঁর সম্পর্ক প্রায় হেগেলের সঙ্গে ফয়েরবাখ্-এর সম্পর্কেরই মতো। হেগেল-এর সঙ্গে তুলনায় ফয়েরবাখ আত্যন্তিকভাবেই অকিঞ্চিৎকর। তাসত্ত্বেও তিনি ছিলেন হেগেল-এর

পরবর্তী কালের পক্ষে যুগান্তকারী, কারণ তিনি এমন কতকগুলি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন যেগুলি খ্রীষ্টীয় চেতনার কাছে অপ্রীতিকর অথচ সমালোচনার অগ্রগতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, এবং যাদের হেগেল রহস্যময় অর্ধ-অস্পষ্টতার মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন।

প্রুধোঁর এই গ্রন্থখানিতে, বলা যেতে পারে, একটি বলিষ্ঠ পেশীবহুল বাচনভঙ্গি তখনও বজায় ছিল। আর আমার মতে এই বাচনভঙ্গিই এর মুখ্য গুণ। যে কেউ দেখতে পাবেন যে, শুধু পুরনো কথাব পুনরাবৃত্তি করার সময়েও প্রুধোঁ যেন নিজস্ব আবিষ্কার উপস্থিত করছেন: তিনি যা বলছেন তা তাঁর কাছে নূতন, এবং নূতনের মর্যাদা পাচ্ছে। উত্তেজক ঔদ্ধত্য, অর্থশাস্ত্রের 'পবিত্রেষু পবিত্রতমের' উপর হস্তক্ষেপ, অপূর্ব আপাতবিরোধী বক্তব্যে বুর্জোয়া মামুলীবুদ্ধিকে ঠাট্টা, সুতীব্র সমালোচনা, তিক্ত বিদ্রূপ, প্রচলিত সমস্ত জঘন্যতার সম্বন্ধে এখানে ওখানে গভীর আন্তরিক রোষ প্রকাশ, বৈপ্লবিক একাগ্রতা --এইসব কিছুর জন্য 'সম্পত্তি কী?' গ্রন্থখানি এক বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। অর্থশাস্ত্রের সঠিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসে এই গ্রন্থ প্রায় উল্লেখযোগ্যই নয়। কিন্তু এই ধরনের হুজুগে গ্রন্থ যেমন ললিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একটা ভূমিকা নেয়। ম্যালথাসের 'জনসংখ্যা প্রসঙ্গে' বইখানির কথাই ধরুন। প্রথম সংস্করণে বইখানি একটি **'হুজুগে পুস্তিকা'** এবং তদুপরি, আদ্যোপান্ত **অন্যের লেখা চুরি ছাড়া** আর কিছু নয়। কিন্তু, তবু, **মানবজাতির মানহানিকর** এই বস্তুটির দ্বারা কী উত্তেজনার না সৃষ্টি হয়েছিল!

আমার হাতের কাছে প্রুধোঁর কোনো গ্রন্থ থাকলে আমি তাঁর অনুসৃত **প্রথম পদ্ধতির** ব্যাখ্যার জন্য সহজেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে পারতাম। যে অংশগুলি তিনি নিজেই সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন বলে বিবেচনা করতেন সেখানে অ্যাণ্টিনমির (দ্বন্দ্ব-পরম্পরার) আলোচনায় ক্যাণ্ট যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তিনি তারই অনুসরণ করেছেন। তিনি অনুবাদের মাধ্যমে একমাত্র যে জার্মান দার্শনিকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি ক্যাণ্ট। আর তাঁর মনে এই ধারণাই প্রবল হয় যে, ক্যাণ্টের পক্ষেও যেমন তাঁর পক্ষেও তেমনি অ্যাণ্টিনমির মীমাংসার ব্যাপারটি মানুষের বোধের **'বহির্ভূত,'** অর্থাৎ ব্যাপারটি এমন একটি কিছু যার সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণাটাই তমসাচ্ছন্ন।

কিন্তু তাঁর যত কিছু মেকি স্বর্গজয় সত্ত্বেও 'সম্পত্তি কী?' বইখানির মধ্যেও এই স্ববিরোধ চোখে পড়বে যে, প্রুধোঁ একদিকে ছোট জমির মালিক কৃষকের (পরে পেটি বুর্জোয়ার) চোখ দিয়ে ও তার মতবাদ থেকে সমাজের সমালোচনা করছেন, অথচ অন্যদিকে প্রয়োগ করেছেন সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে পাওয়া মাপকাঠি।

বইখানির ত্রুটি একেবারে তার নামকরণের মধ্যেই দেখা যায়। প্রশ্নটা এমন ভ্রান্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে সঠিকভাবে উত্তর দেওয়া যায় না। **প্রাচীন 'সম্পত্তি-সম্পর্কসমূহ'** লয় পেয়েছিল **সামন্ততান্ত্রিক** সম্পত্তি-সম্পর্কের মধ্যে; এবং তারা আবার লোপ পায় **'বুর্জোয়া'** সম্পত্তি-সম্পর্কের ভিতর। এইভাবে ইতিহাস নিজেই অতীত **সম্পত্তি-সম্পর্কের** সমালোচনা চালিয়েছে। প্রুধোঁর আসল বিচার্য বিষয় ছিল **আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তি** — যা আজ বর্তমান। বস্তুটি যে কী, সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত কেবল **'অর্থশাস্ত্রের'** সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে যাতে সমগ্র **সম্পত্তি-সম্পর্ক** ধরা হচ্ছে, **ইচ্ছাগত সম্পর্কের আইনগত** অভিব্যক্তি হিসাবে নয়, **উৎপাদন-সম্পর্ক-রূপ** বাস্তব মূর্তিতে। কিন্তু যেহেতু প্রুধোঁ এই সমগ্র অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলিকে **'সম্পত্তির'** সাধারণ আইনগত সংজ্ঞার মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছেন, তাই ১৭৮৯ সালের আগেই এই ধরনের রচনায় ব্রিসো একই ভাষায় প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন 'সম্পত্তির অর্থ হল চুরি,' তাকে অতিক্রম করতে তিনি পারলেন না।

এর ভিতর থেকে খুব বেশী হলে এইটুকু পাওয়া যেতে পারে যে **'চৌর্য'** সম্বন্ধে বুর্জোয়া আইনী প্রত্যয় বুর্জোয়াদের নিজেদের **'সদুপায়ে'** অর্জিত লাভ সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। অপরপক্ষে, যেহেতু **'চৌর্য'** সম্পত্তির বলপূর্বক লঙ্ঘন বললে **সম্পত্তিকেই আগে ধরে নেওয়া হচ্ছে,** সেইহেতু **প্রকৃত বুর্জোয়া সম্পত্তি** সম্বন্ধে প্রুধোঁ সর্বপ্রকার অলীক কল্পনার জালে নিজেকে জড়িয়েছেন যা এমন কি তাঁর নিজের কাছেও দুর্বোধ্য।

১৮৪৪-এ প্যারিসে অবস্থানকালে আমি প্রুধোঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছিলাম। এখানে এ কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে পণ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়াকে ইংরেজরা যে **'মিশ্রণদুষ্টি'** *('Sophistication')* আখ্যা দিয়ে থাকে প্রুধোঁর এই মিশ্রণদুষ্টির জন্য আমিও কিছুটা পরিমাণে দোষী। প্রায়ই সারা রাত্রি ব্যাপী দীর্ঘ বিতর্কের সময় আমি তাঁকে হেগেলীয় মতবাদের দ্বারা সংক্রামিত করে তাঁর ক্ষতি সাধনই করেছিলাম -- জার্মান ভাষায় ব্যুৎপত্তির অভাবে তিনি এবিষয়ে যথাযথভাবে অধ্যয়ন করতে পারেননি। প্যারিস থেকে আমার বহিষ্কারের পর, আমি যা শুরু করেছিলাম তা চালিয়ে নিয়ে গেলেন **কার্ল গ্র্যুন** মহাশয়। জার্মান দর্শনের শিক্ষক হিসাবে আমার চেয়ে তাঁর এই সুবিধা ছিল যে, তিনি নিজেই এ বিষয়ে কিছু বুঝতেন না।

প্রুধোঁর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'দারিদ্র্যের দর্শন, ইত্যাদি' প্রকাশিত হবার অল্প কিছুদিন পূর্বে, তিনি নিজে একখানি অতি বিস্তারিত পত্রে আমার কাছে সে কথা জানান এবং প্রসঙ্গক্রমে লেখেন: 'আমি আপনার কঠোর সমালোচনার প্রত্যাশায় রইলাম।' এই সমালোচনা শীঘ্রই তাঁর উপর গিয়ে পড়ে (প্যারিস থেকে ১৮৪৭-এ প্রকাশিত আমার

'দর্শনের দারিদ্র্য ইত্যাদি' গ্রন্থে) এমনই ভাবে যে, চিরতরেই আমাদের বন্ধুত্বের অবসান ঘটে।

আমি এখানে যা বলেছি তা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে, 'সম্পত্তি কী?' এই প্রশ্নের উত্তর প্রকৃতপক্ষে প্রথম ছিল প্রুধোঁর 'দারিদ্র্যের দর্শন বা অর্থনৈতিক বিরোধের পদ্ধতি' গ্রন্থখানির মধ্যে। বস্তুত সে পুস্তক প্রকাশের পরেই মাত্র তিনি অর্থশাস্ত্র বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন; আবিষ্কার করেছিলেন যে, তিনি যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন **গালাগালি** দিয়ে তার জবাব দেওয়া যাবে না, জবাব দেওয়া যাবে একমাত্র আধুনিক **অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণের** মাধ্যমে। একই সময়ে অর্থনৈতিক সংজ্ঞা-বিভাগের প্রণালীকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। ক্যাণ্টের অসমাধেয় **'অ্যাণ্টিনমির'** পরিবর্তে বিকাশের পন্থা হিসাবে **হেগেলীয় 'বিরোধ'** প্রবর্তিত করার কথা থাকে তাতে।

দুখানি স্থূলকায় খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁর গ্রন্থখানির মূল্যায়নের জন্য তার প্রত্যুত্তরে যে বইটি আমি রচনা করেছিলাম তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেখানে অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে আমি দেখিয়েছিলাম বিজ্ঞানসম্মত দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের অন্তস্থলে তিনি কত কম প্রবেশ করেছিলেন; অপরপক্ষে দেখিয়েছিলাম কী ভাবে তিনি নিজেই অনুমানভিত্তিক দর্শনের মোহ পোষণ করেন, কারণ **অর্থনৈতিক সংজ্ঞাগুলিকে বৈষয়িক উৎপাদনের বিকাশধারার কোনো বিশেষ স্তরের সমানুবর্তী ঐতিহাসিক উৎপাদন-সম্পর্কের তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি** হিসাবে না দেখে তিনি সেগুলিকে পূর্ব থেকে বিদ্যমান **চিরন্তন ভাবসংজ্ঞায়** বিকৃত করেছেন, এবং কী ভাবে তিনি এই বাঁকা পথে আবার বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতেই এসে পড়লেন।*

যে অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন সেই **অর্থশাস্ত্রের** বিষয়ে তাঁর জ্ঞান কত চরম অসম্পূর্ণ, এমন কি স্থানে স্থানে স্কুল-ছাত্র-সুলভ তাও আমি দেখিয়েছি; দেখিয়েছি যে ঐতিহাসিক গতি নিজেই **মুক্তির বাস্তব শর্তাবলী** সৃষ্টি করে তার বিশ্লেষণী জ্ঞান থেকে বিজ্ঞান গড়ে তোলার পরিবর্তে কী ভাবে তিনি এবং ইউটোপীয়রা ঘুরে বেড়াচ্ছেন একটি তথাকথিত **'বিজ্ঞান'এর** সন্ধানে - যা থেকে 'সামাজিক সমস্যা সমাধানের' একটি সূত্র সরাসরি বানিয়ে নেওয়া যায়। আর, সমগ্র

* অর্থতত্ত্ববিদরা যখন বলেন যে, আজকের দিনের সম্পর্ক -- বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্কসমূহ — **স্বাভাবিক,** তখন তাঁরা এই অর্থপ্রকাশই করেন যে, সেই সম্পর্কসমূহে প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে পারম্পর্য বজায় রেখেই সম্পদ উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশ ঘটে। সুতরাং এই সম্পর্কগুলি হল নিজেরা কালের প্রভাব নিরপেক্ষ **প্রাকৃতিক নিয়ম।** এগুলি **শাশ্বত নিয়ম** এবং সমাজকে সর্বকালেই নিয়ন্ত্রণ করবে। সুতরাং ইতিহাস আগে ছিল কিন্তু এখন আর থাকছে না। (আমার গ্রন্থের ১১৩ পৃষ্ঠা।) (মার্কসের টীকা।)

বিষয়টির ভিত্তি, **বিনিময়-মূল্যের** সম্বন্ধে প্রুধোঁর চিন্তা যে কী পরিমাণ গোলমেলে, ভ্রান্ত ও অপরিপক্ক থেকে গেছে, আর কী ভাবে নূতন একটি বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে তিনি **রিকার্ডোর** মূল্যতত্ত্বের একটি ইউটোপীয় ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করার মতো ভুলও করেন সে বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিত সামূহিক অভিমত ব্যক্ত করেছি:

'প্রতিটি অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি ভাল এবং একটি মন্দ দিক আছে: এটিই হল একমাত্র কথা যেখানে শ্রীযুক্ত প্রুধোঁ নিজেকে মিথ্যাভাষণে লিপ্ত করেন না। তিনি অর্থতাত্ত্বিকদের দেখানো ভালো দিকটি দেখেন, আবার সমাজতন্ত্রীদের নিন্দিত খারাপ দিকটিও দেখেন। অর্থতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে তিনি ধার করেছেন চিরন্তন সম্পর্কের আবশ্যিকতা আর সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে ধার করেছেন এই মোহ যে দারিদ্র্যের মধ্যে দারিদ্র্য ছাড়া দর্শনীয় আর কিছু নেই (এর ভিতরের বিপ্লবী, বিধ্বংসী যে দিকটি পুরাতন সমাজের উচ্ছেদসাধন করবে সেই দিকটা না দেখে)। নিজের পক্ষে বিজ্ঞানের সমর্থন উধৃত করার প্রচেষ্টায় তিনি এদের উভয়ের সঙ্গেই মতৈক্য পোষণ করেন। বিজ্ঞান তাঁর কাছে ক্ষীণাবয়ব বৈজ্ঞানিক সূত্রমাত্রে পর্যবসিত; তিনি কেবল সূত্র-সন্ধানেই ব্যস্ত! এইভাবেই শ্রীযুক্ত প্রুধোঁ অর্থশাস্ত্র এবং কমিউনিজম এই দুই-এরই সমালোচনা করেছেন ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন ·· বস্তুত, তিনি এই দুইয়েরই নিচে। অর্থতত্ত্ববিদদের তুলনায় নিচে এই কারণে যে, হাতের কাছে একটি যাদু-সূত্র তৈরী আছে এমন একজন দার্শনিক হিসাবে তিনি মনে করেন নিছক অর্থনৈতিক খুঁটিনাটিগুলিকে তিনি পরিহার করে চলতে পারেন; সমাজতন্ত্রীদের নিচে এই কারণে যে, মননের দিক থেকেও বুর্জোয়া দৃষ্টিসীমার ঊর্ধ্বে নিজেকে তোলার মতো তাঁর সাহসও নেই, অন্তর্দৃষ্টিও নেই। বিজ্ঞানের মানুষ হিসাবে তিনি বুর্জোয়া এবং প্রলেতারীয় উভয়েরই সংস্পর্শের ঊর্ধ্বে আকাশচারী হতে চান; আসলে পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে, অর্থশাস্ত্র এবং কমিউনিজমের মধ্যে নিরন্তর দোদুল্যমান **পেটি বুর্জোয়া ছাড়া তিনি আর কিছুই নন।**'*

উপরের এই অভিমত কঠোর শোনালেও আজও এর প্রতিটি শব্দ আমি অনুমোদন করব। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, যখন আমি প্রুধোঁর গ্রন্থখানিকে পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের সংহিতা আখ্যা দিয়েছিলাম, এবং তত্ত্বগতভাবে সে কথা প্রমাণ করেছিলাম, তখনও অর্থশাস্ত্রবিদরা এবং সমাজতন্ত্রীরা সমস্বরে তাঁকে একজন চরম অতিবিপ্লবী বলে নিন্দিত করছিলেন। ঠিক এই কারণেই পরবর্তীকালে বিপ্লবের

* উপরোক্ত গ্রন্থ — ১১৯-২০ পৃষ্ঠা। (মার্কসের টীকা।)

প্রতি তাঁর **'বিশ্বাসঘাতকতা'** নিয়ে সোরগোলে আমি কখনও যোগ দিইনি। প্রথম থেকে তাঁর সম্বন্ধে অন্যদের এবং সেই সঙ্গে তাঁর নিজেরও উপলব্ধিটাই ছিল ভ্রান্ত; তাই তিনি যদি অন্যায্য আশাকে নিরাশ করে থাকেন তবে সে দোষ তাঁর নয়।

'সম্পত্তি কী?' গ্রন্থের তুলনায় 'দারিদ্র্যের দর্শন' বইখানিতে প্রুধোঁর উপস্থাপন পদ্ধতির সব ত্রুটিগুলিই অত্যন্ত প্রতিকূলভাবে প্রকট হয়েছে। প্রকাশভঙ্গি প্রায়শঃ হয়েছে ফরাসীরা যাকে বলে ampoulé*। যেখানেই তাঁর গ্যালিক বিচক্ষণতার ঘাটতি পড়েছে সেখানেই হাজির হয়েছে বাগাড়ম্বরী জল্পনামূলক বুলি, যাকে ভাবা হয়েছে বুঝি জার্মান-দার্শনিক উক্তি। উন্নাসিক, আত্মম্ভরী এবং উদ্ধত সুর, বিশেষ করে **'বিজ্ঞান'** সম্বন্ধে তাঁর বাজে বকুনি, আর তার ভুয়া ভড়ং যা সর্বদাই অতি অপ্রীতিকর তা অবিরত কর্ণকুহর ভারাক্রান্ত করে। তাঁর প্রথম রচনাকে তাপোদ্দীপ্ত করেছিল যে অকৃত্রিম আন্তরিকতা, তার পরিবর্তে এখানে রীতিমত শব্দালঙ্কার প্রয়োগ করে কয়েকটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে একটা সাময়িক রুগ্ন উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত করুন স্বয়ংশিক্ষিতের আনাড়ী ও বিরক্তিকর পণ্ডিতীপনা — যে স্বয়ংশিক্ষিত ব্যক্তিটির মৌলিক ও স্বাধীন চিন্তার অন্তর্নিহিত গর্ববোধ ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছে, অথচ যিনি একজন হঠাৎবিজ্ঞানী হিসাবে যা তিনি নন বা যা তাঁর নেই তাই নিয়ে জাঁক করে বেড়ানো দরকার মনে করেন। তারপরে তাঁর পেটি বুর্জোয়া মনোভাব; ফরাসী প্রলেতারিয়েতের প্রতি ব্যবহারিক মনোভাবের জন্য যাঁকে শ্রদ্ধা করা উচিত, সেই **কাবে-র** মতন লোকের বিরুদ্ধে তিনি চালালেন অভদ্র জানোয়ারের মতো আক্রমণ — যে আক্রমণে না আছে তীক্ষ্ণতা, না আছে গভীরতা, না আছে ন্যায্যতা, আর অপরদিকে তিনি সৌজন্য দেখালেন **দ্যুনুয়ার** মতো লোকের প্রতি (অবশ্য তিনি হলেন রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা): অথচ এই লোকটির তাবৎ গুরুত্ব হল তাঁর হাস্যোদ্দীপক সেই গাম্ভীর্য যে গাম্ভীর্য সহকারে তিনটি স্থূলকায় অসহ্য বিরক্তিকর গ্রন্থখণ্ডের মাধ্যমে তিনি প্রচার করেছেন এক কৃচ্ছ্রসাধনবাদ (rigourism) যাকে হেলভেশিয়াস বর্ণনা করেছেন এইভাবে: 'হতভাগ্যেরা হবে নিখুঁত · এটাই দাবি।'

প্রুধোঁর পক্ষে নিশ্চয়ই এক অতি অসুবিধাজনক মুহূর্তে এসেছিল ফেব্রুয়ারি বিপ্লব, কারণ তিনি মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে, **'বিপ্লবের যুগ'** চিরতরেই শেষ হয়ে গেছে। জাতীয় সভায় তাঁর উক্তিসমূহের মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে যত কমই অন্তর্দৃষ্টি দেখা যাক না কেন, সেগুলি সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। জুন অভ্যুত্থানের **পর** সে বক্তব্য ছিল প্রচণ্ড সাহসের কাজ। তা ছাড়া তার

* Ampoulé — বাগাড়ম্বরপূর্ণ। — সম্পাঃ

সুফল হল এই যে, তাঁর প্রস্তাব সমষ্টির বিরোধিতা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত **তিয়ের** তার বক্তৃতায়, পরে যা বিশেষ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, সমগ্র ইউরোপের কাছে প্রমাণ করে দিলেন কী শিশুসুলভ প্রশ্নোত্তরিকা (catechism) ফরাসী বুর্জোয়াদের এই আধ্যাত্মিক স্তম্ভটির পাদপীঠ হিসাবে কাজ করছিল। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীযুক্ত তিয়ের-এর তুলনায় প্রুধোঁ স্ফীত হয়ে যেন প্রাকপ্লাবন যুগের অতিকায় জীবের আয়তন লাভ করেন।

প্রুধোঁর সর্বশেষ অর্থশাস্ত্রবিষয়ক 'কীর্তি' হল তাঁর **'অবাধ ক্রেডিট'** এবং তার উপর ভিত্তি করে দাঁড়ানো **'জনগণের ব্যাঙ্কের'** আবিষ্কার। বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের প্রথম উপাদান, অর্থাৎ **পণ্য ও মুদ্রার** সম্পর্কটি বুঝবার অক্ষমতা থেকেই যে তাঁর ধারণার তত্ত্বগত ভিত্তির উদ্ভব, অথচ তার ব্যবহারিক উপরিকাঠামোটা যে ঢের বেশী পুরনো ও অনেক বেশী ভালো বিকশিত পরিকল্পনারই পুনরাবৃত্তি মাত্র, তার প্রমাণ আমার 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' প্রথম খণ্ড, বার্লিন ১৮৫৯ গ্রন্থেই (পৃঃ ৫৯-৬৪) পাওয়া যাবে। নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থায় ক্রেডিট-প্রথা যে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি ত্বরান্বিত করার সহায়ক হতে পারে যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ আঠারো শতকের সূচনায়, আবার পরে ঊনিশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংলন্ডে তা এক শ্রেণীর কাছ থেকে আর এক শ্রেণীর কাছে সম্পদ হস্তান্তরের সহায়ক হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহেই স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু **সুদ-দায়ী পুঁজিকেই পুঁজির প্রধানরূপ** বলে গণ্য করা, ক্রেডিট-প্রথার একটি বিশেষ ধরনের প্রয়োগকে, অর্থাৎ সুদের তথাকথিত বিলোপ সাধনকে, সমাজ রূপান্তরের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করতে চাওয়া একেবারে পুরোপুরি **কূপমণ্ডূক** কল্পনাবিলাস। বস্তুত এই কল্পনা, আরো দীর্ঘায়িত রূপে **সতেরো শতকের ইংরেজ পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুখপাত্রদের মধ্যে** আগেই পাওয়া গেছে। সুদ-বিশিষ্ট পুঁজি বিষয়ে বাস্তিয়ার সঙ্গে প্রুধোঁর বাদানুবাদ (১৮৫০) 'দারিদ্র্যের দর্শনের' থেকে অনেক নিম্নস্তরের। তিনি এমন অবস্থা তৈরী করেন যে এমন কি বাস্তিয়ার হাতেও মার খেতে হয়: প্রতিপক্ষ যখন তাঁর উপর মোক্ষম আঘাত হানে তিনি তখন ভাঁড়ামি করে হৈহৈ করে ওঠেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে প্রুধোঁ — আমার মনে হয়, লসান সরকারের নির্দেশক্রমেই — **'করনীতি'** বিষয়ে একটি পুরস্কার-প্রার্থী প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এখানে প্রতিভার শেষ দীপ্তিটুকুও নির্বাপিত। নিখাদ **নিছক পেটি বুর্জোয়া** ছাড়া আর কিছুই এখানে বাকি রইল না।

আর তাঁর রাজনৈতিক ও দর্শন সম্বন্ধীয় যা রচনা — তার সবকটির মধ্যেই তাঁর অর্থতত্ত্বসংক্রান্ত রচনার মতো এই একই স্ববিরোধী এবং দ্বৈত চরিত্র প্রকট। উপরন্তু,

সেগুলির উপযোগিতা একান্তই স্থানিক, ফ্রান্সের মধ্যেই সীমিত। এ সব সত্ত্বেও যে যুগে ফরাসী সমাজতন্ত্রীরা ধার্মিকতায় আঠারো শতকের বুর্জোয়া ভল্টেয়ার-পন্থা অথবা ঊনিশ শতাব্দীর জার্মান নিরীশ্বরতার তুলনায় উন্নততর প্রতিপন্ন হওয়া কাম্য মনে করত, সেযুগে ধর্ম এবং গির্জার উপর তাঁর আক্রমণের বিরাট স্থানীয় তাৎপর্য ছিল। মহান পিটার যদি রুশ বর্বরতাকে পরাস্ত করে থাকেন বর্বরতা দিয়ে তবে প্রুধোঁও ফরাসী বাগাড়ম্বরকে বাক্যচ্ছটায় পরাজিত করার জন্য যথাসাধ্য করেছিলেন।

'ক্ষমতা জবরদখল' বিষয়ক যে রচনায় লুই বোনাপার্টকে নিয়ে তিনি দহরম মহরম করেছিলেন ও প্রকৃতপক্ষে তাঁকে ফরাসী শ্রমিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চান: এবং **পোল্যাণ্ডের** বিরুদ্ধে লেখা তাঁর সর্বশেষ যে রচনায় তিনি জারের মহিমা কীর্তনের জন্যই চরম ক্লীবতাগ্রস্ত নির্লজ্জতার প্রশ্রয় দিয়েছেন, সে দুটি রচনাকে শুধু খারাপ নয়, ইতর লেখা বলেই নিশ্চয় অভিহিত করতে হবে: সে ইতরতা অবশ্য পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুবর্তী।

প্রুধোঁকে প্রায়ই **রুসোর** সঙ্গে তুলনা করা হয়। এর চেয়ে ভ্রান্ত আর কিছুই হতে পারে না। তিনি বরং **নিকোলা লেংগে-রই** সমগোত্র, প্রসঙ্গত, যাঁর বই 'দেওয়ানী আইনের তত্ত্ব' খুবই দীপ্তিমান লেখা।

দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের দিকে প্রুধোঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি কখনো প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব আয়ত্ত করেননি সেইহেতুই তিনি কূটতর্কের বেশি আর গেলেন না। বস্তুত তাঁর পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেই এটি জড়িয়েছিল। ইতিহাসকার **রাউমার** মতোই পেটি বুর্জোয়া ব্যক্তিটিই হল একদিকে একথা অপরদিকে সেকথা দিয়ে গঠিত। এটা তার অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে এবং **সেই কারণেই** তাঁর রাজনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিতেও। নীতিবোধের বেলায় তাই, সর্বত্রই তাই। সে হল জীবন্ত স্ববিরোধ। তদুপরি, প্রুধোঁর মতো যদি সে বুদ্ধিমান লোক হয়, তবে অবিলম্বেই সে নিজের বিরোধগুলি নিয়ে খেলতে শিখবে এবং অবস্থানুসারে তাকে পরিণত করবে চিত্তাকর্ষক, জমকালো কখনও যাচ্ছেতাই, কখনও বা দীপ্যমান অসঙ্গতিতে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হাতুড়েপনা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে আপোষসন্ধান হচ্ছে এ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। এর একটি মাত্রই নিয়ামক উদ্দেশ্য থাকে -- সে উদ্দেশ্য হল কর্তার **অহমিকা;** আর সমস্ত অহংসর্বস্ব মানুষের মতো তার একমাত্র প্রশ্নটা হল বর্তমান মুহূর্তের সাফল্য, দিনের হুজুগ। এইরূপে অনিবার্যভাবেই সেই সাধারণ নৈতিক শালীনতাটুকুও মিলিয়ে যায়, যা দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্ষমতাধিকারীদের সঙ্গে আপোষের ছায়াটা থেকেও রুসোকে দূরে রাখতে পেরেছিল।

সম্ভবত ফ্রান্সের বিকাশের এই সর্বাধুনিক পর্যায়কে উত্তরপুরুষ এই বলেই বিশেষিত করবে যে, লুই বোনাপার্ট ছিলেন তার নেপোলিয়ন এবং প্রুধোঁ হলেন তার রুসো-ভল্টেয়ার।

এবার ভদ্রলোকের মৃত্যুর পরে এত তাড়াতাড়ি আপনি যে আমাকে তাঁর মরণোত্তর বিচারকের ভূমিকার ভার চাপালেন, তার পূর্ণ দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।

আপনাদের অতি বিশ্বস্ত

কার্ল মার্কস

মার্কস কর্তৃক ১৮৬৫ সালের
২৪শে জানুয়ারি তারিখে লিখিত

১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারির
১,৩ ও ৫ তারিখের *Social-Democrat*
পত্রিকায় প্রকাশিত এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাদিত মার্কসের 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থের ১৮৮৫ সালের জার্মান সংস্করণের ক্রোড়পত্ররূপে পুনঃপ্রকাশিত

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
১৮৮৫ সালের সংস্করণ
মুদ্রণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা

জার্মান থেকে অনূদিত
ইংরেজী ভাষ্যে। ভাষান্তর

কার্ল মার্কস

মজুরি দাম মুনাফা

[মুখবন্ধ]

নাগরিকগণ,

আলোচ্য বিষয়ে যাবার আগে আপনাদের অনুমতি নিয়ে কয়েকটি প্রারম্ভিক মন্তব্য করব।

ইউরোপীয় মহাদেশ জুড়ে এখন বাস্তবিকই সংক্রামক আকারে ধর্মঘট চলেছে ও মজুরি-বৃদ্ধির সার্বজনীন দাবি উঠছে। আমাদের কংগ্রেসে এ প্রশ্ন উঠবে। আন্তর্জাতিক সমিতির নেতা হিসাবে আপনাদের এই একান্ত জরুরী প্রশ্ন সম্পর্কে স্থির মত থাকা উচিত। আপনাদের ধৈর্যের উপরে কড়া রকম জবরদস্তি করার ঝুঁকি নিয়েও আমার তরফ থেকে তাই আমি এ প্রসঙ্গের পূর্ণ আলোচনা করা কর্তব্য বলে বিবেচনা করি।

নাগরিক ওয়েস্টন সম্পর্কে গোড়াতেই আর একটা মন্তব্য আমায় করতে হচ্ছে: তিনি শুধু যে আপনাদের কাছে কতগুলি মতামত হাজির করেছেন তা নয়, প্রকাশ্যে সে মতামত সমর্থনও করেছেন, যেগুলি তাঁর ধারণায় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে হলেও শ্রমিক শ্রেণীর কাছে অতি অপ্রিয় বলে তিনি জানেন।* এ ধরনের নৈতিক সাহস প্রদর্শন আমাদের সকলের কাছেই অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। আমি আশা করি যে, আমার নিবন্ধের অমার্জিত ধরন সত্ত্বেও এর উপসংহারে তিনি দেখতে পাবেন, তাঁর থিসিসগুলির মূলে যেটুকু খাঁটি ভাবনা আছে তাকে সত্য বলে আমি মনে করি, তার সঙ্গে আমি একমত, যদিও তার বর্তমান আকারে সে থিসিসগুলিকে আমি তত্ত্বের দিক থেকে ভুল ও কার্যক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলে মনে না করে পারছি না।

এবারে আমি সরাসরি আমাদের উপস্থিত আলোচ্য বিষয়টি শুরু করব।

* ইংরেজ শ্রমিক জন ওয়েস্টন শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের সামনে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, উচ্চতর মজুরি মজুরদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে না এবং ট্রেড ইউনিয়নের ক্রিয়াকলাপ ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করতে হবে। — সম্পাঃ

১ [উৎপাদন ও মজুরি]

নাগরিক ওয়েস্টনের যুক্তি আসলে নির্ভর করছে দুটি প্রতিজ্ঞার উপরে: প্রথমত, **জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ** হচ্ছে **একটি নির্দিষ্ট বস্তু,** গাণিতিকেরা যাকে বলবেন **স্থির** *(constant)* রাশি বা পরিমাণ; দ্বিতীয়ত, **আসল মজুরির পরিমাণ,** অর্থাৎ তা দিয়ে যে পরিমাণ পণ্য কেনা চলে তার হিসাবে মাপা মজুরির পরিমাণ হচ্ছে একটা **নির্দিষ্ট** রাশি, একটা **স্থির** পরিমাণ।

তাঁর প্রথম উক্তিটি স্পষ্টতই ভুল। আপনারা দেখতে পারেন, বছরের পর বছর উৎপন্নের মূল্য ও পরিমাণ বেড়ে চলেছে, জাতীয় শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বাড়ছে এবং এই ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন সঞ্চালনের জন্য যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন, ক্রমাগতই তার পরিবর্তন ঘটছে। বছর-শেষের হিসাবে যা সত্য, বিভিন্ন বছরের তুলনামূলক হিসাবে যা সত্য — বছরের প্রতিটি গড়পড়তা দিনের পক্ষেও তা-ই সত্য। জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ বা আয়তন নিরন্তর বদলাচ্ছে। এটি **স্থির** নয়, বরং এটি একটা **পরিবর্তনশীল** পরিমাণ, আর জনসংখ্যায় পরিবর্তনের কথা না ধরলেও **পুঁজি সঞ্চয় ও শ্রমের উৎপাদন-শক্তিতে** ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটনার দরুন তা না হয়ে পারে না। একথা খুবই ঠিক যে, আজ যদি **মজুরির সাধারণ হার বৃদ্ধি** পায় তবে তার পরিণাম ফল যাই হোক না কেন ঐ বৃদ্ধি **আপনা থেকেই, অবিলম্বে** উৎপন্নের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাবে না। সর্বাগ্রে বর্তমান অবস্থা থেকেই তার যাত্রা শুরু হবে। কিন্তু মজুরি-বৃদ্ধির **আগে** জাতীয় উৎপন্ন যদি **স্থির** না হয়ে **পরিবর্তনশীল** থেকে থাকে, তবে মজুরি-বৃদ্ধির **পরেও** তা স্থির না থেকে পরিবর্তনশীল হয়েই থাকবে।

কিন্তু ধরুন, জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ **পরিবর্তনশীল** না হয়ে **স্থিরই** আছে। সে ক্ষেত্রেও বন্ধু ওয়েস্টন যাকে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচনা করছেন, তা এক অযৌক্তিক ঘোষণাই থেকে যাবে। যদি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দেওয়া থাকে, ধরুন আট, তাহলে এই সংখ্যাটির **অনপেক্ষ** সীমা আছে বলে তার অংশগুলির **আপেক্ষিক** সীমার পরিবর্তন আটকায় না। যদি মুনাফা ছয় ও মজুরি দুই হয়, তবে মজুরি বেড়ে ছয় ও মুনাফা কমে দুই হতে পারে, কিন্তু তখনও মোট সংখ্যাটি থাকবে আট-ই। কাজেই, উৎপন্নের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকলেই তার থেকে কোনো ক্রমেই প্রমাণিত হয় না যে মজুরির মাত্রাও স্থির। বন্ধু ওয়েস্টন তাহলে মজুরির মাত্রার স্থিরতা প্রমাণ করছেন কী করে? শুধু তা জোর গলায় ঘোষণা করেই।

কিন্তু তাঁর ঘোষণা যদি মেনেও নেওয়া যায় তবে দু-দিকেই তা কাটবে, অথচ তিনি কেবল একদিকেই জোর দিচ্ছেন। মজুরির পরিমাণ যদি একটা স্থির রাশি হয় তবে তাকে বাড়ানোও যায় না, কমানোও যায় না। কাজেই, যদি জোর করে সাময়িকভাবে

মজুরি বাড়ানো মজুরদের পক্ষে বোকামি হয়, তবে জোর করে সাময়িকভাবে মজুরি কমানো পুঁজিপতিদের পক্ষেও কম নির্বুদ্ধিতা নয়। বন্ধুবর ওয়েস্টন অস্বীকার করেন না যে, অবস্থাবিশেষে মজুরেরা জোর করে মজুরি বাড়িয়ে নিতে **পারে** বটে, কিন্তু মজুরির পরিমাণ স্বভাবতই নির্দিষ্ট থাকার ফলে এর একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। অপরপক্ষে, এও তিনি জানেন যে, পুঁজিপতিরা জোর করে মজুরি কমাতে **পারে,** আর বস্তুত তারা অনবরতই সে চেষ্টা করে যাচ্ছে। মজুরির স্থিরতার নীতি অনুসারে এক্ষেত্রেও যতটুকু প্রতিক্রিয়া ঘটা উচিত, প্রথম ক্ষেত্রের থেকে তা মোটেই কম নয়। সুতরাং, মজুরি হ্রাস কিংবা তার চেষ্টার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে মজুরেরা ঠিক কাজই করবে। আর জোর করে **মজুরি-বৃদ্ধির জন্য** সংগ্রাম করে তারা ঠিকই করবে, কারণ মজুরি-হ্রাসের বিপক্ষে প্রত্যেকটি **প্রতিক্রিয়া** হচ্ছে মজুরি-বৃদ্ধির স্বপক্ষে **ক্রিয়াস্বরূপ।** অতএব নাগরিক ওয়েস্টনের নিজস্ব **মজুরি স্থিরতার** নীতি অনুসারেই মজুরদের উচিত অবস্থাবিশেষে মজুরি-বৃদ্ধির জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও সংগ্রাম করা।

এ সিদ্ধান্ত তিনি যদি না মানেন তবে যে প্রতিজ্ঞা থেকে এর উদ্ভব সেটিকেই তাঁকে অস্বীকার করতে হবে। মজুরির পরিমাণ একটা **স্থির রাশি** বলা তাঁর চলবে না, বরং তাঁকে বলতে হবে যে, যদিও মজুরি **বাড়তে** পারে না ও **বাড়া** উচিত নয় তবুও পুঁজির তরফ থেকে যখনই মজুরি কমানোর মর্জি হবে তখনই তা **কমানো** যেতে পারবে ও তাকে **কমতে** হবে। পুঁজিপতির যদি খুশি হয় আপনাকে মাংসের বদলে আলু আর গমের বদলে জই খাইয়ে রাখবে, তবে তার সেই খেয়ালকেই ধরতে হবে অর্থশাস্ত্রের নিয়ম বলে ও তা মেনে নিতে হবে। এক দেশের মজুরির হার যদি আর এক দেশের তুলনায় বেশী হয়, যেমন ধরা যাক, যুক্তরাষ্ট্রের হার যদি ইংলণ্ডের তুলনায় বেশী হয়, তবে মজুরির হারের এই তফাৎটাকে আপনাকে মার্কিন পুঁজিপতি ও ইংরেজ পুঁজিপতির মর্জির তফাৎ বলেই ব্যাখ্যা করতে হবে। এ পদ্ধতি শুধু অর্থনৈতিক ঘটনাবলী নয়, অন্যান্য সবরকম ঘটনার পর্যালোচনাকেও নিশ্চয় ভারি সহজ করে দেবে।

কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি: মার্কিন পুঁজিপতির মর্জি ইংরেজ পুঁজিপতির মর্জি থেকে ভিন্ন হয় **কেন ?** আর সে প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আপনাকে যেতে হবে **মর্জির** আওতা ছাড়িয়ে। কোনো পাদ্রি হয়ত আমায় বলতে পারেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ফ্রান্সে একরকম, ইংলণ্ডে অন্যরকম। এবম্বিধ দ্বৈত ইচ্ছা কেন বুঝিয়ে দেবার জন্য জেদ করলে তিনি হয়ত নির্লজ্জভাবে বলে বসবেন যে, ফ্রান্সে একরকম ইচ্ছা আর ইংলণ্ডে অন্যরকম ইচ্ছা থাকাটাই ঈশ্বরের মর্জি। কিন্তু বন্ধু ওয়েস্টন নিশ্চয়ই যুক্তিকে এভাবে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে কথা বলার মতো লোক নন।

যতদূর সম্ভব আদায় করে নেওয়াই অবশ্য পুঁজিপতির **মর্জি**। আমাদের উচিত, পুঁজিপতির **মর্জির** কথা তোলা নয়, তার **ক্ষমতা, সে-ক্ষমতার সীমা** ও **সেই সব সীমার চরিত্র** সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

২ [উৎপাদন, মজুরি, মুনাফা]

নাগরিক ওয়েস্টন যে-ভাষণ পড়ে আমাদের শোনালেন সেটা খুব সংক্ষেপেই বলা যেত।

তাঁর সমস্ত যুক্তিটা দাঁড়াচ্ছে এই: শ্রমিক শ্রেণী যদি আর্থিক মজুরি হিসাবে চার শিলিং-এর জায়গায় পাঁচ শিলিং দিতে পুঁজিপতি শ্রেণীকে বাধ্য করে তবে পণ্য হিসাবে পুঁজিপতি পাঁচ শিলিং-এর বদলে দেবে চার শিলিং মূল্যের জিনিস। মজুরি বাড়বার আগে শ্রমিক শ্রেণী চার শিলিং দিয়ে যা কিনত, এখন তার জন্য পাঁচ শিলিং খরচ করতে হবে। কিন্তু কেন এমন হবে? কেন পুঁজিপতি পাঁচ শিলিং-এর বিনিময়ে মাত্র চার শিলিং মূল্যের জিনিস দেবে? কারণ মোট মজুরির পরিমাণ হচ্ছে নির্দিষ্ট। কিন্তু চার শিলিং মূল্যের পণ্যের পরিমাণেই বা তা নির্দিষ্ট কেন? কেন তিন, দুই বা অন্য কোনো মূল্যের পণ্যের পরিমাণে তা আবদ্ধ নয়? মজুর ও পুঁজিপতি এই উভয়েরই ইচ্ছা নিরপেক্ষ এক অর্থনৈতিক নিয়মের দ্বারা যদি মজুরির পরিমাণের মাত্রা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তবে নাগরিক ওয়েস্টনের প্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল সে নিয়মকে বিবৃত ও প্রমাণিত করা। তাছাড়া এও তাঁর প্রমাণ করা উচিত ছিল যে, প্রত্যেকটি মুহূর্তবিশেষে যে পরিমাণ মজুরি বাস্তবিকই দেওয়া হয়ে থাকে তা সর্বদাই আবশ্যিক মজুরির পরিমাণের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় -- একচুল এদিক ওদিক হয় না। অপর পক্ষে, মজুরির পরিমাণের ঐ বিশেষ মাত্রা যদি পুঁজিপতির **মর্জিমাত্রের** উপরে অথবা তার অর্থলোভের মাত্রার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে তা এক মনগড়া মাত্রা। তার মধ্যে আবশ্যিক কিছু নেই। পুঁজিপতির মর্জি **অনুসারে** সেই মাত্রা বদলে যেতে পারে -- সুতরাং পুঁজিপতির মর্জির **বিরুদ্ধেও** এই মাত্রা বদলানো যায়।

নাগরিক ওয়েস্টন তাঁর তত্ত্বের স্বপক্ষে আপনাদের কাছে উদাহরণ দিয়েছেন এই বলে যে, একটি পাত্রে যখন নির্দিষ্ট কয়েকজন লোকের খাওয়ার মতো কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ শুরুয়া থাকে, তখন চামচগুলিকে চওড়ার দিকে বাড়ানোর ফলে শুরুয়ার পরিমাণ বাড়ে না। এই দৃষ্টান্তকে যদি আমি বেকুবি* বলে মনে করি, তবে কিন্তু

* ইংরেজিতে এখানে শব্দের খেলা আছে: spoon — 'চামচ' আর spoony — বোকা, বেকুব। — সম্পাঃ

আমায় মাপ করতে হবে। এতে মেনেনিউস এ্যাগ্রিপ্পা যে উপমা প্রয়োগ করেছিলেন, খানিকটা সে কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। রোমের সাধারণ জন যখন রোমের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আঘাত হানে তখন অভিজাত এ্যাগ্রিপ্পা তাদের বলেন যে, অভিজাতরূপী উদরটাই রাষ্ট্রদেহের সাধারণ লোকরূপ অন্যান্য অঙ্গকে আহার্য জোগায়। এ্যাগ্রিপ্পা অবশ্য দেখাতে পারেননি যে, একজনের পেট ভরতি করে অপর একজনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুষ্ট করা চলতে পারে। নাগরিক ওয়েস্টন তেমনি ভুলে গেছেন যে, মজুরেরা যে পাত্র থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে তা গোটা জাতীয় শ্রমের উৎপন্ন দিয়েই পূর্ণ, আর তা থেকে তারা যে আরও বেশি নিতে পারছে না তার কারণ হল পাত্রের সংকীর্ণতা নয়, তার ভিতরকার জিনিসের স্বল্পতাও নয়, বরঞ্চ তাদের চামচের ক্ষুদ্রতাই।

পুঁজিপতি পাঁচ শিলিং নিয়ে চার শিলিং মূল্যের জিনিস ফিরিয়ে দিতে পারে কী কৌশলে? সে যে পণ্য বিক্রি করে তার দাম বাড়িয়ে দিয়ে। কিন্তু পণ্যের দাম বৃদ্ধি, আরো সাধারণভাবে বললে, ঐ দামের কোনো পরিবর্তন, পণ্যের দাম জিনিসটাই কি নিতান্ত পুঁজিপতির ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে? নাকি সে ইচ্ছা সফল হতে হলে বিশেষ কতকগুলি অবস্থার প্রয়োজন? তা না হলে বাজার-দরের ওঠানামা, তার নিরন্তর হ্রাসবৃদ্ধি এক অভেদ্য রহস্য হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা যখন ধরে নিয়েছি, শ্রমের উৎপাদন-শক্তিতে বা নিয়োজিত পুঁজি ও শ্রমের পরিমাণে বা যে-মুদ্রায় উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্যে প্রকাশিত হয় তার মূল্যে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, **পরিবর্তন** ঘটেছে **শুধু মজুরির হারেই**, তখন এই **মজুরি-বৃদ্ধি** কী ভাবে **পণ্যের দামকে** প্রভাবিত করতে পারবে? পারবে শুধু এসব পণ্যের চাহিদার সঙ্গে যোগানের বাস্তব অনুপাতের উপর প্রভাব বিস্তার করেই।

একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, সমগ্রভাবে বিচার করলে শ্রমিক শ্রেণী **আবশ্যিক দ্রব্যাদি** ক্রয়ের খাতে তার আয় খরচ করে ও খরচ করতে হয়। কাজেই, সাধারণভাবে মজুরি বাড়লে **আবশ্যিক দ্রব্যাদির** চাহিদাও বেড়ে যায় এবং ফলে **সেগুলির বাজার-দরও** বাড়ে। যে পুঁজিপতিরা এইসব আবশ্যিক দ্রব্যাদি তৈরি করে তারা তাদের পণ্যের চড়তি বাজার-দরের ফলে বাড়তি মজুরির খরচা পুষিয়ে নেয়। কিন্তু যে-সব পুঁজিপতি এইসব আবশ্যিক দ্রব্যাদি উৎপাদন করে **না** তাদের ক্ষেত্রে কী হবে? ভাববেন না যে সংখ্যায় তারা অল্প। একবার ভাবুন তো যে, জাতীয় উৎপন্নের দুই-তৃতীয়াংশ ভোগ করছে জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ মানুষ। কমন্স সভায় একজন সভ্য সম্প্রতি বলেছেন যে, এরা হল জনসংখ্যার এক-সপ্তমাংশ মাত্র। তাহলে বুঝবেন যে, জাতীয় উৎপাদনের কী বিপুল অংশ বিলাসদ্রব্য হিসাবে উৎপন্ন হয় বা বিলাসদ্রব্যের জন্য **বিনিময় করা** হয় এবং কী বিপুল পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদি অপচয় করা হয় চাপরাশী, ঘোড়া, বিড়াল প্রভৃতির

পিছনে। এই অপব্যয় যে আবশ্যিক দ্রব্যাদির দাম বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই বহুলাংশে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে — এ কথা তো আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি।

তাহলে যেসব পুঁজিপতি আবশ্যিক দ্রব্যাদি উৎপাদন করে **না** তাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে? সাধারণভাবে মজুরি বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের **মুনাফার হার যেটুকু কমে যায়, নিজেদের উৎপন্ন পণ্যের দর বাড়িয়ে** তারা কিন্তু সেটুকু পুষিয়ে নিতে পারে না, কারণ ঐ সব পণ্যের চাহিদা তো আর বাড়েনি। তাদের আয় যাবে কমে আর ঐ কমতি আয় থেকে বাড়তি দামের আবশ্যিক দ্রব্যাদি আগের মতো পরিমাণে কিনতে গিয়ে আরো বেশি টাকা ব্যয় হবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আয় হ্রাস পেল বলে বিলাসদ্রব্যের জন্য ব্যয়ের খাতে তাদের টান ধরবে, আর তাই তাদের নিজ নিজ পণ্যের পারস্পরিক চাহিদা যাবে কমে। এই চাহিদা হ্রাসের ফলে তাদের পণ্যের দাম কমতে থাকবে। সুতরাং শিল্পের এইসব শাখায় **মুনাফার হার কমে যাবে** — কমে যাবে কেবল সাধারণ মজুরি-হার বৃদ্ধির সরল অনুপাতে নয়, সাধারণ মজুরি-বৃদ্ধি, আবশ্যিক দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি ও বিলাসদ্রব্যের দাম হ্রাসের চক্রবৃদ্ধি হারেও।

শিল্পের বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত পুঁজির **মুনাফা হারে এই তারতম্যের** ফল কী হতে পারে? যখনই, যে কোনো কারণেই হোক, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে **মুনাফার গড়পড়তা হার** বিভিন্ন হলে সাধারণত যা ঘটে থাকে, এ-ক্ষেত্রেও অবশ্য তাই হবে। কম লাভজনক থেকে বেশী লাভজনক শাখায় পুঁজি ও শ্রম স্থানান্তরিত হতে থাকবে এবং এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া চলবে যতক্ষণ না শিল্পের এক শাখার পণ্য-যোগান বর্ধিত চাহিদা অনুপাতে বেড়ে উঠছে এবং অপর শাখার পণ্য-যোগান পড়তি চাহিদা অনুযায়ী কমে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন ঘটার পর বিভিন্ন শাখায় মুনাফার সাধারণ হার আবার **সমীকৃত** হবে। বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা ও যোগানের অনুপাতের একটা পরিবর্তন থেকেই যেহেতু সমস্ত অব্যবস্থাটা গোড়ায় শুরু হয়েছিল, তাই কারণটুকু চলে গেলে তার ফলাফলও থাকবে না, ফলে **দামগুলি** আবার তাদের পুরানো স্তরে ও সাম্যাবস্থায় ফিরে যাবে। মজুরি-বৃদ্ধির ফলে **মুনাফার হার হ্রাস** শ্রমশিল্পের কয়েকটি শাখায় সীমাবদ্ধ না থেকে তখন হয়ে দাঁড়াবে **ব্যাপক**। যে অবস্থা আমরা ধরে নিয়েছি সেই দিক থেকে কথাটা দাঁড়াল এই — শ্রমের উৎপাদন-শক্তির কোনো বদল হচ্ছে না, উৎপন্নের মোট পরিমাণেরও বদল হচ্ছে না, **কিন্তু এই নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্নের রূপটা বদলে যাচ্ছে।** উৎপন্নের বৃহত্তর অংশ এখন থাকবে আবশ্যিক দ্রব্যাদির আকারে, ক্ষুদ্রতর অংশ থাকবে বিলাসদ্রব্যের রূপে। অথবা যা একই কথা, বিদেশী বিলাসদ্রব্যের সঙ্গে একটা ক্ষুদ্রতর অংশ বিনিময় হবে ও তার আদি আকারেই ভোগে আসবে, অর্থাৎ ঐ একই কথা, দেশের উৎপন্নের বৃহত্তর অংশ বিলাসদ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় না হয়ে বিনিময় হবে বিদেশী আবশ্যিক দ্রব্যাদির সঙ্গে। সুতরাং মজুরির হার সাধারণভাবে বেড়ে গেলে

বাজার-দরের একটা সাময়িক বিচলিতির পর তার ফল হয় শুধু মুনাফা হারের একটা সাধারণ পড়তি, পণ্যের দামে কোনো স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে না।

যদি বলা হয় যে, পূর্ববর্তী যুক্তিতে আমি ধরে নিয়েছি **সমস্ত** বাড়তি মজুরিই আবশ্যিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের খাতে ব্যয় হচ্ছে, তাহলে জবাব দেব যে, আমি নাগরিক ওয়েস্টনের মতের পক্ষে সব থেকে অনুকূল অবস্থাটিই ধরেছি। মজুরেরা আগে ব্যবহার করত না এমন জিনিসপত্রের জন্য যদি বাড়তি মজুরি ব্যয় করা হয় তবে তাদের ক্রয়ক্ষমতা যে সত্য সত্যই বেড়েছে তার জন্য প্রমাণের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু মজুরি বৃদ্ধি পাওয়াতেই এর উৎপত্তি বলে মজুরের ক্রয়ক্ষমতা যতটুকু বাড়ে পুঁজিপতিদের ক্রয়ক্ষমতা ঠিক ততটুকু কমে যাওয়া চাই। অতএব পণ্যসম্ভারের **মোট চাহিদা বাড়বে না,** কিন্তু ঐ চাহিদার বিভিন্ন অংশে **পরিবর্তন ঘটবে।** একদিকে বাড়তি চাহিদার তাল সামলাবে অন্যদিকের কমতি চাহিদা। কাজেই, মোট চাহিদা সমান থাকায় পণ্যসম্ভারের বাজার-দরের কোনোরকম পরিবর্তন ঘটতে পারবে না।

সুতরাং আপনারা দাঁড়াবেন এই উভয়সংকটের মুখোমুখি: হয়, বাড়তি মজুরি সবরকম ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য সমানভাবে ব্যয় হবে; সেক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর তরফের চাহিদা-স্ফীতি পুঁজিপতি শ্রেণীর তরফের চাহিদা-সংকোচনের দ্বারা সমতা বজায় রাখবে। নয়তো, বাড়তি মজুরি ব্যয় হবে শুধু কতকগুলি বিশেষ দ্রব্য ক্রয়ের খাতেই; সেক্ষেত্রে সেই বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের বাজার-দর সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে শিল্পের কোনো কোনো শাখায় মুনাফা-হারের বৃদ্ধি ও অন্যান্য শাখায় মুনাফা-হার হ্রাসের জন্য পুঁজি ও শ্রমের বণ্টনে পরিবর্তন ঘটবে এবং তা চলতে থাকবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না পণ্য-যোগান শিল্পের এক শাখায় বর্ধিত চাহিদার স্তর অবধি ওঠে এবং অন্যান্য শাখায় হ্রাসপ্রাপ্ত চাহিদার স্তর পর্যন্ত নেমে আসে।

প্রথম সম্ভাবনা মেনে নিলে পণ্যের দামের কোনো পরিবর্তন হবে না। দ্বিতীয়টি অনুসারে, বাজার-দরের কিছুটা ওঠানামার পর পণ্যের বিনিময়-মূল্য পুরনো স্তরে ফিরে যাবে। উভয় অবস্থাতেই মজুরি হারের সাধারণ বৃদ্ধির ফলে শেষ পর্যন্ত মুনাফা-হারের সাধারণ হ্রাস ছাড়া আর কিছু ঘটবে না।

আপনাদের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করার জন্য নাগরিক ওয়েস্টন অনুরোধ জানিয়েছেন, আপনারা যেন ভেবে দেখেন ইংলন্ডের কৃষি-মজুরি সার্বজনীনভাবে নয় শিলিং থেকে আঠারো শিলিং পর্যন্ত বেড়ে গেলে তার ফলাফল কী মুশকিল ঘটাবে। সাবেগে তিনি বলে উঠেছেন, আবশ্যিক দ্রব্যাদির চাহিদার বিপুল বৃদ্ধি ও তারই ফল হিসাবে ভয়াবহ দাম বৃদ্ধির কথা একবার ভেবে দেখুন! কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে, মার্কিন কৃষি-মজুরের গড়পড়তা মজুরি ইংরেজ কৃষি-মজুরের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি, যদিও যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-উৎপন্নের দর ইংলন্ড থেকে কম, যদিও যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজি

ও শ্রমের সাধারণ সম্পর্ক ইংলণ্ডের মতোই এবং যদিও ইংলণ্ডের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে বাৎসরিক উৎপন্নের পরিমাণ অনেক কম। তবে কেন আমাদের বন্ধু এই পাগলা ঘণ্টি বাজাচ্ছেন? শুধু আমাদের সামনেকার আসল প্রশ্নটিকে সরিয়ে দেবার জন্যই। হঠাৎ নয় শিলিং থেকে আঠারো শিলিং মজুরি বাড়া হচ্ছে সহসা শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি। ইংলণ্ডে মজুরির সাধারণ হার হঠাৎ শতকরা ১০০ ভাগ বাড়তে পারে কিনা আমরা এখানে মোটেই সে প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। বৃদ্ধির **পরিমাণের** সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই -- *সে পরিমাণ প্রত্যেকটি বাস্তব দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে তার নির্দিষ্ট* অবস্থার উপরে নির্ভর করবে ও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবে। আমাদের দেখতে হবে শুধু মজুরি-হারের সাধারণ বৃদ্ধি, এমন কি যদি তা শতকরা একভাগের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে, তা হলেও তার ক্রিয়া কী হবে।

বন্ধুবর ওয়েস্টনের কল্পনাপ্রসূত শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধির কথা ছেড়ে দিয়ে আমি গ্রেট ব্রিটেনে ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে সত্যসত্যই মজুরির যে বৃদ্ধি ঘটেছিল তার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আপনারা সকলেই ১৮৪৮ সাল থেকে যে দশ ঘণ্টা রোজ, অথবা সঠিকভাবে বললে সাড়ে দশ ঘণ্টা রোজের আইন প্রবর্তিত হয়েছে তার কথা জানেন। আমাদের দেখা বৃহত্তম অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। কয়েকটি স্থানীয় শিল্পব্যবসার ক্ষেত্রে নয়, বরঞ্চ ইংলণ্ড দুনিয়ার বাজারে যার জোরে কর্তৃত্ব করে শিল্পের সেই সব অগ্রগণ্য শাখাতেই এ হল এক আকস্মিক ও বাধ্যতামূলক মজুরি-বৃদ্ধি। এই মজুরি-বৃদ্ধি ঘটল একান্ত অসুবিধাজনক ব্যবস্থার মধ্যেই। ডাঃ ইউর, অধ্যাপক সিনিয়র ও মধ্য শ্রেণীর অন্যান্য সরকারী অর্থনৈতিক মুখপাত্রেরা **প্রমাণ করেছিলেন** বলতেই হবে বন্ধু ওয়েস্টনের থেকে অনেক জোরাল যুক্তির জোরেই প্রমাণ করেছিলেন যে, এর ফলে ব্রিটিশ শিল্পের অন্তিম দশা উপস্থিত হবে। তাঁরা প্রমাণ করে দেন যে, এর অর্থ নিছক সাদাসিধে মজুরি-বৃদ্ধি নয় — বরং এর অর্থ হচ্ছে নিয়োজিত শ্রমের পরিমাণ-হ্রাস দ্বারা সূচিত এবং তারই উপরে প্রতিষ্ঠিত মজুরি-বৃদ্ধি। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে ১২শ ঘণ্টাটি আপনারা পুঁজিপতির কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছেন সেইটিই হল একমাত্র ঘণ্টা যার থেকে সে মুনাফা কামায়। সঞ্চয় হ্রাস, দাম বৃদ্ধি, বাজার হাতছাড়া, উৎপাদন সঙ্কোচন, সেইহেতু মজুরির উপরে এর প্রতিক্রিয়া এবং পরিণামে সর্বনাশের ভয় দেখান তাঁরা। বস্তুত, তাঁরা বলেই বসলেন যে, মাক্সিমিলিয়ান রবেসপিয়েরের 'ঊর্ধ্বতম আইন'* তো এর তুলনায় তুচ্ছ ব্যাপার এবং এক হিসাবে তাঁরা ঠিকই

* 'ঊর্ধ্বতম আইন' ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে জ্যাকোবিন প্রতিনিধি সভা কর্তৃক ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত। এই আইনের ফলে পণ্যের দরের নির্দিষ্ট সীমা ও ঊর্ধ্বতম মজুরি বেঁধে দেওয়া হয়। — সম্পাঃ

বলেছিলেন। কিন্তু ফলাফল কী দাঁড়িয়েছিল? দৈনিক খাটুনির ঘণ্টা কমে যাওয়া সত্ত্বেও কারখানার মজুরদের মাইনে বৃদ্ধি, কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি, উৎপন্ন সামগ্রীর ক্রমাগত দর হ্রাস, শ্রমের উৎপাদন-শক্তির বিস্ময়কর বিকাশ, পণ্যের জন্য বাজারের একটা অশ্রুতপূর্ব ক্রমবর্ধমান প্রসার। ১৮৬০ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে 'বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির' সভায় আমি নিজে মিঃ নিউম্যানকে এ কথা স্বীকার করতে শুনেছি যে তিনি, ডাঃ ইউর, সিনিয়র ও অর্থনীতি বিজ্ঞানের অন্যান্য সরকারী প্রবক্তারা ভুল করেছিলেন আর জনসাধারণের সহজবুদ্ধিই ছিল নির্ভুল। অধ্যাপক ফ্র্যান্সিস নিউম্যান নন, মিঃ ডব্লিউ নিউম্যানের* উল্লেখই আমি করছি, কারণ মিঃ টমাস টুকের অপূর্ব গ্রন্থ -- যাতে ১৭৯৩ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত দামের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করা হয়েছে -- সেই **'দামের ইতিহাস'এর** সম্পাদক ও অন্যতম লেখক হিসাবে তিনি অর্থনীতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। স্থির নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরি, স্থির নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন, শ্রমের উৎপাদন-শক্তির স্থির নির্দিষ্ট মাত্রা, পুঁজিপতিদের স্থির নির্দিষ্ট ও চিরন্তন ইচ্ছা সম্পর্কে আমাদের বন্ধু ওয়েস্টনের স্থির নির্দিষ্ট ধারণা এবং তাঁর অন্যান্য সব স্থির নির্দিষ্টতা ও চরমকথা যদি ঠিক হয় তবে অধ্যাপক সিনিয়রের সখেদ আশঙ্কাই নির্ভুল হত, আর রবার্ট ওয়েন — ১৮১৬ সালেই যিনি দৈনিক খাটুনির সময় বেঁধে দেওয়াকে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং সাধারণ সংস্কারের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে সত্যসত্যই তাঁর নিউ ল্যানার্কের কাপড়-কলে নিজের দায়িত্বেই তার প্রবর্তনও করেছিলেন — তিনিই ভুল প্রতিপন্ন হতেন।

দশ ঘণ্টা রোজ আইনের প্রবর্তন ও তার ফলে মজুরি-বৃদ্ধি যে সময়ে ঘটে ঠিক সেই সময়েই গ্রেট ব্রিটেনে **কৃষি-মজুরি সাধারণভাবে বৃদ্ধি** পায় — কী কারণে তা ঘটে এখানে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

আপনারা যাতে বিভ্রান্ত না হন তার জন্য আমার আশু লক্ষ্যের দিক থেকে প্রয়োজনীয় না হলেও কয়েকটি গোড়ার কথা বলে নিতে চাই।

কোনো লোক যদি সপ্তাহে দু-শিলিং মজুরি পায় আর তার মজুরি যদি বেড়ে চার শিলিং হয় তাহলে তার **মজুরির হার** শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এটাকে **মজুরির হারে বৃদ্ধি** হিসাবে দেখলে একটা চমৎকার ব্যাপার বলে মনে হবে, যদিও **মজুরির বাস্তব পরিমাণ** - সপ্তাহে চার শিলিং -- তখনও একটা অতি শোচনীয় অনশনমাত্রার আয় হয়েই থাকছে। কাজেই মজুরির **হারের** গালভরা শতকরা হিসাবে

---

* মার্কসের এখানে ভুল হয়েছিল। ব্রিটিশ অর্থতাত্ত্বিক নিউমার্চের কথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন। — সম্পাঃ

নিজেদের ভেসে যেতে দেবেন না। সব সময়েই প্রশ্ন তুলতে হবে — **মূল** পরিমাণটা কত ছিল?

তাছাড়া এ কথাও বোঝা যায়, হপ্তায় ২ শিলিং করে পায় এমন দশজন, ৫ শিলিং করে পায় এমন পাঁচজন ও ১১ শিলিং করে পায় এমন পাঁচজন লোক যদি থাকে, তবে কুড়িজন লোক মিলে সপ্তাহে পাবে ১০০ শিলিং বা ৫ পাউন্ড। এখন ধরুন যদি এদের **মোট** সাপ্তাহিক মজুরির পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ বেড়ে যায় তা হলে ৫ পাউন্ড বেড়ে দাঁড়াবে ৬ পাউন্ডে। গড় হিসাব নিয়ে বলা যায় যে, **মজুরির সাধারণ হার** শতকরা ২০ ভাগ বাড়ল, যদিও আসলে সেই দশজনের মজুরি একরকমই থেকে গেছে, পাঁচজন লোকের দলটির মজুরি মাত্র ৫ শিলিং থেকে ৬ শিলিং বেড়েছে, আর পাঁচজনের অন্য দলের মজুরি ৫৫ শিলিং থেকে ৭০ শিলিং-এ উঠেছে। অর্ধেক লোকের অবস্থা এখানে কিছুমাত্র উন্নত হল না, এক-চতুর্থাংশের উন্নতি হল নগণ্য মাত্রায় আর এক-চতুর্থাংশের অবস্থা বাস্তবিকই উন্নত হয়ে উঠেছে। তবুও **গড়ের হিসাবে** ঐ কুড়িজন ব্যক্তির মোট মজুরির পরিমাণ বেড়েছে শতকরা ২০ ভাগ, আর যে-পুঁজি তাদের কাজে লাগাচ্ছে তার মোট পরিমাণের ও যে-পণ্য তারা তৈরি করছে তার দামের দিক থেকে ব্যাপারটা হবে ঠিক এমনই যেন তারা সবাই সমানভাবে গড়পড়তা মজুরি-বৃদ্ধির ভাগ পেয়েছে। কৃষি-মজুরদের ক্ষেত্রে মজুরির মান ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন জেলায় বহুলাংশেই বিভিন্ন রকমের হওয়ায় মজুরি-বৃদ্ধির ফল তারা পেয়েছে অত্যন্ত অসমভাবে।

সর্বশেষে, ঐ মজুরি-বৃদ্ধি যে-সময়ে ঘটে সেই সময়েই কতকগুলি বিরুদ্ধ প্রভাব কাজ করছিল — যেমন রুশযুদ্ধজনিত* নতুন ট্যাক্স, ব্যাপকভাবে কৃষি-মজুরদের বসত-কুটীরেব ধ্বংসসাধন, ইত্যাদি।

এইটুকু মুখবন্ধ করে বলা যাক যে, ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনে কৃষি-মজুরির গড়পড়তা হার **বেড়েছিল প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ।** আমার এই বক্তব্যের প্রমাণ হিসাবে আমি আপনাদের কাছে প্রচুর খুঁটিনাটি তথ্য পেশ করতে পারতাম, কিন্তু বর্তমান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি নীতিনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণী প্রবন্ধের উল্লেখই যথেষ্ট মনে হয়। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু 'কৃষিতে প্রযুক্ত শক্তিসমূহ'; লোকান্তরিত মিঃ জন সি. মর্টন ১৮৬০ সালে লন্ডন আর্ট সোসাইটিতে এটি পাঠ করেছিলেন। স্কটল্যান্ডের বারোটি ও ইংলন্ডের পঁয়ত্রিশটি কাউন্টির অধিবাসী প্রায় একশ জন কৃষকের কাছ থেকে তিনি যে-সব বিল ও অন্যান্য প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহ করেছিলেন তার থেকেই মিঃ মর্টন তাঁর হিসাব খাড়া করেন।

* ১৮৫৩-১৮৫৬ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়া ছিল ইংলন্ডের প্রতিপক্ষ। — সম্পাঃ

বন্ধু ওয়েস্টনের মত অনুসারে, ও সেইসঙ্গে কারখানা-মজুরদের যে যুগপৎ মজুরি-বৃদ্ধি ঘটেছিল তার হিসাব এর সঙ্গে ধরলে, ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যেকার যুগে কৃষিজাত জিনিসপত্রের দাম প্রচণ্ডভাবে বাড়া উচিত ছিল। কিন্তু আসলে ঘটেছিল কী? রুশ যুদ্ধ ও ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত পর পর ফসলের মন্দা সত্ত্বেও ইংলন্ডের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ফসল গমের গড়পড়তা দর ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৮ এই পর্বের কোয়ার্টার পিছু প্রায় ৩ পাউন্ড থেকে ১৮৪৯-১৮৫৯ পর্বের কোয়ার্টার পিছু প্রায় ২ পাউন্ড ১০ শিলিং এ নেমে গিয়েছিল। শতকরা ৪০ ভাগ গড়পড়তা কৃষি-মজুরি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ হল শতকরা ১৬ ভাগেরও বেশি গমের দর হ্রাস। ঐ সময়ের ভিতর যদি আমরা ঐ যুগের শেষদিকের সঙ্গে প্রথমদিকের, অর্থাৎ ১৮৫৯-এর সঙ্গে ১৮৪৯-এর যদি তুলনা করি তবে তার মধ্যে দেখা যায় যে, নিঃস্বদের সরকারী সংখ্যা ৯,৩৪,৪১৯ থেকে কমে গিয়েছিল ৮,৬০,৪৭০-এ — পার্থক্যটা ৭৩,৯৪৯ জনের। আমি মানছি যে, এ হ্রাস খুবই কম এবং পরের বছরগুলিতে তা বজায়ও থাকেনি, কিন্তু তবু তা হ্রাস তো বটেই।

বলা যেতে পারে শস্য আইন* *(Corn Laws)* বাতিল হবার ফলে ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৮ সাল এই পর্বের তুলনায় ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ এই পর্বে বিদেশী শস্য আমদানির পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাতেই বা কী? নাগরিক ওয়েস্টনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এই প্রত্যাশাই স্বাভাবিক যে, বিদেশী বাজারে এই আকস্মিক, বিপুল ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা সেখানকার কৃষিজাত দ্রব্যের দরকে নিশ্চয়ই মারাত্মক রকম চড়িয়ে দেবে- বাইরে থেকেই হোক বা ভিতর থেকেই হোক বর্ধিত চাহিদার ফলাফল এক হবারই কথা। ঘটল কী? ফসল-মন্দার সামান্য কয়েকটি বছর ছাড়া এই গোটা যুগটাতেই শস্যের দরের সর্বনাশা পড়তি নিয়ে ফরাসী দেশে একটানা চেঁচামেচি চলে; মার্কিনদের বার বার করে পোড়াতে হল উদ্বৃত্ত উৎপন্ন; আর মিঃ আর্কার্টের কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, রাশিয়াও তখন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের** প্ররোচনা যোগায়, কারণ ইউরোপের বাজারে তার কৃষি-রপ্তানি পঙ্গু হয়ে পড়েছিল মার্কিন প্রতিযোগিতার চাপে।

নাগরিক ওয়েস্টনের যুক্তির **বিমূর্ত রূপটা** দাঁড়ায় এই রকম: সর্বদাই নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্নের ভিত্তিতেই প্রতিটি চাহিদা-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। সুতরাং তার ফলে

* শস্য আইন লোপের বিল গৃহীত হয় ১৮৪৬ সালে। বিদেশ থেকে শস্য আমদানিতে বাধাদান বা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তথাকথিত এই শস্য আইনে। এটি ইংলণ্ডে গৃহীত হয়েছিল বৃহৎ ভূস্বামী জমিদারদের স্বার্থে। এ আইন নাকচের বিল গৃহীত হওয়ায় অবাধ বাণিজ্যের ধ্বনি নিয়ে শস্য আইন বিরোধী শিল্পবুর্জোয়াদের বিজয় সূচিত হয়।

** আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল ১৮৬১-১৮৬৫ সালে। — সম্পাঃ

কখনও ঈপ্সিত দ্রব্যাদির যোগান বাড়তে পারে **না, বাড়তে** পারে **শুধু তার মুদ্রা-দর।** কিন্তু সবথেকে মামুলি পর্যবেক্ষণের ফলেও দেখা যায় যে, চাহিদা-বৃদ্ধি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পণ্যের বাজার-দরকে একেবারেই অপরিবর্তিত রাখে এবং অপরক্ষেত্রে বাজার-দর সাময়িকভাবে চড়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে যোগান বাড়বে এবং তারপরে দর আগের পর্যায়ে ও অনেক **সময় আগের** পর্যায়েরও **নিচে** নেমে যাবে। বাড়তি মজুরি বা অন্য যে কোনো কারণের জন্যই চাহিদা-বৃদ্ধি ঘটুক না কেন, তাতে মোটেই সমস্যার অবস্থান্তর ঘটে না। বন্ধুবর ওয়েস্টনের মত অনুসরণ করতে গেলে মজুরি বৃদ্ধির অনন্যসাধারণ অবস্থার ফলে উদ্ভূত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা যত কঠিন হয়, এই সাধারণ অবস্থার ঘটনাবলীর ব্যাখ্যাও তেমনি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি সে সম্পর্কে তাঁর যুক্তির কোনও বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা নেই। যে নিয়মগুলির ফলে চাহিদা-বৃদ্ধির দরুন শেষ পর্যন্ত বাজার-দর না চড়ে বরং যোগানই বৃদ্ধি পায়, সে নিয়মগুলির হেতু নির্ণয়ে তাঁর হতবুদ্ধিতাই শুধু এতে প্রকাশ পাচ্ছে।

৩ [মজুরি ও কারেন্সি]

বিতর্কের দ্বিতীয় দিনে আমাদের বন্ধু ওয়েস্টন তাঁর পুরনো বক্তব্যগুলি নতুন ছাঁদে সাজালেন। তিনি বললেন: আর্থিক মজুরি সাধারণভাবে বৃদ্ধি পেলে তার ফলে সেই মজুরি দিতে বেশী মুদ্রা লাগবে। যেহেতু মুদ্রার পরিমাণ স্থির **নির্দিষ্ট,** সুতরাং সেই স্থির নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার সাহায্যে কী করে আপনারা বর্ধিত আর্থিক মজুরি দিতে পারবেন? প্রথমে আর্থিক মজুরি-বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মজুরের বরাদ্দ পণ্যের পরিমাণ স্থির নির্দিষ্ট বলে বিপত্তি ঘটল; এখন মুশকিল বাধছে পণ্যের পরিমাণ স্থির নির্দিষ্ট হলেও আর্থিক মজুরি-বৃদ্ধি পেয়েছে বলে। অবশ্য তাঁর গোড়ার আপ্তবাক্যটা যদি আপনারা বাতিল করেন তাহলে তাঁর পরবর্তী নালিশও দূর হয়ে যায়।

যা হোক, আমি দেখাব যে, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এই কারেন্সি সমস্যার কোনো সম্পর্কই নেই।

আপনাদের দেশে আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা ইউরোপের যে কোনো দেশের চাইতে অনেক বেশী উন্নত। ব্যাঙ্কব্যবস্থার পরিধি ও কেন্দ্রীকরণের কল্যাণে একই পরিমাণ মূল্যের সঞ্চালনে এবং একই, এমন কি অধিক পরিমাণ ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য অনেক কম কারেন্সির প্রয়োজন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মজুরির দিক থেকে দেখলে ইংরাজ কারখানা-মজুর প্রতি সপ্তাহে দোকানদারকে তার মজুরি-লব্ধ অর্থ তুলে দেয়, দোকানদার আবার প্রতি সপ্তাহে সেই অর্থ ব্যাংক-মালিককে জমা দেয়। ব্যাঙ্ক আবার

প্রতি সপ্তাহে শিল্পপতিকে সে অর্থ ফেরত দেয়। সে আবার সেই অর্থ মজুরদের দেয় ইত্যাদি। এই কৌশলের ফলে একজন মজুরের গোটা বছরের মজুরিই, ধরুন ৫২ পাউন্ড, কেবল একটিমাত্র পাউন্ড মুদ্রার সাহায্যে দেওয়া চলে, যা প্রতি সপ্তাহে এই চক্রে ঘুরে আসে। এমন কি ইংলন্ডেও এ ব্যবস্থা স্কটল্যান্ডের মতো উন্নত নয় এবং সর্বত্র সমান উন্নতও নয়; কাজেই আমরা দেখতে পাই যে, নিছক শিল্পপ্রধান অঞ্চলের তুলনায় কোনো কোনো কৃষিপ্রধান অঞ্চলে অনেক কম পরিমাণ মূল্য চলাচলের জন্য অনেক বেশী কারেন্সির প্রয়োজন হয়।

আপনারা যদি চ্যানেলের* ওপারে যান তবে দেখবেন **আর্থিক মজুরি** সেখানে ইংলন্ডের থেকে অনেক কম, কিন্তু জার্মানি, ইতালি, সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সে তা সঞ্চালিত হয় **অনেক বেশী পরিমাণ কারেন্সির** সাহায্যে। স্বর্ণ মুদ্রাটি সেখানে অত তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কের হাতে পড়বে না বা শিল্পপুঁজিপতির কাছে ফেরত যাবে না; আর সেইসব ক্ষেত্রে তাই একটি স্বর্ণ মুদ্রার মাধ্যমে বছরে ৫২ পাউন্ড সঞ্চালন করানোর জায়গায় হয়তো ২৫ পাউন্ডের মতন মজুরি সঞ্চালন করাতেই তিনটি স্বর্ণ মুদ্রার প্রয়োজন হবে। সুতরাং ইউরোপীয় ভূখণ্ডের দেশগুলির সঙ্গে ইংলন্ডের তুলনা করলে আপনারা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারবেন যে, বেশী আর্থিক মজুরির চাইতে হয়তো কম আর্থিক মজুরি সঞ্চালন করাতেই অনেক বেশী কারেন্সির প্রয়োজন হতে পারে। এটা হচ্ছে আসলে আমাদের বর্তমান আলোচনার সম্পূর্ণ বহির্ভূত একটা টেকনিকাল ব্যাপারমাত্র।

সবথেকে ভাল হিসাব যা আমার জানা আছে সে অনুসারে এই দেশের শ্রমিক শ্রেণীর বাৎসরিক আয় ২৫ কোটি পাউন্ড বলে ধরা যেতে পারে। এই বিপুল অঙ্কটির সঞ্চালনে লাগে প্রায় ৩০ লক্ষ পাউন্ড। ধরুন শতকরা ৫০ ভাগ মজুরি বেড়ে গেল। তা হলে ৩০ লক্ষ পাউন্ডের জায়গায় ৪৫ লক্ষ পাউন্ড লাগবে। মজুরদের দৈনিক খরচের মস্ত বড় একটা অংশ রুপো ও তামায় অর্থাৎ সোনার সঙ্গে যার আপেক্ষিক মূল্য অভাঙ্গা কাগুজে মুদ্রার মতো আইনের দ্বারা মনগড়াভাবে নির্ধারিত হয় এমন প্রতীক-মুদ্রাতেই চলে। এইজন্য আর্থিক মজুরি শতকরা ৫০ ভাগ বাড়লে বেশী করে ধরলেও দশ লক্ষ পাউন্ড পরিমাণ অতিরিক্ত স্বর্ণ মুদ্রার চলাচলই যথেষ্ট হবে। ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ড বা বেসরকারী ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে বর্তমানে যে দশ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের স্বর্ণপিণ্ড বা মুদ্রা নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়ে আছে, তাই তখন সঞ্চালন করতে থাকবে। প্রয়োজনীয় বাড়তি কারেন্সির অভাবের দরুন কোনো অসুবিধা উপস্থিত হলে ঐ দশ লক্ষের

* ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মধ্যের সংকীর্ণ সমুদ্রকে ইংলিশ চ্যানেল অথবা চ্যানেল বলা হয়। — সম্পাঃ

বাড়তি মুদ্রণ বা ব্যবহারজনিত বাড়তি ক্ষয়ক্ষতির সামান্য খরচটুকুও এড়ানো যেতে পারে এবং এড়ানোই হবে। আপনারা সবাই জানেন যে, এ দেশের কারেন্সি দু'টো মস্ত ভাগে বিভক্ত। একটা ভাগ হল বিভিন্ন মূল্যের ব্যাংক-নোট — ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসায়ীর লেনদেনের জন্য এবং ভোক্তাদের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের মোটা রকমের মূল্য দেবার সময়ে এর ব্যবহার হয়। আর এক ধরনের কারেন্সি, ধাতব মুদ্রা, চলে খুচরো ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে। স্বতন্ত্র হলেও এই দুই ধরনের কারেন্সি পরস্পরের ক্ষেত্রেও কাজ চালায়। তাই এমনকি মোটা রকমের পাওনা মেটাবার সময়েও ৫ পাউন্ডের কম খুচরো অঙ্কের বেলায় অনেক ক্ষেত্রেই স্বর্ণমুদ্রা চলে। ধরুন যদি আগামীকাল ৪ পাউন্ড, ৩ পাউন্ড বা ২ পাউন্ডের নোট চালু হয় তাহলে এই সব চলাচলের খাতে যে সোনা চলছে তা তখনই সেখান থেকে হঠে গিয়ে চলে যাবে সেইসব খাতে যেখানে আর্থিক মজুরি বাড়ার ফলে তা প্রয়োজন। এইভাবে শতকরা ৫০ ভাগ মজুরি-বৃদ্ধির দরুন যে বাড়তি দশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন — একটি স্বর্ণমুদ্রা না বাড়িয়েও তার যোগান দেওয়া সম্ভব হতে পারে। আবার একটি মাত্র বাড়তি ব্যাংক-নোট ছাড়াও ঐ এক ফলই পাওয়া যেতে পারে বাড়তি হুন্ডি চলাচল মারফত — যেমন বেশ কিছুদিন ধরে চলেছিল ল্যাংকাশায়ারে।

নাগরিক ওয়েস্টন কৃষি-মজুরির ক্ষেত্রে যেমন ধরেছেন, মজুরির হার ঐ রকম শতকরা একশ ভাগ বৃদ্ধি পেলে আবশ্যিক দ্রব্যাদির দাম যদি বিপুল পরিমাণে বাড়ে এবং তাঁর কথা মতো এমন বাড়তি টাকার দরকার পড়ে যা যোগানো অসম্ভব, তা হলে **সাধারণভাবে মজুরি কমে গেলে** বিপরীত দিকেও নিশ্চয়ই একই ফল একই মাত্রায় দেখা যাবে। এদিকে আপনারা সবাই জানেন যে, ১৮৫৮-১৮৬০ এই কটা বছর তুলাশিল্পের পক্ষে সবচেয়ে শ্রীবৃদ্ধির বছর ছিল আর সেইদিক থেকে আশ্চর্যরকম ভাবেই ১৮৬০ সালটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে অতুলনীয় হয়ে রয়েছে, আবার সেই সঙ্গে শিল্পের অন্য সব শাখাগুলিতেও সে বছরে সমৃদ্ধতম অবস্থা ছিল। তুলাশিল্পের মজুরদের ও সংশ্লিষ্ট অন্য সমস্ত মজুরদের মজুরি ১৮৬০ সালে আগের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তারপর এল আমেরিকার সংকট এবং ঐ মোট মজুরি হঠাৎ আগেকার পরিমাণের প্রায় এক-চতুর্থাংশে নেমে গেল। বিপরীত দিকে হলে এটা হত শতকরা ৩০০ ভাগ মজুরিবৃদ্ধি। মজুরি পাঁচ থেকে বেড়ে কুড়ি হলে আমরা বলি, যে, শতকরা ৩০০ ভাগ বেড়েছে; যদি কুড়ি থেকে কমে তা পাঁচে দাঁড়ায় আমরা বলি শতকরা ৭৫ ভাগ কমেছে, অথচ বাড়তির ক্ষেত্রেই হোক অথবা কমতির ক্ষেত্রেই হোক, মজুরি বাড়া-কমার পরিমাণ ঠিক একই অর্থাৎ পনেরো শিলিংই থাকছে। তাই তখন এসেছিল মজুরি-হারের এক অভূতপূর্ব ও আকস্মিক পরিবর্তন। তুলাব্যবসায়ে যারা প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত শুধু তারাই নয়, তার উপরে পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল সমস্ত মজুরের হিসাব

যদি আমরা রাখি তাহলে দেখি যে, সে পরিবর্তনের আওতার মধ্যে যত মজুর পড়েছে তাদের সংখ্যা কৃষি-মজুরদের সংখ্যার দেড়গুণ। কিন্তু গমের দাম কি তখন কমেছিল? ১৮৫৮ থেকে ১৮৬০ সাল এই তিন বছরে ঐ দাম কোয়ার্টার পিছু বাৎসরিক গড়পড়তা ৪৭ শিলিং ৮ পেন্স থেকে ১৮৬১ থেকে ১৮৬৩ এই তিন বছরে কোয়ার্টার পিছু বাৎসরিক গড়পড়তা ৫৫ শিলিং ১০ পেন্সে **বেড়ে উঠল**। আর কারেন্সির ব্যাপারে, ১৮৬০ যেখানে ৩৩,৭৮,১০২ পাউন্ড মুদ্রা টাঁকশালে মুদ্রিত হয়েছিল সেখানে ১৮৬১ সালে ৮৬,৭৩,২৩২ পাউন্ড মুদ্রা মুদ্রিত হল। অর্থাৎ ১৮৬০ সালের থেকে ১৮৬১ সালে ৫২,৯৫,১৩০ পাউন্ড মুদ্রা বেশী মুদ্রিত হয়। এ কথা ঠিক যে, ১৮৬০ সালের চেয়ে ১৮৬১ সালে ব্যাংক-নোট চালু থাকে ১৩,১৯,০০০ পাউন্ড কম। সেটা বাদ দিন। তা হলেও ১৮৬০ সালের সমৃদ্ধ বছর থেকে ১৮৬১ সালের ৩৯,৭৬,১৩০ পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় ৪০,০০,০০০ পাউন্ড বেশী মুদ্রা থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গেই ব্যাংক অব ইংলন্ডের স্বর্ণপিন্ডের মজুদ ঠিক ততটাই না হলেও প্রায় সমানুপাতে কমে যায়।

১৮৪২-এর সঙ্গে ১৮৬২ সালের তুলনা করুন। চালু পণ্যের মূল্য ও পরিমাণের প্রচন্ড বৃদ্ধি ছাড়াও ১৮৬২ সালে ইংলন্ড ও ওয়েল্সের রেলওয়ের শেয়ার, ঋণ ইত্যাদির নিয়মিত লেনদেনের বাবদই শুধু পুঁজি ব্যয়িত হয় ৩২,০০,০০,০০০ পাউন্ড; ১৮৪২ সালে এ সংখ্যা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য বলে বোধ হত। তবু মোট চালু মুদ্রার পরিমাণ ১৮৬২ ও ১৮৪২ সালে প্রায় সমানই ছিল, এবং শুধু পণ্যই নয়, মোটামুটি সমস্ত রকম আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রেই মূল্যের প্রচন্ড ক্রমবর্ধমানতা সত্ত্বেও সাধারণভাবে আপনারা কারেন্সির ক্রমিক হ্রাসপ্রাপ্তির লক্ষণই দেখতে পাবেন। বন্ধু ওয়েস্টনের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এ ধাঁধার সমাধান নেই।

ব্যাপারটাকে আর একটু তলিয়ে দেখলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, মজুরির কথা একেবারে ছেড়ে দিলেও, তাকে স্থির বলে ধরে নিলেও সঞ্চালনীয় পণ্যের মূল্য ও পরিমাণ এবং সাধারণভাবে যে পরিমাণ আর্থিক লেনদেন মেটানো হয়, তার পরিমাণ প্রতিদিনই পরিবর্তিত হয়; যে ব্যাংক-নোট ছাড়া হয় তার পরিমাণ প্রতিদিন বদলায়; মুদ্রার মাধ্যম বিনাই বিল, চেক, খাতাপত্রে ঋণ, ক্লিয়ারিং হাউস মারফত যে পরিমাণ প্রাপ্য মেটানো হয় প্রতিদিনই তার পরিবর্তন হচ্ছে; নগদ ধাতব কারেন্সির যতটা দরকার পড়ে সেক্ষেত্রেও, যে মুদ্রা চালু রয়েছে এবং যে মুদ্রা ও স্বর্ণপিন্ড মজুত রয়েছে কিংবা ব্যাংকের ভান্ডারে নিষ্ক্রিয় রয়েছে তার অনুপাত প্রতিদিন বদলায়; দেশের আভ্যন্তরিক লেনদেনের জন্য যে পরিমাণ স্বর্ণ লাগে এবং আন্তর্জাতিক সঞ্চালনের জন্য বাইরে যে পরিমাণ স্বর্ণ চালান হয় তার অনুপাতও রোজই বদলে যাচ্ছে। তিনি দেখতে পেতেন যে কারেন্সির স্থিরতা সম্পর্কে তাঁর অন্ধ বিশ্বাসটি একটা মস্ত ভুল, দৈনন্দিন

ঘটনাগতির সঙ্গে এর কোনো সঙ্গতিই নেই। কারেন্সির নিয়ম সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্ত ধারণাকে মজুরি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটা যুক্তি হিসাবে খাড়া না করে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে কোন্ কোন্ নিয়মের বলে কারেন্সি নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় বরং সেই সম্পর্কেই তিনি অনুসন্ধান করতে পারতেন।

৪ ।যোগান ও চাহিদা।

আমাদের বন্ধু ওয়েস্টন *repetitio est mater studiorum* (পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বিদ্যাভ্যাসের জননী) এই ল্যাটিন প্রবাদ মানেন। তাই তিনি আবার তাঁর গোড়াকার আপ্তবাক্যটির পুনরাবৃত্তি করছেন এই নতুন রূপে যে, মজুরি-বৃদ্ধিজনিত কারেন্সি সংকোচের ফলে পুঁজি কমে যাবে, ইত্যাদি। কারেন্সি সম্পর্কে তাঁর উদ্ভট ধারণা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি; তাই কারেন্সি সম্পর্কিত তাঁর কাল্পনিক দুর্বিপাক থেকে যে সব কাল্পনিক ফলাফল উৎসারিত হবে বলে তিনি আন্দাজ করেছেন সে নিয়ে আলোচনা আমি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি। ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় তাঁর যে **একটিমাত্র অভিন্ন আপ্তবাক্যের** বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, আমি আর কালক্ষেপ না করে **সেটির সহজতম তাত্ত্বিক রূপটি** দেখাব।

একটিমাত্র মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে কী রকম বিচারবিমুখ মনোভাব নিয়ে তিনি বিষয়টিতে হাত দিয়েছেন। তিনি ওকালতি করেছেন মজুরি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, অথবা সেই বৃদ্ধিজনিত উচ্চ মজুরির বিরুদ্ধে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি বেশি মজুরি আর কম মজুরি বলতে তিনি কী বোঝেন? দৃষ্টান্তস্বরূপ, সপ্তাহে পাঁচ শিলিং মজুরি কেন কম ও বিশ শিলিং মজুরিই বা বেশী কেন; বিশের তুলনায় পাঁচ যদি কম হয় তবে দু'শর তুলনায় বিশ তো আরো কম। তাপমান যন্ত্রের সম্পর্কে যদি কাউকে বক্তৃতা করতে হয় আর যদি তিনি বেশি ও কম তাপমাত্রা নিয়ে গলাবাজি শুরু করেন তবে কোনও জ্ঞানই তিনি বিতরণ করবেন না। তাঁকে গোড়াতেই বলতে হবে, কী করে হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বার করতে হয় আর কীভাবে তাপমান যন্ত্রের বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারকের খামখেয়ালির দ্বারা নয়, প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারাই ঐ প্রমাণ-মাত্রাগুলি নির্দিষ্ট। মজুরি ও মুনাফার ব্যাপারে নাগরিক ওয়েস্টন যে শুধু অর্থনৈতিক নিয়ম থেকে ঐ ধরনের প্রমাণ-মাত্রা বার করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাই নয়, সেগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেননি। কম ও বেশী বাজার-চলতি এই বুলিটার নির্দিষ্ট অর্থ আছে এই কথা মেনে নিয়েই তিনি খুশী, যদিও এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে মজুরি মাপবার মতো একটা প্রমাণ-মাত্রার সঙ্গে তুলনা করেই বলা চলে মজুরি বেশি কি কম।

তিনি আমায় বলতে পারবেন না কেন বিশেষ পরিমাণ শ্রমের জন্য বিশেষ পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়। যদি তিনি জবাব দেন — যোগান ও চাহিদার নিয়ম দ্বারাই এটা নির্দিষ্ট হয়েছে, তাহলে আমি তাঁকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করব, যোগান ও চাহিদা নিজেরাই বা কোন নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়? সে জবাব তখন তাঁকেই ফেলবে বেকায়দায়। শ্রমের যোগান ও চাহিদার মধ্যেকার সম্পর্ক ক্রমাগত পরিবর্তিত হয় ও তারই সঙ্গে বদলায় শ্রমের বাজার-দর। চাহিদা যদি যোগানকে ছাপিয়ে যায় তাহলে মজুরি বাড়ে; যোগান যদি চাহিদাকে ছাপায় তবে মজুরি কমে, যদিও সে পরিস্থিতিতে যোগান ও চাহিদার সত্যকার অবস্থা **যাচাই করার জন্য,** ধরুন, ধর্মঘট বা অন্য কোনো পদ্ধতির প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু যোগান ও চাহিদাকেই যদি আপনি মজুরি-নিয়ামক নিয়ম বলে মেনে নেন তাহলে মজুরি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গলাবাজি করা যেমন ছেলেমানুষি তেমনই নিরর্থক হবে, কারণ যে পরম নিয়মের আপনি দোহাই পাড়ছেন সেই নিয়ম অনুসারেই কিছুদিন অন্তর অন্তর মজুরি হ্রাসের মতোই কিছুদিন পরে পরে মজুরি-বৃদ্ধিও সমান আবশ্যিক ও সঙ্গত। যোগান ও চাহিদাকে যদি আপনি মজুরি-নিয়ামক নিয়ম বলে **না** মানেন তাহলে আমি আবার প্রশ্ন তুলব -- কেন বিশেষ পরিমাণ শ্রমের জন্য বিশেষ পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়?

কিন্তু আরো ব্যাপকভাবে বিবেচনা করলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই: শ্রম বা অন্য কোনো পণ্যের মূল্য শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় যোগান ও চাহিদার দ্বারা --- একথা ভাবলে আপনারা সম্পূর্ণ ভুল করবেন। বাজার-দরের সাময়িক **উঠতি-পড়তিটুকু** ছাড়া যোগান ও চাহিদা আর কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে না। কোনো পণ্যের বাজার-দর কেন তার **মূল্যের** ওপরে ওঠে বা নিচে নামে যোগান ও চাহিদা তার কারণ আপনাদের বোঝাতে পারবে, কিন্তু সেই খাস **মূল্যটা** সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা তারা দিতে পারবে না। ধরুন, যোগান ও চাহিদা সমান সমান হল, অথবা অর্থতাত্ত্বিকেরা যা বলেন সাম্যাবস্থায় উপনীত হল। এই বিপরীত শক্তিদুটি সমান সমান হওয়া মাত্রই তো তারা পরস্পরকে অকেজো করে ফেলবে, এদিক বা ওদিক কোনো দিকেই তারা তখন কাজ করতে পারবে না। যে মুহূর্তে যোগান ও চাহিদা পরস্পর সমান সমান হয় এবং তার ফলে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তখনই পণ্যের **বাজার-দর** তার **আসল মূল্যের** সঙ্গে, যাকে ঘিরে পণ্যের বাজার-দর ওঠানামা করে সেই নির্দিষ্টমান দামের সঙ্গে মিলে যায়। সুতরাং, ঐ **মূল্যের** প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে হলে বাজার-দরের ওপর যোগান ও চাহিদার সাময়িক প্রভাবের কোনো কথা আসে না। মজুরি ও অন্য সমস্ত পণ্যের দামের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

৫ [মজুরি ও দাম]

সহজতম তত্ত্বগতরূপে পর্যবসিত করলে আমাদের বন্ধুর সমস্ত যুক্তিগুলি এই একটিমাত্র আপ্তবাক্যে দাঁড়ায়: **'পণ্যের দাম নির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় মজুরির দ্বারা।'**

এই অচল ও ভ্রান্তপ্রমাণিত যুক্তিবিভ্রমের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে আমি বাস্তব পর্যবেক্ষণের আবেদন জানাতে পারতাম। আপনাদের বলতে পারতাম যে, ইংরেজ কারখানা-মজুর, খনি-শ্রমিক, জাহাজী-মজুর প্রভৃতি যাদের শ্রমের দাম অপেক্ষাকৃত উঁচু — সস্তা উৎপন্নের দরুন সব জাতির থেকে কম দামে তাদের মাল বিকোয়। অথচ ধরুন ইংরেজ কৃষি-মজুর, যার শ্রমের দাম অপেক্ষাকৃত কম, তার উৎপন্ন সামগ্রীর উঁচু দামের ফলে প্রায় সবদেশই পণ্য বিক্রয় করে তার থেকে কম দামে। একই দেশের বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে এবং বিভিন্ন দেশের পণ্যের মধ্যে তুলনা টেনে দেখাতে পারতাম যে, কিছু ব্যতিক্রম — যতটা বাহ্যিক ততটা আসলে নয় — বাদ দিলে গড়পড়তায় উঁচু দামের শ্রম উৎপাদন করে সস্তা দামের পণ্য এবং সস্তা দামের শ্রম উৎপাদন করে উঁচু দামের পণ্য। অবশ্য এর থেকে প্রমাণ হবে না যে, একক্ষেত্রে শ্রমের উঁচু দাম ও অন্যক্ষেত্রে তার সস্তা দামই যথাক্রমে ঐ ধরনের সম্পূর্ণ বিপরীত ফলাফলের কারণ। তবু এর থেকে অন্তত এটা প্রমাণ হয় যে, পণ্যের দাম শ্রমের দামের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। অবশ্য এই ধরনের হাতুড়ে পদ্ধতি প্রয়োগ আমাদের পক্ষে একেবারেই বাহুল্য।

'পণ্যের দাম নির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় মজুরির দ্বারা' — বন্ধুবর ওয়েস্টন যে এই আপ্তবাক্যের অবতারণা করেছেন তা হয়ত অস্বীকার করা হবে। বাস্তবিকপক্ষে তিনি কখনও একে সূত্রাকারে উপস্থিত করেননি। বরঞ্চ তিনি এ কথাই বলেছেন যে, পণ্যের দামের মধ্যে মুনাফা ও খাজনারও অংশ রয়েছে, কারণ পণ্যের দাম থেকে শুধু মজুরের মজুরি নয়, পুঁজিপতির মুনাফা ও ভুস্বামীর খাজনাও দিতে হয়। তাহলে তাঁর ধারণা অনুসারে দাম গঠিত হয় কী ভাবে? প্রথমত, মজুরি দিয়ে। তারপরে তার সঙ্গে বাড়তি একটি শতকরা অংশ যোগ করা হয় পুঁজিপতিবাবদ এবং আর একটি অংশ ভূস্বামীবাবদ। ধরুন কোনো পণ্য-উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমের মজুরি হচ্ছে দশ। মুনাফা-হার যদি শতকরা ১০০ ভাগ হয় তবে যে মজুরি আগাম দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে পুঁজিপতি যোগ দেবে দশ, আর খাজনা-হারও মজুরির শতকরা ১০০ ভাগ হলে এর সঙ্গে যোগ হবে আরো দশ। তাহলে পণ্যের মোট দাম দাঁড়াবে ত্রিশ। কিন্তু এভাবে দাম নির্ধারণের অর্থ হচ্ছে নিতান্ত মজুরি দ্বারাই দাম নির্ধারণ। এ ক্ষেত্রে যদি মজুরি বেড়ে বিশে দাঁড়ায় তাহলে পণ্যের দাম হবে ষাট ইত্যাদি। তদনুসারে অর্থশাস্ত্রের যে সব সেকেলে লেখকেরা মজুরিই দাম নিয়ন্ত্রণ করে এই আপ্তবাক্যের পত্তন করেছিলেন, তাঁরা এ সূত্র প্রমাণ করতে চেয়েছেন মুনাফা ও খাজনাকে **মজুরির উপর বাড়তি কিছু শতকরা অংশ হিসাবে**

দেখিয়ে। অবশ্য তাঁদের কেউই ঐ শতকরা অংশের মাত্রাকে কোনো অর্থনৈতিক নিয়মের মধ্যে ফেলতে পারেননি। বরঞ্চ মনে হয় যেন তাঁরা ভাবেন ঐতিহ্য, প্রচলিত **প্রথা,** পুঁজিপতির ইচ্ছা বা এই ধরনের যথেচ্ছ ও ব্যাখ্যাতীত কোনো পদ্ধতিতেই **মুনাফা** নির্ধারিত হয়। যদি তাঁরা বলেন যে, মুনাফা নির্দিষ্ট হয় পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দিয়ে, তাহলেও কিছুই বলা হবে না। সেই প্রতিযোগিতা বিভিন্ন ব্যবসায়ের ভিন্ন ভিন্ন মুনাফার হার নিশ্চয়ই সমান করতে থাকে, অথবা বিভিন্ন হারকে একটা গড়পড়তা মাত্রায় এনে ফেলে, কিন্তু মাত্রাটিকে অথবা সাধারণ মুনাফা-হারকে তা কখনই নির্ধারিত করতে পারে না।

পণ্যের দাম মজুরির দ্বারা নির্ধারিত হয় এ কথা বলতে কী বোঝায়? শ্রমের দামের নামই যেহেতু মজুরি, তাই বোঝায় যে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রিত হয় শ্রমের দাম দিয়ে। যেহেতু **'দাম'** হচ্ছে বিনিময়-মূল্য — এবং মূল্য বলতে আমি সর্বদা বিনিময়-মূল্যই বুঝিয়েছি — **মুদ্রার অঙ্কে ব্যক্ত** বিনিময়-**মূল্য,** তাই বক্তব্যটি দাঁড়ায় এই রকম যে, **'পণ্যের মূল্য** নির্ধারিত হয় শ্রমের মূল্য দিয়ে'। অথবা **'শ্রমের মূল্যই হল মূল্যের সাধারণ পরিমাপ'।**

কিন্তু **'শ্রমের মূল্যটা'** তাহলে স্থির হয় কী ভাবে? এইখানেই আমাদের থমকে দাঁড়াতে হয়। অবশ্য থমকাতে হয় যদি যুক্তিসম্মতভাবে আমরা চিন্তা করতে চাই। এ মতবাদের প্রবক্তারা অবশ্য যুক্তিগত নীতিনিষ্ঠার পরোয়া করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের বন্ধু ওয়েস্টনকেই ধরুন। গোড়ায় তিনি আমাদের বললেন যে, মজুরিই পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করে আর কাজেই মজুরি বাড়ালে দামও বাড়তে বাধ্য। তারপর তিনি উল্টো গেয়ে আমাদের দেখালেন যে, মজুরি বাড়লে কিছু লাভ নেই, কারণ পণ্যের দাম বেড়ে যাবে এবং কারণ, যে সব পণ্যের পেছনে মজুরি খরচ করা হয় তাদের দাম দিয়েই আসলে তা মাপা হয়। অর্থাৎ এই বলে শুরু করা হল যে, শ্রমের মূল্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে, আর শেষ করা হল এই বলে যে, পণ্যের মূল্য শ্রমের মূল্য স্থির করে। এইভাবে এক অতি জটিল কুম্ভীপাকের মধ্যে ঘুরপাক খেতে হবে, কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছন যাবে না।

মোটের উপর এটা স্পষ্ট যে, কোনো একটা পণ্যের মূল্যকে, যেমন ধরুন শ্রম, শস্য, বা অন্য কোনও পণ্যের মূল্যকে, মূল্যের সাধারণ পরিমাপ ও নিয়ামক হিসাবে গ্রহণ করলে সঙ্কট ঠেলে রাখা হয় মাত্র, কারণ একটি মূল্য যার নিজেরই পরিমাপ প্রয়োজন তাকে দিয়েই আমরা স্থির করেছি আর একটি মূল্য।

'মজুরি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে' — এই আপ্তবাক্যকে সব থেকে অমূর্তভাবে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় এই যে, 'মূল্য নির্ধারিত হয় মূল্যের দ্বারাই' এবং এই পুনরাবৃত্তির অর্থ এই যে, আসলে মূল্য সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলে

অর্থতত্ত্বের সাধারণ নিয়ম সম্পর্কিত সমস্ত যুক্তিতর্ক শুধু বাচালতাতেই পর্যবসিত হয়। তাই রিকার্ডোর মস্ত কীর্তি হল এই যে, তিনি ১৮১৭ সালে প্রকাশিত তাঁর 'অর্থতত্ত্বের নীতিসমষ্টি' গ্রন্থে 'মজুরি দাম নির্ধারণ করে' এই সাবেকী অতি প্রচলিত, জরাজীর্ণ যুক্তিবিভ্রম সমূলে খণ্ডন করেন — সেই যুক্তিভ্রম যা অ্যাডাম স্মিথ ও তাঁর ফরাসী পূর্বগামীরা তাঁদের গবেষণার সত্যকার বৈজ্ঞানিক অংশে বর্জন করলেও জন-প্রচারিত স্থূল অধ্যায়গুলিতে আবার তা পুনরুদ্ধৃত করেছিলেন।

৬ [মূল্য ও শ্রম]

নাগরিকগণ, আমি এখন এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছি যেখানে আমাকে প্রশ্নটির সত্যকার পরিব্যাখ্যানের মধ্যে যেতে হবে। খুব সন্তোষজনক ভাবে এ কাজ করার প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি না, কারণ তা করতে হলে আমাকে অর্থতত্ত্বের সমগ্র এলাকা ধরে টান দিতে হবে। ফরাসীরা যাকে বলে মাত্র *effleurer la question* আমি তেমনি শুধু মূল কথাগুলি ছুঁয়ে যেতে পারি।

প্রথম প্রশ্ন তুলতে হবে: পণ্যের **মূল্য** কী? কী ভাবে তা নির্ধারিত হয়?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পণ্যের মূল্য জিনিষটা বুঝি একেবারেই **আপেক্ষিক;** একটি পণ্যকে অন্য সমস্ত পণ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে না দেখলে বুঝি মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। বাস্তবিকই, মূল্য বলতে, অর্থাৎ কোনো পণ্যের বিনিময়-মূল্য বলতে আমরা অন্য সব পণ্যের সঙ্গে আনুপাতিক পরিমাণে তার যে লেনদেন হয় তা-ই বুঝে থাকি। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে: পণ্যসমূহের ভিতর পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাতটাই বা নির্ধারিত হয় কী ভাবে?

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, এই অনুপাতগুলি অসংখ্য ধরনের হতে পারে। কোনো একটি পণ্যকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ গমকে ধরলে আমরা দেখব যে, বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে প্রায় অসংখ্য রকমের নানা অনুপাতে এক কোয়ার্টার গমের বিনিময় হতে পারে। তবু **তার মূল্য বরাবরই একই থাকায়** রেশম, সোনা বা অন্য যে-কোনা পণ্যের মাধ্যমেই তা প্রকাশ পাক না কেন, বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে **বিনিময়ের বিভিন্ন হার** থেকে তাকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন একটা সত্তা হতেই হবে। বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে এই বিভিন্ন সমীকরণগুলিকে একেবারেই অন্যরূপে প্রকাশ করা অবশ্য সম্ভব।

তাছাড়া আমি যদি বলি এক কোয়ার্টার গমকে এক বিশেষ অনুপাতে লোহার সঙ্গে বিনিময় করা যায়, বা এক কোয়ার্টার গমের মূল্য এক বিশেষ পরিমাণ লোহার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাহলে আমি এ কথাই বলি যে, গমের মূল্য ও লোহার ক্ষেত্রে তার তুল্যমূল্য হচ্ছে **তৃতীয় একটি জিনিসের** সমান যা গমও নয় লোহাও নয়, কারণ

আমি ধরে নিয়েছি যে দুই বিভিন্ন রূপে ওরা একটা পরিমাণকেই প্রকাশ করছে। কাজেই দুয়ের মধ্যে যে-কোনটিকে, তা সে গমই হোক আর লোহাই হোক, অপরটির ওপর নির্ভর না করেই তৃতীয় একটি জিনিসে পরিণত করা যেতে পারে, যে তৃতীয় জিনিসটি হল তাদের উভয়েরই সাধারণ পরিমাপ।

এই ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করার জন্য আমি খুবই সহজ একটি জ্যামিতিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করব। সবরকম সম্ভাব্য রূপ ও আয়তনের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তুলনা করার সময়, অথবা চতুষ্কোণ বা অন্য যে কোনো ঋজুরেখ ক্ষেত্রের সঙ্গে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তুলনা করার সময়ে আমরা কী করি? আমরা যে কোনো ত্রিকোণের ক্ষেত্রফলকে পরিণত করি এমন একটা আকারে যা তার দৃশ্য-রূপ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ত্রিকোণের ক্ষেত্রফল তার ভূমি ও উচ্চতার গুণফলের অর্ধেক — ত্রিকোণের চরিত্র থেকে একথা জেনে আমরা এবার নানারকম ত্রিকোণের এবং যে কোনও ঋজুরেখ ক্ষেত্রের নানা মূল্য তুলনা করতে পারি, কারণ সমস্ত ঋজুরেখ ক্ষেত্রকেই কতকগুলি ত্রিকোণে ভাগ করা সম্ভব।

বিভিন্ন পণ্যের মূল্যের বেলায়ও ঐ একই ধরনের পদ্ধতি থাকা উচিত। সমস্ত পণ্যকেই পরিণত করতে পারা চাই এমন একটা অভিব্যক্তিতে যা তাদের সকলকার পক্ষেই সাধারণ এবং এই একই পরিমাপটা যে বিভিন্ন অনুপাতে তাদের মধ্যে বর্তমান তাই দিয়েই তাদের পার্থক্য।

যেহেতু পণ্যের **বিনিময়-মূল্য** ঐসব দ্রব্যের নিছক **সামাজিক ক্রিয়া,** তাদের **স্বাভাবিক** গুণাগুণের সঙ্গে এ বিনিময়-মূল্যের কোনো সম্পর্ক নেই, সেহেতু গোড়াতেই আমাদের প্রশ্ন তুলতে হবে: সমস্ত পণ্যের ভিতরকার সাধারণ **সামাজিক সারবস্তু** কী? সে হচ্ছে **শ্রম।** কোনো পণ্য উৎপাদন করতে গেলে তার উপর কিছু পরিমাণ শ্রম লাগাতে হবে, তার মধ্যে কিছু শ্রম রূপায়িত করতেই হবে। এখানে আমি শুধু **শ্রমই** নয়, **সামাজিক** শ্রমের কথাই বলছি। যদি কেউ তার নিজের আশু ব্যবহারের জন্য এবং নিজেই তা ভোগ করার জন্য কোনো সামগ্রী উৎপাদন করে তাহলে সে যা সৃষ্টি করল তা হল **উৎপন্ন দ্রব্য,** কিন্তু **পণ্য** নয়। একজন আত্মপোষক উৎপাদনকারী হিসাবে সমাজের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু একটি **পণ্য** উৎপাদন করতে গেলে মানুষ শুধু **সামাজিক** চাহিদা মেটাবার মতো কোনো সামগ্রী উৎপাদন করলেই চলবে না, তার নিজের শ্রমকেও সমাজ যে শ্রম ব্যয় করে তার সমগ্র পরিমাণের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হতে হবে। এ শ্রমকে **সমাজের অভ্যন্তরস্থ শ্রমবিভাগের** অধীন হতে হবে। অন্যান্য শ্রমবিভাগ না থাকলে সে শ্রম কিছুই নয়, এবং তার কাজও আবার ঐ শ্রমবিভাগকে **সুসম্পূর্ণ** করা।

পণ্যকে যদি আমরা **মূল্য হিসাবে** বিবেচনা করি তবে আমরা তাকে কেবল **মূর্ত, নির্দিষ্ট** অথবা বলা যায় **ঘনীভূত সামাজিক শ্রম** — এই একটা দিক থেকেই বিচার করি। এই দিক থেকে তাদের ভিতরে **পার্থক্য হতে** পারে কেবল তাদের মধ্যে নিহিত

কম বা বেশি পরিমাণ শ্রম দিয়ে। যেমন একটা ইঁটের চেয়ে রেশমী রুমালের মধ্যে হয়ত বেশি পরিমাণ শ্রম নিহিত হয়েছে। কিন্তু **শ্রমের পরিমাণ** কী করে মাপা যায়? **যতক্ষণ শ্রম চলল সেই সময়টা দিয়ে,** ঘণ্টা, দিন প্রভৃতির মাপে শ্রমকে পরিমাপ করেই। অবশ্য এই মাপকাঠি প্রয়োগ করতে গেলে বিভিন্ন রকমের শ্রমকে দাঁড় করাতে হয় তাদের একক হিসাবে গড়পড়তা বা সরল শ্রমে।

তাই এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হচ্ছি: পণ্যের **মূল্য** থাকে, কারণ তা **সামাজিক শ্রমের ঘনীভূত রূপ।** তার মূল্যের, অর্থাৎ **আপেক্ষিক** মূল্যের **বিপুলতা** নির্ভর করে তার অন্তর্নিহিত এই সামাজিক সারবস্তুর পরিমাণের কমবেশির ওপরে, অর্থাৎ তার উৎপাদনের জন্য যে শ্রম লাগে তার আপেক্ষিক পরিমাণের ওপরে। সুতরাং **পণ্যসমূহের আপেক্ষিক মূল্য যথাক্রমে তাদের মধ্যে নিযুক্ত, মূর্ত, নির্দিষ্ট শ্রমের পরিমাপ** বা **পরিমাণের** দ্বারাই নির্ধারিত হয়। **একই শ্রম-সময়ের মধ্যে** বিভিন্ন পণ্যের **যথাক্রমে** যে পরিমাণ উৎপন্ন হয় তা **সমান।** অথবা কোনো দুই পণ্যের মূল্যের অনুপাত যথাক্রমে তাদের মধ্যে নিহিত শ্রম-পরিমাণের অনুপাতের সমান।

আমার আশঙ্কা আছে আপনাদের মধ্যে অনেকেই প্রশ্ন করবেন: তাহলে **মজুরি** দ্বারা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এবং তার উৎপাদনের জন্য যে **আপেক্ষিক পরিমাণ শ্রম** লাগে তার দ্বারা নির্ধারণ এই দুয়ের মধ্যে কি বাস্তবিকই অত বিপুল, অথবা আদৌ কোনো পার্থক্য আছে? আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, শ্রমের **পারিশ্রমিক** ও শ্রমের **পরিমাণ** হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, এক কোয়ার্টার গম ও এক আউন্স সোনায় **সমান পরিমাণ শ্রম** নিহিত আছে। আমি এ দৃষ্টান্ত নিচ্ছি কারণ বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন ১৭২৯ সালে প্রকাশিত 'কাগজী মুদ্রার প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান' শীর্ষক তাঁর প্রথম প্রবন্ধে এটি ব্যবহার করেন; মূল্যের সত্যকার প্রকৃতি যাঁরা সবার আগে ধরতে পেরেছিলেন তিনি তাঁদের একজন। যাই হোক, আমরা তাহলে ধরে নিচ্ছি যে, এক কোয়ার্টার গম ও এক আউন্স সোনা **সমান মূল্যের** বা **তুল্যমূল্য,** কারণ তারা হচ্ছে **সমান পরিমাণ গড়পড়তা শ্রমের ঘনীভূত রূপ,** তাদের মধ্যে যথাক্রমে অত ঘণ্টা বা অত সপ্তাহের শ্রম নিবদ্ধ রয়েছে। সোনা ও শস্যের আপেক্ষিক মূল্য এইভাবে নির্ধারণের সময়ে আমরা কি কোনক্রমে কৃষি-মজুর ও খনি-মজুরের মজুরির কথা টেনে আনছি? মোটেই না। রোজকার বা সপ্তাহের শ্রমের দরুন **কী ভাবে** তাদের পাওনা দেওয়া হয়েছিল অথবা মজুরি-শ্রম আদৌ নিয়োগ করা হয়েছিল কিনা — এসব আমরা সম্পূর্ণ **অনির্ধারিত** রাখছি। মজুরি-শ্রম নিয়োগ করা হলেও মজুরি খুবই অসমান থাকতে পারে। এক কোয়ার্টার গমের মধ্যে যে মজুরের শ্রম রূপ পেয়েছে সে হয়ত পেয়েছে মাত্র দু'বুশেল গম আর খনিতে নিযুক্ত মজুরের জুটে থাকতে পারে ঐ এক আউন্স সোনার আধখানা। অথবা তাদের মজুরি সমান

ধরলে সে-মজুরি তাদের উৎপন্ন পণ্যের মূল্য থেকে সর্ববিধসম্ভব অনুপাতে বিভিন্ন হতে পারে। এক কোয়ার্টার গম বা এক আউন্স সোনার অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-পঞ্চমাংশ অথবা অন্য যে কোনো আনুপাতিক অংশ হতে পারে ঐ মজুরি। অবশ্য তাদের **মজুরি** তারা যে পণ্য উৎপাদন করছে তার মূল্যকে **ছাপিয়ে যেতে** বা তার থেকে **বেশি** হতে পারে না, কিন্তু তার থেকে **কম** হতে পারে সম্ভাব্য সবরকম মাত্রায়। উৎপন্ন সামগ্রীর **মূল্য** দিয়ে তাদের **মজুরি সীমাবদ্ধ** হবে, কিন্তু মজুরি দিয়ে **তাদের উৎপন্নের মূল্য** সীমাবদ্ধ হবে না। আর সর্বোপরি মূল্য, উদাহরণস্বরূপ শস্য ও সোনার আপেক্ষিক মূল্য স্থির হবে নিহিত শ্রমের মূল্য অর্থাৎ **মজুরির** সাথে কোনরকম সম্পর্ক না রেখেই। যে **আপেক্ষিক পরিমাণ শ্রম তাদের মধ্যে বিধৃত আছে** তাই দিয়ে পণ্যসমূহের মূল্য বিচার হল শ্রমের মূল্য বা **মজুরি** দিয়ে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের যে একই কথা বলার পদ্ধতি রয়েছে তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই ব্যাপারটা অবশ্য পরে এই আলোচনা প্রসঙ্গে আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

কোনো পণ্যের বিনিময়-মূল্য নিরূপণের সময় **সর্বশেষে** যে শ্রম নিয়োগ করা হল তার পরিমাণের সঙ্গে পণ্যের কাঁচামালের ভিতরে **ইতিপূর্বেই** যে শ্রম বিধৃত রয়েছে এবং যে সব সরঞ্জাম, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও বাড়িঘরের সহায়তা নিয়ে ঐ শ্রম করা হয়েছে তাদের মধ্যে নিহিত শ্রমের পরিমাণটাও যোগ দিতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতোর মূল্য হল সুতোকাটা প্রক্রিয়ায় তুলার মধ্যে যে পরিমাণ শ্রম যোগ করা হল, তুলার নিজের ভিতরেই ইতিপূর্বে যে পরিমাণ শ্রম মূর্ত ছিল, কয়লা, বা তেল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে সব সামগ্রী ব্যবহার হয়েছে তাদের ভিতরে যে পরিমাণ শ্রম মূর্ত রয়েছে, বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও টাকু বা কারখানাঘর প্রভৃতিতে যে পরিমাণ শ্রম নিবদ্ধ রয়েছে, এ সব কিছু শ্রমের ঘনীভূত রূপ। সঠিকভাবে যাকে উৎপাদনের উপকরণ বলা হয়, যেমন হাতিয়ারপত্র. যন্ত্রপাতি, ভবন, উৎপাদনের পৌনঃপুনিক প্রক্রিয়ায় কম বা বেশি কাল ধরে এগুলো বারবার ব্যবহৃত হয়। কাঁচামালের মতো এগুলি যদি এক দফাতেই ব্যবহৃত হয়ে যেত তাহলে যে সব পণ্য উৎপাদনে এরা সহায়তা করে তাদের মধ্যে এদের সমগ্র মূল্যই হয়ে যেত সঞ্চারিত। কিন্তু, দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেহেতু একটি টাকু ক্রমশ ক্ষয় পায় তাই তার গড় আয়ুষ্কালের উপরে ভিত্তি করে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, ধরুন একদিনে তার মোটামুটি ক্ষয়ক্ষতি বাবদ অপচয়ের উপরে ভিত্তি করে একটা গড়পড়তা হিসাব করা হয়। এইভাবে আমরা হিসাব করি প্রতিদিন যে সুতো কাটা হয় তার মধ্যে টাকুর কতটা মূল্য সঞ্চারিত হচ্ছে, এবং ধরুন এক পাউন্ড সুতোর মধ্যে যে মোট পরিমাণ শ্রম বিধৃত থাকে তার মধ্যে কতটা অংশ উক্ত টাকুটির মধ্যে নিহিত শ্রম পরিমাণ থেকে পাওয়া গেল। আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এ ব্যাপার নিয়ে আর বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

মনে হতে পারে যে পণ্যের মূল্য যদি **তার উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ শ্রম বিধৃত হয়েছে** তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় তাহলে মানুষ যত কুড়ে বা যত বেশি আনাড়ি হবে তার পণ্যও তত মূল্যবান হবে, কারণ পণ্য তৈরি করতে পরিশ্রমের সময় তার বেশি লাগবে। এটা অবশ্য একটা শোচনীয় ভুল। আপনাদের হয়ত মনে আছে যে আমি এর আগে **'সামাজিক শ্রম'** কথাটি ব্যবহার করেছি এবং **'সামাজিক'** এই বৈশিষ্ট্য আরোপের মধ্যে অনেক কথাই নিহিত আছে। পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তার মধ্যে যে **পরিমাণ শ্রম** বিধৃত বা ঘনীভূত রয়েছে তার দ্বারাই — একথা বলতে তাই সমাজের একটা নির্দিষ্ট অবস্থায়, উৎপাদনের কতকগুলি নির্দিষ্ট সামাজিক গড়পড়তা পরিস্থিতিতে, বিশেষ এক সামাজিক গড়পড়তা প্রখরতায়, এবং নিয়োজিত শ্রমের গড়পড়তা দক্ষতার সাহায্যে পণ্য উৎপাদনে যে **পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন** হয় তার কথা বোঝাচ্ছি। ইংলণ্ডে হাতে-চালানো তাঁতের সঙ্গে কলের তাঁত যখন পাল্লা দিয়ে এল, তখন একটা বিশেষ পরিমাণ সুতোকে এক গজ কাপড়ে পরিণত করতে আগে যতক্ষণ শ্রম করতে হত তার মাত্র অর্ধেক সময়ের প্রয়োজন হল। অবশ্য হাতে-চালানো তাঁতের তাঁতী বেচারাকে আগে যেখানে নয়-দশ ঘণ্টা কাজ করলেই চলত এখন সেখানে দিনে সতেরো-আঠারো ঘণ্টা খাটতে হল। তবুও তার নিজস্ব শ্রমের বিশ ঘণ্টার ফল এখন মাত্র দশ ঘণ্টা সামাজিক শ্রমের, অর্থাৎ এক বিশেষ পরিমাণ সুতোকে কাপড়ে পরিণত করতে সামাজিকভাবে আবশ্যিক দশ ঘণ্টা শ্রমের তুল্য হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং তার বিশ ঘণ্টার শ্রমের ফলের এখন যা মূল্য সেটা পূর্বেকার দশ ঘণ্টা শ্রমের ফলের চেয়ে বেশি নয়।

অতএব পণ্যে যে পরিমাণ সামাজিকভাবে আবশ্যিক শ্রম মূর্ত হয়েছে তাই যদি তার বিনিময়-মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে কোনো পণ্য উৎপাদনে আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তার মূল্যও বৃদ্ধি পাবে, আর তা হ্রাস পেলে মূল্যও হ্রাস পাবে।

বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য যথাক্রমে আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণ যদি স্থির থাকে তাহলে তাদের আপেক্ষিক মূল্যও স্থির থাকবে। কিন্তু তা ঘটে না। নিয়োজিত শ্রমের উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে পণ্য উৎপাদনের পক্ষে আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণও ক্রমাগত বদলাতে থাকে। শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যত বেশি হবে, এক বিশেষ শ্রম-সময়ের মধ্যে তত বেশি জিনিস উৎপন্ন হবে: আর শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যত কম হবে, সেই সময়ের মধ্যে জিনিস তত কম তৈরি হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিগুলি চাষ করার দরকার পড়ে তাহলে একই পরিমাণ ফসল পাওয়া যেতে পারে কেবল বেশি পরিমাণে শ্রম করেই, আর কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্যও তার ফলে বেড়ে যাবে। অন্যদিকে আধুনিক উৎপাদনের উপায়ের সাহায্যে একদিনের শ্রমে একজন সুতোকাটুনী যদি ঐ একই সময়ে চরকায় কাটা সুতোর

বহু হাজার গুণ সুতো কাটতে পারে, তাহলে এটাও পরিষ্কার যে, প্রতি পাউণ্ড তুলায় আগের থেকে বহু হাজার গুণ কম সুতোকাটুনী শ্রম নিহিত থাকবে, কাজেই প্রতি পাউণ্ড তুলোর সঙ্গে সুতো কাটার ফলে যে মূল্য যুক্ত হবে তা আগের তুলনায় হাজার ভাগ কম। সুতোর মূল্যও পড়ে যাবে সেই অনুপাতে।

বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম স্বাভাবিক কর্মশক্তি ও অর্জিত কর্মদক্ষতার কথা বাদ দিলে শ্রমের উৎপাদন-শক্তি প্রধানত নির্ভর করবে:

প্রথমত, শ্রমের **প্রাকৃতিক** অবস্থার উপরে, যেমন জমির উর্বরতা, খনির সমৃদ্ধি ইত্যাদি:

দ্বিতীয়ত, **শ্রমের সামাজিক শক্তির** ক্রমান্বয় উন্নতিসাধনের ওপর, যা আসে বিপুল মাত্রায় উৎপাদন, পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও শ্রমের সংযোজন, শ্রমের বিভাজন, যন্ত্রের প্রয়োগ, উন্নত পদ্ধতি, রাসায়নিক ও অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার, যোগাযোগ ও পরিবহণের ফলে দেশ ও কালের সংকোচন, এবং আর যেসব কৌশলে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তিকে শ্রমের কাজে লাগায় ও যাতে শ্রমের সামাজিক ও সমবায়ী চরিত্র বিকশিত হয়, তা থেকে। শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যত বেশী হয়, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন সামগ্রীর উপর ব্যয় হয় তত কম শ্রম। কাজেই সেই সামগ্রীর মূল্যও ততই কম হবে। শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যত কম হয় সম পরিমাণ উৎপন্ন সামগ্রী তত বেশি শ্রমসাধ্য হয়ে পড়ে। কাজেই ততই বেশী হয় তার মূল্য। একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে তাই আমরা বলতে পারি:

পণ্যের মূল্য নির্ণীত হয় তার উৎপাদনে যতটা শ্রম-সময় প্রযুক্ত হয় তার সাক্ষাৎ অনুপাতে এবং প্রযুক্ত শ্রমের উৎপাদন-শক্তির বিপরীত অনুপাতে।

এতক্ষণ পর্যন্ত শুধু **মূল্যের** কথা বলার পরে এবার আমি **দাম** সম্পর্কে কয়েকটি কথা যোগ করব। দাম হচ্ছে মূল্যেরই একটি বিশেষ রূপ।

স্বতন্ত্রভাবে দেখলে **দাম মূল্যের মুদ্রাগত অভিব্যক্তি** ছাড়া আর কিছু নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এ দেশে সমস্ত পণ্যের মূল্য সোনার দামের মারফৎ প্রকাশ পায় আর ইউরোপীয় ভূখণ্ডে তার প্রকাশ প্রধানত রূপার দামের মারফৎ। অন্যান্য পণ্যের মতো সোনা বা রূপার মূল্যও নিয়ন্ত্রিত হয় তা আহরণের জন্য যে শ্রম লাগে তার পরিমাণ দ্বারাই। আপনাদের দেশের উৎপন্নের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ যার মধ্যে দেশবাসীদের শ্রমেরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘনীভূত রয়েছে, তা আপনারা বিনিময় করছেন সোনা ও রূপা উৎপাদনকারী অন্য দেশের উৎপন্নের সঙ্গে, যার মধ্যে ঘনীভূত রয়েছে **তাদের** শ্রমেরও নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ। এইভাবেই আসলে দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমেই আপনারা সমস্ত পণ্যের মূল্যকে অর্থাৎ ঐসব পণ্যের উপরে যথাক্রমে যে শ্রম প্রযুক্ত হয়েছে তাকে, সোনা ও রূপায় প্রকাশ করতে শেখেন। **মূল্যের মুদ্রাগত প্রকাশ** বা অন্য কথায় মূল্যের দামে রূপান্তরের ব্যাপারটিকে একটু তলিয়ে দেখলে আপনারা বুঝবেন যে, সেটা হচ্ছে

এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা আপনি সমস্ত পণ্যের **মূল্যকে** একটা **স্বাধীন** ও **সমমাত্রিক রূপ** দিচ্ছেন, অথবা যার দ্বারা আপনি তাদের প্রকাশ করছেন সমান সামাজিক শ্রমের বিভিন্ন পরিমাণরূপে। এই পর্যন্ত যেহেতু দাম হচ্ছে মূল্যের মুদ্রাগত প্রকাশ মাত্র, সেহেতু অ্যাডাম স্মিথ তাকে বলেছেন **স্বাভাবিক দাম,** ফরাসী ফিজিওক্রাটরা বলেছেন **আবশ্যিক দাম** (*prix nécessaire*)।

মূল্য ও বাজার-দর অথবা **স্বাভাবিক দাম** ও **বাজার-দরের** মধ্যে সম্পর্কটা তাহলে কী? আপনারা সবাই জানেন, ব্যক্তিগত উৎপাদকের উৎপাদনের অবস্থায় যতই তারতম্য থাকুক না কেন, একই ধরনের সমস্ত পণ্যের **বাজার-দর একই।** উৎপাদনের গড়পড়তা পরিস্থিতিতে, বাজারে একটি বিশেষ সামগ্রী নির্দিষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করার জন্য **সামাজিক শ্রমের** যে **গড়পড়তা পরিমাণ** প্রয়োজন হয়, বাজার-দর তাকেই প্রকাশ করে। নির্দিষ্ট ধরনের কোনো পণ্যের সমগ্র পরিমাণের উপরেই এই হিসাব করা হয়।

একটা পণ্যের **বাজার-দর** আর তার **মূল্য** এই পর্যন্ত একই। অন্যদিকে মূল্য বা স্বাভাবিক দামের কখনও উপরে, কখনও বা নিচে বাজার-দরের যে উঠতি-পড়তি, তা যোগান ও চাহিদার ওঠানামার ওপরেই নির্ভরশীল। মূল্য থেকে বাজার-দর অনবরত বিচ্যুত হয়ে চলে, কিন্তু অ্যাডাম স্মিথের কথা অনুসারে 'স্বাভাবিক দাম হচ্ছে... কেন্দ্রীয় দাম, যার দিকে সমস্ত পণ্যের দাম ক্রমাগতই আকর্ষিত হচ্ছে। নানা আকস্মিক ঘটনা কখনও কখনও দামকে ঐ কেন্দ্রীয় দামের বহু উপরে উঠিয়ে দিতে পারে, কখনও বা এমন কি তার কিছুটা নিচেও নামিয়ে দিতে পারে। কিন্তু স্থিরতা ও অপরিবর্তনীয়তার এই কেন্দ্রে স্থিতিলাভ করার পথে যে প্রতিবন্ধকই ব্যাহত করুক না কেন, ওরই দিকে দামের অবিরত আকর্ষণ।'*

এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের অবকাশ নেই। শুধু এই কথা বলাই যথেষ্ট যে, **যদি** যোগান ও চাহিদা পরস্পরের ভারসাম্য ঘটায়, তাহলে পণ্যের বাজার-দর তার স্বাভাবিক দাম অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য আবশ্যিক শ্রমের যথাক্রমিক পরিমাণের দ্বারা নির্ধারিত যে মূল্য তারই অনুরূপ হবে। কিন্তু যোগান ও চাহিদা পরস্পরের মধ্যে ভারসাম্য ঘটাবার চেষ্টা **করবেই** যদিও তা করবে মাত্র এক ধরনের বিচ্যুতিকে আর এক ধরনের বিচ্যুতি দিয়ে ক্ষতিপূরণ করে, উঠতিকে পড়তি দিয়ে এবং পড়তিকে উঠতি দিয়ে। শুধু রোজকার উঠতি-পড়তি বিচারের বদলে আপনারা যদি দীর্ঘতর কাল জুড়ে বাজার-দরের গতি বিশ্লেষণ করেন, যেমন করেছেন মিঃ টুক তাঁর **'দামের ইতিহাস'** গ্রন্থে, তাহলে দেখবেন যে, বাজার-দরের হ্রাসবৃদ্ধি, মূল্য থেকে তাদের বিচ্যুতি, তাদের

* Adam Smith, *The Wealth of Nations,* Book I, Chap. VII, p. 57, New York 1931. — সম্পাঃ

ওঠানামা পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে ও পরস্পরের ক্ষতিপূরণ করে। কাজেই একচেটিয়া শিল্পের ফলাফল ও আরো কয়েকটি ব্যতিক্রমের প্রসঙ্গ যা আমাকে আপাতত এড়িয়ে যেতে হচ্ছে তাদের বাদ দিলে, সব ধরনের পণ্যই গড়ে তাদের নিজ নিজ **মূল্যে** বা স্বাভাবিক দামেই বিক্রয় হয়। যে গড়পড়তা কালের মধ্যে বাজার-দরের উঠতি-পড়তি পরস্পরের কাটাকুটি করে যায় তা ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র, কারণ চাহিদার সঙ্গে যোগান খাপ খাওয়ানো কোনো একটা পণ্যের পক্ষে সহজ, কোনো পণ্যের পক্ষে কঠিন।

কাজেই মোটামুটিভাবে এবং কিছুটা দীর্ঘতর কাল হিসাবে ধরলে যদি বলা চলে সবরকমের পণ্য তাদের আপন আপন মূল্যেই বিক্রয় হয়, তাহলে বিশেষ কোনো একটি ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন ব্যবসায়ের নিয়মিত ও স্বাভাবিক মুনাফা উদ্ভূত হয় পণ্যের দাম **বাড়িয়ে** অথবা **মূল্যের** তুলনায় উচ্চতর দামে তাকে বিক্রয় করে — একথা ভাবা অর্থহীন। সামগ্রিকভাবে উপস্থিত করলে এ ধারণার অসম্ভাব্যতা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। বিক্রেতা হিসাবে লোকে অনবরত যা লাভ করতে থাকবে, সমান অনবরত তাই লোকসান দেবে ক্রেতা হিসাবে। একথা বললে চলবে না যে, এমন মানুষ আছে যারা বিক্রেতা নয়, শুধুই ক্রেতা বা উৎপাদক নয়, শুধুই ভোক্তা। এই লোকেরা উৎপাদকদের যা দিয়ে থাকে তা প্রথমে উৎপাদকদের কাছ থেকেই বিনা প্রতিদানেই তাদের পাওয়া চাই। যদি কোনো লোক প্রথমে আপনার টাকা নেয় ও পরে আপনার পণ্য কিনতে গিয়ে সেই টাকাই ফেরৎ দেয়, তাহলে আপনি ঐ লোকের কাছে পণ্য অতিরিক্ত চড়া দামে বিক্রয় করে কখনই বড়লোক হতে পারবেন না। এই ধরনের লেনদেন হয়তো লোকসান কমাতে পারে, কিন্তু কখনও মুনাফা কামাতে সহায়তা করবে না।

সুতরাং **মুনাফার সাধারণ প্রকৃতি** ব্যাখ্যা করতে গেলে আপনাকে শুরু করতে হবে এই সূত্র থেকেই যে, গড়পড়তা হিসাবে পণ্য **বিক্রয় হয় তার আসল মূল্যে** এবং **পণ্যকে তার মূল্যে** অর্থাৎ তার মধ্যে যে পরিমাণ শ্রম নিহিত রয়েছে সেই অনুপাতে **বিক্রি করেই মুনাফা অর্জিত হয়!** এই কথাটি মেনে নিয়ে যদি আপনি মুনাফার হেতু নির্ধারণ না করতে পারেন তাহলে কোনদিনই আপনি তার হদিশ পাবেন না। কথাটা আপাতবিরোধী ও প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার পরিপন্থী বোধ হয়। পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে আর জল যে দুটি ভীষণ দাহ্য বাষ্প দিয়ে গড়া এও তো আপাতবিরোধী। পদার্থের বিভ্রান্তিকর বাহ্যরূপটাই শুধু ধরা পড়ে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায়, তাই সেই অভিজ্ঞতার দৃষ্টি থেকে বৈজ্ঞানিক সত্য তো সর্বদাই আপাতবিরোধী।

৭। শ্রম করবার শক্তি*

তাড়াহুড়ো করে যতটা সম্ভব তারমধ্যে **মূল্যের, যে কোনও পণ্যের মূল্যের** প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার পর এখন আমাদের নজর ফেরাতে হবে বিশেষ করে **শ্রমের মূল্যের** দিকে। আর এখানেও আবার এক আপাতবিরোধী বক্তব্য দিয়ে আপনাদের চমকে দিতে হবে। আপনাদের সকলেরই নিশ্চিত ধারণা এই যে, প্রত্যহ শ্রমিকেরা যা বিক্রয় করে তা হচ্ছে তাদের শ্রম, তাই শ্রমের একটা দাম আছে আর যেহেতু পণ্যের দাম শুধু তার মূল্যের মুদ্রাগত অভিব্যক্তি, তাই **শ্রমের মূল্য** বলেও নিশ্চয় একটা জিনিস আছে। কিন্তু সাধারণভাবে কথাটি যে অর্থে গ্রহণ করা হয়, সেভাবে **শ্রমের মূল্য** বলে কোনো জিনিসই নেই। আমরা দেখেছি পণ্যের মধ্যে যে পরিমাণ প্রয়োজনীয় শ্রম ঘনীভূত থাকে তাই হল তার মূল্য। এখন, মূল্য সম্পর্কে এই ধারণা প্রয়োগ করে কী করে আমরা, ধরুন, দশ ঘণ্টা খাটুনির রোজের মূল্য বিচার করব? ঐ রোজের ভিতর কতটা শ্রম আছে? দশ ঘণ্টার শ্রম। দশ ঘণ্টার খাটুনির রোজের মূল্য দশ ঘণ্টার শ্রম বা তার মধ্যে নিহিত শ্রমের পরিমাণ একথা বলা মানে কেবল একই কথা ঘুরিয়ে বলা এবং তদুপরি একটা অর্থহীন কথা বলার সামিল। অবশ্য **'শ্রমের মূল্য'** কথাটির প্রকৃত অথচ প্রচ্ছন্ন অর্থটি একবার ধরতে পারলে আমরা মূল্যের এই অযৌক্তিক আপাত-অসম্ভব প্রয়োগের ব্যাখ্যা করতে পারব, ঠিক যেমন নভোচারী গ্রহ নক্ষত্রের প্রকৃত গতি সম্পর্কে একবার নিশ্চিত হতে পারলে আমরা তাদের আপাতগোচর অথবা কেবল পরিদৃশ্যমান গতিবিধিরও ব্যাখ্যা করতে পারি।

শ্রমিক যা বিক্রয় করে তা সরাসরি তার **শ্রম** নয়, বরং তার **শ্রম করবার শক্তি,** সাময়িকভাবে সেটা সে তুলে দেয় পুঁজিপতির হাতে। ব্যাপারটা এতই সঠিক যে, ইংরাজী আইনে আছে কিনা জানি না, কিন্তু কোনও কোনও ইউরোপীয় আইন অনুসারে তো বটেই, একজন মানুষ কতক্ষণ তার শ্রম করবার শক্তি বেচতে পারবে তার **ঊর্ধ্বতম সময়** নির্দেশ করা আছে। যে কোনো অনির্দিষ্ট কালের জন্য শ্রম করবার শক্তি বিক্রয় মঞ্জুর করা মাত্রই সেটা হবে দাসত্ব প্রথার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই বিক্রয় যদি জীবদ্দশা পর্যন্ত ধরা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক এতে মালিকের আজীবন ক্রীতদাস হয়ে পড়বে।

ইংলণ্ডের প্রাচীনতম অর্থতাত্ত্বিক ও সর্বাপেক্ষা মৌলিক চিন্তার দার্শনিকদের অন্যতম টমাস হব্স্ ইতিপূর্বেই তাঁর 'লেভিয়াথান' নামক গ্রন্থে পরবর্তী সমস্ত পণ্ডিতদের দ্বারা উপেক্ষিত এই ব্যাপারটিকে সহজ বুদ্ধির বলে আঁচ করে যান। তিনি

* 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রামাণ্য ইংরেজী অনুবাদে 'শ্রমশক্তি' কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে। — সম্পাঃ

বলেন, 'অন্যান্য জিনিসের মতো **মানুষের মূল্য বা কদর** হচ্ছে তার যা দাম, অর্থাৎ **তার শক্তি ব্যবহারের** জন্য তাকে যতটা দেওয়া হবে তাই।'

এই ভিত্তি থেকে শুরু করলে আমরা অন্যান্য পণ্যের মতো **শ্রমের মূল্যও** স্থির করতে পারি।

কিন্তু তা করার আগে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি: বাজারে যে চোখে পড়ে একদিকে একদল ক্রেতা যারা জমি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও জীবনধারণের উপকরণাদি, যার মধ্যে অনাবাদী জমি ছাড়া বাকি সবই হল **শ্রমোৎপন্ন জিনিস**, এ সমস্ত কিছুরই মালিক, এবং অন্যদিকে অপর একদল বিক্রেতা, যাদের শ্রম করবার শক্তি, খাটবার দু-খানা হাত ও মাথা ছাড়া বেচবার মতো আর কিছুই নেই — এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটে কী করে? একটি দল মুনাফা লুটবার ও বড়লোক হবার জন্য ক্রমাগত কিনছে আর অপর দলটি জীবিকা অর্জনের জন্য ক্রমাগত বেচছে — এ কেমন ঘটনা? এই প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধানের অর্থ হচ্ছে অর্থতাত্ত্বিকেরা যাকে বলেন **'পূর্ববর্তী বা আদি সঞ্চয়'**, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যাকে বলা উচিত **আদি লুণ্ঠন**, তার সম্পর্কে অনুসন্ধান। আমরা দেখতে পাব যে, এই তথাকথিত **আদি সঞ্চয়** এমন কতগুলি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয় যার ফল হল মেহনতী মানুষের সঙ্গে তার শ্রমের উপকরণের **আদি ঐক্যের ভাঙন।** সে অনুসন্ধান অবশ্য আমার বর্তমান বিচার্য বিষয়ের বাইরে। মেহনতী মানুষ এবং তার শ্রমের উপকরণের ভিতরকার **বিচ্ছেদ** একবার কায়েম হয়ে যাবার পর সে অবস্থা চালু থাকবে আর ক্রমবর্ধমান মাত্রায় তার ব্যাপকতা বেড়ে চলবে, যতদিন না উৎপাদন-পদ্ধতিতে নূতন ও মূলগত এক বিপ্লব আবার তাকে উলটিয়ে দেয় এবং নতুন এক ঐতিহাসিক রূপে সেই আদি ঐক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটায়।

শ্রম করবার শক্তির মূল্য তাহলে কী?

অন্য যে কোনো পণ্যের মতোই এর মূল্য নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনের জন্য আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণ দ্বারাই। মানুষের শ্রম করবার শক্তির অস্তিত্ব শুধু তার জীবন্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যেই। বেড়ে ওঠা ও বেঁচে থাকার জন্যই মানুষকে কতকগুলি আবশ্যিক দ্রব্যাদি ভোগ করতেই হয়। কিন্তু মানুষও যন্ত্রের মতোই জীর্ণ হয়ে যাবে এবং তার জায়গায় অন্য মানুষকে নিতে হবে। **তার নিজের** জীবনধারণের জন্য যে পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন তা ছাড়াও শ্রমের বাজারে তার স্থান গ্রহণ এবং শ্রমিকদের বংশ রক্ষা করতে পারে এমন কিছু সংখ্যক সন্তান পালনের জন্য সে চায় আরও কিছু পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদি। তাছাড়া তার শ্রম করবার শক্তির উন্নয়ন ঘটাতে ও নির্দিষ্ট একটা দক্ষতা অর্জন করতে হলে আরও কিছু পরিমাণ মূল্য খরচ করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে শুধুমাত্র **গড়পড়তা** শ্রমের বিচারই যথেষ্ট, যার মধ্যে শিক্ষণ ও উন্নয়নের খরচটা নগণ্য পরিমাণ। তবু এই উপলক্ষের সুযোগে আমি

বলতে চাই যে, যেমন বিভিন্ন গুণাগুণের শ্রম করবার শক্তি উৎপাদনের খরচও বিভিন্ন, তেমনই বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত শ্রম করবার শক্তির মূল্যও ভিন্ন হতে বাধ্য। **সমান মজুরির** জন্য সোরগোলটা তাই একটা ভ্রান্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, সে হল **এমন এক নির্বোধ** কামনা যা কখনও **সার্থক হবার নয়**। এই দাবি আসছে সেই মিথ্যা ও ভাসাভাসা এক র‍্যাডিকালপনা থেকে যা হেতুভিত্তিটা মানে, কিন্তু তার সিদ্ধান্ত এড়াবার চেষ্টা করে। মজুরি-প্রথার ভিত্তিতে শ্রম করবার শক্তির মূল্য অন্য যে-কোনো পণ্যের মূল্যের মতো একই পদ্ধতিতে স্থির হয়, আর যেহেতু বিভিন্ন ধরনের শ্রম করবার শক্তির মূল্য বিভিন্ন, অর্থাৎ তা উৎপন্নের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ শ্রম প্রয়োজন, তাই শ্রমের বাজারে তারা অবশ্যই বিভিন্ন দাম **পাবেই**। দাসপ্রথার ভিত্তিতে **স্বাধীনতার** জন্য গলাবাজি করাও যা, মজুরি-প্রথার ভিত্তিতে **সমান এমন কি ন্যায্য পারিশ্রমিকের** জন্য হৈচৈ করাও তাই। আপনি কাকে ঠিক বা ন্যায্য বলে মনে করেন সে প্রশ্ন অবান্তর। প্রশ্ন হচ্ছে: একটা নির্দিষ্ট উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোনটা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য?

যা বলা হল তার থেকে দেখা যাবে যে, **শ্রম করবার শক্তির মূল্য** নির্ধারিত হয় সেই শ্রম করবার শক্তির উৎপাদন, উন্নয়ন, পোষণ ও ধারারক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় **আবশ্যিক দ্রব্যাদির মূল্যের** দ্বারাই।

৮। উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদন

এখন ধরুন, একজন শ্রমিকের গড়ে প্রতিদিন যে পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন তার উৎপাদনের জন্য **ছয় ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম** লাগে। এও ধরে নিন যে, ৩ শিলিং পরিমাণ সোনার মধ্যেও নিহিত রয়েছে ছয় ঘণ্টা গড়পড়তা শ্রম। তাহলে ঐ মানুষটির **শ্রম করবার শক্তির প্রাত্যহিক মূল্যের দাম** বা মুদ্রাগত রূপ হচ্ছে ৩ শিলিং। সে প্রতিদিন যদি ছয় ঘণ্টা খাটে তাহলে প্রতিদিন গড়ে তার যে পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদি প্রয়োজন ঠিক ততটা ক্রয়ের মতো, অর্থাৎ মেহনতী হিসাবে নিজেকে বজায় রাখার মতো মূল্য সে উৎপন্ন করতে পারে।

কিন্তু আমাদের এই মানুষটি হচ্ছে মজুরি-খাটা শ্রমিক। কাজেই পুঁজিপতির কাছে তাকে তার শ্রম করবার শক্তি বিক্রি করতেই হবে। সে যদি রোজ ৩ শিলিং-এ অথবা সপ্তাহে ১৮ শিলিং-এ শ্রম করবার শক্তি বেচে তবে সে প্রকৃত মূল্যেই তা বেচবে। ধরুন, সে একজন সুতোকাটুনী। প্রতিদিন যদি সে ছ'ঘণ্টা খাটে তাহলে তুলার সঙ্গে সে রোজ ৩ শিলিং মূল্য যোগ করবে। এইভাবে প্রতিদিন সে যে মূল্য যোগাবে তা হবে সে প্রতিদিন যে মজুরি অথবা শ্রম করবার শক্তির দাম পাচ্ছে ঠিক তার সমান।

কিন্তু সেক্ষেত্রে কোনও **উদ্বৃত্ত মূল্য** বা **উদ্বৃত্ত উৎপন্ন** পুঁজিপতির হাতে যাবে না। এইখানেই হল মুশকিল।

মজুরের শ্রম করবার শক্তি কেনার ও তার মূল্য দেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য যে কোনো ক্রেতার মতোই পুঁজিপতি ক্রীত পণ্যকে ভোগ বা ব্যবহার করার অধিকার অর্জন করেছে। যন্ত্র চালিয়েই যেমন আপনি যন্ত্রকে ভোগ বা ব্যবহার করতে পারেন, তেমনি মানুষকে খাটিয়েই আপনি ভোগ বা ব্যবহার করেন তার শ্রম করবার শক্তিকে। সুতরাং মজুরের শ্রম করবার শক্তির প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক মূল্য দিয়ে পুঁজিপতি **গোটা দিন বা সপ্তাহ** জুড়ে তাকে ব্যবহার অর্থাৎ খাটাবার অধিকার অর্জন করেছে। অবশ্য শ্রম-দিবস, শ্রম-সপ্তাহের কতগুলি সীমা আছে, পরে আমরা আরো ভাল করে সেদিকে নজর দেব।

বর্তমানে একটি চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপারের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

শ্রম করবার শক্তির **মূল্য** তার পরিপোষণ বা পুনরুৎপাদনের জন্য আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণের দ্বারাই নির্ধারিত হয়, কিন্তু সেই শ্রম করবার শক্তির **ব্যবহার** কেবল শ্রমিকের সক্রিয় কর্মক্ষমতা ও শারীরিক শক্তি দিয়েই সীমায়িত। শ্রম করবার শক্তির প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক **মূল্য** ঐ শক্তির প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক **প্রয়োগের** থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার, ঠিক যেমন ঘোড়ার যে খাদ্য দরকার আর যে সময় ধরে সে আরোহীকে বয়ে বেড়াতে পারে, এ দুটো হচ্ছে একেবারেই আলাদা জিনিস। শ্রম করবার শক্তির **মূল্য** যে পরিমাণ শ্রমের দ্বারা সীমাবদ্ধ সেটা কখনই তার সেই শক্তি যে পরিমাণ শ্রম করতে সক্ষম তার সীমা নির্ধারণ করে না। আমাদের সুতোকাটুনীর দৃষ্টান্তই নিন। আমরা দেখেছি যে, প্রতিদিন তার শ্রম করবার শক্তি পুনরুৎপাদনের জন্য তাকে প্রতিদিনই তিন শিলিং মূল্য পুনরুৎপাদন করতে হবে, প্রতিদিন ছ'ঘণ্টা খেটেই সে তা করতে পারে। অথচ এর ফলে প্রতিদিন দশ বারো বা আরো বেশি ঘণ্টা খাটতে সে অপারগ হয়ে পড়ে না। কিন্তু সুতোকাটুনীর শ্রম করবার শক্তির প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক **মূল্য** দিয়ে পুঁজিপতি **গোটা দিন বা সপ্তাহ** জুড়ে সেই শক্তি ব্যবহারের অধিকার অর্জন করেছে। কাজেই সে তাকে, ধরুন, রোজ **বারো** ঘণ্টা খাটাবে। মজুরি হিসাবে তাকে যা দেওয়া হয় তা তুলে নেবার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছ'ঘণ্টার **ওপরেও** অর্থাৎ তার শ্রম করবার শক্তির মূল্যের **ওপরেও** তাই তাকে **আরো ছ-ঘণ্টা** খাটতে হবে; সময়টাকে আমি বলব **উদ্বৃত্ত শ্রমের** ঘণ্টা, এ উদ্বৃত্ত শ্রম আবার **উদ্বৃত্ত মূল্য** ও **উদ্বৃত্ত উৎপন্নের** মধ্যে রূপায়িত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের সুতোকাটুনী যদি তার দৈনন্দিন ছ-ঘণ্টা শ্রমের ফলে তুলার সঙ্গে তিন শিলিং মূল্য যোগ করে থাকে, যে মূল্য হচ্ছে ঠিক তার মজুরির সমান, তাহলে বারো ঘণ্টায় সে তুলার সঙ্গে ছ-শিলিং মূল্য যোগ করবে এবং **সেই**

অনুপাতে বাড়তি সুতো তৈরী করবে। কিন্তু সে তার শ্রম করবার শক্তি পুঁজিপতিকে বেচেছে বলে তার উৎপন্নের সমগ্র মূল্য যাবে পুঁজিপতির কাছে, তার শ্রম করবার শক্তির তৎকালীন মালিকের মালিকানায়। তিন শিলিং আগাম দিয়ে পুঁজিপতি তাই ছ-শিলিং মূল্য উশুল করবে, কারণ ছ-ঘণ্টার শ্রম ঘনীভূত হয়েছে এমন মূল্য আগাম দিয়ে পুঁজিপতি তার বদলে পাচ্ছে এমন একটা মূল্য যার ভিতরে রূপ লাভ করেছে বারো ঘণ্টার শ্রম। প্রতিদিন এই একই প্রক্রিয়া চালিয়ে পুঁজিপতি রোজ আগাম দেবে তিন শিলিং আর রোজ পকেটে পুরবে ছ-শিলিং যার অর্ধেক যাবে ফের মজুরি দেবার জন্য, আর বাকি অর্ধেক হবে **উদ্বৃত্ত মূল্য,** যার বদলে পুঁজিপতিকে কোনো প্রতিমূল্য দিতে হবে না। **পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে এই ধরনের বিনিময়ের** উপরেই প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী উৎপাদন বা মজুরি ব্যবস্থা এবং এই থেকেই মজুরের মজুর হিসাবে আর পুঁজিপতির পুঁজিপতি হিসাবে অবিরাম পুনরুৎপাদন হতে থাকে।

বাকি সমস্ত অবস্থা যথাপূর্ব থাকলে **উদ্বৃত্ত মূল্যের হার** নির্ভর করবে শ্রম করবার শক্তির মূল্য পুনরুৎপাদনের জন্য শ্রম-দিবসের যে অংশটি প্রয়োজন তার সঙ্গে পুঁজিপতির জন্য যে **উদ্বৃত্ত সময়** বা **উদ্বৃত্ত শ্রম** দেওয়া হয় তার অনুপাতের ওপরেই। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে মজুর তার শ্রম করবার শক্তির মূল্য পুনঃসৃষ্টি করে বা তার মজুরি পরিশোধ করে, **তার ওপরেও শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য যে হারে বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে** সেই হারের উপর তা নির্ভর করবে।

৯। শ্রমের মূল্য

এবার আমাদের ফিরতে হবে **'শ্রমের মূল্য বা দাম'** কথাটিতে।

আমরা দেখেছি যে, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু শ্রম করবার শক্তির মূল্য যা মাপা হয় ঐ শক্তিকে পরিপোষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য দিয়ে। কিন্তু যেহেতু মজুর তার মজুরি পায় শ্রম সম্পাদনের **পরে,** তাছাড়া এও সে জানে যে, পুঁজিপতিকে আসলে যা সে দিচ্ছে তা হল তার শ্রম, সেহেতু তার শ্রম করবার শক্তির মূল্য বা দাম তার কাছে স্বভাবতই প্রতিভাত হয় **তার শ্রমেরই দাম** বা **মূল্য** হিসাবে। তার শ্রম করবার শক্তির দাম যদি হয় তিন শিলিং যার ভিতরে নিবদ্ধ থাকছে ছ-ঘণ্টার শ্রম আর যদি সে খাটে বারো ঘণ্টা জুড়ে, তাহলে স্বভাবতই তার মনে হয় যে এই তিন শিলিংই হচ্ছে তার বারো ঘণ্টা শ্রমের মূল্য বা দাম, যদিও তার ঐ বারো ঘণ্টার শ্রম রূপ লাভ করছে ছ-শিলিং মূল্যের মধ্যে। এর থেকে দু-রকম ফলাফলের উদ্ভব হয়:

প্রথমত, **শ্রম করবার শক্তির মূল্য বা দাম, শ্রমেরই দাম বা মূল্যের** আকারে প্রতিভাত হয়, যদিও সঠিকভাবে বলতে গেলে শ্রমের মূল্য ও দাম কথাটা অর্থহীন।

দ্বিতীয়ত, যদিও মজুরের প্রতিদিনকার শ্রমের একটি অংশের জন্যই শুধু তাকে **পারিশ্রমিক দেওয়া হয়** ও অপর অংশের জন্য তাকে **কিছুই দেওয়া হয় না**, আর যদিও ঠিক ঐ বিনা পয়সার উদ্বৃত্ত শ্রম থেকেই সেই তহবিল গড়ে ওঠে যার থেকে আসে **উদ্বৃত্ত মূল্য** বা **মুনাফা**, তবু মনে হয় মোট শ্রমের জন্যই বুঝি পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে।

এই ভ্রান্ত প্রতীতিই শ্রমের অন্যান্য **ঐতিহাসিক** রূপগুলি থেকে **মজুরি-শ্রমকে** একটা বিভিন্নতা দান করে। মজুরি-প্রথার ভিত্তিতে এমন কি **পারিশ্রমিকহীন** শ্রমকেও **পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত** শ্রম বলে বোধ হয়। উল্টোদিকে **ক্রীতদাসের** বেলায় তার শ্রমের যে অংশটির জন্য তাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, মনে হয় যেন তার জন্যও তাকে কিছুই দেওয়া হয়নি। কাজ করতে গেলে অবশ্যই ক্রীতদাসকে বাঁচতে হবে, তাই তার শ্রম-দিবসের একাংশ তার নিজের জীবনধারণের মূল্য সংস্থান করতেই যায়। কিন্তু তার ও তার প্রভুর মধ্যে যেহেতু কোনো লেনদেন হয়নি, এবং দু-পক্ষের মধ্যে যেহেতু ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার চলে না, তাই মনে হয় যেন তার সমস্ত শ্রমের বদলে বুঝি সে কিছুই পেল না।

অন্যদিকে, বলতে পারি এই সেদিন অবধি গোটা পূর্ব ইউরোপে যার অস্তিত্ব ছিল সেই কৃষক-ভূমিদাসের কথাটা ধরুন। এই কৃষক-ভূমিদাস তার নিজের বা বরাদ্দ জমিটুকুতে নিজের জন্য তিন দিন কাজ করত, আর পরের তিন দিন তাকে তার প্রভুর জমিদারিতে বাধ্যতামূলকভাবে ও বিনা মজুরিতে বেগার খাটতে হত। এক্ষেত্রে তাই শ্রমের পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত অংশ ও পারিশ্রমিকহীন অংশ যুক্তিভাবে, স্থান কাল হিসাবে পৃথক করা হয়েছে; তাই আমাদের উদারপন্থীরা মানুষকে বেগার খাটানোর এই যুক্তিলেশহীন ব্যাপারে নৈতিক ক্রোধে উদ্বেল হয়ে উঠতেন।

একজন মানুষের সপ্তাহে তিন দিন নিজের জন্য নিজের জমিতে ও তিন দিন বিনা পারিশ্রমিকে প্রভুর জমিতে কাজ করা, আর ফ্যাক্টরি বা কারখানায় রোজ ছ'ঘণ্টা নিজের জন্য ও ছ'ঘণ্টা মালিকের জন্য খাটা — আসলে এ দুটো কিন্তু একই ব্যাপার, যদিও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্রমের পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ও পারিশ্রমিকহীন অংশ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মেশানো থাকে আর গোটা লেনদেনের চরিত্রটি সম্পূর্ণ গোপন থাকে একটি **চুক্তির মধ্যস্থতা** ও সপ্তাহান্তিক **বেতনের** আড়ালে। পারিশ্রমিকহীন খাটুনি একক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক ও অপরক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বলে বোধ হয়। এইটুকুই যা তফাৎ।

'শ্রমের মূল্য' কথাটা আমি **'শ্রম করবার শক্তির মূল্যের'** শুধু একটা বহু প্রচলিত, আটপৌরে প্রতিশব্দ হিসাবেই ব্যবহার করব।

১০। পণ্যকে তার যথা মূল্যে বিক্রি করে মুনাফা মেলে

ধরুন এক ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম ছ-পেনি মূল্যের ভিতরে অর্থাৎ বারো ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম ছ-শিলিং-এর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। আরো ধরা যাক, শ্রমের মূল্য হচ্ছে তিন শিলিং অথবা ছ-ঘণ্টার শ্রমের উৎপন্ন। এখন যদি পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে চব্বিশ ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম রূপায়িত হয়ে থাকে তাহলে সে সবের মূল্য হল বারো শিলিং। এর উপরে যদি পুঁজিপতি কর্তৃক নিযুক্ত মজুর উৎপাদনের ঐ সব উপায়ের সঙ্গে বারো ঘণ্টার শ্রম যোগ করে, তাহলে ঐ বারো ঘণ্টা আরো ছ-শিলিং মূল্যের মধ্যে রূপ লাভ করবে। **উৎপন্নের সামগ্রিক মূল্য** তাহলে দাঁড়াবে ছত্রিশ ঘণ্টার রূপায়িত শ্রম বা আঠারো শিলিং-এর সমান। কিন্তু মজুরের শ্রমের মূল্য বা মজুরি তিন শিলিং মাত্র হওয়াতে মজুর ছ'ঘণ্টা ধরে যে উদ্বৃত্ত শ্রম করল এবং যে শ্রম পণ্যের মূল্যের মধ্যে রূপ পেল, তার বদলে পুঁজিপতিকে কোনো প্রতিমূল্য দিতে হল না। এই পণ্যটিকে তার যথা মূল্য — আঠারো শিলিং-এ বিক্রি করে পুঁজিপতি তাই তিন শিলিং মূল্য উশুল করবে — যার বদলে সে প্রতিমূল্য কিছুই দেয়নি। এই তিন শিলিংই হবে উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফা যা যাবে তারই পকেটে। ফলে পুঁজিপতি তিন শিলিং মুনাফা করবে পণ্যটিকে তার মূল্যের চেয়ে **বেশী** দরে বিক্রি করে নয়, তাকে **তার যথার্থ মূল্যে** বিক্রি করেই।

পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তার ভিতরে যে **শ্রম** বিধৃত থাকে তার **সমগ্র পরিমাণের** দ্বারাই। কিন্তু শ্রমের ঐ পরিমাণের এক অংশ রূপায়িত হচ্ছে একটি মূল্যের ভিতরে যার তুল্যমূল্য মজুরি রূপে দেওয়া হয়েছে, আর একটি অংশ উশুল হচ্ছে এক মূল্যের ভিতরে যার জন্য **কোনো** তুল্যমূল্য দেওয়া **হয়নি**। পণ্যের ভিতরে যে শ্রম রয়েছে তার এক অংশ হচ্ছে **পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত** শ্রম, আরেক অংশ হচ্ছে **পারিশ্রমিকহীন** শ্রম। কাজেই পণ্যকে **তার মূল্যে** অর্থাৎ তার মধ্যে নিবদ্ধ **শ্রমের গোটা পরিমাণের** ঘনীভূত রূপ হিসাবে বিক্রি করে পুঁজিপতি নিশ্চয়ই মুনাফা রেখেই তা বেচতে পারে। যার জন্য পুঁজিপতিকে তুল্যমূল্য দিতে হয়েছে শুধু তাই নয়, যার জন্য তার মজুরকে গতর খাটাতে হলেও নিজেকে কিছুই দিতে হয়নি তাও সে বিক্রি করে। পণ্যের জন্য পুঁজিপতি যে খরচটা করল ও আসলে যে খরচ হল এ দুটো আলাদা ব্যাপার। তাই আবার বলি, স্বাভাবিক ও গড়পড়তা মুনাফা আসে পণ্যকে তার মূল্যের চাইতে **বেশি** মূল্যে নয়, **তার যথার্থ মূল্যে** বিক্রি করেই।

১১। বিভিন্ন অংশে উদ্বৃত্ত মূল্যের বাঁটোয়ারা

উদ্বৃত্ত মূল্য, অর্থাৎ সমগ্র পণ্য-মূল্যের সেই অংশ যার ভিতরে মজুরের **উদ্বৃত্ত** বা **পারিশ্রমিকহীন শ্রম** রূপ পেয়েছে, তাকেই আমি বলি **মুনাফা**। সেই মুনাফার সবটাই নিয়োগকর্তা পুঁজিপতির পকেটে যায় না। কৃষি, নির্মাণ, রেলপথ অথবা অন্য যে কোনো উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যেই জমি ব্যবহৃত হোক না কেন, জমির ওপরে একচেটিয়া থাকায় ভূস্বামী **খাজনা** এই নামে **উদ্বৃত্ত মূল্যের** একাংশ হস্তগত করতে পারে। অন্যদিকে **শ্রমের উপকরণসমূহ** অধিকারে থাকে বলেই নিয়োগকারী পুঁজিপতি **উদ্বৃত্ত মূল্য** উৎপাদন করতে পারে অর্থাৎ অন্য কথায় **পারিশ্রমিকহীন শ্রমের একটা অংশ আত্মসাৎ করতে** পারে, তাই শ্রমের উপকরণসমূহের যে মালিক নিয়োগকারী পুঁজিপতিকে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ঐসব উপকরণ ধার দেয় — অর্থাৎ এক কথায় মহাজনী পুঁজিপতি — **সুদ** নাম দিয়ে ঐ উদ্বৃত্ত মূল্যের আর এক অংশ নিজের বলে দাবি করতে পারে। ফলে **নিছক** নিয়োগকারী পুঁজিপতির জন্য যা বাকি থাকে তাকে বলা হয় **শিল্পগত** বা **কারবারী** মুনাফা।

এই তিন ধরনের লোকের মধ্যে গোটা উদ্বৃত্ত মূল্যের এই ভাগাভাগি কোন নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এ প্রশ্ন একেবারেই আমাদের বিষয় বহির্ভূত। তবু যা বলা হয়েছে তার থেকে অন্তত এটুকু বেরিয়ে আসে:

খাজনা, সুদ ও শিল্পগত মুনাফা হচ্ছে পণ্যের **উদ্বৃত্ত মূল্যের** অথবা **পণ্যের ভিতরে নিবদ্ধ পারিশ্রমিকহীন শ্রমের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম** মাত্র এবং **এই উৎস থেকে, কেবল মাত্র এই উৎস থেকেই একইভাবে** এগুলির **উদ্ভব**। নিছক জমি থেকে বা নিছক **পুঁজি** থেকেই তারা উদ্ভূত নয়। কিন্তু নিয়োগকারী পুঁজিপতি মজুরের কাছ থেকে যে উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করে নেয়, তাতেই জমি ও পুঁজি মালিকরা নিজ নিজ ভাগ বসাতে সমর্থ হয় তাদের জমি ও পুঁজির জোরে। মজুরের উদ্বৃত্ত শ্রম বা পারিশ্রমিকহীন শ্রম থেকে উদ্ভূত উদ্বৃত্ত মূল্য সবটাই সাক্ষাৎ নিয়োগকারী পুঁজিপতির পকেটে গেল কিংবা শেষোক্ত লোকটি খাজনা ও সুদের খাতে তার কিছু অংশ তৃতীয় পক্ষের হাতে দিতে বাধ্য হল — মজুরের নিজের কাছে এর গুরুত্ব নিতান্তই গৌণ। ধরুন, নিয়োগকারী পুঁজিপতি শুধু তার নিজের পুঁজি ব্যবহার করছে ও সে নিজেই নিজের ভূস্বামী, তাহলে সমগ্র উদ্বৃত্ত মূল্যই যাবে তারই পকেটে।

নিয়োগকারী পুঁজিপতিই মজুরের কাছ থেকে সাক্ষাৎভাবে ঐ উদ্বৃত্ত মূল্য উশুল করে, তা শেষ পর্যন্ত তার যতটা অংশই সে নিজের হাতে রাখতে পারুক না কেন। সুতরাং নিয়োগকারী পুঁজিপতি ও মজুরি-খাটা শ্রমিকের মধ্যেকার এই সম্পর্কের ওপরেই সমগ্র মজুরি-প্রথা ও গোটা বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা নির্ভর করছে। আমাদের

বিতর্কে যে নাগরিকেরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যাপারটাকে হাল্কা করতে চেষ্টা করে এবং নিয়োগকারী পুঁজিপতি ও মজুরের ভিতরকার এই মূল সম্পর্ককে গৌণ প্রশ্ন হিসাবে দেখে তাই ভুল করেছেন, যদিও বর্তমান অবস্থায় দামের বৃদ্ধি ঘটলে তার প্রভাব যে সাক্ষাৎ নিয়োগকারী পুঁজিপতি, ভূস্বামী, মহাজনী পুঁজিপতি এবং, বলতে পারেন, ট্যাক্স আদায়কারীর ওপরেও খুবই অসমান মাত্রায় পড়তে পারে, একথা তাঁরা ঠিক বলেছিলেন।

যা বলা হল তার থেকে আর একটি সিদ্ধান্ত এসে পড়ছে।

পণ্য-মূল্যের সেই অংশ যা কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, এক কথায় উৎপাদনের উপায়াদি যতটা ব্যবহৃত হয়েছে ততটার মূল্যেরই সমান, সেটা কোনো **আয় নয়,** তা **শুধু পুঁজির স্থান পূরণ করে।** কিন্তু সে কথা বাদ দিলেও পণ্য-মূল্যের অপর যে অংশটা **হল আয়,** অর্থাৎ যা মজুরি, মুনাফা, খাজনা, সুদ রূপে খরচ হয়, তা মজুরির মূল্য, খাজনার মূল্য, মুনাফার মূল্য প্রভৃতি দিয়ে **গঠিত হয়** এ কথাটা ভুল। গোড়ায় আমরা মজুরির কথা ছেড়ে দেব এবং শুধু শিল্পগত মুনাফা, সুদ ও খাজনার আলোচনাই করব। আমরা একটু আগেই দেখেছি যে পণ্যের মধ্যে নিবদ্ধ **উদ্বৃত্ত মূল্য,** অথবা তার মূল্যের সেই অংশ যার মধ্যে বিধৃত হয়েছে **পারিশ্রমিকহীন শ্রম,** তা তিনটি বিভিন্ন নামের ভিন্ন ভিন্ন ভগ্নাংশে বিভক্ত হয়। কিন্তু **এই তিন উপাদানের স্বতন্ত্র মূল্যের সমষ্টিই** হল সে মূল্য, অথবা তাদের **যোগফলের** দ্বারাই সে মূল্য **গঠিত হয়** -- এ কথা বললে পুরোপুরিই সত্যের বিপরীত কথা বলা হবে।

এক ঘণ্টার শ্রম যদি ছ-পেনি মূল্যের ভিতরে রূপ পায়, মজুরের শ্রম-দিবস যদি হয় বারো ঘণ্টার, এর অর্ধেকটা সময় যদি হয় পারিশ্রমিকহীন শ্রম, তাহলে পণ্যের সঙ্গে ঐ উদ্বৃত্ত শ্রম যোগ করবে তিন শিলিং পরিমাণ **উদ্বৃত্ত মূল্য,** অর্থাৎ সেই মূল্য যার বদলে প্রতিমূল্য কিছু দেওয়া হয়নি। তিন শিলিংএর এই উদ্বৃত্ত মূল্যই হল সেই **মোট তহবিল** যেটুকু নিয়োগকারী পুঁজিপতি, যে অনুপাতেই হোক না কেন, ভূস্বামী ও মহাজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে পারে। যে মূল্যটা তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করতে পারে তার সীমা হল এই তিন শিলিং। নিয়োগকারী পুঁজিপতিই পণ্য-মূল্যের সঙ্গে স্বীয় মুনাফা বাবদ খুশিমতো একটা মূল্য যোগ করল আর একটা মূল্য যোগ করা হল ভূস্বামী বাবদ, এবং এই ভাবে চালিয়ে খুশিমতো নির্ধারিত মূল্যগুলির যোগফল হল মোট মূল্য — ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। তাই, তিনটি অংশে একটি **নির্দিষ্ট মূল্যের বিভাগকে** তিনটি **স্বাধীন** মূল্যের যোগফল দ্বারা সেই মূল্যটির **গঠন** বলে ভুল করা, এবং এইভাবে যে মোট মূল্য থেকে খাজনা, মুনাফা ও সুদ আসছে তাকে একটা খুশিমতো নির্ধারিত পরিমাণে পরিণত করার প্রচলিত ধারণাটির যুক্তি বিভ্রম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।

পুঁজিপতি যে মোট মুনাফা কামাল তা যদি ১০০ পাউণ্ডের সমান হয় তাহলে **অনপেক্ষ** রাশি হিসাবে দেখে এই সংখ্যাকে আমরা বলি **মুনাফার পরিমাণ**। কিন্তু ঐ ১০০ পাউণ্ডের সঙ্গে যে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছে তার অনুপাতের যদি আমরা হিসাব করি তাহলে এই **আপেক্ষিক** পরিমাণকে আমরা বলি **মুনাফার হার**। স্পষ্টতই এই মুনাফার হার দু-ভাবে প্রকাশ করা চলে।

ধরা যাক, **মজুরি বাবদ আগাম দেওয়া** পুঁজি হচ্ছে ১০০ পাউণ্ড। যে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয়েছে তাও ধরুন ১০০ পাউণ্ড অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, মজুরের শ্রম-দিবসের অর্ধেকটা **পারিশ্রমিকহীন** শ্রম। এখন ঐ মুনাফাকে যদি আমরা মজুরি বাবদ আগাম দেওয়া পুঁজির মূল্য দিয়েই পরিমাপ করি তাহলে আমাদের বলতে হবে যে, **মুনাফার হার** হচ্ছে শতকরা একশ, কারণ যে মূল্য আগাম দেওয়া হয়েছে তা হল একশ আর যে মূল্য পাওয়া গেল তা হল দুইশত।

অপর পক্ষে যদি আমরা শুধু **মজুরি বাবদ আগাম দেওয়া পুঁজি** নয়, বরং আগাম ঢালা **মোট পুঁজির** কথাই ধরি, দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন ৫০০ পাউণ্ড, যার মধ্যে ৪০০ পাউণ্ড যাচ্ছে কাঁচামাল, মেশিন প্রভৃতির মূল্য বাবদ, তাহলে আমরা বলব যে, **মুনাফার হার** হচ্ছে শতকরা কুড়ি ভাগ মাত্র, কারণ একশ পাউণ্ড মুনাফা হল বিনিয়োগ-করা **মোট** পুঁজির এক-পঞ্চমাংশ মাত্র।

মুনাফার হার প্রকাশের শুধু প্রথম পদ্ধতিটি থেকেই পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ও পারিশ্রমিকহীন শ্রমের প্রকৃত অনুপাত, অর্থাৎ **শ্রম** *exploitation*-এর (এই ফরাসী শব্দটি ব্যবহারের অনুমতি নিতে হচ্ছে) যথার্থ মাত্রা আমরা দেখতে পাই। প্রকাশের অন্য পদ্ধতিটিই সচরাচর ব্যবহৃত হয় এবং কোনো বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে তা সত্যই উপযোগী। অন্তত মজুরের কাছ থেকে পুঁজিপতি বিনা মজুরিব শ্রম কী হারে আদায় করছে তা গোপন রাখার পক্ষে এটা খুবই উপযুক্ত।

বাকি বক্তব্যে আমি বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে উদ্বৃত্ত মূল্য ভাগাভাগির হিসাব না করে পুঁজিপতি যে মোট উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করে সেই সবখানির জন্যই **মুনাফা** শব্দটি ব্যবহার করব আর **মুনাফার হার** কথাটি ব্যবহারের সময়ে সর্বদাই মুনাফার পরিমাপ করব মজুরি বাবদ আগাম দেওয়া পুঁজির মূল্য দিয়েই।

১২। মুনাফা, মজুরি ও দামের সাধারণ সম্পর্ক

একটি পণ্যের মূল্য থেকে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায়ের মূল্যটা বাদ দিন, অর্থাৎ যে মূল্য পণ্যের মধ্যে বিধৃত **অতীতের** শ্রমকে প্রকাশ করে তা বাদ দিন, যেটা বাকি রইল সেটা হল **সর্বশেষে** নিযুক্ত মজুরের যোগ করা **শ্রম**। ঐ মজুর

যদি দিনে বারো ঘণ্টা কাজ করে, বারো ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম যদি ছয় শিলিং-এর সমান পরিমাণ সোনার মধ্যে ঘনীভূত হয়, তবে এই ছ-শিলিং পরিমাণ অতিরিক্ত মূল্যই হচ্ছে **একমাত্র** মূল্য যা তার শ্রমের সৃষ্টি। তার শ্রমের সময়ের দ্বারা নির্ধারিত এই নির্দিষ্ট মূল্যটাই হচ্ছে একমাত্র ভাণ্ডার যার থেকে মজুর ও পুঁজিপতি উভয়েই তাদের নিজের নিজের ভাগ বা পাওনা নিতে পারে — একমাত্র মূল্য যা বণ্টিত হবে মজুরি ও মুনাফায়। দু-পক্ষের মধ্যে নানা রকম অনুপাতে তা ভাগ করা যায়, কিন্তু তার দ্বারা খাস মূল্যটার যে কোনো বদল হয় না তা স্পষ্টই। একজন শ্রমিকের জায়গায় যদি আপনি সমগ্র শ্রমিক জনসংখ্যাকে ধরেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি শ্রম-দিবসের জায়গায় যদি এক কোটি বিশ লক্ষ শ্রম-দিবস নেন, তাহলেও হিসাবে পরিবর্তন হবে না।

যেহেতু এই সীমাবদ্ধ মূল্য, অর্থাৎ যেটুকু মূল্যের পরিমাপ হল মজুরের মোট শ্রম, সেটুকুই শুধু পুঁজিপতি ও মজুর ভাগাভাগি করে নিতে পারে তাই এক পক্ষ যত বেশি পায়, অন্য পক্ষ পায় তত কম, আর এক পক্ষ যত কম পায় অন্য পক্ষ তত বেশি পায়। পরিমাণটা নির্দিষ্ট থাকলে তার এক অংশ বাড়বে অপর অংশ কমার যথাযথ অনুপাতে। মজুরির যদি পরিবর্তন হয় তাহলে মুনাফার পরিবর্তন ঘটবে উল্টো দিকে। মজুরি কমলে মুনাফা বাড়বে আর মজুরি বাড়লে মুনাফা কমবে। আমরা আগে যে রকম ধরেছিলাম সেই হিসাবে মজুর যদি পায় তিন শিলিং, অর্থাৎ সে যে মূল্য সৃষ্টি করেছে তার অর্ধেকের সমান, অথবা তার সমস্ত শ্রম-দিবস যদি হয় অর্ধেক পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত, অর্ধেক পারিশ্রমিকহীন শ্রম নিয়ে গঠিত, তাহলে **মুনাফার হার** হবে শতকরা ১০০, কারণ পুঁজিপতিও পাচ্ছে তিন শিলিং। মজুর যদি পায় মাত্র দু-শিলিং, অর্থাৎ যদি সে সমস্ত দিনের তিনভাগের একভাগ মাত্র খাটে নিজের জন্য, তাহলে পুঁজিপতি পাবে চার শিলিং এবং মুনাফার হার হবে শতকরা ২০০। মজুর যদি পায় চার শিলিং, পুঁজিপতি পাবে মাত্র দু-শিলিং এবং মুনাফার হার কমে দাঁড়াবে শতকরা ৫০। কিন্তু এসব বাড়তি-কমতির কোনো প্রভাব পড়বে না পণ্য-মূল্যের উপরে। সুতরাং মজুরি সাধারণভাবে বাড়লে তার ফলে মুনাফার সাধারণ হার কমবে, কিন্তু মূল্যের উপরে তার কোনো প্রভাব পড়বে না।

শেষ পর্যন্ত বাজার-দর যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে পণ্যের সেই মূল্য যদিও একমাত্র তার ভিতরে বিধৃত শ্রমের মোট পরিমাণ দিয়েই নির্ধারিত হয়, ঐ পরিমাণের মধ্যে পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ও পারিশ্রমিকহীন শ্রমের ভাগাভাগি দিয়ে নয়, তবু তার থেকে এটা মোটেই ধরা চলে না যে, বারো ঘণ্টায় উৎপন্ন একই পণ্য বা নানা পণ্যের মূল্য একরকমই থাকবে। একটা নির্দিষ্ট কালের বা নির্দিষ্ট পরিমাণের শ্রম দ্বারা **কতগুলি** বা কী পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন হবে, তা নির্ভর করে নিয়োজিত শ্রমের **উৎপাদন-শক্তির** উপরে, তার **প্রসার** বা দৈর্ঘ্যের উপরে নয়। সুতোকাটুনীর শ্রমের উৎপাদন-শক্তির এক ধরনের মাত্রায়

ধরুন বারো ঘণ্টা শ্রমের ফলে একদিনে বারো পাউন্ড সুতা তৈরি হতে পারে, কম মাত্রার উৎপাদন-শক্তিতে হয়ত হবে মাত্র দু-পাউন্ড। যদি তাই বারো ঘণ্টার গড়পড়তা শ্রম ছয় শিলিং মূল্যে পরিণতি লাভ করে তাহলে একক্ষেত্রে বারো পাউন্ড সুতোর দাম হবে ছয় শিলিং, অন্যক্ষেত্রে দু-পাউন্ডের দামও হবে ছয় শিলিং। তাই এককক্ষেত্রে এক পাউন্ড সুতোর দাম হবে ছয় পেনি, অন্যক্ষেত্রে — তিন শিলিং। দামের এই পার্থক্য ঘটছে যে শ্রম নিয়োগ করা হয়েছে তার উৎপাদন-শক্তির তারতম্যের দরুন। বেশী উৎপাদন-শক্তির ক্ষেত্রে যেখানে এক ঘণ্টার শ্রম এক পাউন্ড সুতোয় রূপায়িত হবে সেখানে কম উৎপাদন-শক্তির বেলায় ছয় ঘণ্টার শ্রমের পরিণতি হবে সেই এক পাউন্ড সুতো। এককক্ষেত্রে মজুরি অপেক্ষাকৃত বেশী ও মুনাফার হার কম হলেও এক পাউন্ড সুতোর দাম হবে মোটে ছয় পেনি, অন্যক্ষেত্রটিতে মজুরি কম ও মুনাফার হার বেশি হলেও তার দাম হবে তিন শিলিং। এ রকমটা হবে তার কারণ এক পাউন্ড সুতোর দাম তার মধ্যে **মোট যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করা হয়েছে** তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এ **মোট পরিমাণ শ্রমটা** কী **অনুপাতে পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ও পারিশ্রমিকহীন শ্রমে বিভক্ত** তার দ্বারা নয়। তাই চড়া দামের শ্রমেও সস্তা এবং সস্তা দামের শ্রমেও চড়া দামের পণ্য উৎপন্ন করা যায় এই যে কথাটা আগে বলেছি তার আপাতবিরোধী চেহারাটা আর থাকে না। এই সাধারণ নিয়মটিরই তা অভিব্যক্তি যে পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় তার মধ্যে নিহিত শ্রম দিয়ে এবং বিধৃত শ্রমের পরিমাণ নির্ভর করে নিযুক্ত শ্রমের উৎপাদন-শক্তির ওপর আর তাই তা শ্রমোৎপাদিকা শক্তির প্রতিটি বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়।

১৩। মজুরি-বৃদ্ধির জন্য বা মজুরি-হ্রাস প্রতিরোধের জন্য প্রচেষ্টার প্রধান প্রধান দৃষ্টান্ত

মজুরি-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অথবা মজুরি-হ্রাসের প্রতিরোধ যে যে ক্ষেত্রে ঘটে তার প্রধান প্রধান দৃষ্টান্ত এবার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যাক।

১। আমরা দেখেছি যে **শ্রম করবার শক্তির মূল্য** বা আরো চলতি ভাষায় **শ্রমের মূল্য** তার উৎপাদনের জন্য যে সব আবশ্যিক দ্রব্যাদি লাগে তাদের মূল্য বা তাদের উৎপাদনোপযোগী শ্রম-পরিমাণ দ্বারাই নির্ধারিত হয়। তাহলে কোনো একটি বিশেষ দেশে একজন মজুরের প্রতিদিন গড়ে যে সব আবশ্যিক দ্রব্যাদি লাগে তার মূল্য যদি তিন শিলিং-এ প্রকাশিত ছয় ঘণ্টা শ্রমের সমান হয় তাহলে মজুরকে প্রতিদিনকার জীবনধারণের সমগ্র পরিমাণ জিনিস তৈরী করতে হলে রোজ খাটতে হবে ছ-ঘণ্টা। পুরো খাটুনির রোজ যদি হয় বারো ঘণ্টা তাহলে পুঁজিপতি তাকে তিন শিলিং দিলেই তার শ্রমের মূল্য দেওয়া হবে। শ্রম-দিবসের অর্ধেক হবে পারিশ্রমিকহীন শ্রম আর মুনাফার

হার দাঁড়াবে শতকরা ১০০ ভাগ। এখন ধরা যাক উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসের ফলে একই **পরিমাণ** কৃষিজাত সামগ্রী তৈরী করতে বেশি শ্রমের দরকার পড়েছে, যার ফলে গড়পড়তা আবশ্যিক দ্রব্যাদির দাম তিন শিলিং থেকে চার শিলিং-এ উঠেছে। সেক্ষেত্রে শ্রমের **মূল্য** তিনভাগের একভাগ বা শতকরা ৩৩⅓ ভাগ বাড়বে। তার পুরানো জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী মজুরের প্রতিদিনকার জীবনধারণের সমপরিমাণ জিনিসের উৎপাদনে লাগবে শ্রম-দিবসের আট ঘণ্টা। উদ্বৃত্ত শ্রম তাই ছয় থেকে চার ঘণ্টায় নামবে আর মুনাফার হার নামবে শতকরা ১০০ থেকে ৫০-এ। আর মজুরি-বৃদ্ধির দাবি তুলে মজুর **তার শ্রমের বর্ধিত মূল্যই** শুধু দাবি করবে, যেমন যে কোনও পণ্য বিক্রেতা তার পণ্য তৈরীর খরচা বেড়ে গেলে সেই বর্ধিত মূল্যটা পাবার চেষ্টা করে। আবশ্যিক দ্রব্যাদির বর্ধিত মূল্যে পোষাবার মতো মজুরি যদি না বাড়ে অথবা যথেষ্ট না বাড়ে তাহলে শ্রমের **দাম নেমে** যাবে **শ্রমের মূল্যের** নিচে আর অবনতি ঘটবে মজুরের জীবনযাত্রার মানে।

উল্টো দিকেও কিন্তু পরিবর্তন সম্ভব। শ্রমের বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তির ফলে একই পরিমাণ গড়পড়তা আবশ্যিক দ্রব্যাদি তিন শিলিং থেকে দু-শিলিং-এ নেমে আসতে পারে অথবা ছ-ঘণ্টার বদলে খাটুনির রোজের মাত্র চার ঘণ্টা লাগতে পারে আবশ্যিক দ্রব্যাদির তুল্যমূল্য পুনরুৎপাদনে। মজুরটি আগে তিন শিলিং দিয়ে যে পরিমাণ আবশ্যিক দ্রব্যাদি কিনত এখন দু-শিলিং-এই তাই কিনতে পারবে। বাস্তবিকই **শ্রমের মূল্য** যাবে কমে, কিন্তু সেই হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে আগে যা পাওয়া যেত তার সমপরিমাণ পণ্যই মিলবে। মুনাফা তখন তিন থেকে চার শিলিং-এ উঠবে আর মুনাফার হার চড়বে শতকরা ১০০ ভাগ থেকে ২০০-তে। যদিও মজুরের অনপেক্ষ জীবনযাত্রার মান একই থাকবে তবু পুঁজিপতির তুলনায় তার **আপেক্ষিক** মজুরি ও সেই সঙ্গে তার **আপেক্ষিক সামাজিক স্থান** নেমে যাবে। মজুর যদি এই আপেক্ষিক মজুরি-হ্রাসে বাধা দেয় তাহলে সে শুধু তারই নিজের বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তির একটা অংশ পাবার এবং সামাজিক ক্রমবিন্যাসে তার সাবেকী আপেক্ষিক স্থান বজায় রাখবারই চেষ্টা করবে। এইভাবে 'শস্য আইন' বাতিল হওয়ার পর শস্য আইন-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে সগাম্ভীর্যে যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ঘোরতরভাবে তা লঙ্ঘন করে ইংরেজ কারখানা মালিকেরা সাধারণভাবে শতকরা দশ ভাগ মজুরি কমিয়ে দেয়। গোড়ার দিকে মজুরদের প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু যে শতকরা দশ ভাগ খোয়া গিয়েছিল পরে তা আবার ফিরে পাওয়া যায়. কী অবস্থাচক্রের ফলে তা আপাতত আলোচনা করছি না।

২। আবশ্যিক দ্রব্যাদির **মূল্য** ও তার ফলে **শ্রমের মূল্য** একই থাকতে পারে, কিন্তু আগেই **মুদ্রার মূল্যের** যে **অদলবদল** ঘটেছে তার ফলে ঐ সব সামগ্রীর **মুদ্রা-দামে** পরিবর্তন ঘটতে পারে।

আরো বেশি স্বর্ণগর্ভা খনি আবিষ্কারাদির ফলে ধরুন দু'আউন্স সোনা তৈরী

করতে যা শ্রম পড়ছে তা আগে এক আউন্সে যা পড়ত তার চেয়ে বেশি নয়। সোনার **মূল্য** তাহলে অর্ধেক অথবা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমে যাবে। অন্য সমস্ত পণ্যের **মূল্য** তখন যেমন তাদের আগেকার **মুদ্রা-দামের** দ্বিগুণ সংখ্যায় প্রকাশ পাবে, **শ্রমের মূল্যের** বেলায় ঠিক তাই হবে। বারো ঘণ্টার শ্রম আগে যেখানে ছ-শিলিং-এ প্রকাশ পেত এখন সেখানে লাগবে বারো শিলিং। মজুরের মজুরি যদি ছ-শিলিং-এ না উঠে তিন শিলিংই থেকে যায় তাহলে **তার শ্রমের মুদ্রা-দাম তার শ্রম-মূল্যের** মাত্র **অর্ধেকেরই** সমান হয়ে দাঁড়াবে আর তার জীবনযাত্রার মান খুব কমে যাবে। কম-বেশি মাত্রায় এই ব্যাপারই ঘটবে যদি তার মজুরি বাড়ে, কিন্তু সোনার মূল্যে যতটা কমেছে সেই অনুপাতে না বাড়ে। সেক্ষেত্রে শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বা যোগান ও চাহিদা, অথবা মূল্য - এর কোনটির বেলাতেই কোনো অদলবদল হচ্ছে না। ঐ সব মূল্যের আর্থিক **নামটুকু** ছাড়া আর কিছুরই পরিবর্তন ঘটা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মজুরের আনুপাতিক মজুরি-বৃদ্ধির জন্য পীড়াপীড়ি করা উচিত নয় -- এই কথা বলাও যা, জিনিসের বদলে নাম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা তার উচিত এই কথা বলাও তা। সমগ্র অতীত ইতিহাস প্রমাণ করে যে, যখনই ঐ রকম মুদ্রার মূল্য-হ্রাস ঘটে তখনই পুঁজিপতিরা মজুরদের ঠকিয়ে নেবার এই সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য তৈরী থাকে। অর্থনীতিবিদদের একটি মস্ত স্কুল জোর গলায় বলেন যে, নতুন নতুন স্বর্ণাঞ্চল আবিষ্কার, রুপার খনিগুলিতে উন্নততর পদ্ধতি এবং সস্তা দরে পারা সরবরাহের ফলে দামী ধাতুগুলির মূল্য আবার কমে গিয়েছে। ইউরোপীয় ভূখণ্ডে যে সাধারণ ও যুগপৎ মজুরি-বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে তার কারণ এইটে।

৩। এখন পর্যন্ত আমরা ধরে নিয়েছি যে, **শ্রম-দিবসের** একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। শ্রম-দিবসের কিন্তু এমনিতে কোনো চিরন্তন সীমা নেই। পুঁজির নিরবচ্ছিন্ন ঝোঁক হল তাকে শারীরিক ভাবে যতদূর সম্ভব টেনে বাড়ানো, কারণ ততটা পরিমাণেই উদ্বৃত্ত শ্রম ও তার ফলে উদ্বৃত্ত মুনাফা বেড়ে উঠবে। পুঁজি শ্রম-দিবসকে যত দীর্ঘ করতে পারবে অপরের শ্রম সে তত বেশি আত্মসাৎ করবে। সতেরো শতকে ও এমন কি আঠারো শতকের প্রথম দুই-তৃতীয়াংশ কালে দশ ঘণ্টা শ্রম-দিবসই ছিল সারা ইংলণ্ডের স্বাভাবিক শ্রম-দিবস। আসলে যে যুদ্ধ ছিল বৃটিশ মেহনতীজনদের বিরুদ্ধে বৃটিশ ব্যারনদেরই যুদ্ধ সেই জ্যাকোবিনবিরোধী যুদ্ধের* সময় পুঁজির উদ্দাম মরশুম গেছে, পুঁজি সেই সময়ে শ্রম-দিবসকে দশ ঘণ্টা থেকে বারো, চৌদ্দ, আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। ম্যালথাসকে আপনারা নিশ্চয়ই অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ বলে কখনোই সন্দেহ করবেন না,

---

* আঠারো শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের পর্বে ইংলণ্ড ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধবিগ্রহ চালায় তার কথা বলা হচ্ছে। এই যুদ্ধের কালে ইংরাজ সরকার দেশে মেহনতীদের বিরুদ্ধে কঠোর সন্ত্রাসের আমল চালু করে। বিশেষ করে এই পর্বে সমস্ত গণ-আন্দোলন দমিত ও শ্রমিক ইউনিয়ন নিষিদ্ধ হয়। — সম্পাঃ

তিনি পর্যন্ত ১৮১৫ সাল নাগাদ প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় ঘোষণা করেন যে, ব্যাপারটা এই রকম চললে জাতির জীবনমূলেই কুঠারাঘাত করা হবে। নব-আবিষ্কৃত যন্ত্র সাধারণভাবে চালু হওয়ার বছর কয়েক আগে, ১৭৬৫ সাল নাগাদ ইংলন্ডে 'ব্যবসা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ' নামে এক পুস্তিকা বেরোয়। শ্রমিক শ্রেণীর প্রকাশ্য শত্রু এই বেনামী প্রবন্ধকার খাটুনির ঘণ্টার সীমা দীর্ঘতর করার প্রয়োজন সম্পর্কে গলাবাজি করেন। এই অভিসন্ধি সিদ্ধির অন্যান্য উপায়ের মধ্যে তিনি **শ্রম-আগারের** প্রস্তাব করেছেন, যেগুলি তাঁর মতে হওয়া উচিত 'বিভীষিকা-আগার'। আর এই 'বিভীষিকা-আগারের' জন্য তিনি কতটা দীর্ঘ রোজ প্রস্তাব করেছেন? **বারো ঘণ্টা** — ঠিক সেই ক-ঘণ্টাই ১৮৩২ সালে যাকে পুঁজিপতি, অর্থনীতিবিদ ও মন্ত্রীরা শুধু চলতিই নয়, বারো বছরের নীচের শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় বলেই ঘোষণা করেন।

মজুর তার শ্রম করবার শক্তি বিক্রয় করতে গিয়ে - বর্তমান ব্যবস্থায় তাকে তা করতেই হবে — পুঁজিপতির হাতে ঐ শক্তি ব্যবহারের ভার তুলে দেয়, কিন্তু তা দেয় একটা যুক্তি সঙ্গত সীমার মধ্যে। শ্রম করবার শক্তির স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতির কথা বাদ দিলে বলা যায়, সে তার শ্রম করবার শক্তি বেচে তা বজায় রাখার জন্যই, তাকে নষ্ট করার জন্য নয়। শ্রম করবার শক্তিকে তার দৈনিক বা সাপ্তাহিক মূল্যে বিক্রয় করার সময়ে এ কথা ধরে নেওয়া হয় যে, একদিনেই বা এক সপ্তাহেই ঐ শ্রম করবার শক্তিকে দু'দিন অথবা দু'সপ্তাহের অপচয় বা ক্ষয়ক্ষতি সইতে হবে না। ১,০০০ পাউন্ড দামের একটি যন্ত্রের কথা ধরুন। যদি দশ বছরে সেটি পুরো ব্যবহৃত হয়ে যায়, তাহলে যে-সব পণ্য উৎপাদনে এটি সাহায্য করে তাদের মূল্যের সঙ্গে যন্ত্রটি বছরে ১০০ পাউন্ড যোগ দেবে। পাঁচ বছরে পুরো ব্যবহৃত হলে সেটি বছরে ২০০ পাউন্ড যোগ দেবে অথবা তার বাৎসরিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্য হল যে সময়ে সেটি পুরো ব্যবহৃত হয়ে যায় তার বিপরীত অনুপাতে। কিন্তু যন্ত্রের সঙ্গে মজুরের তফাৎ এইখানেই। যন্ত্রপাতি ঠিক যে-হারে ব্যবহৃত হয় ঠিক সেই অনুপাতে সেটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। উল্টোদিকে মানুষ যত বাড়তি কাজ করে তার সংখ্যাগত যোগফল থেকে যতটা দেখা যায়, তার থেকে বেশি অনুপাতে সে ক্ষয় পায়।

খাটুনির ঘণ্টাকে তার আগের যুক্তিযুক্ত আয়তনের মধ্যে নামিয়ে আনার চেষ্টা করে, অথবা যেখানে স্বাভাবিক খাটুনির ঘণ্টা আইন বেঁধে নির্দিষ্টকরণ শ্রমিকরা বলবৎ করতে পারছে না সেখানে মজুরি-বৃদ্ধি মারফৎ — শুধু যে বাড়তি সময় খাটতে হচ্ছে সেই অনুপাতে নয়, তার থেকে বেশি অনুপাতে মজুরি-বৃদ্ধি মারফৎ অতিখাটুনি ঠেকানোর চেষ্টা করে মজুরেরা নিজেদের ও নিজ বংশধরদের প্রতি কর্তব্য পালন করছে মাত্র। তারা শুধু পুঁজির অত্যাচারী জবরদখলের ওপর সীমারোপ করছে মাত্র। সময়ের পরিসরেই ঘটে মানুষের বিকাশ। যে লোকের হাতে খুশিমতো কাটাবার কোনো নিরঙ্কুশ সময় নেই, ঘুম, খাওয়াদাওয়া প্রভৃতি নিতান্ত দৈহিক ধরনের ছেদগুলি ছাড়া যার সমস্ত জীবনই

পুঁজিপতির জন্য খাটতে হয়, সে ভারবাহী পশুরও অধম। দেহের দিক থেকে জীর্ণ ও মনের দিক থেকে পশুত্বের স্তরে অধঃপতিত হয়ে সে হয় অপরের সমৃদ্ধি সৃষ্টির একটি যন্ত্র মাত্র। অথচ আধুনিক শিল্পের সমগ্র ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে, বাধা না পেলে পুঁজি সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীকেই এই চূড়ান্ত অবনতির স্তরে নিয়ে ফেলার জন্য বেপরোয়া ও নির্মমভাবে কাজ করে যাবে।

খাটুনির ঘণ্টা বাড়ানোর সময়ে পুঁজিপতি **উচ্চতর মজুরি** দিয়েও **শ্রমের মূল্য** কমিয়ে দিতে পারে, যদি যে বৃহত্তর পরিমাণ শ্রম আদায় করা হচ্ছে ও তার ফলে শ্রম-করবার শক্তির যে দ্রুততর ক্ষয় হচ্ছে তার সঙ্গে সমানুপাতিক মজুরি-বৃদ্ধি না ঘটে। আর এক ভাবে তা করা চলে। মধ্য শ্রেণীর পরিসংখ্যানবিদেরা হয়তো আপনাদের বলবেন যে দৃষ্টান্তস্বরূপ, ল্যাঙ্কাশায়ার কারখানা এলাকার পরিবারগুলির গড়পড়তা মজুরি বেড়ে গেছে। তাঁরা ভুলে যান যে, একটা লোকের শ্রমের জায়গায় পরিবারের কর্তা পুরুষটি, তার স্ত্রী ও হয়ত তিন চারটি ছেলেমেয়েও এখন পুঁজির জগন্নাথী রথচক্রে পিষ্ট হচ্ছে এবং পরিবারটি থেকে মোট যে উদ্বৃত্ত শ্রম আদায় করা হচ্ছে সেটার সঙ্গে মোট মজুরি-বৃদ্ধি তাল রাখেনি।

শিল্পের যে সব শাখা কারখানা-আইনের আওতায় পড়ে সেখানে এমন কি খাটুনির ঘণ্টার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেও শুধু **শ্রম-মূল্যের** সাবেক মান বজায় রাখার জন্যই মজুরি-বৃদ্ধির প্রয়োজন হতে পারে। শ্রমের **তীব্রতা** বাড়িয়ে আগে দু-ঘণ্টায় যতটা জীবনী শক্তি ব্যয় হত এখন এক ঘণ্টাতেই ততটা ব্যয় করতে একজনকে বাধ্য করা যেতে পারে। কারখানা-আইনের অধীন শিল্পগুলিতে যন্ত্রবেগ বাড়িয়ে ও একজন মানুষকে যে সব কর্মযন্ত্রের তত্ত্বাবধান করতে হয় তার সংখ্যাবৃদ্ধি করে এই ব্যাপারই কিছুটা করা হয়েছে। শ্রমের তীব্রতাবৃদ্ধি অথবা এক ঘণ্টায় যে শ্রম ঢালতে হয় তার পরিমাণ যদি খাটুনির ঘণ্টার মাত্রাহ্রাসের সঙ্গে কিছুটা ন্যায্য অনুপাতে চলে তাহলেও মজুরেরই জিত। এই মাত্রা পেরোলেই একদিকে সে যা জিতবে অন্যদিকে তাই সে হারাবে এবং সেক্ষেত্রে দশ ঘণ্টার শ্রম আগেকার বারো ঘণ্টার শ্রমের মতোই সর্বনাশা হতে পারে। পুঁজির এই ঝোঁককে ঠেকিয়ে, শ্রমের তীব্রতাবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে মজুরি-বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করে মজুর শুধু তার শ্রমের ক্ষয়ক্ষতিকে এবং তার উত্তরপুরুষের অবনতিকেই প্রতিরোধ করছে।

৪। আপনারা সবাই জানেন যে কতকগুলি কারণের দরুন, যা এখন আমার ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, পুঁজিবাদী উৎপাদন কতকগুলি পর্যায়িক চক্রের ভিতর দিয়ে চলে। নিস্পন্দভাব, ক্রমবর্ধমান তেজীভাব, সমৃদ্ধি, অতি-বাণিজ্য, সংকট ও অচলাবস্থা — এই সব পর্যায়ের ভিতর দিয়েই তা অগ্রসর হয়। পণ্যের বাজার-দর ও মুনাফার বাজার-হার এই সব পর্যায় অনুসরণ করে চলে কখনও তার গড়পড়তা হারের নিচে নেমে যায়, কখনও বা তার ওপরে ওঠে। সমগ্র চক্রটির কথা ধরলে আপনারা দেখবেন যে, বাজার-

দরের একটি বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করছে আর একটি বিচ্যুতি এবং সমস্ত চক্রের গড় ধরলে পণ্যের বাজার-দর তাদের মূল্যের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু! পড়তি বাজার-দর, সংকট ও অচলাবস্থার যুগে মজুরের কাজ যদি বা একেবারেই না যায় তাহলে তার মজুরি অন্তত নিশ্চয়ই কমে যাবে। না ঠকতে হলে বাজার-দরের ঐ রকম হ্রাস সত্ত্বেও কতটা আনুপাতিক হারে মজুরি-হ্রাস প্রয়োজন হয়ে পড়েছে -- এই নিয়ে পুঁজিপতির সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হবে। সমৃদ্ধির যুগে, যখন বাড়তি মুনাফা কামানো হয় তখন যদি সে মজুরি-বৃদ্ধির লড়াই না করে থাকে, তাহলে একটি চক্রের গড়ের হিসাব অনুসারে সে তার **গড়পড়তা মজুরি** বা তার শ্রমের **মূল্য** পর্যন্তও পাবে না। চক্রের প্রতিকূল পর্যায়গুলিতে তার মজুরি স্বভাবতই প্রভাবিত হলেও চক্রের সমৃদ্ধ পর্যায়ে তার উচিত ক্ষতিপূরণ চেষ্টা থেকে বিরত থাকা এই দাবি করা নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত। চাহিদা ও যোগানের অবিশ্রাম উঠতি-পড়তি থেকে উদ্ভূত নিরন্তর পরিবর্তনশীল বাজার-দরের ক্ষতিপূরণ মারফতই কেবল সাধারণত সমস্ত পণ্যের **মূল্য** হাসিল হয়। বর্তমান ব্যবস্থার ভিত্তিতে শ্রম অন্য যে কোনো পণ্যের মতোই নিছক একটি পণ্য। তাই তাকেও তার মূল্য অনুযায়ী গড়পড়তা দাম পেতে হলে সমান উঠতি-পড়তির ভিতর দিয়ে যেতে হবে। একদিকে তাকে পণ্য হিসাবে গণ্য করা আর অন্যদিকে পণ্যের দাম যে-নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার আওতা থেকে তাকে বাদ দিতে চাওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিহীন হবে। ক্রীতদাস একটা স্থায়ী ও নির্দিষ্ট পরিমাণ ভরণপোষণ পায়, মজুরি-খাটা শ্রমিক তা পায় না। তাকে এক সময়ে মজুরি-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতেই হবে, আর কিছু না হোক শুধু অন্য সময়ের মজুরি-হ্রাস পূরণ করার জন্যই। পুঁজিপতির ইচ্ছা ও হুকুমকে শাশ্বত অর্থনৈতিক নিয়ম হিসাবে মেনে যদি সে হাল ছেড়ে দেয় তবে তার ভাগ্যে ক্রীতদাসের সমস্ত দুর্গতি জুটবে, কিন্তু জুটবে না ক্রীতদাসের নিরাপত্তা।

৫। যতগুলি দৃষ্টান্ত আমি বিবেচনা করলাম, তার সবগুলিতেই (আর একশ-র মধ্যে এগুলিই হচ্ছে নিরানব্বই) আপনারা দেখেছেন যে, মজুরি-বৃদ্ধির সংগ্রাম শুধু **পূর্ববর্তী** পরিবর্তনের পিছু পিছু চলে এবং উৎপাদনের পরিমাণ, শ্রমের উৎপাদন-শক্তি, শ্রমের মূল্য, মুদ্রার মূল্য, যে শ্রম আদায় করা হচ্ছে তার মাত্রা বা তীব্রতা, চাহিদা ও যোগানের উঠতি-পড়তির ওপরে নির্ভরশীল এবং শিল্পচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বাজার-দরের উঠতি-পড়তি — এই সব ক্ষেত্রে আগেই যে পরিবর্তন ঘটে গেছে, স্বভাবত তার থেকেই তার উদ্ভব। এক কথায়, পুঁজির পূর্বতন ক্রিয়ার বিরুদ্ধে শ্রমের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই তার উদ্ভব। এই সমস্ত অবস্থা থেকে মজুরি-বৃদ্ধির সংগ্রামকে স্বতন্ত্র করে দেখলে, অন্য যে সব পরিবর্তন থেকে তার উদ্ভব তাকে উপেক্ষা করে শুধু মজুরির পরিবর্তনটুকুই দেখলে, আপনারা ভ্রান্ত পূর্বপ্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করবেন এবং পেঁাছবেন ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে।

১৪। পুঁজি ও শ্রমের সংগ্রাম এবং তার ফলাফল

১। মজুরি-হ্রাসের বিরুদ্ধে মজুরদের পর্যায়িক প্রতিরোধ ও মজুরি-বৃদ্ধির জন্য তাদের পর্যায়িক প্রচেষ্টা মজুরি-প্রথারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; শ্রম পণ্য হয়ে উঠার দরুনই তার উদ্ভব, এবং সেই কারণে দামের সাধারণ গতিবিধি নিয়ন্ত্রক নিয়মগুলির তা অধীন - এটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধারণভাবে মজুরি-বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মুনাফার হার পড়ে যাবে, কিন্তু তার ফলে পণ্যের গড়পড়তা দাম বা তাদের মূল্য প্রভাবিত হবে না এও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এখন এই প্রশ্ন ওঠে: পুঁজি ও শ্রমের মধ্যেকার এই অবিরাম সংগ্রামে শ্রমের পক্ষে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা কতটুকু?

একটা সাধারণসূত্রে আমি এর জবাব দিতে পারি, বলতে পারি যে, অন্য সব পণ্যের মতো শ্রমের ক্ষেত্রেও তার **বাজার-দর** শেষ পর্যন্ত তার **মূল্যের** সঙ্গে মিলবে, সুতরাং সমস্ত উঠতি-পড়তি সত্ত্বেও, যত চেষ্টাই সে করুক না কেন গড়পড়তায় মজুর পাবে শুধু তার শ্রমের মূল্যই অর্থাৎ যা হচ্ছে শ্রম করবার শক্তির মূল্য এবং যা নির্ধারিত হয় ঐ শ্রম করবার শক্তি সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদনের জন্য যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাগে তার মূল্যের দ্বারা -- সে সব প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যও আবার শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ শ্রম লাগে তার দ্বারাই।

কিন্তু **শ্রম করবার শক্তির মূল্য** বা **শ্রমের মূল্য** অন্য সব পণ্যের মূল্য থেকে কতগুলি অদ্ভুত রকমের বৈশিষ্ট্যের ফলে স্বতন্ত্র। শ্রম করবার শক্তির মূল্য গঠিত হয় দুটি উপাদান দিয়ে - একটি শুধুমাত্র দৈহিক, অন্যটি ঐতিহাসিক বা সামাজিক। তার **চূড়ান্ত সীমানা দৈহিক** উপাদানের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ নিজেকে জীইয়ে রাখার ও পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য, নিজের শারীরিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধির পক্ষে একেবারে অপরিহার্য আবশ্যিক দ্রব্যাদি পেতেই হবে। কাজেই ঐ আবশ্যিক দ্রব্যাদির **মূল্যই শ্রমের মূল্যের** চূড়ান্ত সীমা নির্দেশ করে। অন্যদিকে শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্যও কতকগুলি চূড়ান্ত, যদিও অত্যন্ত নমনীয় সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট। মেহনতকারী মানুষের দৈহিক শক্তিই তার চূড়ান্ত সীমা-রেখা নির্দেশ করে। তার জীবনীশক্তির প্রাত্যহিক ক্ষয় যদি একটা বিশেষ মাত্রা ছাপিয়ে যায়, তাহলে নতুন করে প্রতিদিন আর তা পুনঃপ্রয়োগ করা চলে না। অবশ্য আমি আগেই বলেছি এই সীমারেখা অত্যন্ত নমনীয়। সবল ও দীর্ঘায়ু শ্রমিকরা বংশানুক্রমিকভাবে যেমন শ্রমের বাজারের চাহিদা মেটাতে পারে, দ্রুত বংশ-পরম্পরায় ভগ্নস্বাস্থ্য ও স্বল্পায়ু শ্রমিকরাও তেমনি শ্রম-বাজারের চাহিদা মেটাবে।

শুধুমাত্র এই দৈহিক উপাদান ছাড়াও প্রত্যেক দেশে শ্রমের মূল্য একটি **ঐতিহ্যগত জীবনযাত্রার মানের** দ্বারা নির্ধারিত। এ শুধু দেহাশ্রিত জীবনধারণই নয়, জনসাধারণ

যে সামাজিক অবস্থায় রয়েছে ও যার মধ্যে তারা লালিতপালিত হয়েছে, তার থেকে উদ্ভূত কতগুলি প্রয়োজনের পরিতৃপ্তিও চাই। ইংরেজী জীবনযাত্রার মানকে আইরিশদের মানে, জার্মান কৃষকের জীবনযাত্রার মানকে লিভোনিয়ান কৃষকের মানে নামিয়ে আনা যেতে পারে। এ দিক দিয়ে ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও সামাজিক অভ্যাস যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তা আপনারা মিঃ থর্নটনের 'অতিরিক্ত জনসংখ্যা' গ্রন্থ থেকে জানতে পারেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, ভূমিদাস প্রথার কবল থেকে ইংলণ্ডের বিভিন্ন কৃষিপ্রধান জেলাগুলি যেমন যেমন অনুকূল অবস্থায় বেরিয়ে এসেছে মোটের উপর সেই অনুসারেই এখনও তাদের গড়পড়তা মজুরিতে তারতম্য রয়েছে।

শ্রম-মূল্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এই ঐতিহাসিক বা সামাজিক উপাদানকে বাড়িয়ে, কমিয়ে বা একেবারে নির্মূল করেও দেওয়া যায়; যাতে একমাত্র **দৈহিক সীমা** ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বুড়ো জর্জ রোজ — সেই ঝানু, ট্যাক্সোখোর ও পরভোজী *জর্জ* রোজের কথামতো যে জ্যাকোবিনবিরোধী যুদ্ধ চালানো হয়েছিল ফরাসী কাফেরদের হাত থেকে আমাদের পবিত্র ধর্ম রক্ষা করার জন্য, সেই যুদ্ধের আমলে যে সৎ ইংরেজ খামারীদের সম্পর্কে আমাদের আগেকার এক বৈঠকে খুব নরমভাবে বলা হয়েছিল তারা কৃষি-মজুরদের মজুরি একেবারে **ন্যূনতম দৈহিক মাত্রারও** নীচে নামিয়ে দেয় আর দৈহিক বংশরক্ষার জন্য আরো যেটুকু প্রয়োজন তা 'দুঃস্থ আইনের' ('পুওর ল')* সাহায্যে পুষিয়ে দেয়। মজুরি-খাটা শ্রমিককে ক্রীতদাসে আর শেক্সপিয়রের সেই দৃপ্ত প্রজাকে নিঃস্বে রূপান্তরিত করার এ এক চমৎকার পন্থা।

বিভিন্ন দেশের ও একই দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে প্রচলিত মজুরি মান বা শ্রম-মূল্য তুলনা করলে আপনারা দেখবেন যে, অন্য সমস্ত পণ্যের মূল্য স্থির থাকলেও **শ্রম-মূল্য** ব্যাপারটাই একটা স্থির রাশি নয়, বরঞ্চ পরিবর্তনশীল রাশিই।

একই রকমের তুলনা করে দেখলে প্রমাণ হবে যে মুনাফার **বাজার-হারই** যে শুধু বদলায় তাই নয়, তার **গড়পড়তা** হারও বদলায়।

কিন্তু **মুনাফার** বেলায় তার **ন্যূনতম সীমা** নির্দেশ করে এমন কোনো নিয়ম নেই। কোন চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত তা যে কমতে পারে তা আমরা বলতে পারি না। কেন আমরা সে সীমা নির্দেশ করতে পারি না? কারণ আমরা **ন্যূনতম** মজুরি স্থির করতে পারলেও আমরা তার **সর্বোচ্চ সীমা** নির্ধারণ করতে পারি না। আমরা শুধু বলতে পারি যে, শ্রম-দিবসের সীমা নির্দিষ্ট থাকলে **মজুরির দৈহিক ন্যূনতম মাত্রার** ক্ষেত্রে হবে

---

* 'দুঃস্থ আইন' ইংলণ্ডে চালু হয় ষোলো শতক থেকে, এতে প্রতি প্যারিসে দরিদ্রদের জন্য একটা বিশেষ কর ধার্য হয়। প্যারিসের যে সব অধিবাসীরা নিজেদের বা নিজ পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারত না, তারা দরিদ্র সহায় দপ্তর থেকে সাহায্য পেত। — সম্পাঃ

মুনাফার সর্বোচ্চ সীমা, আর মজুরি নির্দিষ্ট থাকলে **সর্বোচ্চ মুনাফা** হবে মজুরের দৈহিক শক্তির পক্ষে যথা সম্ভব খাটুনির ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে। সর্বোচ্চ মুনাফা তাই মজুরির ন্যূনতম দৈহিক মাত্রা ও শ্রম-দিবসের সর্বোচ্চ দৈহিক মাত্রা দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই **মুনাফার সর্বোচ্চ হারের** দুই সীমানার মধ্যে যে অসংখ্য রকমের অদলবদল সম্ভব তা সুস্পষ্ট। বাস্তব ক্ষেত্রে কোন মাত্রায় তা নির্দিষ্ট হবে তা পুঁজি ও শ্রমের ভিতরে অবিশ্রাম সংগ্রামের মাধ্যমেই স্থির হয়। পুঁজিপতি অবিরাম চেষ্টা করে দৈহিক ন্যূনতম মাত্রা অবধি মজুরি কমানো ও দৈহিক সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত খাটুনির ঘণ্টা বাড়ানোর জন্য, আর মজুর অনবরত ঠেলা দেয় এর উল্টো দিকে।

ব্যাপারটা প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের পারস্পরিক শক্তির প্রশ্নেই দাঁড়ায়।

২। অন্য সব দেশের মতো ইংলণ্ডেও **শ্রম-দিবস বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারটা** কখনও **আইনগত হস্তক্ষেপ** ছাড়া স্থির হয়নি। বাইরে থেকে মজুরেরা অবিশ্রাম চাপ না দিলে ঐ হস্তক্ষেপ কখনও ঘটত না। সে যাই হোক, মজুর ও পুঁজিপতিদের মধ্যে ঘরোয়া ব্যবস্থায় ঐ ফল পাওয়া সম্ভব হত না। **সাধারণ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের** এই যে প্রয়োজন, এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, তার নিছক অর্থনৈতিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পুঁজিই হচ্ছে অধিকতর শক্তিশালী পক্ষ।

শ্রম-মূল্যের সীমার ক্ষেত্রে, আসল নিষ্পত্তিটা সব সময়েই নির্ভর করে যোগান ও চাহিদার উপর অর্থাৎ পুঁজির তরফ থেকে শ্রমের চাহিদা ও মজুরদের তরফ থেকে শ্রমের যোগানের ওপর। উপনিবেশের দেশগুলিতে যোগান ও চাহিদার নিয়ম মজুরদের অনুকূলে কাজ করে। এইজন্যই যুক্তরাষ্ট্রে অপেক্ষাকৃত উচ্চ হারের মজুরি রয়েছে। পুঁজি যতই চেষ্টা করুক মজুরি-খাটা শ্রমিক ক্রমাগত স্বাধীন, আত্মনির্ভর কৃষকে পরিণত হওয়ার ফলে শ্রম-বাজারের ক্রমাগত শূন্যতা সে রোধ করতে পারে না। মার্কিন জনসাধারণের মস্ত এক অংশের পক্ষে মজুরি-খাটা শ্রমিকের বৃত্তি শুধু একটা উৎক্রমণ পর্যায়; আজ হোক, কাল হোক এ বৃত্তি তারা পরিত্যাগ করে যাবেই।* এই রকম ঔপনিবেশিক অবস্থার সংশোধনের জন্য পিতৃস্থানীয় বৃটিশ সরকার কিছুদিনের জন্য আধুনিক ঔপনিবেশিক তত্ত্ব বলে অভিহিত তত্ত্বটি স্বীকার

---

* 'পুঁজি', প্রথম খণ্ড, ৩৩ অধ্যায়, ৭৬৫ পৃষ্ঠার ১ নং মন্তব্য দ্রষ্টব্য: 'আমরা এখানে সত্যকার উপনিবেশের কথা, বিদেশাগত স্বাধীন বাসিন্দা কর্তৃক উপনিবেশে পরিণত অনাবাদী ভূমির কথা বলছি। অর্থনৈতিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র এখনও ইউরোপের উপনিবেশ মাত্র। এ ছাড়া এই দলেই পড়বে সেই সব পুরানো আবাদ, দাসত্ব প্রথার অবসানের ফলে যেখানে আগেকার অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।' যেহেতু ঔপনিবেশিক দেশের সর্বত্র জমি জোর করে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছে, সেহেতু সেখানকার মজুরি-খাটা শ্রমিকেরা আত্মনির্ভর উৎপাদক হওয়ার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। — সম্পাঃ

করে নেন; এই তত্ত্ব অনুযায়ী ঔপনিবেশিক জমিজমার উপরে এক কৃত্রিম চড়া দাম আরোপ করা হয়, যাতে করে মজুরি-খাটা শ্রমিকের স্বাধীন কৃষকে দ্রুতগতি রূপান্তর বন্ধ করা যায়।

কিন্তু এখন আসুন সেই পুরানো সভ্য দেশগুলির ব্যাপারে, পুঁজি যেখানে সমস্ত উৎপাদন-প্রক্রিয়ার উপরে আধিপত্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে ইংলণ্ডের কৃষি-মজুরি বৃদ্ধির কথাটাই ধরুন। কী তার ফল দাঁড়িয়েছিল? বন্ধুবর ওয়েস্টন তাদের যে পরামর্শ দিতেন সেই অনুসারে খামারীরা গমের মূল্য, এমন কি তার বাজার-দরও বাড়াতে পারেনি। বরঞ্চ দর-হ্রাসটাকেই তাদের মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু এই এগারো বছরে তারা নানা রকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, আরো বেশি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করে, কৃষিযোগ্য জমির কিছুটা অংশ রূপান্তর করে চারণ-ভূমিতে, কৃষিক্ষেত্রের আয়তন এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ায় এবং এই ও অন্যান্য সব ব্যবস্থার সাহায্যে তারা শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বাড়িয়ে শ্রমের চাহিদা কমিয়ে আনে ও কৃষিজীবী জনসংখ্যাকে ফের আপেক্ষিকভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত করে তোলে। সাবেকী জন-অধ্যুষিত দেশগুলিতে মজুরি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে পুঁজির যে দ্রুত বা বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া ঘটে, এই হল তার সাধারণ পদ্ধতি। রিকার্ডো ঠিকই বলেছিলেন যে, শ্রমের সঙ্গে যন্ত্র অবিশ্রাম প্রতিযোগিতা করছে এবং অনেক সময়েই যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করা সম্ভব হয় তখনই যখন শ্রমের দাম একটা বিশেষ মাত্রায় পেঁছায়, কিন্তু যন্ত্রের প্রয়োগ হল শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির বহু পদ্ধতির একটি। এই একই যে ঘটনা একদিকে সাধারণ শ্রমকে আপেক্ষিকভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত করে তুলছে, তাই আবার অন্যদিকে দক্ষ শ্রমকেও সরল করে তোলে ও এইভাবে তার মূল্য হ্রাস করে।

এই একই নিয়ম কার্যকরী হয় অন্যভাবেও। শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উচ্চহারের মজুরি সত্ত্বেও পুঁজি সঞ্চয়ের গতি ত্বরান্বিত হবে। কাজেই অ্যাডাম স্মিথের মতো, যাঁর সময়ে আধুনিক শিল্প ছিল শৈশবাবস্থায়, কেউ কেউ অনুমান করতে পারেন যে, পুঁজির দ্রুততর সঞ্চয় শ্রমের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়ে মজুরদের অনুকূলেই পাল্লা ঝোঁকাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বহু সমসাময়িক লেখক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন — গত বিশ বছরে ইংরেজ জনসংখ্যার চেয়ে ইংরেজ পুঁজি অত বেশি দ্রুত বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও মজুরি তত বেশি বৃদ্ধি পেল না কেন। কিন্তু সঞ্চয়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে **পুঁজির সংবিন্যাসেরও** একটা **ক্রমিক পরিবর্তন** ঘটে। মোট পুঁজির যে-অংশটা গঠিত স্থির পুঁজি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, সমস্ত রকমের উৎপাদনের উপায় দিয়ে, সেই অংশটা পুঁজির অন্য যে-অংশ মজুরির জন্য বা শ্রম ক্রয়ের জন্য প্রযুক্ত হয় তার তুলনায় উত্তরোত্তর বেশি করে বৃদ্ধি পায়। মিঃ বার্টন,

রিকার্ডো, সিসমন্দি, অধ্যাপক রিচার্ড জোনস, অধ্যাপক র‍্যামসি, শেরবুলিয়ে ও অন্যান্যেরা মোটের ওপর সঠিকভাবেই এই নিয়মটিকে বিবৃত করেছেন।

পুঁজির এই দুই উপাদানের অনুপাত যদি গোড়ার দিকে সমান সমান থাকে তাহলে শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমটা হয়ে দাঁড়াবে অন্যটার পাঁচ গুণ ইত্যাদি। মোট পুঁজি ৬০০-র মধ্যে ৩০০ যদি যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতিতে আর ৩০০ মজুরিতে নিয়োগ করা হয়, তাহলে ৩০০-র জায়গায় ৬০০ মজুরের চাহিদা সৃষ্টির জন্য মোট পুঁজিকে মাত্র দ্বিগুণ করলেই চলে। কিন্তু ৬০০ পুঁজির মধ্যে ৫০০ যদি যন্ত্রপাতি, মালপত্র প্রভৃতিতে যায়, আর মাত্র ১০০ যায় মজুরিতে, তাহলে ৩০০-র জায়গায় ৬০০ মজুরের চাহিদা সৃষ্টি করতে হলে ঐ একই পুঁজিকে ৬০০ থেকে ৩,৬০০-তে বেড়ে উঠতে হবে। শিল্পোন্নতির পথে তাই শ্রমের চাহিদা পুঁজি সঞ্চয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলে না। চাহিদাও বাড়তে থাকবে, কিন্তু পুঁজি-বৃদ্ধির তুলনায় তা বাড়বে ক্রমক্ষীয়মাণ হারে।

আধুনিক শিল্পের বিকাশলাভের ঘটনাটাই যে মজুরের বিপক্ষে আর পুঁজিপতির স্বপক্ষে উত্তরোত্তর বেশি বেশি করে পাল্লা ভারী করবে আর সেইহেতু পুঁজিবাদী উৎপাদনের সাধারণ ঝোঁক হবে গড়পড়তা মজুরির মান বাড়ানোর দিকে নয়, কমানোর দিকে, অথবা **শ্রমের মূল্যকে** কমবেশি তার **ন্যূনতম সীমায়** ঠেলে দেবার দিকেই, তা দেখাবার পক্ষে উপরের কথা কয়টিই যথেষ্ট। এই ব্যবস্থায় **ঘটনার** প্রবণতা যখন এই দিকে তখন তার অর্থ কি এই যে মজুরদের উচিত পুঁজির জবরদস্তির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ বন্ধ করা ও তাদের সাময়িক উন্নতির জন্য কালেভদ্রে যে সুযোগ মেলে তার যথাসাধ্য সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া? মজুরেরা যদি তাই করে তাহলে তারা এক উদাসীন হতভাগ্যদলের সমস্তরে নেমে যাবে, মুক্তির কোনো আশা যাদের নেই। মনে হয় আমি দেখাতে পেরেছি যে, মজুরির মানের জন্য তাদের সংগ্রামের ঘটনাগুলি সমগ্র মজুরি-প্রথার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, ১০০-র মধ্যে ৯৯টি ক্ষেত্রেই মজুরি বৃদ্ধির জন্য তাদের সংগ্রামটা হচ্ছে তাদের নির্দিষ্ট শ্রম-মূল্যটা বজায় রাখার চেষ্টামাত্র; আর নিজেদের যে পণ্য হিসাবে বেচতে হয় এই অবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে পুঁজিপতির সঙ্গে তাদের দর নিয়ে লড়াইয়ের প্রয়োজন। পুঁজির সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামে তারা যদি কাপুরুষের মতো নতিস্বীকার করে তাহলে নিশ্চয়ই বৃহত্তর কোনো আন্দোলনের উদ্বোধনে তারা নিজেদের অযোগ্য বলেই প্রতিপন্ন করবে।

সেই সঙ্গে মজুরি-প্রথার ভিতরে সাধারণভাবে যে দাসত্ব নিহিত রয়েছে তার কথা বাদ দিলেও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিদিনকার লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফলাফল নিজেদের মধ্যে অতিরঞ্জিত করে দেখা উচিত নয়। তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তারা লড়ছে

ফলাফলের সঙ্গে, ঐ ফলাফলের হেতুর সঙ্গে নয়; তারা নিম্ন গতি মন্দীভূত করছে, সে গতির দিক পরিবর্তন করছে না, তারা উপশমের ওষুধ লাগাচ্ছে, রোগ সারাচ্ছে না। সুতরাং পুঁজির অবিরাম আক্রমণ ও বাজারের হেরফের থেকে অনবরত এই যে সব অনিবার্য গেরিলা যুদ্ধের উদ্ভব হচ্ছে তার মধ্যেই নিজেদের একান্তভাবে ডুবিয়ে রাখা তাদের উচিত নয়। তাদের বোঝা উচিত যে, বর্তমান ব্যবস্থা যত দুর্গতিই তাদের উপরে চাপাক না কেন, সেই সঙ্গে এ ব্যবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় **বৈষয়িক অবস্থা ও সামাজিক রূপ** সৃষ্টি করছে। **'দিনের ন্যায্য খাটুনির জন্য ন্যায্য দিন-মজুরি!'** — এই রক্ষণশীল নীতির বদলে তাদের উচিত পতাকায় এই **বিপ্লবী** মন্ত্র মুদ্রিত করা — **'মজুরি-প্রথার অবসান চাই!'**

আলোচ্য বিষয়ের প্রতি কিছুটা সুবিচার করার জন্য বাধ্য হয়ে এই অত্যন্ত দীর্ঘ ও হয়তো বা ক্লান্তিকর বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, এখন এই সিদ্ধান্তগুলি রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব:

প্রথমত, মজুরি হারের সাধারণ বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মুনাফা-হার হ্রাস পায়, কিন্তু মোটের উপর, পণ্যের দামের ওপরে তার কোনো প্রভাব পড়ে না।

দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী উৎপাদনের সাধারণ ঝোঁক হচ্ছে মজুরির গড়পড়তা মান বাড়ানো নয়, তা কমানোর দিকেই।

তৃতীয়ত, পুঁজির হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঘাঁটি হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভালো কাজ করে। তাদের আংশিক ব্যর্থতা এই জন্য যে, স্বীয় ক্ষমতা তারা বিবেচকের মতো ব্যবহার করে না। তাদের সাধারণ ব্যর্থতা এই জন্য যে, প্রচলিত ব্যবস্থাকে একই সঙ্গে পাল্টানোর চেষ্টার বদলে, শ্রমিক শ্রেণীর চরম মুক্তির জন্য অর্থাৎ মজুরি-প্রথার চূড়ান্ত উচ্ছেদের জন্য আপন সংগঠিত শক্তিটাকে চালক দণ্ড হিসাবে প্রয়োগ করার বদলে এই ব্যবস্থার ফলাফলের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালানোর মধ্যেই তারা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে।

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের দুটি অধিবেশনে, ১৮৬৫ সালের ২০শে ও ২৭শে জুন তারিখে মার্কসের বক্তৃতা

স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসাবে সর্বপ্রথম ১৮৯৮ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত

মার্কসের রিপোর্টের মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা ইংরেজি সংস্করণ অনুসারে অনূদিত

কার্ল মার্কস

'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম জার্মান সংস্করণের ভূমিকা

যে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডখানি আজ আমি জনসমক্ষে উপস্থাপিত করছি সেই গ্রন্থখানি ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত আমার *'Zur Kritik der Politschen Oekonomie'* ('অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে') পুস্তকটির অনুবৃত্তি। বহুবর্ষব্যাপী রোগভোগে আমার লেখা বারেবারে ব্যাহত হওয়ার ফলেই রচনাটির প্রথম অংশ ও তার অনুবৃত্তির মাঝখানে এই দীর্ঘ বিরতি।

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে আমার সেই পূর্ববর্তী পুস্তকের সারমর্ম সংকলিত হয়েছে। এটা শুধু আনুপূর্বিকতা ও সমগ্রতা বজায় রাখার জন্যই করা হয়নি। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনাকেও উন্নত করা হয়েছে। অবস্থাক্রমে যতখানি সম্ভব হয়েছে, সেইভাবেই পূর্ববর্তী বইখানিতে সংকেতমাত্রে বর্ণিত কিছু বক্তব্য এখানে আরো বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, আবার, বিপরীতক্রমেও, পূর্বগ্রন্থে সবিস্তারে আলোচিত কিছু বক্তব্য বর্তমান খণ্ডে শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। মূল্যতত্ত্ব ও মুদ্রার ইতিহাস বিষয়ক অধ্যায়গুলি অবশ্য এখন একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী পুস্তকের পাঠকেরা এখানে প্রথম অধ্যায়ের টীকাগুলিতে এইসব তত্ত্বের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য নির্দেশিকা পাবেন।

প্রতিটি প্রারম্ভই যে দুরূহ -- একথা সকল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং প্রথম অধ্যায়টি, বিশেষত পণ্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণবিষয়ক অংশটি হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারটাই হবে সবচেয়ে শক্ত। বিশেষ করে মূল্যের মর্মবস্তু এবং মূল্যের আয়তন বিশ্লেষণ সম্পর্কিত অংশটিকে আমি যতটা সম্ভব লোকবোধ্য করেছি*। যে মূল্য-রূপের পূর্ণ

* এটা দরকার হয়েছে আরো এই কারণে যে, শুলৎসে-দেলিচ-এর বিরুদ্ধে ফের্দিনান্দ লাসালের রচনার যে বিভাগে এবিষয়ে আমার ব্যাখ্যার 'বুদ্ধিবৃত্তিক সারমর্ম' দেওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবী করেন সেখানেও গুরুত্বপূর্ণ ভুল থেকে গেছে। যদিও ফের্দিনান্দ লাসাল পুঁজির ঐতিহাসিক চরিত্র,

বিকশিত আকার হল মুদ্রা-রূপ, সেটি খুবই প্রাথমিক এবং সরল বস্তু। তাসত্ত্বেও মানব-মন ২,০০০ বছরেরও বেশী কাল ধরে বৃথাই এর রহস্য সন্ধান করেছে, অথচ অপরদিকে আরো জটিল ও মিশ্র রূপসমূহের বিশ্লেষণে অন্তত মোটামুটি সাফল্য সম্ভব হয়েছে। কেন? কারণ কোনো দেহের কোষগুলিকে বিচার করা অপেক্ষা জৈবিক সমগ্রতা হিসাবে সেই দেহটাকেই বিচার করা বেশী সহজ। উপরন্তু, অর্থনৈতিক রূপসমূহের বিশ্লেষণে অনুবীক্ষণ অথবা রাসায়নিক বিকারক (reagent) কোন কাজে আসে না। এই দুয়ের বদলে চাই বিমূর্তীকরণ। অবশ্য বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রমফলের পণ্যরূপ — অথবা পণ্যের মূল্যরূপ — হল অর্থনীতির কোষ-রূপ মাত্র। ভাসাভাসাভাবে যে দেখে তার কাছে এইসব রূপের বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম খুঁটিনাটির ব্যাপার মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি নিয়েই এ বিশ্লেষণের কাজ, কিন্তু আনুবীক্ষণিক শারীরবৃত্তে যে ধরনের সূক্ষ্মতম জিনিষ নিয়ে কারবার এ হল সেই ধরনের।

অতএব মূল্য-রূপ বিষয়ক অংশটা বাদ দিলে বর্তমান খণ্ডটি দুরূহতার দায়ে অভিযুক্ত হতে পারবে না। আমি অবশ্য এমন পাঠকের কথাই ভাবছি যিনি নূতন কিছু শিখতে ইচ্ছুক এবং সেই কারণে নিজে চিন্তা করতেও ইচ্ছুক।

পদার্থবিজ্ঞানী প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন এমন অবস্থায় যেখানে তা ঘটছে তার আদর্শতম রূপে (typical form) ও সর্বাধিক অবাধে অথবা, যেখানেই সম্ভব, তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এমন অবস্থার মধ্যে যাতে ঘটনাটির স্বাভাবিক সংঘটন নিশ্চিত হয়। এই গ্রন্থে আমাকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি এবং সেই পদ্ধতির আনুষঙ্গিক উৎপাদন-ব্যবস্থা ও বিনিময়-ব্যবস্থা বিচার করে দেখতে হয়েছে। এখন পর্যন্ত এর আদর্শ ক্ষেত্র হল ইংলণ্ড। সেই কারণেই আমার তাত্ত্বিক ভাবধারার বিকাশে ইংলণ্ডকেই মুখ্য দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যদি কোনও জার্মান পাঠক ইংরেজ শিল্প-মজুর ও কৃষি-মজুরের অবস্থা দেখে মুখ বাঁকান, অথবা জার্মানিতে অবস্থা যে এতটা খারাপ নয় এই ভেবে আশাবাদী ভঙ্গিতে নিজেকে প্রবোধ দেন, তবে আমি স্পষ্ট করেই তাঁকে বলব: **'De te fabula narratur!'***

অবশ্য পুঁজিবাদী উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়মগুলি থেকে উদ্ভূত সামাজিক বিরোধসমূহের বিকাশের মাত্রাধিক্য বা মাত্রাল্পতার কথা এখানে উঠছে না। প্রশ্ন হল

উৎপাদনের অবস্থা ও উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যেকার সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অর্থতত্ত্ববিষয়ক রচনার সকল সাধারণ তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্যই প্রায় আক্ষরিকভাবে এবং কোন ঋণ স্বীকার না করেই আমার লেখা থেকে গ্রহণ করেছেন, এমন কি আমার সৃষ্ট পরিভাষাগুলি পর্যন্ত নিয়েছেন, তবু তা প্রচারের উদ্দেশ্যেই করেছেন বলে বোধ হয়। আমি অবশ্য এখানে তাঁর সেই সব প্রতিপাদ্যের বিস্তৃতিসাধন বা প্রয়োগের বিষয়ে কিছু বলছি না, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। (মার্কসের টীকা।)

* 'কাহিনীটা আপনাকে নিয়েই!' — সম্পাঃ

সেই নিয়ম নিয়েই, কঠোর আবশ্যিকতায় অনিবার্য পরিণতির দিকে যে-ঝোঁকগুলি কাজ করছে, তারই প্রশ্ন। যে দেশ বেশি শিল্পোন্নত সে অল্প উন্নত দেশকে তার ভবিষ্যতের প্রতিরূপটাই শুধু প্রদর্শন করছে।

কিন্তু এ কথা বাদ দেওয়া যাক। পুঁজিবাদী উৎপাদন জার্মানদের মধ্যে যেখানে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হয়েছে (দৃষ্টান্তস্বরূপ, খোদ ফ্যাক্টরিগুলির মধ্যে) সেখানকার প্রচলিত অবস্থা ইংলণ্ডের থেকে অনেক বেশী শোচনীয়, কারণ সেখানে ফ্যাক্টরি আইনের পাল্টাভার অনুপস্থিত। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই, পশ্চিম ইউরোপ মহাদেশে অন্য সকলের মতো আমরাও, শুধু পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশের জন্যই নয়, এই বিকাশের অসম্পূর্ণতার জন্যও দুর্ভোগ ভুগছি। আধুনিক দুর্গতির পাশাপাশি, প্রাচীন হয়ে যাওয়া উৎপাদন-পদ্ধতির নিষ্ক্রিয় অস্তিত্ব আর তার অনিবার্য আনুষঙ্গিক সামাজিক ও রাজনৈতিক কালব্যতিক্রম থেকে উদ্ভূত উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দুর্গতিসমূহে আমরা নির্যাতিত হচ্ছি। আমরা শুধু জীবিতের হাতেই ভুগছি না, মৃতের হাতেও ভুগছি। ***Le mort Saisit le vif!****

ইংলণ্ডের সামাজিক পরিসংখ্যানের তুলনায় জার্মানির এবং গোটা মহাদেশীয় পশ্চিম ইউরোপের অবশিষ্ট অংশের সামাজিক পরিসংখ্যানের সংকলন অতি শোচনীয়। কিন্তু তা থেকেই যতটা অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয় তাতেই অন্তরালের মেডুসার** মুণ্ড আমাদের ঈষৎ দৃষ্টিগোচর হয়। ইংলণ্ডের মতো আমাদের সরকার এবং আইন-সভাগুলি যদি অর্থনৈতিক অবস্থার তদন্ত করার জন্য মাঝেমাঝে কমিশন নিয়োগ করত; সত্যানুসন্ধানের জন্য যদি এই কমিশনগুলি একই ধরনের ক্ষমতাভূষিত হত; যদি এই কাজের জন্য ইংলণ্ডের কারখানা পরিদর্শকদের মতো, সে দেশের জনস্বাস্থ্যবিষয়ক মেডিকেল রিপোর্টারদের মতো, নারী ও শিশুদের শোষণ বিষয়ে এবং গৃহসংস্থান ও খাদ্য বিষয়ে সে দেশের তদন্ত কমিশনের সদস্যদের মতো যোগ্যতাসম্পন্ন এবং দলীয় পক্ষপাত ও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি শ্রদ্ধাপরতা থেকে মুক্ত মানুষ পাওয়া সম্ভব হত, তবে আমাদের স্বদেশের বাস্তব অবস্থা দেখে আমরা আতংকিত হতাম। পারসিউস এক ঐন্দ্রজালিক টুপি পরতেন, যে-দানবদের পিছনে তিনি তাড়া করতেন তারা যাতে তাঁকে দেখতে না পায়। আমরা ঐন্দ্রজালিক টুপিটা আমাদের চোখ এবং কানের উপর টেনে নামিয়ে ভাবি, দানব কোথাও নেই।

* মৃত রেখেছে জীবিতকে তার মুঠির মধ্যে। — সম্পাঃ

** মেডুসা — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার তিনটি পাখাওয়ালা দানব গর্গনদের একজন। চুলের বদলে তাদের মাথায় থাকে সাপের জটা। পুরাকথা অনুসারে মেডুসার দৃষ্টি পড়লে সমস্ত জীবন্ত প্রাণী পাথরে পরিণত হত। -- সম্পাঃ

কিন্তু এ বিষয়ে নিজেদের যেন আমরা প্রতারিত না করি। আঠারো শতকে যেমন আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ইউরোপীয় মধ্য শ্রেণীকে সংকেত দিয়েছিল, ঊনিশ শতকে তেমনি আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ইউরোপীয় শ্রমিক শ্রেণীকে সংকেতধ্বনি জানিয়েছে। ইংলণ্ডে সামাজিক ভাঙনের অগ্রগতি সুস্পষ্ট। এই ভাঙন একটা নির্দিষ্ট সীমায় পেণছলে, ইউরোপ ভূখণ্ডে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই হবে। সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশের মাত্রা অনুযায়ী-ই অধিকতর পাশবিক বা অধিকতর মানবিক রূপ পরিগ্রহ করবে এই ভাঙন। অতএব, উচ্চতর উদ্দেশ্যের কথা বাদ দিয়েও, সাময়িকভাবে যে সব শ্রেণী শাসকের ভূমিকায় আছে তাদের নিজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থই তাদেরকে বাধ্য করবে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন বিকাশের পথে আইনগতভাবে দূরীকরণযোগ্য সমস্ত বাধাকে অপসারণ করতে। এই কারণে এবং অন্যান্য কারণেও ইংলণ্ডের কারখানা আইনের ইতিহাস, বিস্তারিত বিবরণ ও ফলাফলকে বর্তমান খণ্ডে এতটা বেশী স্থান আমি দিয়েছি। একটি জাতি অপর জাতিদের কাছ হতে শিখতে পারে এবং শেখা উচিতও। কিন্তু যদি কখনো কোন একটি সমাজ নিজের গতির প্রাকৃতিক নিয়মগুলি আবিষ্কার করার সঠিক পথে গিয়ে দাঁড়ায়, — বর্তমান সমাজের গতির অর্থনৈতিক নিয়মের স্বরূপ উদ্ঘাটন করাই এই গ্রন্থের শেষ লক্ষ্য — তখনও সে তার স্বাভাবিক বিকাশের ক্রমিক পর্যায়গুলির বাধাসমূহকে কোন দুঃসাহসী উল্লম্ফনে অতিক্রম করতে বা বিধানিক নির্দেশ দিয়ে অপসারণ করতে পারে না। তবুও জন্মযন্ত্রণা সংক্ষিপ্ত ও লঘু করা সম্ভব।

সম্ভাব্য ভুলবুঝাবুঝি রোধ করার জন্য একটি কথা। পংজিপতি বা জমিদারকে কোন মতেই আমি গোলাপের রঙে রঞ্জিত করছি না। কিন্তু এখানে ব্যক্তি-বিশেষকে দেখানো হচ্ছে ঠিক যে অনুপাতে তারা কেবল কোনও অর্থনৈতিক সংজ্ঞা-বিভাগের ব্যক্তিরূপ, কোনো বিশেষ শ্রেণী-সম্পর্ক বা শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিভূ। আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের অর্থনৈতিক গঠনের বিবর্তন প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটি প্রক্রিয়া বলেই বিবেচিত; তাই বিশেষ কোনও ব্যক্তি সামাজিকভাবে যে সম্পর্কসমূহের অধীন, সেই সম্পর্কগুলির জন্য তাকেই দায়ী করা এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে অন্য যে কোনো মতবাদের তুলনায় কম সম্ভব, — তা সেই ব্যক্তি মনে মনে এই সম্পর্কের যত ঊর্ধ্বেই নিজেকে তুলে ধরুক না কেন।

অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে স্বাধীন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুধু যে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো একই শত্রুদের সম্মুখীন হয়, তাই নয়। যে মালমসলা নিয়ে তার কারবার তার বিশেষ প্রকৃতির জন্যই একে মানবহৃদয়ের সর্বাধিক হিংস্র, নীচ ও মারাত্মক রিপুগুলিকে, ব্যক্তিগত স্বার্থের ডাকিনী যোগিনীদেরকে সংগ্রামভূমিতে শত্রুরূপে টেনে আনতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠিত চার্চ তার আয়ের ৩৯ ভাগের ১ ভাগের উপর

আক্রমণের চেয়ে তার ৩৯টি মূল বিশ্বাস-সূত্রের মধ্যে ৩৮টি সূত্রের উপর আক্রমণকে বরং সহজে ক্ষমা করতে পারে। প্রচলিত সম্পত্তি-সম্পর্কের সমালোচনার সঙ্গে তুলনায় আজ নিরীশ্বরবাদ culpa levis*। তাসত্ত্বেও অগ্রগতি সন্দেহাতীত। উদাহরণ হিসাবে আমি বিগত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিত ব্লু বুকের উল্লেখ করছি: 'সাগরপারে অবস্থিত মহারাণীর মিশনগুলির সঙ্গে শিল্প সম্পর্কিত প্রশ্ন ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের বিষয়ে পত্রালাপ।' ইংরেজ রাজশক্তির বিদেশস্থ প্রতিনিধিরা এখানে ঘোষণা করেছেন যে, জার্মানিতে, ফ্রান্সে, সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইউরোপীয় মহাদেশের সকল সভ্য রাষ্ট্রেই পুঁজি ও শ্রমের বর্তমান সম্পর্কে এক মৌলিক পরিবর্তন ইংলণ্ডের মতোই সুস্পষ্ট এবং অপরিহার্য। একই সময়ে, আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারে, যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ ওয়েড জনসভাসমূহে ঘোষণা করেছেন যে, দাসপ্রথার অবসানের পর পুঁজি এবং ভূসম্পত্তির সম্পর্কসমূহের একটা মৌলিক বদল এবার পরের কর্তব্য। এ-সব হল যুগের নিশানা, রক্তবর্ণ আলখাল্লা** বা কালো জোব্বা দিয়ে এদের ঢেকে রাখা যায় না। আগামী কালই যে অলৌকিক কিছু ঘটবে তা অবশ্য এর দ্বারা সূচিত হয় না। এসব থেকে বোঝা যায় যে, খাস শাসক শ্রেণীগুলির মধ্যেও এই আশঙ্কার সূচনা হচ্ছে যে, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা কঠিন স্ফটিক নয়, পরিবর্তনশীল জীবসত্তা, এবং তা প্রতি নিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হবে পুঁজির সঞ্চালন (দ্বিতীয় ভাগ) এবং বিবর্তনের পথে পুঁজি যে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে সেই রূপগুলো (তৃতীয় ভাগ)। তৃতীয় ও শেষ খণ্ডে (চতুর্থ ভাগ) আলোচিত হবে তত্ত্বের ইতিহাস।

বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনাভিত্তিক প্রতিটি অভিমতকে আমি সাদর আহ্বান জানাই। কিন্তু তথাকথিত জনমতের সংস্কারের কথা ধরলে, তার সঙ্গে আমি কখনো আপোষ করিনি, আগের মতোই এখনো সেই ফ্লোরেন্সবাসী মহাপুরুষের নীতি বাক্যটাই আমার নীতি:

*'Segui il tuo corso, e lascia dir le genti'****

কার্ল মার্কস

লণ্ডন, ২৫শে জুলাই, ১৮৬৭

মার্কস-এর 'পুঁজি' গ্রন্থে প্রকাশিত, হামবুর্গ, ১৮৬৭

লণ্ডন, ১৮৮৭ সালের এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাদিত ইংরেজী সংস্করণ অনুসারে অনূদিত

* লঘু অপরাধ। — সম্পাঃ

** রক্তবর্ণ আলখাল্লা — লাল জোব্বা, রাজতন্ত্রের প্রতীক। কাল জোব্বা — খৃষ্টীয় পুরোহিতদের পরিচ্ছদ। — সম্পাঃ

*** 'নিজের পথ অনুসরণ করে চল, লোকে যা বলে বলুক।' (দান্তে) — সম্পাঃ

কার্ল মার্কস

‘পুঁজি’র প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের ‘পরের কথা’ থেকে

...‘পুঁজি’তে যে পদ্ধতি নিয়োগ করা হয়েছে তা যে খুবই কম বোধগম্য হয়েছে তা বোঝা যায় সে বিষয়ে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন ধারণা থেকে।

যেমন প্যারিসের *Revue Positiviste* এই বলে আমাকে তিরস্কার করেছে যে, একদিকে আমি অর্থশাস্ত্রের আলোচনা করি অধিবিদ্যক দিক থেকে, এবং অন্যদিকে, (কল্পনা করুন!) ভাবীকালের পাকশালার জন্য কোনো পাকপ্রণালী (কোঁৎ-পন্থী?) রচনা করার বদলে আমি নিজেকে নিবদ্ধ রাখি কেবল প্রকৃত ঘটনাবলীর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে। অধিবিদ্যাবিষয়ক তিরস্কারের জবাবে অধ্যাপক জিবের বলছেন, ‘যথার্থ তত্ত্বগত আলোচনার সময় মার্কস যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন তা হল সমস্ত ইংরেজি ধারায় সর্বদা অনুসৃত অবরোহ পদ্ধতি আর এই ধারার যা দোষগুণ তা অর্থশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিকদের সকলের মধ্যেই বর্তমান।’* এম. ব্লক তাঁর ‘Les théoriciens du socialisme en Allemagne: Extrait du Journal des Economistes, Juillet et Août 1872’ লেখাটিতে আবিষ্কার করেছেন যে আমার পদ্ধতি হচ্ছে বিশ্লেষণমূলক এবং বলেছেন, ‘গ্রন্থখানি মিঃ মার্কসকে বিশ্লেষণ ক্ষমতাশীল শ্রেষ্ঠ মনীষিদের মধ্যে স্থান দিয়েছে।’ বলা বাহুল্য, জার্মান সমালোচনাগুলি ‘হেগেলীয় কূটতর্ক’ বলে আর্তনাদ করে উঠেছে। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের ‘ইউরোপীয় বার্তাবহ’** ‘পুঁজি’ গ্রন্থের পদ্ধতির আলোচনার জন্য বিশেষভাবে লেখা একটি প্রবন্ধে*** (মে সংখ্যা,

* Зибер Н., «Теория ценности и капитала Д. Рикардо», Киев, 1871, стр. 170. — সম্পাঃ

** «Вестник Европы». — সম্পাঃ

*** সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপক কাউফমান লিখিত একটি প্রবন্ধের কথা এখানে বলা হয়েছে; প্রবন্ধটির শিরোনামা «Точка зрения *политико-экономической критики у К. Маркса*». — সম্পাঃ

১৮৭২, পৃঃ ৪২৭-৪৩৬) আমার পদ্ধতিকে কঠোর বাস্তবধর্মী বলে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু আমার উপস্থাপন রীতিকে, দুর্ভাগ্যক্রমে, জার্মান-দ্বন্দ্বমূলক বলে অভিহিত করেছে। এখানে বলা হয়েছে, 'প্রথম দৃষ্টিতে, বিষয়বস্তুর বাহ্য উপস্থাপন-রীতির ভিত্তিতে বিচার করলে মার্কস হচ্ছেন ভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভাববাদী — কথাটির অবশ্য জার্মান অর্থে অর্থাৎ কদর্থে। কিন্তু আসলে অর্থতত্ত্বগত সমালোচনার কাজে তিনি তাঁর পূর্বগামীদের সকলের তুলনায় বহুগুণ বেশী বস্তুবাদী। তাঁকে কোনমতেই ভাববাদী বলা যায় না।' এই লেখকের নিজের সমালোচনা থেকেই কয়েকটি অংশের উদ্ধৃতি দিয়েই তাঁকে সবচেয়ে ভালো জবাব দেওয়া যায়। আমার যে সব পাঠকের কাছে রুশ ভাষায় মূল লেখাটি অনধিগম্য, তাঁদের কাছে এই উদ্ধৃতি আকর্ষণীয় হতে পারে।

আমার 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' গ্রন্থের ১৮৫৯-এর বার্লিন সংস্করণের ভূমিকায়, ৪—৭ পৃষ্ঠায়, যেখানে আমি আমার পদ্ধতির বস্তুবাদী ভিত্তির আলোচনা করেছি তা থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে দিয়ে লেখক বলেছেন:

'যে জিনিষটি মার্কসের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, যে ব্যাপারের অনুসন্ধানে তিনি ব্যাপৃত, তার অন্তর্নিহিত নিয়মের উদ্ঘাটন। আর কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালের মধ্যে এই ঘটনার যে একটি নির্দিষ্ট রূপ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান সেই দিক থেকে ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করছে যে নিয়ম শুধু সেইটাই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর কাছে আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল ঘটনার পরিবর্তনের নিয়ম, তাদের বিকাশের নিয়ম, অর্থাৎ তাদের এক রূপ থেকে রূপান্তরের, এক ধরনের সম্পর্কাবলী থেকে আর এক ধরনের সম্পর্কাবলীতে উত্তরণের নিয়ম। নিয়মটি একবার আবিষ্কৃত হবার পর, সমাজ-জীবনে যেসব ফলাফলের মধ্য দিয়ে এর প্রকাশ, সেগুলির তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করেছেন। কাজে কাজেই মার্কস কেবল একটি বিষয় নিয়েই ব্যস্ত: কঠোর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমাজ পরিস্থিতির ক্রমিক নির্ধারিত ধারার অনিবার্যতা প্রমাণ; এবং মৌলিক ভিত্তি হিসাবে যে সব তথ্য তাঁর কাজে লাগবে, যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে তাদের প্রতিষ্ঠা। এর জন্য তাঁর একই সঙ্গে এটুকু প্রমাণ করাই যথেষ্ট যে বর্তমান ব্যবস্থা আবশ্যিক, এবং অপর যে ব্যবস্থায় এর রূপান্তর অনিবার্য তা-ও সমান আবশ্যিক এবং সেটা মানুষ বিশ্বাস করুক বা না করুক, এ বিষয়ে সচেতন হোক আর না হোক। মার্কস সমাজের গতিকে প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক একটি প্রক্রিয়া বলেই বিবেচনা করেন, এই প্রক্রিয়া যে নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সে নিয়ম মানুষের ইচ্ছা, চেতনা এবং বুদ্ধি নিরপেক্ষই শুধু নয়, বরং সেই ইচ্ছা, চেতনা ও বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণকারী ... যদি সভ্যতার ইতিহাসে সচেতন উপাদানটি এত গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করে তবে একথা তো স্বয়ংসিদ্ধ যে, যে বিচারানুসন্ধানের বিষয়বস্তু সভ্যতা, সে অনুসন্ধান নিজের ভিত্তি হিসাবে চেতনার কোনো ফল বা কোনো রূপকে গ্রহণ করবে সবচেয়ে কম। অর্থাৎ কোনো

ভাব নয়, একমাত্র বাস্তব ঘটনা থেকেই তার শুরু। এই ধরনের অনুসন্ধান নিজেকে নিবদ্ধ রাখবে ঘটনাকে ভাবের সঙ্গে নয় — অপর এক ঘটনার সঙ্গে প্রতিস্থাপন ও তুলনার মধ্যে। এই অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যা বিশেষ জরুরি তা হচ্ছে এই যে, যতদূর সম্ভব যথাযথভাবে উভয় ঘটনারই অনুসন্ধান করতে হবে, এবং সত্যসত্যই যে তারা পরস্পর এক বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর, তা দেখতে হবে। কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল এরকম বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি যে ক্রমান্বয়িক ধারায়, যে ঘটনাপরম্পরা ও যে পর্যায়ক্রমের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে তাদের কঠোর বিশ্লেষণ।

কিন্তু বলা যেতে পারে যে, বর্তমানের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হোক কিংবা অতীতের ক্ষেত্রেই হোক, অর্থনৈতিক জীবনের সাধারণ নিয়মগুলি এক এবং অভিন্ন। একথা মার্কস সরাসরি অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে এই ধরনের অমূর্ত নিয়মের অস্তিত্ব নেই। পক্ষান্তরে, তাঁর মতে প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্বের নিজস্ব নিয়ম আছে... সমাজ যখনই বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্ব কাটিয়ে সেই স্তর থেকে অপর একটি স্তরে উত্তীর্ণ হতে থাকে তখনই সে অন্য নিয়মেরও অধীন হতে শুরু করে। এক কথায় বলা যায় যে, জীববিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ক্রমবিকাশের ইতিহাসেরই অনুরূপ একটি ঘটনা হল অর্থনৈতিক জীবন। পুরনো অর্থতাত্ত্বিকেরা যে অর্থতাত্ত্বিক নিয়মাবলীর সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নবিজ্ঞানের নিয়মাবলীর সাদৃশ্য দেখাতেন, তাতে তাঁরা অর্থতাত্ত্বিক নিয়মাবলীর প্রকৃতি ভুল বুঝেছিলেন। ঘটনার বেশী পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণে দেখা যাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মতোই বিভিন্ন সমাজসত্তার মধ্যেও মৌলিক পার্থক্য আছে। কেবল তাই নয়, এই সত্তাগুলির বিভিন্ন গঠনের ফলে, তাদের বিশেষ বিশেষ ধরনের অঙ্গের ফলে, ঐসব অঙ্গ যে বিভিন্ন অবস্থায় কাজ করে ইত্যাদি, এই সবের ফলে একই ঘটনা একেবারে ভিন্ন নিয়মের বশীভূত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সর্বকালে ও সর্বক্ষেত্রে জনসংখ্যাবৃদ্ধির নিয়মটা একই, একথা মার্কস অস্বীকার করছেন। পক্ষান্তরে তিনি দৃঢ়ভাবে এ কথাই বলেছেন যে বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরেরই জনসংখ্যা সম্পর্কে নিজ নিজ নিয়ম আছে... উৎপাদন-শক্তির বিকাশের মাত্রার বিভিন্নতার সঙ্গেই সামাজিক অবস্থা এবং সেই অবস্থার নিয়ামক নিয়মও বিভিন্ন হয়। যখন মার্কস এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুঁজির আধিপত্যাধীন সমাজ-ব্যবস্থার অনুধাবন ও ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন তিনি কেবল কঠোর বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেই লক্ষ্যটিকেই সূত্রবদ্ধ করেন, যা হওয়া উচিত অর্থনৈতিক জীবনের প্রত্যেকটি যথাযথ অনুসন্ধানের লক্ষ্য। একটা নির্দিষ্ট সমাজসত্তার উদ্ভব, অস্তিত্ব, বিকাশ, বিনাশ এবং আরেক উন্নততর সমাজসত্তা কর্তৃক তার স্থান গ্রহণ যে বিশেষ নিয়মসমূহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই নিয়মগুলির উদ্ঘাটনের মধ্যেই এই ধরনের অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক মূল্য। বাস্তবপক্ষে এই মূল্যই রয়েছে মার্কসের গ্রন্থটিতে।'

লেখক প্রকৃতপক্ষে আমার পদ্ধতি বলে যেটিকে গ্রহণ করেছেন এবং এমন

চমৎকারভাবে ও (আমার দ্বারা সেই পদ্ধতি প্রয়োগ প্রসঙ্গে) এমন সহৃদয়তার সঙ্গে যা চিত্রিত করেছেন তা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির চিত্রায়ণ ছাড়া আর কী?

অবশ্যই অনুসন্ধানের পদ্ধতি থেকে উপস্থাপনার পদ্ধতি নিশ্চয়ই রূপের ক্ষেত্রে পৃথক হবে। প্রথমটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিভিন্ন মালমসলাকে আয়ত্ত করে, বিকাশের বিভিন্ন ধরনগুলিকে বিশ্লেষণ করে, তাদের অন্তর্নিহিত সম্পর্কগুলিকে নির্ণয় করে। এই কাজ সম্পন্ন হবার পরেই কেবল প্রকৃত গতিধারা সম্যকভাবে বর্ণনা করা সম্ভব। এ কাজ যদি সাফল্যের সঙ্গে করা যায়, সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুটির জীবনধারা যদি আয়নার মতো নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তা হলে মনে হতে পারে যেন আমাদের সামনে কেবল একটা a priori যুক্তি-বিন্যাস দেখছি।

আমার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হেগেলীয় পদ্ধতি থেকে শুধু পৃথক নয়, সরাসরি বিপরীত। হেগেলের কাছে মানব-মস্তিষ্কের জীবনপ্রক্রিয়া, অর্থাৎ চিন্তনের প্রক্রিয়া, যাকে তিনি 'ভাব' নাম দিয়ে একটি স্বাধীন কর্তায় রূপান্তরিত করেছেন, তাই হল বাস্তব জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং বাস্তব জগৎ হল শুধুমাত্র এই 'ভাব'এর বাহ্যিক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ। অন্যপক্ষে, আমার কাছে ভাব মানব-মনে প্রতিবিম্বিত এবং চিন্তার রূপে রূপায়িত বাস্তব জগৎ ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে যখন হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্বই ছিল রেওয়াজ, তখনই আমি তার রহস্য-সৃষ্টির দিকটাকে সমালোচনা করি। কিন্তু যখন আমি 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ড রচনায় ব্যস্ত সেই সময় যাঁরা আজ জার্মানির সংস্কৃতিরাজ্যে বাগাড়ম্বর করে থাকেন সেই খিটখিটে, উদ্ধত, মাঝারি বুদ্ধি আধুনিকেরা (Epigoni) হেগেল সম্বন্ধে ঠিক তেমন আচরণে আনন্দ পাচ্ছিলেন, লেসিং-এর সমকালে মহাবীর মজেস মেন্দেলসন যেভাবে দেখতেন স্পিনোজাকে অর্থাৎ 'মরা কুকুরের' মতো। সেইজন্যই আমি প্রকাশ্যে নিজেকে সেই শক্তিশালী মনীষীর ছাত্র বলে ঘোষণা করেছিলাম, এবং এমন কি মূল্যতত্ত্বের অধ্যায়ে এখানে সেখানে তাঁর বিশেষ বাচনভঙ্গি নিয়ে খেলাও করেছি। হেগেলের হাতে দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব রহস্যায়িত হলেও সম্যক ও সচেতনভাবে এই পদ্ধতির ক্রিয়ার সাধারণ রূপটিকে সর্বপ্রথম উপস্থিত করতে তাঁর বাধেনি। হেগেলের পদ্ধতি দাঁড়িয়ে ছিল মাথায় ভর দিয়ে। রহস্যের খোলসের ভিতর থেকে যুক্তিসিদ্ধ শাঁসটি আবিষ্কার করতে হলে একে আবার উল্টিয়ে ঠিকমত দাঁড় করাতে হবে।

রহস্যবাদী রূপেই দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব জার্মানিতে রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কারণ, মনে হত যেন প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থাকে তা নবরূপ ও মহিমা দান করছে। অন্যদিকে যুক্তিসিদ্ধ রূপে তা বুর্জোয়াতন্ত্র ও তাদের মতসর্বস্ব অধ্যাপকদের কাছে বিশ্রী ও জঘন্য ঠেকে কারণ, দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের যুক্তিসিদ্ধ রূপের মধ্যে প্রচলিত ব্যবস্থার উপলব্ধি ও ইতিবাচক স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আছে সেই ব্যবস্থার নেতীকরণ, অবশ্যম্ভাবী

ভাঙনেরও স্বীকৃতি: কারণ, এই তত্ত্ব ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত প্রতিটি সমাজরূপকে প্রবহমান গতিধারা হিসাবে দেখে এবং সেই হেতু তার ক্ষণিক অস্তিত্বের মতো তার অস্থায়ী প্রকৃতিটাও সমান নজরে রাখে; কারণ, এ তত্ত্বের ওপর জোর করে কিছু চাপানো যায় না, এবং এ তত্ত্ব মর্মগতভাবেই সমালোচনামূলক ও বৈপ্লবিক।

আধুনিক শ্রমশিল্প যে পর্যায়ক্রমিক চক্রের মধ্য দিয়ে চলে এবং যে চক্রের চরম বিন্দু হল বিশ্বজনীন সংকট, — সেই চক্রের পরিবর্তনসমূহের মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদী সমাজের গতিধারায় নিহিত বিরোধগুলি কাজের মানুষ বুর্জোয়াদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। সেই সংকট আর একবার ঘনায়মান, যদিও তা এখনো তার অতিপ্রাথমিক অবস্থাতেই রয়েছে: আর এই সংকটের কার্যক্ষেত্রের সর্বজনীনতা এবং এর ক্রিয়াকাণ্ডের তীব্রতা নতুন, পবিত্র প্রুশো-জার্মান সাম্রাজ্যের গজিয়ে ওঠা ভুঁইফোরদের মাথাতেও দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব ঢুকিয়ে দেবে।

কার্ল মার্কস

লণ্ডন, ২৪ জানুয়ারি, ১৮৭৩

মার্কসের 'পুঁজি'র দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত

লণ্ডন, ১৮৮৭, ইংরেজী সংস্করণ অনুসারে অনূদিত এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাদিত

কার্ল মার্কস

পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক ঝোঁক

'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩২শ অধ্যায়

পুঁজির আদি সঞ্চয়, অর্থাৎ তার ঐতিহাসিক উৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে কী দাঁড়ায়? যে পরিমাণে তা দাস ও ভূমিদাসদের সরাসরি মজুরি-খাটা শ্রমিকে রূপান্তর নয়, এবং সেইহেতু শুধুমাত্র রূপের পরিবর্তন নয়, সেই পরিমাণে তার একমাত্র মানে হল সাক্ষাৎ উৎপাদকদের উচ্ছেদসাধন, অর্থাৎ নিজের শ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ। সামাজিক, যৌথ সম্পত্তির বিপরীত প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব একমাত্র সেখানেই সম্ভব যেখানে শ্রমের উপায় ও শ্রম প্রয়োগের বাহ্যিক শর্তাবলী থাকে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন লোকের হাতে। কিন্তু এইসব লোক শ্রমজীবী, কি শ্রমজীবী নয়, সেই অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রকৃতির পার্থক্য হয়। প্রথম দৃষ্টিতে তার যে অসংখ্য ছায়াপাত ধরা পড়ে তা এই দুই চরম অবস্থানের অন্তর্বর্তী নানা পর্যায়ের অনুরূপ। শ্রমকারীর উৎপাদনের উপায়সমূহে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হল ছোট শিল্পের ভিত্তি — তা সে কৃষিশিল্পই হোক, বা শ্রমশিল্পই হোক, বা উভয়ই হোক; ছোট শিল্প আবার সামাজিক উৎপাদন ও শ্রমকারী মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশে এক অতি প্রয়োজনীয় শর্ত। উৎপাদনের এই ক্ষুদ্রায়তন পদ্ধতির অস্তিত্ব অবশ্য দাস প্রথায়, ভূমিদাস ব্যবস্থায় ও অধীনতার অন্যান্য স্তরেও দেখা যায়। কিন্তু যেখানে শ্রমকারী শ্রমের যে উপায় কাজে লাগায় তার মালিক সে নিজেই — কৃষক যে জমি চাষ করে তার মালিক সে নিজেই, কারিগর দক্ষহাতে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তার মালিক সে নিজেই, — একমাত্র সেখানেই এই উৎপাদন-পদ্ধতি বিশেষ উন্নতিলাভ করে, তার সমস্ত উদ্যোগ স্ফুরিত হয়, এবং যথার্থ চিরায়ত স্বকীয় রূপটি গ্রহণ করে। এই ধরনের উৎপাদন-পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া হয় যে, জমি টুকরা টুকরা করে ফেলা হয়েছে এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায়ও ছড়িয়ে পড়েছে। এই পদ্ধতি যেমন উৎপাদনের এইসব উপায়ের

কেন্দ্রীকরণ বর্জন করে চলে, তেমনি সমবায়ীকরণ, উৎপাদনের প্রতিটি পৃথক ধারায় শ্রমবিভাগ, সমাজ কর্তৃক প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদনের কাজে তার প্রয়োগ এবং সামাজিক উৎপাদন-শক্তিসমূহের স্বাধীন বিকাশও বর্জন করে চলে। সংকীর্ণ ও কমবেশী আদিম গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ এক সমাজ ও উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গেই একমাত্র এ পদ্ধতি খাপ খায়। পেকের ঠিকই বলেছিলেন যে এ পদ্ধতিকে চিরস্থায়ী করার মানে হল 'সর্বজনীন মাঝারিপনার বিধান দেওয়া'। বিকাশের এক নির্দিষ্ট স্তরে এ পদ্ধতি নিজেই তার বিলোপের বৈষয়িক কারিকাগুলিকে সৃষ্টি করে। সেই মুহূর্ত থেকে সমাজের বুকে নতুন নতুন শক্তি ও আবেগ জেগে ওঠে; কিন্তু পুরানো সামাজিক সংগঠন তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দমিত করে রাখে। তাকে ধ্বংস করতেই হয়; তাকে ধ্বংস করাও হয়। তার ধ্বংস, ব্যক্তিগত ও বিক্ষিপ্ত উৎপাদনের উপায়সমূহের সমাজগত কেন্দ্রীভূত উপায়ে রূপান্তর, বহু ব্যক্তির অতি ক্ষুদ্র সম্পত্তিগুলির অল্প কয়েকজনের বিরাট সম্পত্তিতে পরিণতি, ভূমি থেকে, প্রাণধারণের উপকরণ ও শ্রমের উপায় থেকে বিশাল জনসংখ্যার উচ্ছেদ — জনগণের বিরাট অংশের এই ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক উচ্ছেদই পুঁজির ইতিবৃত্তের মুখবন্ধ। এর মধ্যে আসে বলপ্রয়োগমূলক নানা পদ্ধতি, তার ভিতর যেগুলি পুঁজির আদি সঞ্চয়ের প্রণালী হিসাবে যুগান্তকারী, শুধু তাদের কথাই আমরা প্রসঙ্গত আলোচনা করেছি। নিষ্ঠুর বর্বরতার সঙ্গে আর অতি কলঙ্কিত, অতি ঘৃণ্য, অতি হীন, অতি নীচ-জঘন্য রিপুর প্রকোপে সাক্ষাৎ উৎপাদকদের উচ্ছেদসাধন করা হয়েছিল। যে স্বোপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল বলা চলে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন শ্রমকারী ব্যক্তিকে তার শ্রমের শর্তাবলীর সঙ্গে একত্রে মেলানো, তার জায়গায় আসে পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি — যার ভিত্তি হল অপরের, নামে মাত্র স্বাধীন শ্রমের অর্থাৎ মজুরি-খাটা শ্রমের শোষণ।*

রূপান্তর সাধনের এই ধারা যখনই পুরানো সমাজকে আপাদমস্তক যথেষ্ট পরিমাণ পচিয়ে ফেলে, যখনই মেহনতকারীরা প্রলেতারীয়তে পরিণত হয়, তাদের শ্রমের উপায়সমূহ যখনই পর্যবসিত হয় পুঁজিতে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা যখনই নিজের পায়ে দাঁড়ায়, তখনই শ্রমের আরো সমাজীকরণ এবং ভূমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায়সমূহের সমাজ-নিয়োজিত উৎপাদনের উপায়সমূহে, অর্থাৎ সাধারণ উপায়সমূহে

* 'আমরা এমন এক অবস্থায় রয়েছি যা সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন ... আমরা সম্পত্তির প্রতিটি রূপকে শ্রমের প্রতিটি রূপ থেকে পৃথক করার চেষ্টা করছি।' সিসমন্দি, ***Nouveaux Principes de l'Economie Politique, Vol. II, p. 434.*** (মার্কসের টীকা।)

মার্কস এখানে এস. সিসমন্দির লেখা **Nouveaux principes d'economie politique, ou de la richesse dans ses rapports avec la population, Vols. I-II, Paris, 1827** বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের কথা উল্লেখ করছেন। — সম্পাঃ

আরো রূপান্তর সাধন, তথা ব্যক্তিগত মালিকদেরও আরো উচ্ছেদসাধন এক নতুন রূপ নেয়। যে শ্রমকারী নিজের জন্য কাজ করছে এবার আর তাকে উচ্ছেদের কথা নয়, এবার যে পুঁজিপতি বহু শ্রমিককে শোষণ করছে তাকেই উচ্ছেদ করতে হবে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের অন্তর্লীন নিয়মের ক্রিয়াতেই, পুঁজির কেন্দ্রীকরণের ফলেই এই উচ্ছেদ সাধিত হয়। একজন পুঁজিপতি সবসময়েই বহু পুঁজিপতিকে শেষ করে। এই কেন্দ্রীকরণ, বা স্বল্পসংখ্যক পুঁজিপতি দ্বারা বহু পুঁজিপতির এই উচ্ছেদসাধনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমবর্ধমান আকারে বিকাশ লাভ করতে থাকে শ্রমপ্রক্রিয়ার সমবায় রূপ, বিজ্ঞানের সচেতন কারিগরী প্রয়োগ, পরিকল্পিত জমিচাষ, শ্রমের যন্ত্রপাতির এমন শ্রমের যন্ত্রপাতিতে রূপান্তর যা শুধু সমষ্টিগতভাবেই ব্যবহার করা চলে, যৌথ সমাজীকৃত শ্রমের উৎপাদনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে উৎপাদনের সকল উপায়সমূহের মিতব্যয়ীকরণ, বিশ্ববাজারের জালে সব জাতির বিজড়ণ, আর সেইসঙ্গে পুঁজিবাদী আমলের আন্তর্জাতিক চরিত্র। যেসব ধনকুবের এই রূপান্তরসাধন-ক্রিয়ার সবটুকু সুবিধা জবরদখল করে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে, তাদের সংখ্যা যেমন ক্রমাগত কমতে থাকে, তারই সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে দারিদ্র্য, নিপীড়ন, দাসত্ব, অধঃপতন ও শোষণের পুঞ্জীভূত পরিমাণ, কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহও বাড়তে থাকে, সে শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, পুঁজিবাদী উৎপাদনক্রিয়ার ব্যবস্থাতেই সে শ্রেণী হয়ে উঠে সুশৃঙ্খল, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত। পুঁজির একচেটিয়া ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ও তারই নেতৃত্বে উৎপাদনের যে পদ্ধতির উদ্ভব ও উন্নতি হয়েছে, সে পদ্ধতির পথে শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়ায় সেই একচেটিয়া ব্যবস্থা। উৎপাদনের উপায়সমূহের কেন্দ্রীকরণ আর শ্রমের সমাজীকরণ শেষ পর্যন্ত এমন এক বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছায় যেখানে পুঁজিবাদী খোলসের সঙ্গে তা আর খাপ খায় না। খোলসটা ফেটে যায়। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৃত্যু ঘণ্টা বাজে। উচ্ছেদ ঘটে উচ্ছেদকারীদের।

পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির যা ফল সেই পুঁজিবাদী দখলী ব্যবস্থা থেকেই পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি। স্বীয় শ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির এই হল প্রথম নেতীকরণ। প্রাকৃতিক নিয়মের অমোঘতায় পুঁজিবাদী উৎপাদন নিজেরই নেতির সৃষ্টি করে। এ হল নেতির নেতীকরণ। এতে উৎপাদকের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানা পুনঃস্থাপিত হয় না, কিন্তু সে পায় পুঁজিবাদী যুগের অর্জনের ভিত্তিতে অর্থাৎ সহযোগিতা এবং সমষ্টিগতভাবে ভূমি ও উৎপাদনের উপায়সমূহের অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

যে পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাস্তবিক পক্ষে ইতিমধ্যেই সমাজীকৃত উৎপাদনের উপর নির্ভর করছে তাকে সমাজীকৃত সম্পত্তিতে রূপান্তর সাধনের তুলনায় স্বভাবতই

অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী, প্রচণ্ডতর ও কঠিনতর ছিল ব্যক্তি শ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পংজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াটা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে হয়েছিল অল্প কয়েকজন জবরদখলী দ্বারা ব্যাপকজনের উচ্ছেদসাধন; আর পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে ঘটছে ব্যাপক জনগণ কর্তৃক অল্প কয়েকজন জবরদখলীর উচ্ছেদ।*

১৮৬৭ সালে হামবুর্গে মার্কসের 'পংজি' গ্রন্থে প্রকাশিত

লণ্ডন, ১৮৮৭, ইংরেজী সংস্করণ অনুযায়ী মুদ্রিত, এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাদিত
ইংরেজী থেকে অনুবাদ

---

* 'যন্ত্রশিল্পের যে অগ্রগতি বুর্জোয়া শ্রেণী না ভেবেই বাড়িয়ে চলে, তার ফলে শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা-হেতু বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আসে সম্মিলন-হেতু বিপ্লবী ঐক্য। সুতরাং, যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন করে ও উৎপন্ন দখল করে, আধুনিক শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটাই কেড়ে নিচ্ছে। তাই বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টি করছে সর্বোপরি তারই সমাধি-খনকদের। বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ, দুইই সমান অনিবার্য ... আজকের দিনে বুর্জোযাদের মুখোমুখি যেসব শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে শুধু প্রলেতারিয়েত হল প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী। অপর শ্রেণীগুলি আধুনিক যন্ত্রশিল্পের সামনে ক্ষয় হতে হতে লোপ পায়; প্রলেতারিয়েত হল সেই যন্ত্রশিল্পের বিশিষ্ট ও অপরিহার্য সৃষ্টি ... নিম্ন মধ্যবিত্ত, ছোট হস্তশিল্প-কারখানার মালিক, দোকানদার, কারিগর, চাষী — এরা সকলে বুর্জোযাদের বিরুদ্ধে লড়ে মধ্য শ্রেণীর টুকরো হিসাবে নিজেদের অস্তিত্বটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্য ... তাই তারা বিপ্লবী নয়, রক্ষণশীল। বলতে গেলে প্রতিক্রিয়াশীলও, কেননা ইতিহাসের চাকা পিছনে ঘোরাবার চেষ্টা করে তারা।' (মার্কসের টীকা।) মার্কস এই উদ্ধৃতিটি নিয়েছিলেন 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' থেকে, এই খণ্ডের প্রথম অংশের ৩৫-৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

মার্কসের 'পুঁজি'

১

পুঁজিপতি এবং শ্রমিকেরা যতদিন ধরে পৃথিবীতে আছে ততদিনের মধ্যে এমন কোনো বই বেরোয়নি শ্রমিকদের কাছে যার গুরুত্ব আমাদের আলোচ্য বইটির সমান। পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্ক নিয়ে, আমাদের সমগ্র বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা যে অক্ষের উপর ঘুরছে তা নিয়ে এই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করা হল; আর তা করা হয়েছে এমন সম্পূর্ণতা ও তীক্ষ্ণতার সঙ্গে যা শুধু একজন জার্মানের পক্ষেই সম্ভব। ওয়েন, সাঁ-সিমোঁ বা ফুরিয়ের লেখা এখনও মূল্যবান এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে, তবু সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়ালে পর্যবেক্ষকের চোখে নিচেকার পার্বত্যদৃশ্য যেমনভাবে ধরা দেয়, তেমনই স্পষ্টভাবে এবং সমগ্রভাবে আধুনিক সামাজিক সম্পর্কের সমগ্র ক্ষেত্র দেখতে পারার মতো উচ্চতায় আরোহণের কাজটা একজন জার্মানের জন্যই রাখা ছিল।

অর্থশাস্ত্র এতদিন পর্যন্ত আমাদের শিখিয়েছিল যে, শ্রম হল সব সম্পদের উৎস আর সব মূল্যের মাপকাঠি; অর্থাৎ দুটো জিনিসের উৎপাদনে যদি সমান শ্রমকাল লেগে থাকে তাহলে তাদের মূল্য হবে সমান, এবং একটির বিনিময়ে অন্যটিকে নেওয়া চলবে, কারণ গড়পড়তার হিসাবে কেবল সমান সমান মূল্যেরই পারস্পরিক বিনিময় সম্ভব। কিন্তু অর্থশাস্ত্র সঙ্গে সঙ্গে একথাও শেখায় যে, এক ধরনের সঞ্চিত শ্রমও আছে, যাকে আখ্যা দেওয়া হয় পুঁজি, এই পুঁজির মধ্যে এমন সহায়ক উৎস আছে যার ফলে পুঁজি জীবন্ত শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা শতগুণ, সহস্রগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং তারই বদলে দাবি করে একটা নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ যাকে বলা হয় মুনাফা বা লাভ। আমাদের সবারই জানা আছে যে বাস্তবক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা ঘটে এমনভাবে যাতে সঞ্চিত মৃত শ্রমের মুনাফা ক্রমাগত আরও বিশাল আকার ধারণ করতে থাকে, পুঁজিপতির পুঁজি ক্রমাগত হয়ে উঠতে থাকে আরও বিপুল, অথচ জীবন্ত শ্রমের মজুরি ক্রমাগত কমে যায় আর শুধু মজুরির উপরই নির্ভর করে যে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক বেঁচে আছে তাদের সংখ্যা ও দারিদ্র্য আরও বেড়ে চলে। এই বিরোধের সমাধান কোথায়? কী করে পুঁজিপতির মুনাফা থাকে

যদি শ্রমিক তার উৎপন্ন দ্রব্যে যেটুকু শ্রম যুক্ত করে দেয় তার পূর্ণমূল্য সে নিজেই পেয়ে যায়? অথচ তাই হওয়া উচিত, কারণ শুধুমাত্র সমান সমান মূল্যেরই পারস্পরিক বিনিময় চলে। অন্যদিকে, বহু অর্থতত্ত্ববিদেরা যা স্বীকার করেন, সেভাবে শ্রমিকের উৎপন্ন দ্রব্য যদি শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, তাহলে সমান সমান মূল্যের পারস্পরিক বিনিময় হয় কী ভাবে, শ্রমিক তার উৎপন্ন দ্রব্যের পূর্ণমূল্য পায় কী করে? এতদিন পর্যন্ত অর্থশাস্ত্র এই বিরোধের সামনে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়েছিল; এমন সব কথা বিব্রতভাবে লিখে আসছে বা আমতা আমতা করে বলেছে যার কোনো অর্থ হয় না। এমন কি অর্থশাস্ত্রের পূর্বতন সব সমাজতন্ত্রী সমালোচকরাও এই বিরোধেরই উপর জোর দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি; এতদিন কেউ তার সমাধান করেননি। শেষ পর্যন্ত এখন মার্কস একেবারে মুনাফার মূল পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিলেন কী প্রক্রিয়ায় মুনাফার উৎপত্তি হয়; তার ফলে সবকিছু তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

পুঁজির বিকাশের ধারা খুঁজতে গিয়ে মার্কস এই সহজ ও অতি পরিচিত স্পষ্ট তথ্যটির থেকে শুরু করলেন যে, বিনিময়ের মাধ্যমে পুঁজিপতিরা তাদের পুঁজির মূল্য বাড়ায়: তারা টাকা দিয়ে পণ্যদ্রব্য কেনে আর তার চেয়ে বেশী দামে পরে সেগুলিকে বেচে দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো পুঁজিপতি ১,০০০ টেলার দিয়ে তুলো কিনে সেটা আবার বিক্রি করে দেয় ১,১০০ টেলারে। এইভাবে সে ১০০ টেলার 'রোজগার করে'। গোড়ার পুঁজির উপর অতিরিক্ত এই ১০০ টেলারকে মার্কস নাম দিয়েছেন **উদ্বৃত্ত মূল্য**। এই উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস কী? অর্থতত্ত্ববিদদের স্বীকৃতি অনুযায়ী শুধু সমান সমান মূল্যের মধ্যেই বিনিময় হয়, আর অমূর্ত তত্ত্বের ক্ষেত্রে একথা নিশ্চয় সত্য। তাই একটি রৌপ্য টেলারের সঙ্গে ত্রিশটি রৌপ্য গ্রশেনের বিনিময়ের কিংবা খুচরোগুলির সঙ্গে রৌপ্য টেলারের পুনর্বিনিময়ের ভিতর দিয়ে যেমন কোনও উদ্বৃত্ত মূল্য আসতে পারে না তেমনই তুলো কিনে আবার বিক্রি করার ফলেও কোনো উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। এ পদ্ধতিতে কেউই আরও ধনী বা আরও দরিদ্র হতে পারে না। বিক্রেতারা পণ্যদ্রব্যের মূল্যের চেয়ে বেশী দামে বিক্রি করা বা ক্রেতারা মূল্যের চেয়ে কমে কেনার ভিতর দিয়েও কোনো উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপত্তি সম্ভব নয়; কারণ, প্রত্যেকেই পালাক্রমে ক্রেতা ও বিক্রেতা হয় আর সেইজন্য আবার সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে সমতা স্থাপিত হতে বাধ্য। তেমনই আবার ক্রেতা ও বিক্রেতারা পারস্পরিকভাবে পরস্পরকে মেরে যাওয়ার ফলেও উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হতে পারে না; কারণ এতে নতুন বা উদ্বৃত্ত কোনো মূল্য সৃষ্টি হয় না, শুধু বর্তমান পুঁজিটাই ভিন্নভাবে পুঁজিপতিদের মধ্যে বণ্টন হতে পারে মাত্র। পুঁজিপতি যথার্থ মূল্যেই পণ্য কেনে ও যথার্থ মূল্যেই পণ্য বেচে, তবু সে যতটা মূল্য বিনিয়োগ করেছিল তার থেকে বেশী মূল্য পায়। এটা সম্ভব হয় কী করে?

সমাজের বর্তমান অবস্থায় পণ্যদ্রব্যের বাজারে পুঁজিপতি পায় এমন **এক পণ্য** যার এক অদ্ভুত গুণ আছে: **এই পণ্যের ব্যবহারই হল নতুন মূল্যের উৎস, এতে নতুন মূল্যের সৃষ্টি হয়।** এই পণ্যের নাম **শ্রমশক্তি।**

শ্রমশক্তির মূল্য কী? প্রতিটি পণ্য উৎপাদনে যতখানি শ্রম প্রয়োজন হয় তা দিয়েই মাপা হয় সেই পণ্যের মূল্য। শ্রমশক্তির অস্তিত্ব হল জীবন্ত শ্রমিকের মধ্যে, নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবং পরিবার প্রতিপালনের জন্য — এই পরিবারই তার মৃত্যুর পরে শ্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে — তার নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রাণধারণের উপকরণ প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রাণধারণের এই উপকরণ উৎপাদনে যতখানি শ্রমকাল লাগে তাই হল শ্রমশক্তির মূল্য। পুঁজিপতি প্রতি সপ্তাহে এই মূল্যটুকু দিয়ে শ্রমিকের এক সপ্তাহের শ্রম ব্যবহার করার অধিকার কিনে নেয়। অর্থতত্ত্ববিদ ভদ্রলোকেরা শ্রমশক্তির মূল্য সম্পর্কে এতদূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে খুবই একমত হবেন।

এরপর পুঁজিপতি তার শ্রমিককে কাজে লাগায়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাপ্তাহিক মজুরির সমান পরিমাণ শ্রম শ্রমিক করে ফেলবে। ধরা যাক যে একজন শ্রমিকের সাপ্তাহিক মজুরির পরিমাণ হয় তিন শ্রমদিনের সমান। তাহলে সোমবার থেকে শুরু করে বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে সে **প্রাপ্ত মজুরির পূর্ণমূল্য** পুঁজিপতিকে **ফিরিয়ে দেয়।** কিন্তু তখন কি সে কাজ বন্ধ করে দেয়? মোটেই না। পুঁজিপতি তার **সপ্তাহেরই** শ্রম কিনেছে, তাই সপ্তাহের শেষ তিনটি দিনও তাকে কাজ করে যেতে হবে। শ্রমিকের মজুরি প্রত্যর্পণের জন্য যে সময় প্রয়োজন হয় তার উপর বাড়তি এই যে **উদ্বৃত্ত শ্রম** এটাই হল **উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস,** মুনাফার, পুঁজির ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির উৎস।

এ কথা বলবেন না যে শ্রমিক প্রাপ্ত মজুরির সমপরিমাণ কাজ তিন দিনে করে দিয়ে বাকি তিন দিন পুঁজিপতির জন্য খাটে — এটা হল একটা খেয়ালখুশিমতো ধরে নেওয়া ব্যাপার; মজুরি ফিরিয়ে দেবার জন্য শ্রমিকের ঠিক তিন দিন, না দুদিন, না চার দিন লাগে সে কথা নিশ্চয় এখানে অবান্তর, অবস্থা অনুযায়ী তার তারতম্য ঘটবে; আসল কথা হল এই যে পুঁজিপতি যতখানি শ্রমের জন্য পয়সা দিয়েছে তা ছাড়াও এমন কিছুটা শ্রম আদায় করে নেয় **যার জন্য সে পয়সা দেয়নি,** আর একথাটা আদৌ খেয়ালখুশিমতো ধরে নেওয়া ব্যাপার নয়, কারণ শেষ পর্যন্ত যেদিন পুঁজিপতি যতটা মজুরি দিয়েছে ঠিক তার সমান শ্রমই শ্রমিকের কাছ থেকে আদায় করবে সেইদিনই সে তার কারখানা বন্ধ করে দেবে, কারণ আসলে তখন তার সমস্ত মুনাফা দাঁড়াবে শূন্যে।

এইখানেই ঐ সব বিরোধের সমাধান পাওয়া যাচ্ছে। উদ্বৃত্ত মূল্যের (যার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পুঁজিপতির মুনাফা) উদ্ভবটা এখন বেশ স্পষ্ট ও স্বাভাবিক। শ্রমশক্তির মূল্য দেওয়া হয়, কিন্তু পুঁজিপতি এই শ্রমশক্তি থেকে যতখানি মূল্য আদায় করে নেয় তার তুলনায় অনেক কম সে মূল্য, এবং ঠিক এই পার্থক্যটুকু, এই **অবৈতনিক**

শ্রমটুকুই হল পংজিপতির অংশ, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে গোটা পংজিপতি শ্রেণীর অংশ। কারণ, তুলোর দাম যদি না বেড়ে থাকে, তাহলে উপরোক্ত উদাহরণে তুলোর ব্যবসায়ীরও তুলোর থেকে যে লাভ এল সেটাও অবৈতনিক শ্রম দিয়েই গঠিত হতে বাধ্য। ব্যবসায়ীটি নিশ্চয় তা বিক্রি করেছে কোনো বস্ত্র উৎপাদকের কাছে যে তার উৎপন্ন দ্রব্য থেকে ১০০ টেলার ছাড়া আরও কিছু মনাফা নিশ্চয় আদায় করতে সক্ষম; এবং তাই যেটুকু অবৈতনিক শ্রম সে আত্মসাৎ করেছে সেটাই সে ব্যবসায়ীর সঙ্গে ভাগ করে নেয়। সমাজের যে সব সদস্য কাজ করে না এই অবৈতনিক শ্রমই সাধারণভাবে তাদের প্রতিপালন করছে। রাষ্ট্রীয় ও পৌর করের যতটা পংজিপতি শ্রেণীর ওপর পড়ে সেটা এবং জমির মালিকের প্রাপ্য খাজনা ইত্যাদি এর থেকেই দেওয়া হয়। এর উপরই নির্ভর করছে গোটা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা।

বর্তমান অবস্থায়, যখন একদিকে পংজিপতিদের এবং অন্যদিকে মজুরি-খাটা শ্রমিকদের মাধ্যমে উৎপাদন চলছে, শুধু তখনই অবৈতনিক শ্রমের সৃষ্টি হয়েছে একথা ভাবলে কিন্তু অত্যন্ত ভুল হবে। পক্ষান্তরে চিরকালই পদানত শ্রেণীকে অবৈতনিক শ্রম করতে হয়েছে। যখন দাসত্বই ছিল শ্রম সংগঠনের প্রচলিত প্রথা, সেই দীর্ঘ পুরো যুগটায় দাসদের প্রাণধারণের উপকরণ হিসাবে যেটুকু ফিরে আসত তার থেকে অনেক বেশী শ্রম তাদের করতে হয়েছিল। ভূমিদাসত্বের আমলে, কৃষকের বেগার খাটার একেবারে বিলোপ সাধনের সময় পর্যন্ত অবস্থা একই ছিল। বস্তুত এক্ষেত্রে কৃষক যতখানি সময় নিজের জীবিকা উপার্জনের জন্য কাজ করে এবং যতখানি সময় তাকে মহালের ভূস্বামীর জন্য উদ্বৃত্ত শ্রম করতে হয় তার মধ্যে পার্থক্যটা বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় ঠিক এই কারণে যে, শেষোক্ত ধরনের কাজ সম্পন্ন হয় প্রথম ধরনটির থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে। এখন রূপ বদলে গেছে, কিন্তু আসল জিনিসটা রয়েছে একই, আর যতদিন পর্যন্ত 'উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর সমাজের এক অংশের একচেটিয়া প্রভুত্ব থাকে, ততদিন পর্যন্ত, শ্রমিক স্বাধীনই হোক বা পরাধীনই হোক, তাকে তার নিজ প্রাণধারণের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়টুকুর সঙ্গে যোগ দিতে হবে উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকদের জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদনের জন্য একটা অতিরিক্ত শ্রম-সময়' (মার্কস, পৃঃ ২০২)।

২

আগের প্রবন্ধে আমরা দেখেছি যে পংজিপতি যেসব শ্রমিককে নিয়োগ করে তাদের প্রত্যেককে দুই ধরনের শ্রম করতে হয়: শ্রমকালের একটা অংশে সে পংজিপতির আগাম-দেওয়া মজুরি প্রত্যর্পণ করে, আর তার শ্রমের এই অংশের নাম মার্কস দিয়েছেন

আবশ্যিক শ্রম। কিন্তু তারপরও তাকে কাজ করে যেতে হয় আর সেই সময়টায় সে উৎপাদন করে পুঁজিপতির জন্য **উদ্বৃত্ত মূল্য।** এরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল **মুনাফা।** শ্রমের এই অংশটার নাম উদ্বৃত্ত শ্রম।

ধরে নেওয়া যাক যে সপ্তাহে তিন দিন শ্রমিক নিজের মজুরি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করছে আর বাকি তিন দিন খাটছে পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। অন্যভাবে বললে এর মানে দাঁড়ায় যে, দিনে বারো ঘণ্টা কাজের মধ্যে দৈনিক ছ-ঘণ্টা সে তার মজুরি উৎপাদনের জন্য কাজ করে, আর বাকি ছ-ঘণ্টা কাজ করে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের জন্য। সপ্তাহে মাত্র ছ-টা দিনই পাওয়া যায়, অথবা রবিবার ধরলে বড়জোর সাত দিন, কিন্তু প্রত্যেকটি দিনেই ছয়, আট, দশ, বারো, পনেরো, কিংবা এমন কি আরও বেশী ঘণ্টার কাজ আদায় করে নেওয়া সম্ভব। একদিনের মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক পুঁজিপতির কাছে একটি শ্রমদিন বিক্রি করে। কিন্তু **একটি শ্রমদিন কতক্ষণ?** আট ঘণ্টা না আঠারো ঘণ্টা?

পুঁজিপতির স্বার্থ হল শ্রমদিনটা যতটা সম্ভব লম্বা করা। শ্রমদিন যত বেশী লম্বা হবে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন হবে তত বেশী। শ্রমিক ন্যায্যভাবেই অনুভব করে যে মজুরি ফিরিয়ে দেওয়ার সময়ের উপর অতিরিক্ত যত ঘণ্টা কাজ তাকে করতে হচ্ছে, তার সবটুকুই তার কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে অন্যায় করে; তিক্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই সে শেখে অত্যধিক সময় কাজ করার মানে কী। পুঁজিপতি লড়াই করে তার মুনাফার জন্য, আর শ্রমিক লড়ে তার স্বাস্থ্যের জন্য, দৈনিক কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য, কাজ-খাওয়া-ঘুমোনো ছাড়াও মানবিক অন্যান্য কিছু কাজকর্ম করার সুযোগের জন্য। প্রসঙ্গত বলা চলে যে ব্যক্তিগতভাবে কোনো পুঁজিপতি এই লড়াইয়ে নামতে চাইবে কি না তা তার সদিচ্ছার উপর আদৌ নির্ভর করছে না, কারণ, প্রতিযোগিতার চাপে সবচেয়ে লোকহিতৈষী পুঁজিপতিও তার সহকর্মীদের সঙ্গে যোগ দিতে এবং তাদেরই মতো দীর্ঘ কাজের ঘণ্টা চালু করতে বাধ্য হয়।

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রথম যেদিন স্বাধীন শ্রমিক দেখা দিয়েছিল সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত চলেছে শ্রমদিনের ঘণ্টা বাঁধার সংগ্রাম। বিভিন্ন শাখায় শ্রমদিনের বিভিন্ন চিরাচরিত রীতি আছে; কিন্তু আসলে বেশির ভাগ সময়েই সে রীতি খুব কম মানা হয়। শুধুমাত্র যেখানে আইন করে শ্রমদিন বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং আইনই দেখছে তা পালন করা হচ্ছে কিনা, সেখানেই সত্যি করে বলা চলে যে স্বাভাবিক শ্রমদিন চালু আছে। আর এখন পর্যন্ত প্রায় একমাত্র ইংলণ্ডের কারখানা অঞ্চলগুলিতেই তেমন ব্যবস্থা আছে। সেখানে মেয়েদের জন্য এবং তেরো থেকে আঠারো বছরের কিশোরদের জন্য দশ ঘণ্টা শ্রমদিন (পাঁচ দিন সাড়ে দশ ঘণ্টা করে আর শনিবার সাড়ে সাত ঘণ্টা)

নির্দিষ্ট হয়েছে, আর যেহেতু এদের বাদ দিয়ে পুরুষরা কাজ চালাতে পারে না, সেহেতু তারাও পড়ছে দশ ঘণ্টা শ্রমদিনের আওতার মধ্যে। ইংরেজ কারখানা-মজুরেরা এই আইনটি আদায় করতে পেরেছে বহু বছর কষ্ট সহ্য করে, কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে একান্ত দৃঢ় ও একাগ্র সংগ্রাম চালিয়ে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সাহায্যে, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ও সভাসমিতি করার অধিকারের সুবিধা নিয়ে তথা আপন শাসক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদটাকেই অতি নিপুণভাবে কাজে লাগিয়ে। এই আইন ইংরেজ শ্রমিকদের রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়িয়েছে, শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত শাখায় ক্রমে ক্রমে এই আইন প্রসারিত হয়েছে এবং গতবছর* প্রসারিত হয়েছে প্রায় **সকল শিল্পে,** অন্ততপক্ষে যেগুলিতে নারী ও শিশুদের নিয়োগ করা হয় সেগুলিতে। ইংলণ্ডে আইন করে শ্রমদিন নির্ধারণের এই ইতিহাস সম্পর্কে আলোচ্য বইটিতে অতি বিশদ তথ্য রয়েছে। পরবর্তী বৈঠকে উত্তর জার্মান রাইখ্‌স্টাগকেও আলোচনা করতে হবে কারখানার নিয়মাবলী এবং সেই সঙ্গে ফ্যাক্টরি শ্রমের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন নিয়ে। আশা করি, জার্মান শ্রমিকেরা যেসব প্রতিনিধিদের নির্বাচন করেছে তাঁদের মধ্যে কেউই আগে **মার্কসের** বইটির আগাগোড়া সবকিছু ভালভাবে জেনে না নিয়ে খসড়া আইনটি আলোচনা করতে যাবেন না। **এখানে অনেক কিছু লাভ করার আছে।** শাসক শ্রেণীর নিজেদের ভিতরকার বিভেদ শ্রমিকদের পক্ষে এখানে যতখানি অনুকূল ততখানি ইংলণ্ডে কখনও হয়নি, কারণ **সর্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থার ফলে শাসক শ্রেণীকে বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের অনুগ্রহ পাওয়ার চেষ্টা করতে হচ্ছে।** এই পরিস্থিতিতে, নিজেদের অবস্থার সুযোগ নিতে পারলে, এবং সর্বোপরি বুর্জোয়ারা যে কথাটা জানে না, অর্থাৎ আসল প্রশ্নটা কী, তা জানলে শ্রমিক শ্রেণীর চার পাঁচজন প্রতিনিধিও রীতিমত **একটা শক্তি।** এবং এই উদ্দেশ্যে সব মালমসলা তৈরী অবস্থায় তাঁদের কাছে এনে দেবে মার্কসের **বইখানি।**

অধিকতর তত্ত্বগত গুরুত্বসম্পন্ন আরও কয়েকটি অতি চমৎকার পর্যালোচনা পেরিয়ে গিয়ে আমরা থামব শুধু শেষ অধ্যায়ে, যেখানে পুঁজি সঞ্চয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রথমে দেখানো হয়েছে যে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে, অর্থাৎ যেখানে একদিকে পুঁজিপতি ও অন্যদিকে মজুরি-খাটা শ্রমিকের মাধ্যমে উৎপাদন হচ্ছে সেখানে, শুধু যে পুঁজিপতিদের জন্য ক্রমাগত নতুন করে পুঁজি সৃষ্টি হয় তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে শ্রমিকদের দারিদ্র্যও; তাতে করে এই দাঁড়ায় যে, একদিকে প্রাণধারণের সমস্ত উপকরণ, সমস্ত কাঁচামাল এবং শ্রমের সমস্ত যন্ত্রপাতির মালিক পুঁজিপতিরা বরাবরই নতুন হয়ে থেকে যাচ্ছে, আর অন্যদিকে থাকছে অসংখ্য

* অর্থাৎ ১৮৬৭ সাল। — সম্পাঃ

শ্রমিক যারা প্রাণধারণের সেইটুকু উপকরণের জন্য নিজেদের শ্রমশক্তি এই পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয় যাতে বড়জোর কোনোমতে শুধু নিজেদের কর্মক্ষম রাখা এবং কর্মক্ষম প্রলেতারীয়দের নতুন এক বংশ গড়ে তোলাই সম্ভব। কিন্তু পুঁজি শুধু নিজেকে পুনরুৎপন্নই করে না: অনবরত বর্ধিত ও প্রসারিত হয়ে ওঠে পুঁজি এবং তার ফলে বাড়তে থাকে সম্পত্তিহীন শ্রমিক শ্রেণীর উপর তার আধিপত্য। আর ঠিক যেমন পুঁজি নিজে ক্রমাগত বৃহত্তর আয়তনে পুনরুৎপাদিত হয়, তেমনই বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি সম্পত্তিহীন শ্রমিক শ্রেণীকেও ক্রমাগত বৃহত্তর আকারে ও বিপুলতর সংখ্যায় পুনরুৎপন্ন করতে থাকে। '... পুঁজি সঞ্চয়ের ফলে পুঁজি-সম্পর্ক ক্রমবর্ধমান হারে পুনরুৎপন্ন হতে থাকে, একপ্রান্তে আরও বেশীসংখ্যক কিংবা বৃহত্তর পুঁজিপতি, আর অন্যপ্রান্তে আরও বেশীসংখ্যক মজুরি-খাটা শ্রমিক ... **সুতরাং পুঁজি সঞ্চয়ের মানে হল প্রলেতারিয়েতের বৃদ্ধি**' (পৃঃ ৬০০)। অথচ যন্ত্রপাতির উন্নতি, উন্নত কৃষি ইত্যাদির ফলে যেহেতু সমপরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে ক্রমশই অল্পতর সংখ্যায় শ্রমিক প্রয়োজন হয়, এই নিখুঁতীকরণ, অর্থাৎ শ্রমিকদের অনাবশ্যক করে তোলার কাজ যেহেতু ক্রমবর্ধমান পুঁজির চেয়েও দ্রুত গতিতে বেড়ে চলে, তাই চিরবর্ধমান এই শ্রমিক সংখ্যার তাহলে কী হবে? তারা পরিণত হয় শিল্পক্ষেত্রের এক মজুত বাহিনীতে; ব্যবসার অবস্থা খারাপ বা মাঝারি রকমের থাকলে এদের শ্রমের মূল্যের চেয়ে **কম** মজুরিতে নিয়োগ করা হয়, অনিয়মিতভাবে নিয়োগ করা হয়, কিংবা ছেড়ে দেওয়া হয় জনসাধারণের দাক্ষিণ্যের উপর, তবু ব্যবসা যখন খুব জোর চলে, তখন ধনিক শ্রেণীর কাছে এরা হয় অপরিহার্য যেমন ইংলণ্ডে স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু **সব অবস্থাতেই** নিয়মিতভাবে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রতিরোধের শক্তি ভাঙতে তথা তাদের মজুরি কম রাখতে এরাই সাহায্য করে। 'সামাজিক সম্পদ যত বাড়ে... ততই বাড়ে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা বা শিল্পগত মজুত বাহিনীও। কিন্তু সক্রিয় (নিয়মিতভাবে নিযুক্ত) শ্রমবাহিনীর অনুপাতে এই মজুত বাহিনী যতই বাড়ে, তত বৃদ্ধি পায় সংহত (স্থায়ী) উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা বা শ্রমিকদের সেই স্তর যাদের দুর্দশা চলে শ্রম যন্ত্রণার বিপরীত অনুপাতে। শেষ পর্যন্ত, শ্রমিক শ্রেণীর দুর্গতদের স্তর ও শিল্পগত মজুত বাহিনী যতই বিস্তৃত হয়, সরকারী হিসাবের দুঃস্থতা-ও ততই বাড়ে। **এই হল পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের অনপেক্ষ সাধারণ নিয়ম**' (পৃঃ ৬৩১)।

এই হল আধুনিক পুঁজিবাদী সামাজিক ব্যবস্থার কয়েকটি মূল নিয়ম যা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত — সরকারী অর্থনীতিবিদরা অবশ্য এর খণ্ডনের সামান্যতম চেষ্টাও সযত্নে পরিহার করেন। কিন্তু এই কি সব? আদৌ নয়। পুঁজিবাদী উৎপাদনের খারাপ দিকগুলি মার্কস খুব তীক্ষ্ণভাবে জোর দিয়ে দেখিয়েছেন, কিন্তু সমান জোরের সঙ্গে তিনি স্পষ্টভাবে এটাও প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, যে-পর্যায়ে সমাজের **সব** সদস্যের

সমানভাবে মানুষের মতন বিকাশলাভ সম্ভব হবে, সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলিকে সেই পর্যায়ে বিকশিত করে তোলার জন্য এই সামাজিক রূপটিব প্রয়োজন ছিল। সমাজের পূর্বতন সব রূপ এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে ছিল বড়ই দরিদ্র। তার জন্য যতখানি সম্পদ ও উৎপাদন-শক্তি প্রয়োজন পুঁজিবাদী উৎপাদনই তা প্রথম সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করছে সংখ্যাবহুল ও নিপীড়িত শ্রমিকরূপী এমন এক সামাজিক শ্রেণীকেও, যে-শ্রেণী সে সম্পদ ও সেই উৎপাদন-শক্তি ক্রমশ আরো বেশী করে নিজের হাতে তুলে নিতে বাধ্য, যার ফলে আজ যেমন এগুলি একটি একচেটিয়া শ্রেণীর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে তার বদলে সমগ্র সমাজের স্বার্থে এগুলিকে ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

১৮৬৮ সালের ১লা থেকে
১৩ই মার্চ এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত
১৮৬৮ সালের ২১শে ও ২৮শে মার্চের
Demokratisches Wochenblatt পত্রিকায়
প্রকাশিত
স্বাক্ষরহীন

পত্রিকার লেখা অনুযায়ী মুদ্রিত
জার্মান থেকে অনূদিত
ইংরেজী ভাষ্যের ভাষান্তর

•

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

'পুঁজি' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা থেকে

মার্কস তাহলে উদ্বৃত্ত মূল্য সম্পর্কে নতুন কী বলেছেন? কেমন করে এটা সম্ভব হল যে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতন মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব মোক্ষম আঘাত হানল এবং তা সমস্ত সভ্য দেশেই, অথচ রদবের্তুস সমেত মার্কসের পূর্বগামী সমস্ত সমাজতন্ত্রীদের মতবাদ ব্যর্থ হয়ে মিলিয়ে গেল?

রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের এক উদাহরণ থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

গত শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত আমরা জানি যে ফ্লজিস্টিক (Phlogistic) তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। এই মতবাদ অনুসারে জ্বলন্ত পদার্থ থেকে আরেকটি অনুমানসিদ্ধ পদার্থ, ফ্লজিস্টন নামে একটি সম্পূর্ণ দাহ্য পদার্থের বিচ্ছিন্ন হওয়াই হল সব দহনের মূল কথা। তখন পর্যন্ত যেসব রাসায়নিক ঘটনা জানা ছিল তার প্রায় সবকিছুই এই মতবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেত, যদিও বহু ক্ষেত্রেই জবরদস্তি করেই। কিন্তু ১৭৭৪ সালে প্রিস্টলি এমন এক ধরনের বায়ু উৎপাদন করলেন 'যা তিনি দেখলেন এতই বিশুদ্ধ. অথবা যা ফ্লজিস্টন থেকে এতখানি মুক্ত, যে তার তুলনায় সাধারণ বায়ু দূষিত বলে মনে হয়।' তিনি এর নাম দিলেন ফ্লজিস্টনমুক্ত বায়ু। তাঁর কিছুদিন পরেই সুইডেনে শেলে একই ধরনের বায়ু পেলেন এবং বায়ুমণ্ডলে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে দিলেন। তিনি আরো দেখলেন যে এই বায়ুতে বা সাধারণ বায়ুতে কোনো পদার্থ দহন করা মাত্র এ বায়ু মিলিয়ে যায়, তাই তিনি এর নাম দিলেন অগ্নি বায়ু। 'এইসব তথ্য থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত টানলেন যে বায়ুর একটি উপাদানের সঙ্গে ফ্লজিস্টন যুক্ত হওয়ার ফলে' অর্থাৎ দহনের সময়ে, 'যে মিশ্র পদার্থের সৃষ্টি হয় তা আর কিছুই নয়, তা হল আগুন বা উত্তাপ, কাঁচের মধ্যে দিয়ে যা বেরিয়ে আসে।'*

প্রিস্টলি ও শেলে অক্সিজেন উৎপাদন করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা জানতেন না জিনিসটা কী। তাঁরা ফ্লজিস্টিক 'তত্ত্বাবলীকে যে অবস্থায় পেয়েছিলেন, ঠিক তারই মধ্যে জড়িয়ে রইলেন।' যে উপাদানটি পরে সমস্ত ফ্লজিস্টিক মতবাদ উল্টে দিয়ে রসায়নশাস্ত্রে বিপ্লব আনল তাঁদের হাতে সেটি নিষ্ফল হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু প্রিস্টলি সঙ্গে সঙ্গেই

* Roscoe-Schorlemmer — *Ausführliches Lehrbuch der Chemie* Braunschweig, 1877, I, p.p. 13, 18. (এঙ্গেলসের টীকা।)

তাঁর আবিষ্কারের কথা প্যারিসে লাভুয়াজিয়েকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং লাভুয়াজিয়ে এই নতুন তথ্যের সাহায্যে সমস্ত ফ্লজিস্টিক রসায়নশাস্ত্র পরীক্ষা করে দেখলেন। তিনিই প্রথমে আবিষ্কার করলেন যে নতুন ধরনের এই বায়ু হল নতুন এক রাসায়নিক উপাদান এবং দহনের কারণ জ্বলন্ত পদার্থ থেকে রহস্যময় ফ্লজিস্টনের **বহির্গমন** নয়, বরং জ্বলন্ত পদার্থের সঙ্গে এই নতুন উপাদানটির **সম্মিলন**। সমগ্র রসায়নশাস্ত্রই যেন ফ্লজিস্টনের তত্ত্বে মাথা নিচের দিকে করে দাঁড়িয়েছিল, লাভুয়াজিয়ে প্রথম এইভাবে তাকে সোজা করে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। পরে তিনি যা দাবি করেছিলেন সেভাবে অবশ্য অন্যদের সঙ্গে একই সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তিনি অক্সিজেন উৎপাদন না করলেও "অপর দুজনের তুলনায় তিনিই অক্সিজেনের সত্যিকারের **আবিষ্কারক**। অন্য দুজন অক্সিজেন শুধু **উৎপাদনই করেছিলেন**, কিন্তু **কী জিনিস** উৎপাদন করলেন সে সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণাই ছিল না।

প্রিস্টলি এবং শেলের সঙ্গে লাভুয়াজিয়ের যে সম্পর্ক, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বের ক্ষেত্রে পূর্বগামীদের সঙ্গে মার্কসেরও ঠিক একই সম্পর্ক। আমরা এখন উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের যে অংশটিকে উদ্বৃত্ত মূল্য বলি, তার **অস্তিত্বের** কথা মার্কসের বহু পূর্বেই নিরূপিত হয়েছিল। উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্যে আসল বস্তুটির কথা, অর্থাৎ প্রতিমূল্য হিসাবে কিছু না দিয়েই আত্মসাৎকারী যে শ্রমফল আত্মসাৎ করে, সেকথাও মোটামুটি স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছিল। কিন্তু এর বেশি আর কেউ এগোতে পারেনি। উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ঠিক কী অনুপাতে শ্রমের ফল ভাগ হয়, বড়জোর সেই বিষয়ে অনুসন্ধান চালাত একটি দল — ক্লাসিকাল বুর্জোয়া অর্থতত্ত্ববিদরা। অন্য দলটি — অর্থাৎ সমাজতন্ত্রীরা — এই বিভাজনকে অন্যায় বলে মনে করত এবং খুঁজত এই অন্যায় দূর করার ইউটোপীয় উপায়। হাতে পাওয়া অর্থনৈতিক সংজ্ঞার শৃঙ্খলেই উভয়েই আবদ্ধ হয়ে রইল।

তারপর এগিয়ে গেলেন মার্কস। তাঁর পূর্বগামীদের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেই তিনি এগিয়ে এলেন। যেখানে তারা **সমাধান** দেখেছিল, তিনি সেখানে দেখলেন শুধু একটি **সমস্যা**। তিনি দেখলেন যে ব্যাপারটা ফ্লজিস্টনমুক্ত বায়ুও নয়, অগ্নিবায়ুও নয়, আসলে অক্সিজেন। তিনি দেখলেন যে ব্যাপারটা শুধু একটি অর্থশাস্ত্রের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা নয়, বা এই তথ্যের সঙ্গে চিরন্তন ন্যায় ও সত্যিকারের নীতিবোধের বিরোধও নয়; এখানে এমন একটি তথ্যের ব্যাপার রয়েছে যা সমগ্র অর্থশাস্ত্রে বিপ্লব আনবে এবং যে একে ব্যবহার করতে জানে তার হাতে সমগ্র পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা বুঝবার চাবিকাঠি তুলে দেবে। এই তথ্যের থেকে শুরু করে তিনি প্রচলিত সংজ্ঞা-বিভাগ সব যাচাই করে দেখলেন, ঠিক যেমন অক্সিজেনের উপর ভিত্তি করে লাভুয়াজিয়ে ফ্লজিস্টিক রসায়নশাস্ত্রের প্রচলিত সংজ্ঞা-বিভাগগুলি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। উদ্বৃত্ত

মূল্য কী তা জানার জন্য মার্কসকে জানতে হল মূল্য কী। প্রথমেই করতে হল রিকার্ডোর মূল্যতত্ত্বের সমালোচনা। এইভাবেই মার্কস মূল্য সৃষ্টিকারী গুণের দিক থেকে শ্রম নিয়ে অনুসন্ধান চালালেন এবং এই প্রথম তিনিই দেখালেন **কোন** শ্রম মূল্য উৎপাদন করে, আর কেন ও কী ভাবে তা করে; দেখালেন যে মূল্য **এই** ধরনের পুঞ্জীভূত শ্রম ছাড়া কিছুই নয় — যে কথাটা রদবের্তুস জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেননি। তারপর মার্কস মুদ্রার সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের সম্পর্ক পরীক্ষা করে দেখলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন, অন্তর্নিহিত মূল্যগুণ থাকার দরুন কেন এবং কী ভাবে পণ্য ও পণ্য-বিনিময় থেকে পণ্য ও মুদ্রার বিরোধ সৃষ্টি হতে বাধ্য। এই ভিত্তির উপর তিনি যে মুদ্রাতত্ত্ব রচনা করলেন তা হল প্রথম সম্পূর্ণ মুদ্রাতত্ত্ব, এবং এখন এ তত্ত্ব বিনা উচ্চবাচ্যে প্রায় সবাই স্বীকার করে নেন। মুদ্রা কী ভাবে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয় সে সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে এই রূপান্তর সাধনের ভিত্তি হল শ্রমশক্তির ক্রয় ও বিক্রয়। শ্রমের জায়গায় শ্রমশক্তিকে, মূল্য উৎপাদক গুণকে বসিয়ে মার্কস এক পলকে তেমন একটা অসুবিধা দূর করে দিলেন যার সামনে রিকার্ডীয় মতবাদ চূর্ণ হয়ে গেল: অর্থাৎ শ্রমের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণের রিকার্ডীয় নীতির সঙ্গে পুঁজি ও শ্রমের পারস্পরিক বিনিময়ের সমন্বয় সাধনের অসম্ভাবিতা। স্থির ও পরিবর্তনশীল পুঁজির পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করে তিনিই প্রথম উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সত্যিকারের ধারাটির সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যন্ত অনুধাবন করতে সমর্থ হন, ও তার ব্যাখ্যাও এতে সম্ভব হল — এটা তাঁর পূর্বগামীরা কেউই করতে পারেননি। এইভাবে তিনি পুঁজির নিজের মধ্যেই একটা পার্থক্য স্থিরীকৃত করলেন যে ব্যাপারে রদবের্তুস বা বুর্জোয়া অর্থতত্ত্ববিদরা কেউই কিছু করে উঠতে পারেননি, অথচ এইটিই হল জটিলতম অর্থতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি, যা দ্বিতীয় খণ্ডে, বিশেষ করে তৃতীয় খণ্ডে, পুনরায় অতি চমৎকারভাবে প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে — পরে তা দেখা যাবে। উদ্বৃত্ত মূল্যটাকেও আরও বিশ্লেষণ করে মার্কস এর দুটি রূপ, অর্থাৎ অনপেক্ষ এবং আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য আবিষ্কার করেন, পুঁজিবাদী উৎপাদনের ঐতিহাসিক বিকাশে এরা যে বিভিন্ন ধরনের, অথচ প্রতিক্ষেত্রেই চূড়ান্ত ভূমিকা নিয়েছিল তাও মার্কস দেখিয়ে দেন। মজুরি সম্পর্কে প্রথম যুক্তিসঙ্গত যে মতবাদ আমরা পাই তা তিনি বিকশিত করে তোলেন উদ্বৃত্ত মূল্যের ভিত্তিতে এবং পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্য ও তার ঐতিহাসিক ঝোঁকের বর্ণনাটাও তিনিই প্রথম উপস্থিত করেছিলেন...

১৮৮৫ সালের ৫ই মে 'পুঁজি' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য এঙ্গেলস কর্তৃক রচিত, হামবুর্গ, ১৮৮৫

গ্রন্থের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত

জার্মান থেকে ইংরেজী ভাষ্যের ভাষান্তর

কার্ল মার্কস

ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ

ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভূমিকা

আমি আগে কখনও ভাবিনি যে, 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' সম্পর্কে আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের অভিভাষণের একটি নতুন সংস্করণের ব্যবস্থা করতে এবং তার একটা ভূমিকা লিখতে আমাকে বলা হবে। আমি তাই এখানে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কেই শুধু দু-চারটি কথা বলতে পারব।

উল্লিখিত বড় রচনাটির মুখবন্ধ হিসাবে আমি ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের দুটি ছোটো অভিভাষণ জুড়ে দিয়েছি। কারণ, প্রথমত, এ দুটির মধ্যে দ্বিতীয়টির 'গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে অথচ প্রথমটিকে বাদ দিলে দ্বিতীয়টি পুরোপুরি বোঝা যায় না। তাছাড়া ইতিহাসের বিরাট ঘটনা যে সময়ে আমাদের চোখের সম্মুখেই ঘটে চলেছে, বা সবেমাত্র ঘটেছে, সেই সময়েই তাদের চরিত্র, তাৎপর্য এবং অনিবার্য ফলাফল সম্যকরূপে বুঝতে পারার যে বিস্ময়কর প্রতিভা তিনি 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থে প্রথম দেখিয়েছিলেন, সেই প্রতিভারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন 'গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থের চেয়ে মার্কসের লেখা এই রচনা দুটিতেও কম নয়। আর সর্বশেষ কারণ হল এই যে, মার্কস এইসব ঘটনার যে ফলাফল দেখা দেবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আমরা জার্মানিতে আজও তা ভোগ করে চলেছি।

প্রথম অভিভাষণে যা ঘটবে বলা হয়েছিল, তা কি ঘটেনি? লুই বোনাপার্টের বিরুদ্ধে জার্মানির যুদ্ধ যদি আত্মরক্ষামূলক চরিত্র হারিয়ে ফরাসী জনসাধারণকে পদানত করার যুদ্ধে পরিণত হয়, তাহলে তথাকথিত মুক্তি যুদ্ধের* পরে জার্মানির যে দুর্ভাগ্য দেখা দিয়েছিল, তা প্রবলতর হয়ে আবার ফিরে আসবে — এই ভবিষ্যদ্বাণী কি ফলেনি? আরও বিশ বৎসর ধরে বিসমার্কের শাসন, আগে যেখানে বাক্যবাগীশ

* প্রথম নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ১৮১৩-১৫ সালের যুদ্ধবিগ্রহ। — সম্পাঃ

বক্তারা (demagogues) সরকারী কোপে পড়ত সেখানে জরুরী আইন* ও সমাজবাদীদের নির্যাতন, তার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের ঠিক একই রকম যথেচ্ছাচার এবং আইনের হুবহু একই ধরনের হতভম্বকর ভাষ্য — এই কি আমাদের জোটেনি?

আলসাস-লোরেন গ্রাসের ফলে 'ফ্রান্স রাশিয়ার বাহুপাশে আবদ্ধ হতে বাধ্য হবে;' এই রাজ্য দখলের পর জার্মানিকে হয় পরিণত হতে হবে রাশিয়ার বিশ্বস্ত দাসে, নয়ত বা স্বল্পকাল বিরামের পর নতুন যুদ্ধ সজ্জা করতে হবে, সে যুদ্ধও হবে আবার 'স্লাভ ও রোমক উভয় জাতির বিরুদ্ধে জাতি-যুদ্ধ' (race war) — এই ভবিষ্যদ্বাণীও কি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়নি? ফরাসী প্রদেশ দুটিকে জার্মানি গ্রাস করে নেওয়ায় ফ্রান্স কি রাশিয়ার বুকে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়নি? পুরো বিশ বছর ধরে বিসমার্ক কি জারের কৃপাদৃষ্টিলাভের জন্য বৃথাই তাঁর তোষণ করেননি এবং এমন সেবা দ্বারা তোষণ, যা 'ইউরোপের পয়লা নম্বরের শক্তি' হয়ে ওঠার আগে ক্ষুদে প্রাশিয়া 'পুণ্য রাশিয়ার' শ্রী পাদপদ্মে যা অঞ্জলি দিত তার চেয়েও হীন? তাছাড়া, প্রতিদিনই কি আমাদের মাথার উপর ঝুলে থাকছে না যুদ্ধরূপে ডেমোক্রিসের তরবারি, যে যুদ্ধের প্রথম দিনেই রাজন্যদের সকল চুক্তিবিধি তুষের মতোন উড়ে যাবে; যে-যুদ্ধ সম্পর্কে ফলাফলের একান্ত অনিশ্চয়তা ছাড়া আর কিছুই নিশ্চিত নয়; যে জাতি-যুদ্ধ শুরু হলে দেড়কোটি থেকে দুইকোটি সশস্ত্র মানুষ ইউরোপ ধ্বংসের কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে; যে-যুদ্ধ এখনই শুরু হচ্ছে না একমাত্র এই কারণে যে, এর চূড়ান্ত ফলাফলের একান্ত দুর্জ্ঞেয়তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সামরিক বলে বলীয়ান প্রবলতম রাষ্ট্র পর্যন্ত ভয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ে?

তাই ১৮৭০ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী যে-নীতি নিয়েছিল তার দূরদর্শিতার অর্ধবিস্মৃত এইসব জ্বলন্ত প্রমাণ আবার জার্মান শ্রমিকদের কাছে পেঁছে দেবার দায়িত্ব আমাদের আজ আরও বেশি।

এই দুইটি ভাষণ সম্পর্কে যে-কথা খাটে, 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য। ২৮শে মে তারিখে কমিউনের শেষ যোদ্ধরা বেলভিলের ঢালু জমিতে প্রবলতর শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে প্রাণত্যাগ করল। আর তার মাত্র দুই দিন পরেই, ৩০শে মে তারিখে মার্কস সাধারণ পরিষদের সামনে পড়লেন তাঁর এই লেখা, যাতে প্যারিস কমিউনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে সংক্ষিপ্ত, জোরালো রেখায়, কিন্তু এমন তীক্ষ্ণতায় ও তার চাইতেও বড় কথা, এমনই সত্যে যে, এই বিষয়ের ওপর রাশীকৃত সাহিত্যে আর কখনো তা দেখা যায়নি।

---

* জরুরী আইন — সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জরুরী আইন জার্মানিতে গৃহীত হয় ১৮৭৮ সালে। এই আইনে সমস্ত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি সংগঠন ও গণ শ্রমিক সংগঠন নিষিদ্ধ, শমিক সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য নিষিদ্ধ হয় ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নির্বাসন শুরু হয়। ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের চাপে জরুরী আইনটি ১৮৯০ সালে নাকচ হয়ে যায়। — সম্পাঃ

১৭৮৯ সালের পর ফ্রান্সে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ হয়েছে, তার দরুন গত পঞ্চাশ বছরে প্যারিস শহরের এমন একটা অবস্থা এসেছে যে, সেখানে কোন বিপ্লব দেখা দিলেই তা প্রলেতারীয় রূপ না নিয়ে পারে না; অর্থাৎ যে প্রলেতারিয়েত তাদের রক্ত দিয়ে জয় অর্জন করেছিল তারা জয়লাভের পরে দাবি দাওয়া উপস্থিত করেনি এমন হয় না। বিশেষ এক একটা পর্যায়ে প্যারিসের শ্রমিক শ্রেণী বিকাশের যে স্তরে পেঁছিতে পেরেছে, সেই অনুপাতেই তাদের দাবি হয়েছে অল্প বিস্তর অপরিষ্কার, এমন কি কিছুটা গোলমেলেও, কিন্তু তাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সকল দাবি পরিণত হয়েছে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী বৈরিতার অবলুপ্তিতে। সত্য বটে, কেউ জানত না কেমন করে এটা ঘটাতে হবে। কিন্তু তখনো যত অনির্দিষ্ট ভাষাতেই দাবিগুলি রচিত হয়ে থাকুক না কেন, তার ভিতরেই নিহিত থাকত প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে এক পরম আশঙ্কা; যে শ্রমিকেরা দাবি উপস্থিত করত তাদের হাতে তখনো থাকত অস্ত্র, তাই রাষ্ট্রের কর্ণধার বুর্জোয়াদের প্রথম অবশ্য কর্তব্য হয়েছিল এদের নিরস্ত্র করা। তাই শ্রমিকেরা যেই না কোন বিপ্লবে জয়ী হয়েছে অমনই শুরু হয়েছে নতুন এক সংগ্রাম, যার শেষ শ্রমিকদের পরাজয়ে।

সবপ্রথমে তা ঘটে ১৮৪৮ সালে। পার্লামেণ্টে বিরোধীদলভুক্ত উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা ভোজসভার আয়োজন করত ভোটাধিকার ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য, যার উদ্দেশ্য ছিল নিজ দলের প্রাধান্য সুনিশ্চিত করে তোলা। সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের ক্রমেই বেশি করে জনসাধারণের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হওয়ায় ধীরে ধীরে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়াদের র‍্যাডিকাল ও প্রজাতন্ত্রী স্তরগুলিকে পুরোভাগে স্থান ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু এদের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল বিপ্লবী শ্রমিকেরা এবং ১৮৩০ সাল থেকে শ্রমিকেরা যতটা রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল তা বুর্জোয়ারা, এমন কি প্রজাতন্ত্রীরা পর্যন্ত ভাবতে পারেনি। সরকার ও বিরোধীদলের ভিতর যখন সংকট ঘনিয়ে এল, সেই মুহূর্তে শ্রমিকেরা শুরু করল রাস্তার লড়াই। উবে গেলেন লুই ফিলিপ এবং তাঁর সঙ্গে ভোট-বিধির সংস্কার; আর সেই জায়গায় দেখা দিল প্রজাতন্ত্র এবং বস্তুত এমন প্রজাতন্ত্র যে, বিজয়ী শ্রমিকেরা তাকে 'সামাজিক' প্রজাতন্ত্র আখ্যা দিল। সামাজিক প্রজাতন্ত্র বলতে ঠিক কী বোঝাবে সে সম্পর্কে কিন্তু কারও স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না, এমন কি শ্রমিকদেরও নয়। কিন্তু তাদের হাতে তখন অস্ত্র; রাষ্ট্রের একটা অন্যতম শক্তি তারা। তাই কর্ণধার বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা যেই পায়ের তলায় খানিকটা শক্ত মাটির মতো কিছু অনুভব করল, অমনি তাদের প্রথম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল শ্রমিকদের নিরস্ত্রীকরণ। তা করা হল সরাসরি বিশ্বাস ভঙ্গ করে, খোলাখুলি কথা খেলাপ করে ও বেকারদের দূর প্রদেশে নির্বাসনের চেষ্টা মারফৎ শ্রমিকদের ১৮৪৮-এর জুনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে ঠেলে দিয়ে। সরকার আগে

থেকেই সতর্কতার সঙ্গে শক্তির বিপুল প্রাধান্য হাতে রেখেছিল। পাঁচ দিন ধরে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের পর শ্রমিকেরা পরাজিত হল। আর তার পরেই শুরু হল নিরস্ত্র বন্দীদের রক্তস্নান — রোম প্রজাতন্ত্রের পতনসূচক গৃহযুদ্ধের দিনগুলির পরে যেমনটি আর দেখা যায়নি। স্বীয় স্বার্থ ও দাবি নিয়ে শ্রমিকেরা পৃথক শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস দেখানো মাত্র বুর্জোয়ারা প্রতিহিংসার কী উন্মত্ত নিষ্ঠুরতায় ধাবিত হবে, এই প্রথম তারা তা দেখিয়ে দিল। তবু ১৮৭১ সালের বুর্জোয়া তাণ্ডবের তুলনায় ১৮৪৮ সালের ঘটনা তো একটা ছেলেখেলা মাত্র।

শাস্তি এল পায়ে পায়ে। প্রলেতারিয়েত যদি বা তখনও ফ্রান্স শাসন করার উপযুক্ত হয়ে উঠতে না পেরে থাকে, তাহলে বুর্জোয়ারাও তা আর পেরে উঠল না। অন্তত পক্ষে সে সময় ত নয়ই যখন তাদের বেশির ভাগটাই ছিল রাজতন্ত্রের অনুকূলে, আর তিনটি রাজবংশীয় পার্টি আর চতুর্থ একটি প্রজাতন্ত্রী পার্টিতে তারা বিভক্ত। বুর্জোয়া শ্রেণীর এই আভ্যন্তরীণ বিবাদের সুযোগে ভাগ্যান্বেষী লুই বোনাপার্ট সমস্ত শাসন-কেন্দ্রগুলি — সেনাবাহিনী, পুলিশ, প্রশাসনিক যন্ত্র — সব হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আনতে পারলেন আর ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে উড়িয়ে দিতে পারলেন বুর্জোয়াদের শেষ ঘাঁটি, জাতীয় সভা। শুরু হল দ্বিতীয় সাম্রাজ্য, একদল রাজনৈতিক ও আর্থিক ভাগ্যান্বেষীর হাতে ফ্রান্সের শোষণ; কিন্তু সেই সঙ্গে শুরু হল এমন শিল্পের অগ্রগতি, যেটা সম্ভব ছিল না লুই ফিলিপের সংকীর্ণমনা ভীরু শাসন-ব্যবস্থায়, যেখানে ছিল বৃহৎ বুর্জোয়াদের মাত্র এক ক্ষুদ্র অংশের একচ্ছত্র আধিপত্য। লুই বোনাপার্ট পুঁজিপতিদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করলেন একদিকে শ্রমিকদের হাত থেকে পুঁজিপতিদের, অন্যদিকে পুঁজিপতিদের হাত থেকে শ্রমিকদের বাঁচাবার অজুহাতে। প্রতিদান হিসাবে কিন্তু তাঁর আমলে উৎসাহ পেল ফাটকাবাজি এবং শিল্প প্রয়াস — এক কথায় গোটা বুর্জোয়া শ্রেণীর এতটা ঊর্ধ্বগতি ও ধন-বৃদ্ধি যা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। একথাও অবশ্য সত্য যে, দুর্নীতি ও ব্যাপক চুরি-জোচ্চুরি ফেঁপে ওঠে তার চাইতেও বেশি; রাজদরবার হয়ে ওঠে তার কেন্দ্র ও এ সমৃদ্ধি থেকে মোটা রকমের বখরা লুটতে থাকে।

কিন্তু দ্বিতীয় সাম্রাজ্য সে ত ফরাসী উগ্রজাতিবাদের প্রতি আবেদন, ১৮১৪ সালে খোয়া যাওয়া প্রথম সাম্রাজ্যের সীমানা, অন্তত পক্ষে প্রথম প্রজাতন্ত্রের সীমানা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি। সাবেকি রাজতন্ত্রের সীমানার ভিতরে, বস্তুতপক্ষে তার চাইতেও বেশী কর্তিত ১৮১৫ সালের সীমানার অভ্যন্তরে, ফরাসী সাম্রাজ্য এটা বেশী দিন চলতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে যুদ্ধ করে সীমানা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু রাইন নদীর বাম তীরের জার্মান এলাকা আত্মসাৎ করার কথায় ফরাসী উগ্রজাতিবাদীদের কল্পনা যতটা ঝলমলিয়ে ওঠে, তা আর কোন ক্ষেত্রের সীমানা সম্প্রসারণে হয় না। রাইন

অঞ্চলে এক বর্গমাইল স্থান এদের কাছে আল্‌প্‌স বা অন্যত্র দশ বর্গমাইল স্থানের চাইতেও অনেক বেশি। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য যদি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এক ধাক্কায় বা ভাগে ভাগে, রাইনের বাম তীর পর্যন্ত এলাকা পুনরুদ্ধারের দাবিটা নিছক সময়ের প্রশ্ন। সে সময় এল, যখন বাধল ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধ। বিসমার্কের হাতে এবং নিজের অতিধূর্ত দোদুল্যমান নীতির ফলে প্রত্যাশিত 'রাজ্য ক্ষতিপূরণের' ব্যাপারে প্রবঞ্চিত হয়ে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করা ছাড়া নেপোলিয়নের গত্যন্তর রইল না; সে যুদ্ধ বাধল ১৮৭০ সালে আর নেপোলিয়নকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল প্রথমে সেদানে এবং সেখান থেকে একেবারে ভিলহেল্‌মসহোয়েতে।*

এর আবশ্যিক ফল হিসাবে দেখা দিল ১৮৭০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের প্যারিস বিপ্লব। সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল তাসের ঘরের মতো; আবার ঘোষিত হল প্রজাতন্ত্র। কিন্তু শত্রু তখন দ্বারে অপেক্ষমান; সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী হয় মেৎস-এ এমনভাবে পরিবেষ্টিত যে বেরিয়ে আসার আশা নেই, নয় জার্মানিতে বন্দী অবস্থায়। এই জরুরী পরিস্থিতিতে জনসাধারণ প্রাক্তন বিধান সভার প্যারিস প্রতিনিধিদের 'জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার' হিসাবে সংগঠিত হতে দিল। এত সহজে এতে রাজি হওয়ার কারণ হল এই যে, বন্দুক কাঁধে নিতে পারে প্যারিস শহরের এমন প্রত্যেকটি মানুষ দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে জাতীয় রক্ষিবাহিনীতে নাম লিখিয়ে অস্ত্রসজ্জিত হয়েছিল, ফলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল শ্রমিকেরাই। কিন্তু প্রায় পুরোপুরি বুর্জোয়া সরকার আর সশস্ত্র শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার বিরোধ অতিশীঘ্র ফেটে পড়ল খোলাখুলি সংঘর্ষে। ৩১শে অক্টোবর কয়েকটি শ্রমিক বাহিনী টাউন হল চড়াও করে সরকারের একাংশকে বন্দী করে ফেলে। বিশ্বাসঘাতকতা, সরাসরিভাবে সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং কতকগুলি পেটি বুর্জোয়া বাহিনীর হস্তক্ষেপে তারা ছাড়া পেল এবং প্রাক্তন সরকারকেই শাসন ক্ষমতায় বহাল রাখা হল, যাতে বিদেশী সামরিক শক্তি কর্তৃক অবরুদ্ধ নগরের মধ্যে গৃহযুদ্ধ না বেধে যায়।

অবশেষে ১৮৭১ সালের ২৮শে জানুয়ারি অনাহারক্লিষ্ট প্যারিস আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এমন মর্যাদায় যা যুদ্ধের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। দুর্গগুলি সমর্পণ করা হল, নগরীর প্রাকার থেকে অপসৃত হল কামানগুলি, লাইন-সৈন্যদল আর সচল রক্ষিবাহিনীর অস্ত্র তুলে দিতে হল বিজয়ীর হাতে আর তারা গণ্য হল যুদ্ধবন্দী হিসাবে। জাতীয় রক্ষিবাহিনী কিন্তু তাদের অস্ত্র আর কামান হাতছাড়া করেনি; বিজেতাদের সঙ্গে তারা এক যুদ্ধবিরতি-চুক্তি করল মাত্র। বিজেতারাও বিজয়-গৌরবে প্যারিস শহরে প্রবেশ

* ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ তারিখে ফরাসী বাহিনী সেদানে বিধ্বস্ত হয়ে সম্রাট সমেত বন্দী হয়। — সম্পাঃ

করতে সাহস পেল না। প্যারিসের মাত্র ছোট এক কোণ দখলের সাহস করেছিল তারা, যে এলাকাটা আবার একাংশে সাধারণের ব্যবহার্য খোলা পার্ক মাত্র, এও তারা দখলে রাখল মাত্র কয়েকদিন! সেই কয়দিনও প্যারিসের সশস্ত্র শ্রমিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রইল তারাই যারা প্যারিস অবরোধ করে ছিল ১৩১ দিন ধরে। বিদেশী বিজেতাদের প্যারিসের যে কোনা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্কীর্ণ সীমানা যাতে কোন 'প্রুশীয়' অতিক্রম না করে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল শ্রমিকেরা। যে সৈন্যদলের কাছে সাম্রাজ্যের সকল বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করে, তাদের মনে এমনই শ্রদ্ধারই উদ্রেক করে প্যারিস শ্রমিকেরা; আর প্রুশীয় য়ুংকার* যারা এসেছিল বিপ্লবের জন্মভূমিতে প্রতিশোধ নিতে, তারাই বাধ্য হল সসম্ভ্রমে থেমে দাঁড়াতে ও এই সশস্ত্র বিপ্লবকেই অভিবাদন জানাতে!

যুদ্ধ চলাকালে প্যারিসের শ্রমিকদের শুধু এইমাত্র দাবি ছিল যে প্রবলভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এখন, যখন প্যারিস আত্মসমর্পণ করার পর শান্তি ফিরে এল, তখন সরকারের নূতন সর্বোচ্চ কর্তা তিয়েরকে বুঝতে হল যে, প্যারিসের শ্রমিকদের হাতে যতক্ষণ অস্ত্র থাকছে ততক্ষণ বিত্তবান শ্রেণীর বৃহৎ জমিদার ও পুঁজিপতিদের শাসন নিয়ত বিপদের মুখে থাকবে। তাঁর প্রথম কাজই হল শ্রমিকদের নিরস্ত্র করার এক প্রচেষ্টা। ১৮ই মার্চ তারিখে তিনি লাইনের সৈন্যদের পাঠালেন এই আদেশ দিয়ে যে, জাতীয় রক্ষিবাহিনীর নিজস্ব কামান কেড়ে আনতে হবে, অথচ প্যারিস অবরোধের সময় এ কামানদল গড়া হয়েছিল সাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে। চেষ্টা বিফল হল; সমগ্র প্যারিস এক হয়ে দাঁড়াল তার প্রতিরোধে, এবং একদিকে প্যারিস ও অন্যদিকে ভার্সাইতে অবস্থিত ফরাসী সরকারের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হল। ২৬শে মার্চ প্যারিস কমিউন নির্বাচিত হয় আর ২৮শে মার্চ ঘোষিত হল কমিউনের শাসন। জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি সে পর্যন্ত শাসন কাজ চালিয়েছিল, এবার তারা প্যারিসের কলঙ্কিত 'সুনীতি-রক্ষী দলটি' ('Morality Police') ভেঙে দেবার আদেশ দিয়ে তারপর পদত্যাগ পত্র পেশ করল কমিউনের কাছে। ২০শে মার্চ তারিখে সরকারী সৈন্যদলভুক্তি ও স্থায়ী সেনাবাহিনী নাকচ করল কমিউন ও ঘোষণা করল যে, জাতীয় রক্ষিবাহিনীই থাকবে একমাত্র সশস্ত্র বাহিনী, আর তাতে ভর্তি করা হবে অস্ত্রবহনক্ষম সমস্ত নাগরিককেই। ১৮৭০ সালের অক্টোবর থেকে পরের বছরে এপ্রিল পর্যন্ত সব বসতবাড়ির ভাড়া কমিউন মকুব করে দিল; সে সময়ের যে ভাড়া দেওয়া হয়ে গিয়েছিল সেটাকে ভবিষ্যতে দেয় ভাড়া হিসাবে জমা নেওয়ার আদেশ হল; পৌরসভার বন্ধকী কাছারিতে বাঁধাপড়া মালের নিলামে বিক্রয় বন্ধ হয়ে গেল।

---

* য়ুংকার — প্রুশীয় অভিজাত ভূস্বামী। — সম্পাঃ

কমিউনের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বিদেশীদের নির্বাচন পাকা করা হল সেই তারিখেই, কারণ 'কমিউনের পতাকা, বিশ্ব প্রজাতন্ত্রেরই পতাকা।' ১লা এপ্রিল তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, কমিউনের কোন কর্মচারীর বেতন, সুতরাং কমিউন সদস্যদেরও বেতন ৬,০০০ ফ্রাঁ-র (৪,৮০০ মার্ক) বেশী হতে পারবে না। পরের দিনই কমিউন চার্চকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নকরণ, কোনরূপ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের অর্থব্যয় নিষেধ আর চার্চের সকল সম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার ডিক্রি জারী করে। এর ফলে ৮ই এপ্রিল ধর্মের সকল প্রতীক, চিত্র, আপ্তবাক্য এবং প্রার্থনাদি, অর্থাৎ যা কিছু 'ব্যক্তিগত বিবেকের বিষয়ভুক্ত বলে গণ্য' তা সবই শিক্ষায়তন থেকে বহিষ্করণের আদেশ জারী ও ধীরে ধীরে কার্যকরী করা হল। দিনের পর দিন ভার্সাই সৈন্যদল কর্তৃক কমিউনের বন্দী যোদ্ধাদের গুলি করে হত্যার জবাবে ৫ তারিখে শত্রুপক্ষীয় লোকদের জামিন হিসাবে বন্দী রাখার আদেশ হয়; কিন্তু তা কখনো কাজে প্রয়োগ করা হয়নি। ৬ তারিখে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর ১৩৭ নম্বর ব্যাটালিয়ন গিলোটিন নিয়ে এসে জনগণের বিপুল উল্লাসের মধ্যে তা প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলল। ১৮০৯ সালের যুদ্ধের পর দখল করা কামান গলিয়ে নেপোলিয়ন যা ঢালাই করেছিলেন, ভাঁদোম ময়দানে স্থিত সেই উগ্রজাতিবাদ ও জাতি-বৈরতার প্রতীক বিজয়-স্তম্ভটিকে ধূলিসাৎ করার সিদ্ধান্ত নিল কমিউন ১২ তারিখে। ১৬ই মে তারিখে এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করা হয়েছিল। যে-সব কারখানা মালিকেরা বন্ধ করে দিয়েছিল তাদের একটা পরিসংখ্যান হিসাব প্রস্তুত করে সেগুলিকে প্রাক্তন শ্রমিকদের দিয়েই আবার চালু করার পরিকল্পনা প্রস্তুতির নির্দেশ এল ১৬ই এপ্রিল; এই শ্রমিকেরা সংগঠিত হবে সমবায় সমিতিতে; সমিতিগুলিকে আবার এক মহা সংঘে সংগঠিত করবার পরিকল্পনা নেবারও আদেশ হল। ২০ তারিখে কমিউন রুটি প্রস্তুতকারীদের রাত্রি কাজ নিষিদ্ধ করে; কর্ম-সংস্থান দপ্তরগুলিও তুলে দেওয়া হয়; দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সময় থেকে পুলিশ-নিযুক্ত জীবেরা এক নম্বরের শ্রমিক-শোষক হিসাবে এই সংস্থাকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। প্যারিসের বিশটি মহল্লার (arrondissements) মেয়র দপ্তরগুলির হাতে তা স্থানান্তরিত করা হয়। বন্ধকী দোকানগুলিতে শ্রমিকদের ব্যক্তিগতভাবে শোষণ চলে, সেগুলি শ্রমের হাতিয়ার এবং ঋণের ওপর শ্রমিকদের অধিকারের পরিপন্থী, এই কারণে ৩০শে এপ্রিল কমিউন এগুলি তুলে দেবার আদেশ দিল। ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ড দানের পাপ স্খালনের জন্য নির্মিত প্রায়শ্চিত্ত গির্জা নষ্ট করার আদেশ দিল কমিউন ৫ই মে তারিখে।

এই ভাবে বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দরুন যেটা আগে পেছনে ছিল, প্যারিসের আন্দোলনের সেই শ্রেণী চরিত্রটি তীক্ষ্ণভাবে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হতে থাকে ১৮ই মার্চ থেকে। যে-হেতু কমিউনের সভায় বসত হয় প্রায় খাঁটি শ্রমিকেরা,

না হয় শ্রমিকদের স্বীকৃত প্রতিনিধিগণ, সে-হেতু তার সিদ্ধান্তগুলিতেও চরিত্রটি সুপরিস্ফুট। এইসব সিদ্ধান্তে যে সব সংস্কার সাধনের আদেশ জারী করা হল, তা হয় প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়ারা নিছক ভীরুতার দরুনই করে উঠতে পারেনি, অথচ তাদের মধ্যে ছিল শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন ক্রিয়াকলাপের আবশ্যিক ভিত্তি যেমন, এই নীতির প্রতিষ্ঠা যে, **রাষ্ট্রের চোখে** ধর্ম হল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র। কিংবা কমিউন জারী করল এমন সব হুকুম যেগুলি সরাসরি শ্রমিক শ্রেণীরই প্রত্যক্ষ স্বার্থে, সমাজের প্রাচীন ব্যবস্থাতে যেগুলি অংশত গভীর ঘা দেয়। অবশ্য শত্রুবেষ্টিত নগরীতে এই সমস্ত কিছু কাজে পরিণত করার ব্যাপারটা শুরু করা মাত্র সম্ভব ছিল। মে মাসের গোড়া থেকে ভার্সাই সরকার যে ক্রমবর্ধিষ্ণু সংখ্যায় সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে থাকে, তার বিরুদ্ধে লড়াইতেই তাদের সমগ্র শক্তি ব্যয় হতে লাগল।

৭ই এপ্রিল ভার্সাই সেনাদল প্যারিসের পশ্চিম রণাঙ্গনে নিউলি-তে সেন নদীর খেয়াঘাট দখল করে নেয়। আবার অন্যদিকে, ১১ তারিখে, দক্ষিণ রণাঙ্গনে তাদের আক্রমণ বিপুল ক্ষতিসহ হঠিয়ে দেওয়া হয় জেনারেল ইওদ কর্তৃক। প্যারিসের উপর চলছিল অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণ; চলছিল তাদেরই হাতে যারা শহরের উপর প্রুশীয়দের গোলাবর্ষণকে পবিত্রতা হানি বলে নিন্দা করেছিল। এরাই আবার এখন প্রুশীয় সরকারের কাছে করজোরে প্রার্থনা করছিল যেন সেদান ও মেৎসের বন্দী ফরাসী সৈন্যদের তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হয় যাতে সেই সৈনিকেরা এদের জন্য প্যারিস পুনর্দখল করতে পারে। মে মাসের গোড়া থেকে এইসব সৈন্যের ক্রমিক প্রত্যাবর্তনে ভার্সাই বাহিনী পেল চূড়ান্ত শক্তি প্রাধান্য। একথা স্পষ্ট বোঝা গেল ২৩শে এপ্রিলেই, যখন তিয়ের বন্দী-বিনিময় সম্পর্কিত আলোচনা ভেঙে দিলেন — কমিউন এ আলোচনা প্রস্তাব করেছিল যাতে প্যারিসের যে আর্চবিশপকে আর যত পাদ্রীকে প্যারিসে জামিন হিসাবে রাখা হয়েছিল তাদের সকলের বিনিময়ে মাত্র একজনকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তিনি হলেন ব্লাঙ্কি, যিনি দুইবার কমিউনের সদস্য নির্বাচিত হলেও আটক ছিলেন ক্লেরভো-তে বন্দী হয়ে। শক্তি প্রাধান্যের কথাটা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকট হল তিয়েরের ভাষার পরিবর্তনে, আগে তিনি টালবাহানা করছিলেন, কথা বলছিলেন দ্ব্যর্থকভাবে। এখন হঠাৎ তিনি হয়ে উঠলেন উদ্ধত, হুমকিদার, বর্বর। ভার্সাই সেনাদল দক্ষিণ রণাঙ্গনে মুলাঁ-সাকে উপদুর্গ দখল করে নিল ৩রা মে তারিখে; ৯ তারিখে নিল ফোর্ট ইসি যেটা গোলাবর্ষণে একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গিয়েছিল; ১৪ তারিখে ফোর্ট ভাঁভ। পশ্চিম রণাঙ্গনে তারা এগোতে লাগল ধীরে ধীরে, নগরীর প্রাকার পর্যন্ত বিস্তৃত বহু গ্রাম ও বাড়ি দখল করতে করতে আর শেষ পর্যন্ত এল প্রধান রক্ষাব্যূহের সম্মুখে; বিশ্বাসঘাতকতা এবং সেখানকার মোতায়েন জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অসাবধানতার দরুন ২১ তারিখে তারা নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশে

সফল হল। উত্তর ও পূর্ব দিকের দুর্গগুলি দখলে ছিল প্রুশীয়দের। তারা ভার্সাই সৈন্যদের নগরীর উত্তর দিকের এলাকার ভিতর দিয়ে পেরিয়ে যেতে দিল, অথচ যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী সে এলাকাতে প্রবেশ করা ভার্সাই সৈন্যের পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ। এইভাবে এগিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাল এমন একটা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যা প্যারিসীয়রা স্বভাবতই ধরে নিয়েছিল যুদ্ধবিরতি সর্তে রক্ষিত, ও তাই তার সুরক্ষায় জোর দেয়নি। এর ফলে, প্যারিসের পশ্চিমার্ধে, খাস বিলাস-নগরীর এলাকায় প্রতিরোধ হল দুর্বল; আক্রমণকারী ফৌজ যতই এগোতে থাকে নগরীর পূর্বার্ধের দিকে, অর্থাৎ যে অংশটি হচ্ছে আসল শ্রমিক নগরী তার কাছে, ততই প্রতিরোধ হতে থাকল ক্রমেই প্রবলতর এবং একরোখা। আট দিন ধরে লড়বার পরই বেলভিল ও মেনিলমঁতাঁর উঁচু জমির উপর কমিউনের শেষ রক্ষীরা পরাজিত হয়। তারপর অসহায় পুরুষ, নারী আর শিশু হত্যার যে হিড়িক এক সপ্তাহ ধরেই ক্রমবর্ধমান হারে চলেছিল, তা উঠল চরমে। ব্রিচলোডার বন্দুকে আর কুলোয় না — যথেষ্ট দ্রুত গতিতে তাতে মানুষ মারা সম্ভব নয়; বিজিতদের শয়ে শয়ে মারা হল মিত্রেলিয়েজের গুলিতে। পের লাশেজ কবরস্থানের 'কমিউনারদের প্রাচীরের'* সামনে এই গণহত্যার শেষ অনুষ্ঠান হয়। শ্রমিক শ্রেণী তার দাবি দাওয়া নিয়ে দাঁড়াবার সাহস পাওয়া মাত্র শাসক শ্রেণী কতদূর উন্মত্ত হতে পারে তারই মূক অথচ মুখর সাক্ষী হিসাবে সেই প্রাচীর আজও দাঁড়িয়ে আছে। তারপর যখন দেখা গেল সকলকে হত্যা করা অসম্ভব, তখন শুরু হল পাইকারীভাবে গ্রেপ্তার, বন্দীদের মধ্যে থেকে নির্বিচারে বাছাই করা লোকদের গুলি করে হত্যা, আর অবশিষ্টদের বড় বড় বন্দীশিবিরে প্রেরণ, যেখানে তারা রইল সামরিক আদালতে বিচারের প্রতীক্ষায়। প্যারিসের উত্তর পূর্বার্ধ পরিবেষ্টিত করে ছিল যে সব প্রুশীয় সেনাদল, তাদের উপর আদেশ ছিল, যেন কোন পলাতক বেরিয়ে না যায়, কিন্তু সর্বোচ্চ অধিনায়কের নির্দেশের চাইতে মানবতার নির্দেশের প্রতি সৈনিকেরা যখন বেশি বাধ্যতা দেখায় তখন অফিসাররা প্রায়ই চোখ বুজে থাকত। এজন্য বিশেষ সম্মান প্রাপ্য স্যাক্সন সেনাবাহিনীর; অতি মানবিক আচরণ করে এরা এবং এমন বহুজনকে পেরিয়ে যেতে দেয় যারা স্পষ্টতই কমিউনের যোদ্ধা।

বিশ বছর পরে আজ যদি আমরা ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের কার্যকলাপ এবং তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিচার করতে বসি তাহলে 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে যে

* কমিউনারদের প্রাচীর — প্যারিসের পের লাসেজ সমাধিক্ষেত্রের দেয়াল, ১৮৭১ সালের ১৭শে মে এখানে ভার্সাই বাহিনীর সঙ্গে প্যারিস কমিউনের যোদ্ধাদের অন্যতম শেষ একটি রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়। এই দেয়ালের কাছে ভার্সাই বাহিনী কমিউনারদের ব্যাপকভাবে গুলি করে মারে। — সম্পাঃ

বিবরণ দেওয়া আছে, তার সঙ্গে আর অল্প কয়েকটি কথা যোগ করে দেওয়ার প্রয়োজন হবে।

কমিউনের সদস্যরা বিভক্ত ছিল দুইটি ভাগে। সংখ্যাগুরু অংশ ছিল ব্লাঙ্কিপন্থী, এদেরই প্রাধান্য ছিল জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটিতেও, আর সংখ্যালঘু অংশ ছিল শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সভ্য, এরা প্রধানত ছিল প্রুধোঁপন্থী সমাজতন্ত্রের গোষ্ঠীভুক্ত। ব্লাঙ্কিপন্থীদের খুব বড় অংশই সে সময় সমাজতন্ত্রী হয়েছিল কেবলমাত্র বিপ্লবী প্রলেতারীয় সহজ-বোধের বশেই; মাত্র অল্প কয়েকজনই নীতি সম্পর্কে অধিকতর পরিষ্কার ধারণায় পেঁছিতে পেরেছিল ভায়ানের মাধ্যমে, যিনি পরিচিত ছিলেন জার্মান বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে। সেইজন্য বোঝা যায় কেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কমিউন অনেক কিছুই করেনি যা এখন আমাদের মতে করা উচিত ছিল। যেরকম ভক্তি-বিহ্বল ভাব নিয়ে ব্যাংক অব ফ্রান্সের দেউড়ির বাইরে এরা সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়েছিল, নিশ্চয় সেটাই সবচেয়ে দুর্বোধ্য। এটা একটা গুরুতর রাজনৈতিক প্রমাদ। কমিউনের দখলে ব্যাংক — বিপক্ষের দশ হাজার লোককে জামিন রাখার চাইতেও তার মূল্য বেশি। এটা ঘটলে সমগ্র ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী ভার্সাই সরকারের উপর চাপ দিত কমিউনের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি করার স্বপক্ষে। তাসত্ত্বেও ব্লাঙ্কিপন্থী ও প্রুধোঁপন্থীদের নিয়ে গঠিত হলেও এই কমিউন যা করেছিল তার অনেক কিছুর নির্ভুলতাই হল অনেক বেশি বিস্ময়কর। স্বভাবতই প্রধানত প্রুধোঁপন্থীরাই দায়ী ছিল কমিউনের অর্থনৈতিক হুকুমনামাগুলির জন্য — তার মধ্যে যা প্রশংসনীয় ও যা নিন্দনীয় উভয়ের জন্য; যেমন ব্লাঙ্কিপন্থীরা দায়ী ছিল কমিউন যে রাজনৈতিক কাজ করেছিল তার জন্য, এবং যা করেনি তারও জন্য। এবং উভয় ক্ষেত্রে ইতিহাসের পরিহাসই এই — মতসর্বস্ব ব্যক্তিরা কর্তৃত্বে এলে সচরাচর যা ঘটে থাকে — নিজ নিজ মতাদর্শ অনুসারে যা করণীয় দুই দলই করে বসল তার বিপরীত কাজ।

ছোট কৃষক ও কারুশিল্পীদের সমাজতন্ত্রী প্রুধোঁ সংগঠনকে ঘোর ঘৃণার চোখে দেখতেন। সংগঠন সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে, এর ভিতর ভাল অপেক্ষা মন্দটাই বেশি; স্বভাবতই তা হল বন্ধ্যা, এমন কি ক্ষতিকারকও, কারণ শ্রমিকের স্বাধীনতার ওপর তা শৃংখলস্বরূপ; ওটা একটা নিছক আপ্তবাক্য, অনুৎপাদক ও দুর্বহ; শ্রমিকের স্বাধীনতার সঙ্গে যেমন এর বিরোধ, তেমনই বিরোধ শ্রম মিতব্যয়িতার সঙ্গে; এর অসুবিধাগুলি বাড়ে তার সুবিধার চাইতে অনেক বেশী দ্রুত, এর তুলনায় প্রতিযোগিতা, শ্রমবিভাগ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি হল অর্থনৈতিক শক্তি। বৃহৎ শিল্প ও রেলওয়ের মতো বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাকে প্রুধোঁ বলছেন ব্যতিক্রম কেবল তেমন ক্ষেত্রেই শ্রমিক সংগঠন উপযোগী ('বিপ্লব সম্পর্কে সাধারণ ধারণা', তৃতীয় নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

সুচারু হস্তশিল্পের কেন্দ্র প্যারিসে পর্যন্ত ১৮৭১ সালের মধ্যে বৃহৎ শিল্প আর এতই ব্যতিক্রম নয় যে, কমিউনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হুকুমনামায় বৃহৎ শিল্প, এমন কি হস্তশিল্প কারখানাকে পর্যন্ত এমনভাবে সংগঠনের নির্দেশ হল যার ভিত্তি হবে প্রতি কারখানায় শ্রমিকদের সমিতি শুধু তাই নয়, এইসব সমিতিকে একটা বড় সঙ্ঘে সম্মিলিত করাও হবে। এক কথায়, মার্কস 'গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে যেটা ঠিকই ধরেছিলেন, এই সংগঠনের আবশ্যিক পরিণতি হবে কমিউনিজম অর্থাৎ প্রুধোঁবাদী নীতির ঠিক বিপরীত। তাই কমিউন হল প্রুধোঁ গোষ্ঠীর সমাজতন্ত্রের কবরস্বরূপ। আজ ফরাসী শ্রমিক শ্রেণী মহল থেকে সে গোষ্ঠী অন্তর্ধান করেছে; সেখানে যেমন 'মার্কসবাদীদের' মধ্যে তেমনই 'সম্ভাবনাবাদীদের' (Possibilists)* ভিতরেও আজ মার্কসের তত্ত্ব অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু 'র‍্যাডিকাল' বুর্জোয়াদের মধ্যেই এখনো প্রুধোঁপন্থী পাওয়া যায়।

ব্লাঙ্কিপন্থীদের অবস্থাও এর চেয়ে ভাল ছিল না। ষড়যন্ত্রের বিদ্যালয়ে লালিতপালিত, এবং তার আনুষঙ্গিক কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলায় দৃঢ়বদ্ধ হয়ে তারা সুরু করেছিল এই ধারণা নিয়ে যে, অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক স্থির সংকল্পে সুসংগঠিত মানুষ অনুকূল সময় এলে যে রাষ্ট্রের হাল ছিনিয়ে নিতে পারবে শুধু তাই নয়, প্রচণ্ড নির্মম উদ্যোগে সেই ক্ষমতা তারা ধরে রেখে শেষ পর্যন্ত বিপুল জনসাধারণকে বিপ্লবে টেনে এনে তাদের ক্ষুদ্র নেতৃগোষ্ঠীর চারপাশে দাঁড় করাতে সক্ষম হবে। এরজন্য সবচাইতে আগে দরকার ছিল নূতন বিপ্লবী সরকারের হাতে সকল ক্ষমতার কঠোরতম একনায়কী কেন্দ্রীকরণ। অথচ আসলে কী করল এই কমিউন, যার ভিতরে সেই ব্লাঙ্কিপন্থীরাই ছিল সংখ্যাগুরু? প্রদেশস্থিত ফরাসী জনগণের উদ্দেশে প্রচারিত সকল ঘোষণাবাণীতে কমিউন আবেদন জানাল, প্যারিসের সঙ্গে মিলে ফরাসী দেশময় সমস্ত কমিউন এক স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করুক, যে জাতীয় সংগঠনটি এই প্রথম হবে আসলে গোটা জাতিরই সৃষ্টি। পূর্বতন কেন্দ্রীভূত সরকারের সেই নিপীড়ক শক্তি, তার সেনাবাহিনী, রাজনৈতিক পুলিশ, আমলাতন্ত্র — ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন যা সৃষ্টি করেন আর পরবর্তীকালে প্রতিটি নূতন সরকার যাকে সাগ্রহে হাতে নিয়ে বিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এসেছে — ঠিক এই নিপীড়ক শক্তিটার যেমন পতন ঘটেছে প্যারিসে তেমন পতন আনতে হবে সর্বত্র।

শুরু থেকেই কমিউন মানতে বাধ্য হল যে, ক্ষমতায় একবার এসেই শ্রমিক শ্রেণী পুরানো শাসনযন্ত্র দিয়ে কাজ চালাতে পারবে না, যে-আধিপত্য শ্রমিক শ্রেণী সদ্য জয়

* সম্ভাবনাবাদীরা: ঊনিশ শতাব্দীর শেষে ফরাসী শ্রমিক আন্দোলনে যে সুবিধাবাদী ঝোঁক দেখা দিয়েছিল তা। — সম্পাঃ

করে নিয়েছে তাকে আবার হারাতে না হলে একদিকে যেমন উচ্ছেদ করে দিতে হবে সকল সাবেকী নিপীড়ন যন্ত্রকে, এতকাল যা তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে, আবার অন্যদিকে তেমনই তাদের আত্মরক্ষা করতে হবে নিজেদের প্রতিনিধি ও সরকারী পদাভিষিক্তদের হাত থেকেও — এই বিধান ঘোষণা করে যে, বিনা ব্যতিক্রমে এদের প্রতিজনকে যে কোনও মুহূর্তে প্রত্যাহার করা যাবে। পূর্বতন রাষ্ট্রের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কী ছিল? সমাজের সাধারণ স্বার্থ দেখা শোনার জন্য নিজস্ব সংস্থাদি সমাজ গড়ে তুলেছিল প্রথমদিকে সহজ শ্রমবিভাগের মাধ্যমে। এই সব সংস্থা আর তার যা শীর্ষস্থানীয় সেই রাষ্ট্রশক্তি কালক্রমে নিজেদের বিশেষ স্বার্থ অনুসরণ করতে গিয়ে সমাজের সেবক থেকে রূপান্তরিত হল সমাজের প্রভুতে। এটা দেখা যায় দৃষ্টান্তস্বরূপ শুধু বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের বেলায় নয়, সমভাবেই দেখা যাবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও। খাস উত্তর আমেরিকাতে 'রাজনীতিকরা' জাতির ভিতরে যেমন স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, তেমনটি আর কোথাও নয়। সেখানে যে-দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল পাল্টাপাল্টি করে ক্ষমতায় আসীন থাকে, তাদের উভয়কেই আবার চালিত করছে কতকগুলি লোক, রাজনীতি নিয়েই যারা ব্যবসা করে, যারা কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিধান সভাগুলির আসন নিয়ে ফাটকা খেলে, কিংবা নিজ নিজ দলের হয়ে প্রচার চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, এবং নিজ দল জয়লাভ করলে যাদের পুরস্কার জোটে বড় বড় পদ। সবাই জানে যে, অসহ্য হয়ে ওঠা এই জোয়াল কাঁধের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্য আমেরিকানরা গত ত্রিশ বৎসর ধরে কত চেষ্টাই না করেছে, অথচ তাসত্ত্বেও কী ভাবে তারা ক্রমান্বয়ে দুর্নীতির পঙ্কে ক্রমাগত নিচে নেমে যাচ্ছে। ঠিক আমেরিকাতেই আমরা সবচাইতে ভাল করে দেখতে পাই যে রাষ্ট্র-শক্তিকে আদিতে সমাজের একটা হাতিয়ার মাত্র ধরা হয়েছিল সেই রাষ্ট্রশক্তির ধীরে ধীরে সমাজ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া। সে দেশে কোন রাজবংশ নেই, অভিজাত সম্প্রদায় নেই, রেড ইণ্ডিয়ানদের উপর নজর রাখবার জন্য নিযুক্ত কিছু লোক ছাড়া স্থায়ী সেনাবাহিনী নেই, নেই স্থায়ী পদ ও পেনশনের অধিকার সম্বলিত আমলাতন্ত্র। অথচ এখানে আমরা দেখি রাজনৈতিক ফাটকাবাজির দুটি বিরাট দল, পাল্টাপাল্টি করে তারা শাসন-ক্ষমতা দখলে রাখছে, আর সেই রাষ্ট্রশক্তির অপব্যবহার করছে সবচেয়ে দুর্নীতিভরা পদ্ধতিতে সবচেয়ে দুর্নীতিপূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য — আর সমগ্র জাতি শক্তিহীন দাঁড়িয়ে আছে রাজনীতিকদের এই দুটি বিরাট জোটের সমক্ষে, যারা বাহ্যত তার সেবক অথচ প্রকৃতপক্ষে তার কর্তা ও লুণ্ঠনকারী।

ভূতপূর্ব সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই যেটা অনিবার্য রূপান্তর, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সংস্থাগুলির সমাজের সেবক থেকে সমাজের প্রভুতে এই রূপান্তরের বিরুদ্ধে কমিউন দুটি অব্যর্থ

অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। প্রথমত, কমিউন প্রশাসনিক, বিচার ও শিক্ষা সম্পর্কিত সকল পদ পূর্ণ করল সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের মারফৎ, এবং এই নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক যে কোনো সময়ে তাদেব প্রত্যাহার করার অধিকার সহ। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য শ্রমিকেরা যে বেতন পায়, উচ্চ নিম্ন নির্বিশেষে সকল কর্মচারীর পক্ষেই সেই বেতন ধার্য হল। কমিউনের দেওয়া সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৬,০০০ ফ্রাঁ। প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর চাপানো অবশ্য পালনীয় ম্যাণ্ডেট যোগ করা ছাড়াও উচ্চপদ সন্ধান ও ভাগ্যান্বেষণের পথে এইভাবে খাড়া করা হয়েছিল একটা কার্যকরী বাধা।

এইভাবে পূর্বতন রাষ্ট্রশক্তি চূর্ণবিচূর্ণ করে (Sprengung) তার স্থলে এক নতুন ও সত্যকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিষ্ঠা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে 'গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থের তৃতীয় অংশে। তবু এর কয়েকটি দিক সম্পর্কে আরও একবার এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন কারণ, বিশেষ করে জার্মানিতে রাষ্ট্রের উপর সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস দর্শন থেকে এসে বুর্জোয়া শ্রেণীর, এমন কি বহু শ্রমিকের চেতনাতেও আসন পেতেছে। দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র হচ্ছে 'ভাবের বাস্তব রূপায়ণ' অথবা কথাটাকে দার্শনিক ভাষায় অনুবাদ করলে -- পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব, এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে শাশ্বত সত্য ও ন্যায় রূপায়িত হয় বা হওয়া উচিত। আর এর থেকেই জাগে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর প্রতি এক সংস্কারাচ্ছন্ন ভক্তি, তা আরো সহজেই শিকড় গেড়ে বসে কারণ লোকে ছেলেবেলা থেকেই কল্পনা করতে অভ্যস্ত হয় যে, সমগ্র সমাজের সাধারণ ব্যাপার ও স্বার্থের দেখা-শোনা অতীতে যেভাবে হয়েছে, তাছাড়া অন্য ভাবে হতে পারে না, অর্থাৎ সম্পন্ন হতে পারে একমাত্র রাষ্ট্রের মারফৎ আর তার মোটা পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীদের দ্বারা। তাই বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উপর বিশ্বাস মন থেকে দূর করে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের নামে শপথ নিতে পারলেই লোকে ভাবে, খুব একটা সাহসিক অসাধারণ পদক্ষেপ করল তারা। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু রাষ্ট্র একশ্রেণীর হাতে অপর শ্রেণীর নিপীড়ন যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং বস্তুত রাজতন্ত্রের বেলা যতটা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে তার চাইতে কিছু কম নয়; শ্রেণী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জয়লাভের পর সে রাষ্ট্র সর্বোত্তম ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একটা অভিশাপ, বিজয়ী প্রলেতারিয়েত, ঠিক কমিউনের মতনই, সঙ্গে সঙ্গেই যার নিকৃষ্টতম দিকগুলি যথাসম্ভব কেটে বাদ না দিয়ে পারে না, যতদিন না নূতন, মুক্ত সামাজিক অবস্থায় মানুষ হয়ে ওঠা নতুন যুগের নর-নারী এসে এই রাষ্ট্রযন্ত্রের সমগ্র অকেজো বোঝাটাকে আবর্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করতে পারছে।

কিছুদিন হল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কূপমণ্ডূক ফের প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব কথাটায় সাধু আতঙ্ক বোধ করছে। তা বেশ, মহাশয়েরা, আপনারা কি জানতে চান সেই একনায়কত্ব দেখতে কেমন? প্যারিস কমিউনের প্রতি চোখ ফেরান। সেই হল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লণ্ডন, প্যারিস কমিউনের
বিংশ বার্ষিকী দিবসে ১৮ই মার্চ, ১৮৯১

গ্রন্থের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত

মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থের পৃথক সংস্করণের জন্য এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত, বার্লিন ১৮৯১

জার্মান থেকে অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের প্রথম অভিভাষণ

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত সভ্যদের প্রতি

১৮৬৪ সালের নভেম্বর 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির' উদ্বোধনী ভাষণে আমরা বলেছিলাম, 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য যদি তাদের ভ্রাতৃত্বসূচক মতৈক্য প্রয়োজন হয়, তাহলে অপরাধমূলক মতলব হাসিল করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং জাতিগত সংস্কার উত্তেজিত করে খাস দস্যুযুদ্ধে জনগণের রক্ত ও অর্থ অপচয় করে যে পররাষ্ট্র নীতি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই নীতি বজায় থাকলে এই মহান ব্রতটি কী করে পূর্ণ করা যাবে?' যে পররাষ্ট্র নীতি দাবী করে আন্তর্জাতিক, তাকে আমরা এই কথায় সংজ্ঞাবদ্ধ করেছিলাম: '...নীতি ও ন্যায়ের যে সব সহজ নিয়ম দিয়ে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক শাসিত হওয়া উচিত, তাদেরই প্রতিষ্ঠা করা জাতিসমূহের মধ্যকার যোগাযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম হিসাবে।'

তাই যে লুই বোনাপার্ট ক্ষমতা জবরদখল করে নিয়েছিলেন ফ্রান্সে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্যুদ্ধের সুযোগে ও তা টিকিয়ে রেখেছিলেন থেকে থেকে বৈদেশিক যুদ্ধ চালিয়ে, তিনি যে প্রথম থেকে আন্তর্জাতিককে মারাত্মক শত্রু বলে গণ্য করেছেন, তাতে আর আশ্চর্যের কিছু নেই। গণভোটের* ঠিক পূর্বাহ্নে তিনি আদেশ দিলেন সারা ফ্রান্সে —

* সাম্রাজ্যের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব কী, তা জানবার তথাকথিত অজুহাতে ১৮৭০ সালের মে মাসে তৃতীয় নেপোলিয়ন এই গণভোট পরিচালনা করেন। গণভোটের প্রশ্নগুলি এমন ভাষায় রচিত হয়েছিল যে, সমস্ত গণতান্ত্রিক সংস্কারের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত না করে তাঁর নীতির অনুমোদন না-করা অসম্ভব ছিল। প্রথম আন্তর্জাতিকের ফরাসী শাখাগুলি এই চাল ফাঁস করে দেয় ও তার সভ্যদের পরামর্শ দিয়েছিল ভোটদান থেকে বিরত থাকতে। — সম্পাঃ

প্যারিসে, লিয়োঁতে, রুয়েঁতে, মার্সেই-এ, ব্রেস্তে ইত্যাদিতে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির প্রশাসনিক কমিটির সভ্যদের উপর হামলা করতে। অজুহাত ছিল যে আন্তর্জাতিক নাকি একটা গুপ্ত সমিতি, তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত; সে অজুহাতের পরিপূর্ণ উদ্ভটত্ব অচিরে তাঁর নিজস্ব বিচারকদের হাতেই পরিপূর্ণ ফাঁস হয়ে গেল। আন্তর্জাতিকের ফরাসী শাখাসমূহের আসল অপরাধটা কী? তারা প্রকাশ্যে ও সজোরে ফরাসী জনসাধারণের কাছে একথাটাই বলেছিল যে, গণভোটে ভোট দিতে যাওয়া মানে স্বদেশে স্বৈরাচার ও বিদেশে যুদ্ধের অনুকূলে ভোট দেওয়া। বস্তুত তাদেরই কাজের ফলে ফ্রান্সের সমস্ত বড় বড় শহরে এবং সকল শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিক শ্রেণী এক হয়ে দাঁড়ায় গণভোটকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য। দুর্ভাগ্যের কথা, পল্লীপ্রধান জেলাগুলির নিরতিশয় অজ্ঞতার দরুন পাল্লা ভারি হল অন্যপক্ষে। ইউরোপের নানা দেশের ফাটকাবাজার, মন্ত্রিসভা, শাসক শ্রেণী ও সংবাদপত্র উৎসব করেছিল এই বলে যে গণভোটটা ফরাসী শ্রমিক শ্রেণীর উপর ফরাসী সম্রাটের চূড়ান্ত বিজয়; আর সেটা আসলে ব্যক্তিবিশেষকে নয়, জাতির পর জাতিকে হত্যার সংকেত বহন করেছিল।

১৮৭০ সালের জুলাই-এর যুদ্ধ চক্রান্তটা* হল ১৮৫১ সালের ডিসেম্বরের কুদেতার** একটা সংশোধিত সংস্করণ মাত্র। প্রথম নজরে ব্যাপারটা এতই অবাস্তব বলে মনে হয় যে ফ্রান্স তার বাস্তবতায় বিশ্বাসই করতে চায়নি। মন্ত্রীদের যুদ্ধ সংক্রান্ত কথাকে ফাটকাবাজারের দালালদের কারসাজি বলে জনৈক প্রতিনিধি যে ধিক্কার হানেন, লোকে বরং তাঁকেই বিশ্বাস করেছিল। যখন ১৫ই জুলাই তারিখে আইন সংসদের (Corps Législatif) কাছে যুদ্ধ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হল, তখন সমগ্র বিরোধীপক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রাথমিক অর্থমঞ্জুরি সমর্থন করতে অস্বীকার করল, তিয়ের পর্যন্ত ব্যাপারটাকে 'ঘৃণ্য' বলে চিহ্নিত করলেন। প্যারিসের সব কয়টি স্বাধীন সংবাদপত্র তার নিন্দা করল, আর বলতে অদ্ভুত ঠেকে, তার সঙ্গে প্রায় একবাক্যে যোগ দিল প্রাদেশিক পত্র-পত্রিকাগুলিও।

আন্তর্জাতিকের প্যারিসস্থ সদস্যরা ইতিমধ্যেই আবার কাজে নেমে পড়েছিল। *Réveil****** পত্রিকায় ১২ই জুলাই বের হল তাদের ইশতেহার 'সকল জাতির শ্রমিকদের প্রতি'। এর থেকে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদ এখানে তুলে দিচ্ছি।

এ'রা বলছেন, 'ইউরোপীয় শক্তিসাম্য রক্ষার অছিলায়, জাতীয় সম্মানরক্ষার

---

* ১৮৭০ সালের ১৯শে জুলাই শুরু হয় ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ। — সম্পাঃ

** ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর লুই বোনাপার্ট কর্তৃক যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাদখলে বোনাপার্টী দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সূত্রপাতের হয় তার কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

*** Réveil — শার্ল দেলেক্লুজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী প্রজাতন্ত্রী পত্রিকা। ১৮৬৮ সাল থেকে ১৮৭১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এই পত্রিকা প্যারিস থেকে বের হয়েছিল। — সম্পাঃ

অছিলায়, বিশ্বশান্তি আর একবার রাজনৈতিক দুরাকাঙ্ক্ষায় বিপন্ন। ফরাসী, জার্মান, স্পেনীয় শ্রমিক! আসুন, আমরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েই এক যোগে ধিক্কার দিই যুদ্ধকে!.. রাষ্ট্র প্রাধান্য বা রাজবংশগত অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে যে যুদ্ধ, সে যুদ্ধ শ্রমিকদের চোখে এক অপরাধী উদ্ভটত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। রক্তক্ষয় থেকে নিজেদের গা বাঁচিয়ে, সর্বসাধারণের দুর্দশায় নূতন ফাটকা খেলার সুযোগ দেখে যারা সব যুদ্ধমুখী ঘোষণা করছে, তাদের প্রতিবাদ করছি আমরা; আমরা চাই শান্তি, কাজ এবং মুক্তি!.. জার্মানির ভাইয়েরা! আমরা বিভক্ত হয়ে পড়লে তার ফলে **স্বৈরাচারের** পরিপূর্ণ বিজয় ঘটবে রাইনের উভয় তীরেই... সকল দেশের শ্রমিক ভাইয়েরা! আমাদের মিলিত প্রচেষ্টার ভাগ্যে আপাতত যাই থাক না কেন, শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্য আমরা কোন সীমানাই মানি না; অবিচ্ছেদ্য সংহতির শপথস্বরূপ তোমাদের কাছে আমরা পাঠালাম ফরাসী শ্রমিকদের শুভেচ্ছা ও সেলাম।'

আমাদের প্যারিস শাখার এই ইশতেহারের পরে বেরয় বহুসংখ্যক অনুরূপ ফরাসী ঘোষণা; তার মধ্য থেকে কেবল *Marseillaise** পত্রিকায় ২২শে জুলাই প্রকাশিত নেয়ি-সুর-সেনের ঘোষণার কিছুটা উদ্ধৃত করব: 'এই যুদ্ধ কি ন্যায়সঙ্গত? না! এই যুদ্ধ কি জাতীয়? না! এ যুদ্ধ নিছক রাজবংশগত যুদ্ধ। এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক যে-প্রতিবাদ করেছে মানবতার নামে, গণতন্ত্রের নামে এবং ফ্রান্সের প্রকৃত স্বার্থের নামে আমরা উৎসাহের সঙ্গে তাকে পূর্ণাঙ্গ সমর্থন জানাচ্ছি।'

এইসব প্রতিবাদে ফরাসী শ্রমজীবী জনগণের আসল মনোভাবই যে ব্যক্ত হয়েছিল তার প্রমাণ অল্পদিনের ভিতরই পাওয়া গেল একটা অদ্ভুত ঘটনায়। লুই বোনাপার্টের সভাপতিত্বে প্রথম গঠিত হয়েছিল যে '১০ই ডিসেম্বরের' দঙ্গল তাদের শ্রমিকের ছদ্মবেশে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় রণোন্মাদনার কসরত দেখানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হলে** উপকণ্ঠের **(Faubourgs)** আসল শ্রমিকেরা প্রকাশ্য শান্তি মিছিলে এগিয়ে

* Marseillaise — ১৮৬৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৭০ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আঁরি রশফোর কর্তৃক প্যারিস থেকে প্রকাশিত বামপন্থী প্রজাতন্ত্রী পত্রিকা। — সম্পাঃ

** ১০ই ডিসেম্বরের সমিতির কথা বলা হচ্ছে (এই নামকরণ কেননা ১৮৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর এই সমিতির রক্ষক লুই বোনাপার্ট নির্বাচিত হন ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে)। — এটি একটি গোপন বোনাপার্টপন্থী সমিতি, গঠিত হয় ১৮৪৯ সালে, প্রধানত শ্রেণীচ্যুত লোকজন, রাজনৈতিক ভাগ্যসন্ধানী, সামরিক চক্রের প্রতিনিধি ইত্যাদিদের নিয়ে। সমিতিটি আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮৫০ সালের নভেম্বরে তুলে দেওয়া হলেও আসলে এই সমিতির লোকেরা বোনাপার্টপন্থী প্রচার চালিয়ে যেতে থাকে ও ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বরের কুদেতায় সক্রিয় অংশ নেয়।

লুই বোনাপার্টের রাজ্যগ্রাসী পরিকল্পনার সমর্থনে ১৮৭০ সালের ১৫ই জুলাই পুলিশের সহায়তায় বোনাপার্টপন্থীরা একটি উগ্রজাতিবাদী শোভাযাত্রা সংগঠিত করে। — সম্পাঃ

আসে। সে মিছিল এতই জোরালো হয়ে উঠেছিল যে, প্যারিস পুলিশের কর্তা পিয়েত্রি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় সমস্ত রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়াই বিজ্ঞজনোচিত বলে মনে করলেন, অজুহাত দেখালেন যে, অনুগত প্যারিসবাসীরা তাদের অবরুদ্ধ দেশপ্রেম এবং উচ্ছ্বসিত রণোৎসাহ যথেষ্ট ব্যক্ত করেছে।

প্রাশিয়ার সঙ্গে লুই বোনাপার্টের যুদ্ধের পরিণতি যাই হোক না কেন, দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের মৃত্যু ঘণ্টা প্যারিসে ইতিমধ্যে ধ্বনিত হয়ে গেছে। শুরুর মতোই তা শেষ হবে এক প্রহসনে। আমাদের কিন্তু ভুললে চলবে না, **পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের** হিংস্র কৌতুকনাট্যের অভিনয় লুই বোনাপার্ট যে আঠারো বছর চালিয়ে যেতে পারলেন, তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার ও শাসক শ্রেণীর দৌলতেই।

জার্মানদের দিক থেকে এ যুদ্ধ আত্মরক্ষার যুদ্ধ, কিন্তু কে জার্মানিকে আত্মরক্ষার এই প্রয়োজনে এনে ফেলল? তার বিরুদ্ধে যুদ্ধচালার সম্ভাবনা লুই বোনাপার্টকে দিল কে? **প্রাশিয়া!** এই লুই বোনাপার্টের সঙ্গেই যিনি ষড়যন্ত্র করেছিলেন স্বদেশে গণ বিরোধিতাকে নিষ্পেষিত করার এবং হয়েনৎসলার্ন রাজবংশের জন্য জার্মানিকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে, সেই বিসমার্ক। সাদোভার* যুদ্ধে জয় না হয়ে যদি হার হত, তাহলে প্রাশিয়ার মিত্র হিসাবেই ফরাসী ফৌজ জার্মানি ছেয়ে ফেলত। জয়লাভের পর প্রাশিয়া কি মুক্ত জার্মানিকে শৃঙ্খলিত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লাগাবার কথা মুহূর্তের জন্যও স্বপ্নেও ভেবেছে?.. ঠিক তার বিপরীত। তার পুরানো বিধি-ব্যবস্থার ভিতর যা-কিছু স্বদেশীয় রূপ-লাবণ্য ছিল তা সযত্নে রক্ষা করে সে তার উপর আরো জুড়ল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সকল কলাকৌশল — তার খাঁটি স্বৈরতন্ত্র ও ভুয়ো গণতন্ত্র, তার রাজনৈতিক ঠাট ও আর্থিক মৃগয়া, তার জমকালো বুলি ও নীচ ঠকবাজি। এ পর্যন্ত রাইনের এক পাড়েই ছিল বোনাপার্ট মার্কা শাসন-ব্যবস্থা, এখন অন্যপাড়েও দেখা দিল তার জাল সংস্করণ। এই অবস্থা থেকে **যুদ্ধ** ছাড়া আর কী গত্যন্তর হতে পারে?

যদি জার্মান শ্রমিক শ্রেণী এই যুদ্ধের নিছক আত্মরক্ষামূলক চরিত্র জলাঞ্জলি দিয়ে একে ফরাসী জনসাধারণের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পর্যবসিত হতে দেয় তাহলে, জয় হোক আর পরাজয়ই হোক, দুই-ই সমভাবে বিপর্যয়কর বলে প্রমাণিত হবে। জার্মানির মুক্তি-যুদ্ধের পর তার ভাগ্যে যেসব দুর্দশা ঘনিয়ে এসেছিল তীব্রতর রূপে ঘটবে তারই পুনরাবৃত্তি।

অবশ্য, আন্তর্জাতিকের নীতি জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে আজ এতটা বিস্তৃত, এত দৃঢ়ভাবে তার শিকড় সেখানে নিবদ্ধ যে, এরকম শোচনীয় পরিণতি আশঙ্কা করার

* ১৮৬৬ সালে যে অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধ বাঁধে তার নির্ধারক লড়াই হয় সাদোভার রণাঙ্গনে (বোহেমিয়াতে); প্রাশিয়ার জয় হয়েছিল এই যুদ্ধে। — সম্পাঃ

কারণ নেই। ফরাসী শ্রমিকদের কণ্ঠধ্বনি জার্মানি থেকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ১৬ই জুলাই ব্রুনস্‌ভিক্‌-এ অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের বিরাট জনসভা প্যারিস ইশ্‌তেহারের সঙ্গে সম্পূর্ণ মতৈক্য ঘোষণা করেছে, ফ্রান্সের সঙ্গে জাতীয় বৈরিতার কথাটাতে পদাঘাত করেছে, ও এই ভাষায় নিজ প্রস্তাব শেষ করেছে: 'সকল যুদ্ধের, কিন্তু সর্বোপরি রাজবংশীয় যুদ্ধের শত্রু আমরা ... গভীর ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে আমাদের এই অনিবার্য অমঙ্গলস্বরূপ আত্মরক্ষার যুদ্ধ সহ্য করতে হচ্ছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, শান্তি ও যুদ্ধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারটা জনসাধারণের নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসে জনগণকেই আপন ভাগ্যনিয়ন্তা করে এইরকম বিপুলায়তন সামাজিক দুর্ভাগ্যের পুনরাবির্ভাবকে অসম্ভব করে তুলবার আহ্বান আমরা জানাচ্ছি সমগ্র জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর কাছে।'

খেম্‌নিৎসে ৫০,০০০ স্যাক্‌সন শ্রমিকের প্রতিনিধিদের এক সভায় নিম্নলিখিত মর্মে এক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়: 'জার্মান গণতন্ত্রের নামে, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের নামে, আমরা ঘোষণা করছি যে, এ-যুদ্ধ রাজবংশীয় যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়... 'আমাদের দিকে প্রসারিত ফ্রান্সের শ্রমিকদের ভ্রাতৃত্বসূচক হাত হাতে ধরতে পেরে আমরা খুসি। **দুনিয়ার মজুর এক হও!** শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির এই ধ্বনি স্মরণে রেখে আমরা কখনই ভুলব না যে **সর্ব** দেশের শ্রমিকরাই আমাদের **মিত্র** আর **সকল** দেশের স্বৈরাচারীরাই আমাদের **শত্রু**।' আন্তর্জাতিকের বার্লিন শাখাও প্যারিস ইশ্‌তেহারের জবাব দিয়েছে; এরা বলছে: 'আমরা মনে-প্রাণে আপনাদের প্রতিবাদে যোগ দিচ্ছি... সগাম্ভীর্যে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সকল দেশের শ্রমের সন্তানদের মিলিত করার সাধারণ কর্তব্য থেকে আমাদের বিচ্যুত করতে পারবে না কোনো রণদুন্দুভিই, কোনো কামান-গর্জনই, কোনো জয়, কোনো পরাজয়।'

তাই হোক!

এই আত্মঘাতী সংঘর্ষের পশ্চাদপটে আভাসিত হচ্ছে রাশিয়ার কৃষ্ণ মূর্তি। যখন মস্কো সরকার সবেমাত্র তার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেলপথগুলি বসানো শেষ করে প্রুথ নদীর দিকে সেনা সমাবেশ করে চলেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে যে এই যুদ্ধ শুরু করার সংকেত দেওয়া হল, এটা অশুভ লক্ষণ। বোনাপার্টীয় আক্রমণাত্মক অভিযানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার যুদ্ধে যে সহানুভূতি জার্মানরা সঙ্গতভাবেই দাবি করতে পারে, সেটুকু অধিকার তারা মুহূর্তেই হারাবে যদি তারা প্রুশীয় সরকারকে কসাক সৈন্যের সাহায্য চাইতে অথবা গ্রহণ করতে দেয়। তারা যেন মনে রাখে যে, প্রথম নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধের পরে জার্মানিকে কয়েক পুরুষ ধরে জারের পদমূলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে থাকতে হয়েছিল।

ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণী ফরাসী ও জার্মান শ্রমিকদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে

দিচ্ছে। তাদের গভীর বিশ্বাস যে, আসন্ন ভয়াবহ যুদ্ধের গতি যে-দিকেই ফিরুক না কেন, সকল দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মৈত্রীই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের নিধন ঘটাবে। যখন সরকারী ফ্রান্স ও জার্মানি ছুটে চলেছে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের মধ্যে, ঠিক তখনই ফ্রান্স ও জার্মানির শ্রমিকরা একে অন্যকে শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী পাঠাচ্ছে, এই যে ঘটনা, অতীত ইতিহাসে যার নজির মেলে না, এই বিরাট ঘটনাই খুলে দিয়েছে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিত। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং রাজনৈতিক জ্বরবিকার সহ এই পুরাতন সমাজের জায়গায় নূতন এক সমাজ জেগে উঠছে, **শান্তিই** হবে তার আন্তর্জাতিক বিধান কারণ, সর্বত্রই তার জাতীয় অধিপতি একই — **শ্রম!** সেই নতুন সমাজেরই অগ্রদূত হল শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি।

[লণ্ডন], ২৩শে জুলাই, ১৮৭০

মার্কস কর্তৃক লিখিত এবং ১৮৭০-এর ২৩শে জুলাই শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের অধিবেশন কর্তৃক অনুমোদিত

সেইসঙ্গেই প্রচারপত্ররূপে ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় মুদ্রিত

ইংরেজী প্রচারপত্রের পাঠ অনুসারে অনূদিত

ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় অভিভাষণ

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত সভ্যদের প্রতি

২৩শে জুলাই আমাদের প্রথম অভিভাষণে আমরা বলেছিলাম: 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের মৃত্যু ঘণ্টা প্যারিসে ইতিমধ্যে ধ্বনিত হয়ে গেছে। শুরুর মতো তার শেষও হবে এক প্রহসনে। আমাদের কিন্তু ভুললে চলবে না **পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের** হিংস্র কৌতুকনাট্যের অভিনয় লুই বোনাপার্ট যে আঠারো বছর চালিয়ে যেতে পারলেন, তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার ও শাসক শ্রেণীর দৌলতেই।'

দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধ কার্যত শুরু হবার আগেই আমরা বোনাপার্টীয় বুদ্‌বুদ্‌টিকে অতীত বলে ধরে নিয়েছিলাম।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে যেমন আমরা ভুল করিনি, তেমনই আমাদের আশঙ্কাটা অমূলক ছিল না যে, জার্মান যুদ্ধ তার 'নিছক আত্মরক্ষামূলক চরিত্র বিসর্জন দিয়ে ফরাসী জনসাধারণের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পর্যবসিত' হবে। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধটা বস্তুত শেষ হয়ে গেল লুই বোনাপার্টের আত্মসমর্পণে, সেদানে সৈন্যদল বন্দী হওয়ায় এবং প্যারিসে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণায়। কিন্তু এইসব ঘটনা ঘটার বহুপূর্বে যেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি একেবারে পচে গেছে, তখনই প্রুশীয় সামরিক দরবারী চক্র (camarilla) দেশজয়ের সংকল্প করেছিল। তাদের সামনে অবশ্য এক বিশ্রী বাধা ছিল — **যুদ্ধের শুরুতে রাজা ভিলহেল্‌ম স্বয়ং যে ঘোষণা-বাণী করেছিলেন সেটি**। সিংহাসন থেকে উত্তর জার্মান রাইখ্‌স্টাগের প্রতি প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায় তিনি গম্ভীরভাবে ঘোষণা করেন যে

লড়াই করা হবে ফরাসীদের সম্রাটের বিরুদ্ধে, ফরাসী জনগণের বিরুদ্ধে নয়। **১১ই আগস্ট ফরাসী জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ইশ্‌তেহারে তিনি বলেছিলেন, 'জার্মান** জাতি যেখানে ফরাসী জনসাধারণের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখে চলতে চেয়েছিল এবং এখনও চায়, সেখানে সম্রাট নেপোলিয়ন স্থল ও জলপথে তাদের উপর আক্রমণ শুরু করাতে, **তাঁর সেই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য** আমি জার্মান সেনাবাহিনীগুলির অধিনায়কত্ব স্বহস্তে তুলে নিলাম, এবং **সামরিক ঘটনাবলীর চাপেই** আমাকে ফ্রান্সের **সীমান্ত অতিক্রম করতে হল।'** যুদ্ধটা যে আত্মরক্ষামূলক ছাড়া আর কিছু নয়, এই কথা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে শুধু **'আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য'** তিনি জার্মান সেনাবাহিনীগুলির অধিনায়কত্ব স্বহস্তে নিয়েছেন বলে ঘোষণা করেই তিনি খুশি থাকতে পারেননি, তিনি যোগ দিলেন যে, 'সামরিক ঘটনাবলীর চাপেই' তিনি ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। অবশ্যই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ থেকেও আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ বাদ দেওয়া যায় না, যদি 'সামরিক ঘটনাবলীর' দরুন তার প্রয়োজন দেখা দেয়।

এইভাবে নিছক আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে নিবদ্ধ থাকার প্রতিশ্রুতিতে এই ধর্মপ্রবণ রাজা ফ্রান্স এবং সমগ্র জগতের সামনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখন কেমন করে তাঁকে সেই পবিত্র প্রতিশ্রুতি থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়? মঞ্চাধ্যক্ষদের দেখাতে হল যেন জার্মান জাতির অপ্রতিরোধ্য নির্দেশ তাঁকে অনিচ্ছাভরেই মেনে নিতে হচ্ছে। তারা তৎক্ষণাৎ সংকেত পাঠাল তার অধ্যাপক, পুঁজিপতি, পৌরসদস্য, ও লেখক-গোষ্ঠী সমেত জার্মান উদারপন্থী মধ্য শ্রেণীর কাছে। এ মধ্য শ্রেণী তাদের নাগরিক স্বাধীনতার সংগ্রামে ১৮৪৬ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত যে অস্থিরমতি, অক্ষমতা ও ভীরুতা প্রদর্শন করেছিল তার তুলনা নেই; জার্মান দেশপ্রেমের গর্জমান সিংহের রূপে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে পদক্ষেপ করার সুযোগ পেয়ে তারা অবশ্য খুবই উল্লসিত হয়ে উঠল। প্রুশীয় সরকার মনে মনে যে মতলব এঁটেছিল এরা সেটাই সেই সরকারের উপর চাপিয়ে দেবার ভান করে যেন নিজেদের নাগরিক স্বাধীনতারই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল। লুই বোনাপার্ট ভ্রম-প্রমাদের ঊর্ধ্বে, এই কথাটাকে তারা দীর্ঘকাল ধরে প্রায় বেদবাক্যের মতো বিশ্বাস করে এসেছিল; আজ তারই প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তারা ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে বিখণ্ডিত করে ফেলার জন্য হাঁক ছাড়ল। বীরপ্রাণ এই দেশপ্রেমিকেরা যে বিশেষ বিশেষ সওয়াল তুলেছিল তা একটু শোনা যাক।

আলসাস আর লোরেনের অধিবাসীরা জার্মান আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছে, এমন ভান করার সাহস এদের ছিল না; সত্য ঠিক তার বিপরীত। ফরাসী দেশভক্তির শাস্তি স্বরূপ, স্বতন্ত্র দুর্গে সুরক্ষিত স্ত্রাসবুর্গ শহরের উপর 'জার্মান' বিস্ফোরক গোলা বর্ষিত হয় ছয়দিন ধরে নির্বিচার পৈশাচিকভাবে। শহর

জ্বালিয়ে দেওয়া হল, অসহায় অধিবাসীরা নিহত হল বিপুল সংখ্যায়। কিন্তু একদা প্রদেশ দুইটির মাটি ভূতপূর্ব জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই যেন সেই মাটি ও যে মানুষের জন্ম সে মাটিতে তাদেরও চিরন্তন জার্মান সম্পত্তি বলে বাজেয়াপ্ত করা উচিত। কিন্তু পুরাতাত্ত্বিকের চালে যদি ইউরোপের মানচিত্র ঢেলে সাজাতে হয়, তবে আমাদের ভোলা চলবে না যে ব্রান্দেনবুর্গের ইলেক্টর তাঁর প্রুশীয় জমিজমার জন্য ছিলেন পোলিশ প্রজাতন্ত্রের অধীন সামন্ত মাত্র।

বেশী জ্ঞানী দেশপ্রেমিকরা অবশ্য আলসাস এবং লোরেনের জার্মান ভাষী এলাকা দাবি করে ফরাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে 'বৈষয়িক রক্ষাকবচ' হিসাবে। এই ঘৃণ্য অজুহাত বহু ক্ষীণ-চেতা লোককে বিমূঢ় করেছে বলে এ বিষয়ে আমাদের আরও বিশদভাবে আলোচনা করতে হচ্ছে।

সন্দেহ নেই যে, রাইনের বিপরীত তীরের তুলনায়, আলসাসের সাধারণ গড়ন এবং বাস্‌ল্‌ ও গের্মারসহাইমের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে স্ত্রাসবুর্গের মতো বৃহৎ সুরক্ষিত শহরের অবস্থিতি দক্ষিণ জার্মানির উপর ফরাসী আক্রমণ চালাবার পক্ষে খুবই অনুকূল, অথচ দক্ষিণ জার্মানি থেকে ফ্রান্স আক্রমণ চালাবার পক্ষে এরাই হল বিশেষ বাধা। এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, আলসাস এবং লোরেনের জার্মান ভাষী অঞ্চলকে সঙ্গে যুক্ত করে নিতে পারলে দক্ষিণ জার্মানির সীমান্ত অনেক বেশি সুরক্ষিত হয় কারণ, তাহলে ভগেজ পর্বতমালার গোটা দৈর্ঘ্য বরাবর গিরিশিখরগুলির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব সে পেতে পারে আর এই পর্বতমালার উত্তরদিকের গিরিপথের রক্ষক দুর্গসমূহও তার দখলে আসে। এর সঙ্গে আবার যদি মেৎস অধিকার করে নেওয়া যায়, তাহলে নিশ্চয় জার্মানির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার দুইটি প্রধান ঘাঁটিই আপাতত ফ্রান্সের হাত-ছাড়া হবে, কিন্তু এতে করে নান্সি অথবা ভেরদেঁ-তে নতুন করে ঘাঁটি গড়ে নেওয়ায় তার বাধা হবে না। জার্মানির দখলে যদি কব্‌লেনৎস, মেইনৎস, গের্মারসহাইম, রাশ্‌তাত ও উল্‌ম থাকে, এ সবই হল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার ঘাঁটি, এ যুদ্ধেও এদের বহুল ব্যবহার হয়েছে,—তাহলে কোন সুবিচারের দোহাই দিয়ে ফ্রান্সের এ অঞ্চলে অবস্থিত দুইটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ, অর্থাৎ স্ত্রাসবুর্গ ও মেৎসের উপর অধিকারে আপত্তি করা সম্ভব? তাছাড়া উত্তর জার্মানি থেকে একটা বিচ্ছিন্ন শক্তি হিসাবে থাকলেই শুধু দক্ষিণ জার্মানির পক্ষে স্ত্রাসবুর্গ বিপজ্জনক। ১৭৯২-৯৫-এর মধ্যে এই দিক থেকে দক্ষিণ জার্মানি কখনও আক্রান্ত হয়নি, কারণ তখন প্রাশিয়া ছিল ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একজন অংশীদার; কিন্তু ১৭৯৫-এ প্রাশিয়া যেই তার নিজের আলাদা শান্তি চুক্তি করে দক্ষিণ জার্মানিকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল, তখন থেকেই শুরু হয়ে ১৮০৯ সাল অবধি চলল স্ত্রাসবুর্গকে ঘাঁটি করে দক্ষিণ জার্মানি আক্রমণ। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, **ঐক্যবদ্ধ** জার্মানি স্ত্রাসবুর্গকে এবং আলসাসে

অবস্থিত ফরাসী বাহিনীকে সর্বদাই অকেজো করে দিতে পারে সারলুই ও লান্দাউ-এর মধ্যে তার সকল সেনাদলকে সন্নিবিষ্ট করে আর মেইনৎস ও মেৎসের মধ্যবর্তী রাস্তার রেখা বরাবর এগিয়ে গেলে, বা এই এলাকাতেই লড়াইয়ে নিযুক্ত হলে। বর্তমান যুদ্ধেও এ-ই করা হয়েছিল। এইখানে বিপুল জার্মান সেনা মোতায়েন থাকলে, যে-ফরাসী সেনাবাহিনী স্ত্রাসবুর্গ থেকে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ জার্মানির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে যাবে তারই পার্শ্বভাগ প্যাঁচে পড়বে ও যোগাযোগ বিপন্ন হবে। বর্তমানের অভিযান যদি কিছু প্রমাণ করে থাকে, তো জার্মানি থেকে ফ্রান্স আক্রমণের সুবিধাটাই প্রমাণ করেছে।

কিন্তু, ভেবে দেখলে, সামরিক বিবেচনাকেই জাতিসমূহের সীমান্ত নির্ধারণের নীতি করে তোলা কি একেবারেই উদ্ভট ও কালব্যতিক্রম নয়? এই নীতিই যদি চলে তাহলে অস্ট্রিয়া এখনও ভেনিস এবং মিনচিও নদী রেখার এলাকা পাবার অধিকারী আর প্যারিস রক্ষার জন্য রাইন নদী রেখার এলাকা ফ্রান্সেরই প্রাপ্য; কারণ দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে বার্লিন আক্রমণের পথ যতটা উন্মুক্ত, উত্তর পূর্ব থেকে প্যারিস আক্রমণের পথ তার চাইতে নিশ্চয় অনেক বেশি উন্মুক্ত। সীমান্ত যদি সামরিক স্বার্থ বিচার করে স্থির করতে হয়, তাহলে দাবির আর অন্ত থাকে না; কারণ প্রতিটি সামরিক সীমান্তরেখাই ত্রুটিপূর্ণ, তার বাইরের আরও খানিকটা রাজ্যাংশ তার সঙ্গে জুড়ে নিলে তা আরও উন্নত হতে পারে; তাছাড়া, তেমন রেখা কখনই চূড়ান্ত ও ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্দিষ্ট হতে পারবে না, কারণ বরাবরই বিজিতের উপর তাকে চাপিয়ে দিতে হবে বিজেতাদের, আর ফলে এর ভিতরেই নিহিত থেকে যাবে নতুন যুদ্ধের বীজ।

সব ইতিহাস থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন এ সত্য, জাতির ক্ষেত্রেও তেমনই। আক্রমণ করার ক্ষমতা কারও কাছ থেকে কেড়ে নিতে হলে, তাদের আত্মরক্ষার উপায় থেকেও বঞ্চিত করতে হবে। শুধু গলা চেপে ধরলেই চলবে না, হত্যাও করতে হবে। কোন বিজেতা যদি একটা জাতির পেশী ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যে 'বৈষয়িক নিশ্চিতি' আদায় করে নিয়ে থাকে, তবে প্রথম নেপোলিয়ন তাই করেছিলেন তিলজিত সন্ধিতে* এবং সেই সন্ধিকে প্রাশিয়া ও বাকি জার্মানির বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে। তবু, কয়েক বছর পরেই, তাঁর সেই বিপুল শক্তি পচা উলুখড়ের মতন ভেঙে পড়ল জার্মান জনসাধারণের ওপর। প্রথম নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার কাছ থেকে যে 'বৈষয়িক নিশ্চিতি' ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তার তুল্য কিছু ফ্রান্সের উপর চাপাতে পারার বা চাপাতে সাহস পাবার কথা প্রাশিয়া কি উদ্দামতম স্বপ্নেও ভাবতে পারে? তার পরিণতিটাও কম বিপর্যয়কর হবে না। ইতিহাস তার প্রতিশোধ নেবে ফ্রান্সের কাছ

* প্রথম নেপোলিয়নের সেনাদলের কাছে প্রাশিয়ার সামরিক পরাজয় হবার পর ১৮০৭ সালে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে তিলজিত চুক্তি সম্পন্ন হয়। — সম্পাঃ

থেকে কত বর্গ মাইল কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তার হিসাব করে নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে **পররাজ্যগ্রাসের নীতিকে** পুনরুজ্জীবিত করার অপরাধের গুরুত্ব দিয়ে।

কিন্তু টিউটনীয় দেশপ্রেমিকদের মুখপাত্ররা বলে থাকেন, ফরাসীদের সঙ্গে জার্মানদের গুলিয়ে ফেললে চলবে না। আমরা যা চাই, তা গৌরব নয়, নিরাপত্তা। জার্মান জাতি নিতান্তই শান্তিপ্রিয় জাতি। তাদের বিচক্ষণ রক্ষণাধীনে পররাজ্যগ্রাস ঘটনাটাই ভবিষ্যৎ যুদ্ধের হেতু না হয়ে পরিণত হয়ে যায় চিরস্থায়ী শান্তির প্রতিশ্রুতিতে। আঠারো শতকের বিপ্লবকে সঙ্গীনবিদ্ধ করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ১৭৯২ সালে যারা ফ্রান্স আক্রমণ করেছিল তারা জার্মান নয় বৈকি! যারা ইতালিকে পদানত, হাঙ্গারিকে নিপীড়িত ও পোল্যান্ডকে বিখণ্ডিত করে হাত কলঙ্কিত করেছিল, তারা ত জার্মান নয়! জার্মানদের বর্তমান যে সামরিক ব্যবস্থায় দেশের সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের দুভাগে ভাগ করে রেখেছে --- একভাগ সাক্ষাৎ সামরিক কার্যে নিযুক্ত স্থায়ী সেনাবাহিনী আর অপরভাগ অবসরভোগী স্থায়ী বাহিনী, ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার বলে যাঁরা শাসক, তাঁদের প্রতি নিষ্ক্রিয় বাধ্যতায় তারা উভয়েই সমান সর্তবদ্ধ — এমন যে সামরিক ব্যবস্থা, সে ত নিশ্চয়ই শান্তিরক্ষার 'বৈষয়িক নিশ্চিতি' আর সভ্যীকরণ প্রবণতার চরম লক্ষ্য! সবদেশের মতন জার্মানিতেও প্রতিষ্ঠিত শক্তির স্তাবকেরা মিথ্যা আত্মশ্লাঘার ধূপ জ্বালিয়ে বিষাক্ত করে জনমন।

মেৎস ও স্ত্রাসবুর্গে ফরাসী দুর্গ দেখে ক্রোধের ভান করলেও এইসব জার্মান দেশপ্রেমিকেরা কিন্তু ওয়ারস, মদলাঁ ও ইভানগরদে মস্কোর সুবিস্তৃত দুর্গজালে কোনো ক্ষতি দেখেন না। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের ভয়াবহতার দিকে নয়ন বিস্ফারিত করলেও স্বৈরতন্ত্রের খবরদারি মেনে চলবার অপমানটায় চোখ বোজেন।

১৮৬৫ সালে লুই বোনাপার্ট ও বিসমার্কের মধ্যে যেমন কথা হয়ে গিয়েছিল, ১৮৭০ সালে ঠিক তেমনই কথা হয়ে গেছে গর্চাকভ ও বিসমার্কের মধ্যেও। লুই বোনাপার্ট যেমন এই আত্মপ্রসাদে নিজেকে বুঝিয়েছিলেন যে, ১৮৬৬-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া উভয়েই যখন অবসন্ন হয়ে পড়বে, তখন তিনিই হবেন জার্মানির দণ্ডমুণ্ডের আসল কর্তা; তেমনই আলেক্সান্দরও এই আত্মপ্রসাদ নিয়েছেন যে, ১৮৭০-এর যুদ্ধ জার্মানি ও ফ্রান্স উভয়কেই শক্তিহীন করে ফেলে তাঁকেই সারা পশ্চিম ইউরোপের ভাগ্য-বিধাতা করে দেবে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য যেমন ভেবেছিল যে, উত্তর জার্মান সংযুক্তরাষ্ট্র তার অস্তিত্বের অন্তরায়, তেমনই স্বৈরতন্ত্রী রাশিয়াও মনে করতে বাধ্য যে প্রুশীয় নেতৃত্বাধীন জার্মান সাম্রাজ্যে সে বিপন্ন। সাবেকী রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিয়মই এই। সে নিয়মের চৌহদ্দির ভিতরে এক রাষ্ট্রের লাভে অপর রাষ্ট্রের ক্ষতি। ইউরোপের উপর জারের চূড়ান্ত প্রভাবের মূল হল জার্মানির উপরে তার চিরাচরিত কর্তৃত্বের ভিতরে। যে-সময়টাতে খোদ রাশিয়ার ভিতরেই অগ্নিগর্ভ সামাজিক শক্তিগুলি

স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি ধরে নাড়া দেবার উপক্রম করেছে, ঠিক তখন জার কি তাঁর বৈদেশিক মর্যাদার এতটা হানি সহ্য করতে পারেন? ১৮৬৬ সালের যুদ্ধের পরে বোনাপার্টীয় পত্রিকাগুলি যে ভাষায় কথা বলেছিল, এর মধ্যেই মস্কোর পত্রিকাগুলিও সেই ভাষারই পুনরাবৃত্তি শুরু করেছে। ফ্রান্সকে রাশিয়ার কোলে জোর করে ঠেলে দিলে জার্মানির মুক্তি ও শান্তি সুনিশ্চিত হবে, এ কথা কি টিউটনীয় দেশপ্রেমিকরা প্রকৃতই বিশ্বাস করেন? অস্ত্রবলের সৌভাগ্য, সাফল্যজনিত দম্ভ এবং রাজবংশজ চক্রান্ত যদি জার্মানিকে টেনে নিয়ে যায় ফ্রান্সের অঙ্গচ্ছেদের দিকে, তাহলে তার সম্মুখে খোলা থাকবে দুটি মাত্র পথ: হয়, সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে তাকে রুশ স্ফীতির **প্রকাশ্য** হাতিয়ারে পরিণত হতে হবে; না হয়, স্বল্পকাল বিরতির পর তাকে প্রস্তুত হতে হবে আবার এক 'আত্মরক্ষামূলক' যুদ্ধের জন্য, হালে চলতি ঐ 'স্থানীয়কৃত' যুদ্ধ নয়, **জাতি যুদ্ধ,** সম্মিলিত স্লাভ ও রোমক জাতিদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

যুদ্ধ নিরোধের শক্তি জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর ছিল না, তাই তারা এ যুদ্ধের দৃঢ় সমর্থন করেছিল এই হিসাবে যে, এটা জার্মান স্বাধীনতার যুদ্ধ, এটা ঐ মড়কের প্রেত দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের হাত থেকে ফ্রান্স ও ইউরোপের মুক্তি যুদ্ধ। আপন পরিবার-পরিজনকে অর্ধাহারে ফেলে রেখে বীর বাহিনীর পেশী গড়েছে জার্মান শ্রমিকেরাই গ্রামের মেহনতীদের সঙ্গে একত্রে। বিদেশে এরা মরেছে যুদ্ধে, আবার স্বদেশেও এদের মরতে হবে দুর্দশায়। এবার এগিয়ে এসে 'নিশ্চিতি' চাইবার পালা এদের, এই রক্ষাকবচ যাতে এদের অপরিমিত আত্মত্যাগ ব্যর্থ না হয়, যাতে তারা মুক্তি পায়, যাতে বোনাপার্টীয় সেনাবাহিনীর উপর তাদের এই বিজয়, ১৮১৫ সালের মতন, জার্মান জনসাধারণের পরাজয়ে রূপান্তরিত না হয়; এবং প্রথম রক্ষাকবচ হিসাবে তারা দাবি করছে **ফ্রান্সের পক্ষে সম্মানজনক শান্তিচুক্তি,** এবং **ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি।**

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ৫ই সেপ্টেম্বরে প্রচারিত এক ইশ্‌তেহারে এইসব রক্ষাকবচের ওপর জোর দেয়। তারা বলে, 'আমরা আলসাস ও লোরেন গ্রাসের প্রতিবাদ করছি। আমরা জানি যে আমরা জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর নামেই কথা বলছি। ফ্রান্স ও জার্মানি উভয়ের স্বার্থে, শান্তি ও মুক্তির স্বার্থে, পূর্বীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে পশ্চিমী সভ্যতার স্বার্থে, জার্মান শ্রমিকেরা আলসাস ও লোরেন দখল চুপ করে বরদাস্ত করবে না... প্রলেতারিয়েতের সাধারণ আন্তর্জাতিক আদর্শে আমরা সকল দেশের শ্রমিক ভাইদের পাশে বিশ্বস্ত হয়ে দাঁড়াব!'

দুর্ভাগ্যবশত তাদের আশু সাফল্যে আমরা নিশ্চিত বোধ করতে পারি না। শান্তির আমলে যেখানে ফরাসী শ্রমিকেরা আক্রমণকারীকে রুখতে সমর্থ হয়নি, সেখানে অস্ত্রের ঝনঝনানির ভিতর বিজয়ীকে আটকাতে জার্মান শ্রমিকেরা কি তার চাইতে বেশী সক্ষম হবে? জার্মান শ্রমিকদের ইশ্‌তেহারে দাবি করা হয়েছে যে, মামুলী আসামীর মতো

লুই বোনাপার্টকে সমর্পণ করতে হবে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের হাতে। তাদের শাসকেরা বরং ফ্রান্সকে ধ্বংস করার সেরা লোক হিসাবে তাঁকেই আবার টুইলেরিসে পুনঃস্থাপিত করার জোর চেষ্টা করছে। সে যা-ই হোক, ইতিহাস প্রমাণ করবে যে, জার্মান মধ্য শ্রেণীর মতো নরম ধাতু দিয়ে জার্মান শ্রমিক শ্রেণী গড়া নয়। তাদের কর্তব্য তারা করে যাবেই।

ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাবকে তাদের মতনই আমরা স্বাগত জানাচ্ছি; সেই সঙ্গে আমাদের মনে কিন্তু সংশয় আছে; আশা করি, সেগুলি অমূলক বলে প্রমাণিত হবে। এই প্রজাতন্ত্র রাজসিংহাসনের মূলোৎপাটন করেনি, তার শূন্য স্থানে গিয়ে বসেছে মাত্র। সামাজিক বিজয় হিসাবে তার ঘোষণা হয়নি, হয়েছে আত্মরক্ষার জাতীয় ব্যবস্থা হিসাবে। যে সাময়িক সরকারের হাতে রয়েছে এই প্রজাতন্ত্র, সে সরকারের একাংশ কুখ্যাত অর্লিয়ান্সী, আর অপরাংশ মধ্য শ্রেণীর প্রজাতন্ত্রী, যাদের কেউ কেউ ১৮৪৮-এর জুন বিদ্রোহে অনপনেয় কলংক চিহ্নে চিহ্নিত। এই সরকারের সদস্যদের মধ্যে কাজ ভাগাভাগির ব্যবস্থাটাও বেজায় বিসদৃশ ঠেকে। মূল ঘাঁটি সেনাবাহিনী ও পুলিশ হস্তগত করেছে অর্লিয়ান্সীরা, আর যারা প্রতিশ্রুত প্রজাতন্ত্রী তাদের ভাগে পড়েছে যত বক্তৃতার দপ্তরগুলি। এদের প্রথম কয়েকটি কাজ অনেকটাই দেখিয়ে দিল যে এরা সাম্রাজ্যের কাছ থেকে শুধু তার ধ্বংসাবশেষ নয়, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তার আতঙ্কটাও উত্তরাধিকার পেয়েছে। পরিণামে যা অসম্ভব, উদ্দাম বাক্যচ্ছটায় প্রজাতন্ত্রের কাছ থেকে তাই দাবি করার পিছনে কি এই উদ্দেশ্য নেই যে 'যেটা সম্ভব' তেমন একটা সরকার চাইবার পথ পরিষ্কার করা হচ্ছে? এই প্রজাতন্ত্রের মধ্য শ্রেণীভুক্ত কোনও কোনও ব্যবস্থাপকের উদ্দেশ্যটা কি এই নয় যে একে ব্যবহার করা হবে নিতান্তই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে, অর্লিয়ান্স-বংশের পুনর্প্রতিষ্ঠার সেতুরূপে?

তাই, ফরাসী শ্রমিক শ্রেণী চলেছে চরম দুরূহ অবস্থার ভিতর দিয়ে। যখন শত্রু প্রায় প্যারিসের দরজায় ঘা দিচ্ছে, বর্তমানের এই সংকটকালে নূতন সরকারকে উল্টে দেবার কোন চেষ্টা হলে তা হবে চরম মূঢ়তা। নাগরিক হিসেবে তাদের যা কর্তব্য, ফরাসী শ্রমিকদের তা সম্পাদন করতেই হবে; সেই সঙ্গে কিন্তু তাদের মনে রাখতে হবে যে, ১৭৯২-এর জাতীয় স্মারকচিহ্ন (souvenirs) দিয়ে তারা যেন নিজেদের ভোলাতে না দেয়, যেমন ফরাসী কৃষকেরা ভুলেছিল প্রথম সাম্রাজ্যের স্মারকচিহ্নে। অতীতের পুনরাবৃত্তি নয়, তাদের কর্তব্য হল ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা। প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীনতার যেসব সুযোগ-সুবিধা আছে, শান্ত ও দৃঢ়চিত্তে সেগুলি ব্যবহার করে আপন শ্রেণী সংগঠনের কাজে যেন তারা তা লাগায়। তাতে তারা পাবে ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবন ও আমাদের সাধারণ কর্তব্য শ্রমের মুক্তি সাধনের জন্য নতুন হারাকিউলীয় শক্তি। প্রজাতন্ত্রের ভাগ্য নির্ভর করছে তাদেরই উদ্যম ও বিজ্ঞতার উপর।

ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিতে ব্রিটিশ সরকারের যে অনিচ্ছা, বাইরে থেকে তার উপর সুষ্ঠু চাপ দিয়ে তাকে কাটিয়ে উঠবার জন্য ইংরেজ শ্রমিকেরা ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছে*। জ্যাকোবিন-বিরোধী যুদ্ধ এবং অশোভনভাবে তাড়াহুড়ো করে ক্ষমতার জোরদখলকে স্বীকৃতি দেবার পূর্বতন দোষস্খালনের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় ব্রিটিশ সরকার বর্তমানে টালবাহনা করে চলেছে। ইংরাজ সংবাদপত্র জগতের একাংশ অতি নির্লজ্জভাবে ফ্রান্সের যে অঙ্গচ্ছেদ করার জন্য ঘেউ ঘেউ করছে, তাকে রোধ করতে সর্বশক্তি প্রয়োগের জন্যও ইংরাজ শ্রমিকেরা তাদের সরকারকে আহ্বান জানায়। এই সেই সংবাদপত্র মহল যারা বিশ বছর ধরে লুই বোনাপার্টকে ইউরোপের বিধাতাপুরুষ জ্ঞানে পূজো করে এসেছিল এবং ক্রীতদাস-মালিকদের বিদ্রোহে** উৎসাহ জুগিয়েছিল উন্মত্ত উল্লাসে। সেদিনকার মতন আজও এরা কঠোর পরিশ্রম করে চলছে দাস-মালিকদেরই স্বার্থে।

প্রতিটি দেশে **শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির** প্রত্যেকটি শাখা শ্রমিক শ্রেণীকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করুক। আজ যদি তারা তাদের কর্তব্য পরিহার করে, যদি তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানের এই প্রচণ্ড যুদ্ধ হবে আরও মারাত্মক আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের অগ্রদূত; আর দেশে দেশে শ্রমিকদের উপর ঘটাবে তরবারির, ভূমির ও পুঁজির অধিপতিদের নতুন বিজয়।

Vive la République.*

মার্কস কর্তৃক লিখিত এবং ১৮৭০-এর ৯ই সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অনুমোদিত

সেই সময়েই ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় প্রচারপত্ররূপে মুদ্রিত

ইংরেজী প্রচারপত্রের পাঠ অনুসারে অনূদিত

* ফরাসী প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতি আদায় করে নেবার জন্য মার্কস ও প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের উদ্যোগে ইংলন্ডে শ্রমিকদের মধ্যে যে বিরাট সভা অভিযান গড়ে তোলা হয়েছিল, এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। — সম্পাঃ

** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোন্নত উত্তর ভাগ এবং বাগিচার ক্রীতদাস প্রথা-সম্বলিত দক্ষিণ ভাগের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল (১৮৬১-৬৫) তাতে ইংরাজ বুর্জোয়া কাগজগুলি দক্ষিণ অর্থাৎ দাসপ্রথাকে সমর্থন করে। — **সম্পাঃ**

*** প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক! — **সম্পাঃ**

১৮৭১ সালের ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের ভাষণ

সমিতির ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থ সকল সদস্যের প্রতি

১

১৮৭০-এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্যারিসের শ্রমজীবীরা যখন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একবাক্যে তাকে স্বাগত জানাল সমগ্র ফ্রান্স, ঠিক তখনই উচ্চপদান্বেষী ব্যারিস্টারদের এক চক্র টাউন হল (Hotel de Ville) দখল করল -- তাদের রাজনৈতিক নেতা হলেন তিয়ের, তাদের জেনারেল ত্রশ্যু। ঐতিহাসিক সংকটের প্রতি যুগে ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করাই প্যারিসের ব্রত, এই ধারণায় তারা তখন এমনই অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন যে, তাদের মনে হল, জবরদখল করে পাওয়া ফ্রান্সের শাসকপদটাকে বৈধ করে নেবার জন্য তাদের তামাদি হয়ে যাওয়া প্যারিস-প্রতিনিধিত্বটুকু হাজির করাই যথেষ্ট হবে। এই লোকগুলির অভ্যুদয়ের পাঁচ দিন পরেই গতযুদ্ধ সম্পর্কে আপনাদের কাছে আমাদের দ্বিতীয় ভাষণে আমরা বলেছিলাম এরা কারা। তথাপি, আকস্মিকতার তোলপাড়ের মধ্যে, শ্রমিক শ্রেণীর নেতারা যখন বোনাপার্টীয় কারাগারে আবদ্ধ, আর প্রুশীয়রা এগিয়ে আসছিল প্যারিসের উপর, সেইসময় এদের ক্ষমতাদখলটাকে প্যারিস মেনে নিয়েছিল, পরিষ্কার এই শর্তে যে, একমাত্র জাতীয় প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই সেই ক্ষমতা ব্যবহার করা হবে। প্যারিস রক্ষা করতে হলে কিন্তু তার শ্রমিক শ্রেণীকে অস্ত্রসজ্জিত করা, কার্যকরী শক্তি হিসাবে তাদের সংগঠিত করা, যুদ্ধের ভিতর দিয়েই তাদের সামরিক কৌশলে সুশিক্ষিত করে তোলা ছাড়া চলে না। অথচ অস্ত্রসজ্জিত

প্যারিস মানেই হল অস্ত্রসজ্জিত বিপ্লব। প্রুশীয় আক্রমণকারীদের উপর প্যারিসের জয়লাভের অর্থ ফরাসী পুঁজিপতি ও তাদের রাষ্ট্রীয় পরগাছাদের উপর ফরাসী শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়। জাতীয় কর্তব্য ও শ্রেণী-স্বার্থের এই সংঘর্ষে জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার এক মুহূর্তও দ্বিধা করল না জাতিদ্রোহী সরকার হয়ে উঠতে।

প্রথম ধাপে তারা ভ্রাম্যমাণ সফরে তিয়েরকে পাঠাল ইউরোপের সব কয়টি রাজদরবারে, প্রজাতন্ত্রের বদলে রাজা গ্রহণের মূল্যে মধ্যস্থতা ভিক্ষা করতে। প্যারিস অবরোধ শুরু হবার চার মাস পরে যখন তারা ভাবল যে আত্মসমর্পণের কথাটা প্রথম ভাঙবার উপযুক্ত সময় এসেছে, তখন জুল ফাভ্র ও অন্যান্য সহকর্মীদের উপস্থিতিতে ত্রশ্যু প্যারিসের সমবেত মেয়রদের কাছে এই মর্মে বক্তৃতা দিলেন:

'ঠিক ৪ঠা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আমার সহকর্মীরা আমাকে প্রথম যে প্রশ্ন করেছিলেন তা হল এই: প্রুশীয় বাহিনীর অবরোধ প্যারিস এতটুকু সাফল্যের সঙ্গে সয়ে থাকতে পারবে কি? নেতিবাচক জবাবে আমি দ্বিধা করিনি। এখানে উপস্থিত আমার কোন কোন সহকর্মী এ কথার সত্যাসত্য ও আমার মতের অবিচলতার প্রমাণ দেবেন। আমি তাঁদের ঠিক এই কথাগুলিই বলেছিলাম যে, বর্তমানের অবস্থায় প্রুশীয় বাহিনীর অবরোধ সহ্য করে টিকে থাকার চেষ্টা করা প্যারিসের পক্ষে মূঢ়তা হবে। বলেছিলাম, সে প্রচেষ্টা বীরোচিত মূঢ়তা হবে সন্দেহ নেই, তবে ঐ পর্যন্তই... পরের ঘটনাগুলি (তাঁর নিজের কারসাজিতেই অবশ্য) আমার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ করেনি।'

বক্তৃতায় উপস্থিত মেয়রদের অন্যতম, শ্রীযুক্ত করবোঁ পরে ত্রশ্যুর এই সুন্দর ছোট্ট বক্তৃতাটুকু প্রকাশ করে দেন।

দেখা যাচ্ছে যে, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সেই সন্ধ্যাতেই ত্রশ্যুর সহকর্মীদের জানা ছিল যে, তাঁর 'পরিকল্পনা' হল প্যারিসকে আত্মসমর্পণ করানো। জাতীয় প্রতিরক্ষা যদি তিয়ের ফাভ্র অ্যান্ড কোম্পানীর ব্যক্তিগত শাসন চালাবার মতো একটা অছিলার বেশি কিছু হত, তাহলে ৪ঠা সেপ্টেম্বরের ভুঁইফোড়ের দল ৫ তারিখেই গদি ছাড়ত, ত্রশ্যুর 'পরিকল্পনা' সম্পর্কে প্যারিসবাসীদের অবহিত করে তাদের আহ্বান জানাত অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতে অথবা নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে তুলে নিতে। তা না করে, কুখ্যাত এই জোচ্চোরেরা স্থির করল, প্যারিসের বীরোচিত মূঢ়তাকে শোধন করবে দুর্ভিক্ষ ও হত্যালীলার এক রাজত্ব দিয়ে আর ইতিমধ্যে তাকে ধোঁকা দিয়ে রাখবে এই আস্ফালনী ইশ্‌তেহার মারফৎ, যে 'প্যারিসের শাসনকর্তা' ত্রশ্যু 'কখনই আত্মসমর্পণ করবেন না', অথবা পররাষ্ট্র সচিব জুল ফাভ্র 'আমাদের এক ইঞ্চি জমি বা আমাদের দুর্গগুলির একটি ইট পর্যন্ত শত্রুকে ছেড়ে দেবেন না।' এই জুল ফাভ্র-ই কিন্তু গাম্বেতাকে লেখা এক পত্রে স্বীকার করেন যে, তাঁরা যাদের বিরুদ্ধে 'প্রতিরক্ষা' করছেন তারা প্রুশীয় সেনাবাহিনী নয়, তারা প্যারিসের শ্রমিক

জনগণ। বুদ্ধি খাটিয়ে ত্রশ্যু যেসব বোনাপার্টীয় গলাকাটাদের প্যারিস বাহিনী চালনার ভার দিয়েছিলেন, তারা অবরোধের গোটা পর্যায় জুড়ে ব্যক্তিগত পত্রালাপে কুৎসিৎ ঠাট্টা বিদ্রূপ করত প্রতিরক্ষার এই সুপরিচিত তামাসাটুকু নিয়ে। (দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্যারিস প্রতিরক্ষা বাহিনীর গোলন্দাজ দলের সর্বাধিনায়ক ও লিজিয়ন অব অনার-এর গ্র্যান্ড ক্রশ ভূষিত আলফোঁস সিমোঁ গিও-র গোলন্দাজ ডিভিসনের অধ্যক্ষ সুজানকে লেখা পত্রাবলী দ্রষ্টব্য; এই পত্রাবলী কমিউনের *Journal Officiel** প্রকাশ করেছিল)। অবশেষে ১৮৭১-এর ২৮শে জানুয়ারি জোচ্চোরদের মুখোস খসে পড়ল। চরম আত্মাবনতির সাচ্চা বীরত্বপনা দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করার ভিতর দিয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার বেরিয়ে এল বিসমার্কের বন্দীদের দ্বারা গঠিত ফরাসী সরকাররূপে — ভূমিকাটা এতই হীন যে, লুই বোনাপার্ট পর্যন্ত সেদানে এ অবস্থা মেনে নেওয়া থেকে পিছিয়ে এসেছিলেন। ১৮ই মার্চের ঘটনাবলীর পরে, পাগলের মতন ভার্সাই অভিমুখে পালাবার সময় এই আত্মসমর্পণকারীরা প্যারিসের হাতে ফেলে গেল তাদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার সাক্ষ্যদায়ী দলিলপত্র; প্রদেশগুলির উদ্দেশে প্রচারিত ইশ্‌তেহারে কমিউন বলেছিল যে সে প্রমাণ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে 'প্যারিসের উপর আঘাতের পর আঘাত হেনে তাকে রক্তসমুদ্রস্নাত ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতেও তারা সংকুচিত হত না।'

এইরকম পরিসমাপ্তির অধীর আগ্রহের আরো কিছু ব্যক্তিগত কারণ ছিল প্রতিরক্ষা সরকারের নেতৃস্থানীয় কোন কোন সদস্যের।

যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন হবার অলপকাল পরেই জাতীয় সভায় প্যারিসের অন্যতম প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মিলিয়ের, যিনি বর্তমানে জুল ফাভ্‌র-এর বিশেষ আদেশে গুলিতে নিহত, তিনি ধারাবাহিক কয়েকটি প্রামাণ্য আইনগত দলিল প্রকাশ করেছিলেন। তাতে এই প্রমাণ হয় যে জুল ফাভ্‌র বসবাস করতেন আলজেরিয়ার বাসিন্দা এক মদ্যপের স্ত্রীর সঙ্গে তার উপপতিরূপে; বহু বছর ধরে চালানো এক দুঃসাহসিক জালিয়াতি করে তিনি তাঁর ব্যভিচারোদ্ভূত সন্তানদের নামে হাত করেন, মস্ত বড় উত্তরাধিকার ও বড়লোক হয়ে ওঠেন; বৈধ উত্তরাধিকারীরা মোকদ্দমা আনলে কারসাজি ফাঁস হওয়া থেকে তিনি বেঁচে যান বোনাপার্টীয় বিচারালয়ের যোগসাজসে। আইনের এই সব নীরস কাগজপত্র যেহেতু গলাবাজির কোনো অশ্বশক্তিতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না তাই জুল ফাভ্‌র জীবনে এই প্রথমবার তাঁর জিহ্বা সংযত করে নীরবে অপেক্ষায় রইলেন গৃহযুদ্ধ বেধে ওঠা পর্যন্ত, যাতে পরিবার ধর্ম শৃঙ্খলা ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে সমূহ বিদ্রোহী একদল পলাতক কয়েদী বলে উন্মত্ত ধিক্কার হানতে পারেন প্যারিসের জনগণের

---

* *Journal Officiel de la République Française* — প্যারিস কমিউন সরকারের মুখপাত্র, ১৮৭১-এর ১৯শে মার্চ থেকে ২৪শে মে পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত। — সম্পাঃ

ওপর। এই জালিয়াতই, ৪ঠা সেপ্টেম্বরের পরে, ক্ষমতা হাতে পেতে না পেতেই পরম দয়াতে সমাজে লেলিয়ে দিলেন পিক ও তায়েফের-কে, যারা সাম্রাজ্যের আমলে পর্যন্ত জালিয়াতির দায়ে দণ্ডিত হয়েছিল *Étendard*-এর* কলঙ্কজনক মামলায়। এদের অন্যতম, তায়েফের দুঃসাহসে ভর করে কমিউন শাসিত প্যারিসে ফিরে এলে পর তাকে সঙ্গে সঙ্গে জেলে ফেরৎ পাঠানো হয়; আর তখন জাতীয় সভার বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে জুল ফাভ্র চেঁচিয়েছিলেন প্যারিস যত জেলঘুঘুকে ছেড়ে দিচ্ছে।

জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের জো মিলার** এর্নেস্ত পিকার, যিনি সাম্রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব হবার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর নিজেকে নিজেই প্রজাতন্ত্রের অর্থসচিব নিযুক্ত করে নিয়েছিলেন, তিনি আর্তুার পিকার নামে এক ব্যক্তির ভাই। সে ব্যক্তিটি আবার প্যারিসের বুর্জ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল জালিয়াতির জন্যে (১৮৬৭ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের পুলিশ দপ্তরের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য) এবং নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে ৫ নং রু পালেস্ত্রোতে অবস্থিত Société Générale-র অন্যতম শাখা ম্যানেজার থাকাকালে ৩,০০,০০০ ফ্রাঁ চুরির দায়ের দণ্ডিত হয়েছিলেন (১৮৬৮ সালের ১১ই ডিসেম্বরের পুলিশ দপ্তরের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। এই আর্তুার পিকারকেই এর্নেস্ত পিকার তাঁর *Electeur Libre* পত্রিকার সম্পাদক করে দিলেন। অর্থদপ্তরের এই পত্রিকাটির সরকারী মিথ্যা ভাষণে ফাটকাবাজারের সাধারণ দালালেরা যখন ভুলপথে চালিত হচ্ছিল, ঠিক তখন আর্তুার অর্থদপ্তর আর বুর্জের মধ্যে ছুটোছুটি করেছেন ফরাসী বাহিনীর বিপর্যয় ভাঙিয়ে বাট্টা আদায়ের জন্য। এই গণ্যমান্য ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে অর্থসংক্রান্ত যত পত্রবিনিময় হয়েছিল তার সবগুলিই কমিউনের হাতে এসে পড়ে।

জুল ফেরি যিনি, ৪ঠা সেপ্টেম্বরের আগে ছিলেন একজন কপর্দকহীন ব্যারিষ্টার, তিনি অবরোধকালীন প্যারিসের মেয়র হিসাবে দুর্ভিক্ষ ভাঙিয়ে ভাগ্য ফেরান। তাঁর প্রশাসনিক অব্যবস্থার জবাবদিহি করতে হলে সেই দিনই তাঁকে অভিযুক্ত হতে হত।

তাই, এইসব লোক প্যারিসের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই একমাত্র খুঁজে পেতে পারত

---

* *L'Étendard* (নিশান) — বোনাপার্টী প্রবণতার একটি ফরাসী সংবাদপত্র, প্যারিসে প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সাল থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত; পত্রিকাটির অর্থসঙ্গতির সূত্র হিসেবে প্রতারণামূলক কারসাজির জন্য এটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। — সম্পাঃ

** জার্মান সংস্করণে আছে কার্ল ফগ্‌ৎ; ফরাসীতে, ফলস্টাফ। জো মিলার — আঠারো শতকের প্রসিদ্ধ ইংরাজ অভিনেতা। কার্ল ফগ্‌ৎ — জনৈক জার্মান বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, পরে তৃতীয় নেপোলিয়নের চর। ফলস্টাফ — শেক্সপিয়রের নাটকের চরিত্রবিশেষ, শয়তানি ও আত্মম্ভরিতার প্রতীক। — সম্পাঃ

তাদের tickets-of-leave*; ঠিক এই ধরনের লোকই খুঁজছিলেন বিসমার্ক। নেপথ্যে থেকে এতদিন যিনি সরকারের সূত্রধরের (prompter) কাজ করছিলেন সেই তিয়ের এখন কিছুটা হাতের তাস চেলে হাজির হলেন সরকারের প্রধানরূপে, এইসব ছাড়-টিকিটওয়ালা লোকদের তাঁর মন্ত্রী করে নিয়ে।

কিন্তু বামন এই তিয়ের প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ফরাসী বুর্জোয়াদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন, কারণ তিনিই হলেন তাদের শ্রেণী কলুষের সবচেয়ে সম্পূর্ণ বুদ্ধিগত প্রকাশ। রাষ্ট্রনেতা হবার আগেই ঐতিহাসিক রূপে তিনি নিজের মিথ্যাভাষণ শক্তির প্রমাণ দেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ইতিবৃত্ত হল ফ্রান্সের দুর্ভাগ্যের ঘটনাপঞ্জী। ১৮৩০-এর আগে প্রজাতন্ত্রী দলের সঙ্গে যুক্ত এই লোকটি লুই ফিলিপের অধীনে তাঁর রক্ষক লাফিৎ-এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ঢুকে পড়তে পারেন মন্ত্রিপদে; যে দাঙ্গায় সাঁ জের্মাঁ ল'অক্‌সেরোয়ার গির্জা এবং আর্চবিশপের প্রাসাদ লুণ্ঠিত হয়েছিল তাতে পুরোহিতদের বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করে এবং ডাচেস দ্য বেরি-র ব্যাপারে মন্ত্রী-গুপ্তচর এবং জেল-ধাইয়ের কাজ করে রাজাকে তিনি হাত করেন। ট্রাঁস্‌নেনে রাস্তায় প্রজাতন্ত্রীদের হত্যালীলা এবং মুদ্রণ ও সংগঠনের অধিকারের বিরুদ্ধে পরবর্তী কুখ্যাত সেপ্টেম্বর আইন তাঁরই কাজ। ১৮৪০ সালের মার্চে মন্ত্রিসভার প্রধান রূপে আবার উদিত হয়ে তিনি ফ্রান্সকে চমকে দিলেন প্যারিস সুরক্ষিত করার পরিকল্পনা নিয়ে। প্যারিসের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র হিসাবে এই পরিকল্পনা প্রজাতন্ত্রীদের কাছে নিন্দিত হওয়াতে তিনি প্রতিনিধি সভার মঞ্চ থেকে জবাব দেন:

'সে কী! রক্ষা ব্যবস্থার নির্মাণে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে কখনও! সম্ভাব্য কোনও সরকার রাজধানীর উপর গোলাবর্ষণ করে নিজেকে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা কোনদিন করতে পারে এই কথা ধরে নিয়ে আপনারা তো আগেই তার মানহানি করে বসছেন... কিন্তু জয়লাভের পর তেমন সরকার আগের চাইতে শতগুণ বেশি অসম্ভব হয়ে পড়বে।' বাস্তবিকই দুর্গ থেকে প্যারিসের ওপর গোলাবর্ষণ করতে কোন সরকারই সাহস পেত না কেবল সেই সরকার ছাড়া, যারা আগে এইসব দুর্গ সমর্পণ করে দিয়েছিল প্রুশীয়দের হাতে।

১৮৪৮-এর জানুয়ারিতে রাজা বোম্বা যখন পালের্মোতে শক্তি পরীক্ষা করতে

---

* ইংলণ্ডে সাধারণ অপরাধীরা কারাদণ্ডের বেশির ভাগটা অতিবাহিত করার পর অনেক সময়ে ছাড় টিকিট পেয়ে পুলিশের তদারকে ছাড়া পায়। এই টিকিটের নাম হল tickets-of-leave এবং তার অধিকারীরা ticket-of-leave men বলে অভিহিত হয়। (১৮৭১ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

গেলেন,* তখন বহুদিন মন্ত্রিত্বহারা তিয়ের প্রতিনিধি সভায় আবার উঠে বলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা জানেন পালের্মোতে কী ঘটছে। আপনারা, সকলেই আপনারা আতঙ্কে শিউরে উঠছেন (অবশ্য পার্লামেণ্টীয় রীতিতে) এইকথা শুনে যে, একটা বড় শহরের উপর গোলাবর্ষণ চলেছে আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে। কে করল এই গোলাবর্ষণ? যুদ্ধের অধিকার নিয়ে কোনও বিদেশী শত্রু? না, মহাশয়গণ, এ গোলাবর্ষণ করেছে তার নিজস্ব সরকার। কিন্তু কেন? কারণ, সেই হতভাগ্য নগরী তার অধিকার দাবি করেছিল। তাহলে অধিকার দাবি করে সে পেল আটচল্লিশ ঘণ্টা গোলাবর্ষণ... আমাকে ইউরোপের জনমতের দরবারে আবেদন করতে অনুমতি দিন। ইউরোপে যেটা সম্ভবত সবচেয়ে মহান মঞ্চ সেখানে উঠে দাঁড়িয়ে এই ধরনের কাজের বিরুদ্ধে কয়েকটা ধিক্কারের কথা (শুধু কথাই বটে) ধ্বনিত করতে পারলে মানবজাতির প্রতি সেবা করা হবে... নিজের দেশের সেবায় অনেক কিছু করেছেন যিনি (তিয়ের নিজে তা কিছুই করেননি) সেই রাজপ্রতিভূ এস্পার্তেরো যখন বার্সিলোনার উপর গোলাবর্ষণ করতে চেয়েছিলেন তার সশস্ত্র অভ্যুত্থান দমন করার জন্য, তখন পৃথিবীর সকল অংশ থেকে উঠেছিল ব্যাপক রোষধ্বনি।'

আঠারো মাস পরেই, যখন ফরাসী বাহিনী রোমের ওপর গোলাবর্ষণ করল তখন তীব্রতম ভাষায় যারা তা সমর্থন করেছিল তাদের মধ্যে তিয়ের ছিলেন অন্যতম**। বস্তুত রাজা বোম্বার অপরাধ যেন বা এই যে তিনি তাঁর গোলাবর্ষণ সীমাবদ্ধ রাখেন আটচল্লিশ ঘণ্টায়।

কর্তৃত্বের আসন ও ধনসম্পত্তি থেকে গিজো-র হাতে দীর্ঘকাল নির্বাসন ভোগে উত্যক্ত হয়ে বাতাসে গণ-উদ্বেলতার গন্ধ পেয়ে তিয়ের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কয়েকদিন আগে নকল বীরের ভঙ্গিতে যে ভঙ্গির দরুন লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল Mirabeau-mouche*** প্রতিনিধি সভায় ঘোষণা করলেন, 'আমি বিপ্লবের দলে, শুধু ফ্রান্সে নয়, সমগ্র ইউরোপেও। আমি চাই বিপ্লবের সরকার থাকবে নরমপন্থীদের হাতে...

* ১৮৪৮ সালের জানুয়ারিতে জনবিদ্রোহ দমনের জন্য দ্বিতীয় ফার্ডিন্যান্ডের সৈন্যবাহিনী পালের্মোর ওপর গোলা দাগাতে শুরু করে, এ বিদ্রোহ থেকে দেখা দেয় ১৮৪৮-৪৯ সালে ইতালীয় রাষ্ট্রসমূহের বুর্জোয়া বিপ্লবের সঙ্কেত; পরে এই বছরেরই শরতে মেসিনায় গোলাবর্ষণের জন্য এ'র নাম জোটে রাজা বোম্বা। — সম্পাঃ

** ১৮৪৯ সালের এপ্রিলে ফরাসী সৈন্যবাহিনী ইতালীয় বিদ্রোহ দমনের জন্য ইতালিতে প্রেরিত হয়। বিপ্লবী রোমের উপর গোলাবর্ষণ করে তারা, এতে ফরাসী সংবিধান স্থূলভাবে লঙ্ঘন করা হয় কেননা সংবিধান ঘোষণা করেছিল যে কোনো জাতির স্বাধীনতা দমনের জন্য প্রজাতন্ত্র কখনো তার শক্তি প্রয়োগ করবে না। — সম্পাঃ

*** মিরাবো-মাছি। — সম্পাঃ

কিন্তু সে সরকারকে যদি এসে পড়তে হয় অত্যুৎসাহীদের হাতে, এমন কি ওই র‍্যাডিকালদের হাতে, তাহলেও আমি আমার আদর্শ বর্জন করব না। আমি চিরকালই থাকব বিপ্লবের দলে।'

ফেব্রুয়ারির বিপ্লব এল। এই ক্ষুদে লোকটি যা স্বপ্ন দেখেছিল, গিজো মন্ত্রিসভাকে পাল্টিয়ে তার জায়গায় তিয়ের মন্ত্রিসভাকে না বসিয়ে বিপ্লব লুই ফিলিপের জায়গায় বসাল প্রজাতন্ত্রকে। জনতার জয় প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথম দিন তিয়ের নিজেকে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলেন; খেয়াল করেননি, তাঁর প্রতি শ্রমিক শ্রেণীর ঘেন্নার ফলেই তিনি তাদের আক্রোশের হাত থেকে আড়ালে আছেন। তাহলেও সাহসের রূপকথামণ্ডিত এই লোকটি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়াটা সলজ্জভাবে এড়িয়ে চলেন, যতদিন না জুনের হত্যালীলা* তাঁর যোগ্য কীর্তির জন্য মঞ্চ পরিষ্কার করে দিল। তখন তিনি হয়ে উঠলেন 'শৃংখলা পার্টির'** এবং তাদের সেই পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের প্রধান মনীষা, যেটা ছিল একটা অনামা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা, যার ভিতরে শাসক শ্রেণীর প্রত্যেকটি প্রতিদ্বন্দ্বী উপদল একযোগে চক্রান্ত করছিল জনসাধারণকে নিষ্পেশিত করতে, আর পৃথকভাবে চক্রান্ত করছিল পরস্পরের বিরুদ্ধে নিজ নিজ রাজবংশকে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করতে। আজকের মতন সেদিনও তিনি প্রজাতন্ত্রীদের ধিক্কৃত করেন এই বলে যে তারাই হল প্রজাতন্ত্রকে সুসংহত করার পথে একমাত্র বাধা; আজকের মতন সেদিনও তিনি প্রজাতন্ত্রকে তাই বলেন যা জল্লাদ বলেছিল দন কার্লোসকে, 'তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমায় আমি হত্যা করব।' সেদিনের মতন আজও তাঁর জয়লাভের পরের দিনই তাঁকে বলে উঠতে হবে, 'L'Empire est fait' - সাম্রাজ্য একটা বাস্তব ঘটনা। প্রয়োজনীয় ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর কপট উপদেশ বর্ষণ এবং লুই বোনাপার্ট সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সত্ত্বেও — বোনাপার্ট তাঁকে বোকা বানিয়ে পার্লামেণ্টীয় ব্যবস্থাকে পদাঘাতে দূর করে দেন, যে ব্যবস্থার কৃত্রিম আবহাওয়ার বাইরে এই সামান্য লোকটি শুকিয়ে শূন্য হয়ে যাবেন বলে জানতেন.- তা হলেও দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিটি দুষ্কর্মে তাঁর হাত ছিল, ফরাসী সৈন্য কর্তৃক রোম দখল থেকে শুরু করে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে

* ১৮৪৮ সালে প্যারিস প্রলেতারিয়েতের জুনের সশস্ত্র অভ্যুত্থান দমন করার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। — সম্পাঃ

** শৃংখলা পার্টি — ফ্রান্সের দুটি রাজতন্ত্রী উপদল লেজিটিমিস্ট (বুরবোঁ রাজবংশের পক্ষপাতী) ও অর্লিয়ান্সী (অর্লিয়োঁ রাজবংশের অনুগামী), এদের জোট হিসাবে বৃহৎ রক্ষণশীল বুর্জোয়াদের এই পার্টিটি দেখা দেয় ১৮৪৮ সালে; ১৮৪৯ সাল থেকে ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বরের কুদেতা পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের বিধান সভায় এরা নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত থাকে; লুই বোনাপার্ট দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য শৃংখলা পার্টির জনবিরোধী নীতির দেউলিয়াপনার সুযোগ নেন। — সম্পাঃ

যুদ্ধ পর্যন্ত। এ যুদ্ধ তিনি উসকিয়ে তোলেন জার্মান ঐক্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ করে, আক্রমণটা এজন্য নয় যে এই ঐক্য স্বৈরতন্ত্রের একটা আবরণস্বরূপ, এই জন্য যে, জার্মান অনৈক্যের ওপর ফ্রান্সের কায়েমী স্বত্বের উপর তা হস্তক্ষেপ। নেপোলিয়নের ঐতিহাসিক জুতাবরদার হয়ে ওঠা এই লোকটা ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দিয়ে ইউরোপের নাকের উপর প্রথম নেপোলিয়নের তরবারি আস্ফালন করতে বড়ই ভাল বাসতেন, অথচ সবসময়েই তিয়েরের পররাষ্ট্র নীতির শেষ পরিণতি হয়েছে ফ্রান্সের চরম অবমাননায় — ১৮৪১-এর লন্ডন চুক্তি থেকে ১৮৭১-এর প্যারিস-সমর্পণ এবং বর্তমান গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত, যেখানে বিসমার্কেরই বিশেষ অনুমতিক্রমে সেদান ও মেৎসের বন্দীদের তিনি প্যারিসের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন। বহুমুখী কৃতিত্ব এবং লক্ষ্যের পরিবর্তনশীলতা সত্ত্বেও এই লোকটির সারা জীবন ছিল অতি অচল বাঁধিগতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। আধুনিক সমাজের গভীরতর অন্তঃস্রোত যে তাঁর কাছ থেকে চিরকাল গুপ্ত থাকবে, একথা স্বয়ংসিদ্ধ; কিন্তু সমাজের উপরিভাগেও যে-সব পরিবর্তন অতি সুস্পষ্ট, তাও ধরা পড়ত না এই মস্তিষ্কে, যার সব শক্তিটুকু আশ্রয় নিয়েছিল জিহ্বাগ্রে। তাই পুরাতন ফরাসী সংরক্ষণ ব্যবস্থা থেকে সামান্য মাত্র বিচ্যুতিকেই মহাপাপ বলে ধিক্কার দিতে তাঁর ক্লান্তি কখনো দেখা যায়নি। লুই ফিলিপের মন্ত্রী থাকা কালে রেলওয়েকে উদ্ভট কল্পনা বলে তিনি বিদ্রূপ করেছিলেন; আবার যখন লুই বোনাপার্টের রাজত্বকালে তিনি ছিলেন বিরোধী পক্ষে তখন পচে-যাওয়া ফরাসী সামরিক ব্যবস্থা সংস্কারের প্রতিটি প্রচেষ্টাকেই তিনি পবিত্রতাহানি বলে অভিহিত করেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে একটিও — অতি সামান্য মাত্রাতেও, কাজের ব্যবস্থা গ্রহণের দোষ তিনি কখনো করেননি। তিয়ের একনিষ্ঠ ছিলেন কেবল ধনলালসায় এবং ধন যারা উৎপাদন করে তাদের প্রতি ঘৃণায়। লুই ফিলিপের অধীনে প্রথম মন্ত্রিত্ব পদে যখন তিনি প্রবেশ করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন জোবের মতন দরিদ্র; যখন সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তিনি লক্ষপতি। এই রাজার অধীনেই তাঁর সর্বশেষ (১৮৪০ সালের ১লা মার্চের) মন্ত্রিত্বের সময় প্রতিনিধি সভায় তাঁর বিরুদ্ধে টাকা মারার অভিযোগ এনে তাঁকে যখন প্রকাশ্যে নাস্তানাবুদ করা হল, তখন তিনি চোখের জলে জবাব দিয়েই নিরস্ত হলেন; এ জিনিসটার কারবারে তিনি জুল ফাভ্র বা অন্য কোনও কুমিরের মতনই সিদ্ধহস্ত। বোর্দো-তে আসন্ন আর্থিক সর্বনাশ থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করার জন্য তিনি যে প্রথম ব্যবস্থাটি নিলেন তা হল নিজের জন্য বছরে ত্রিশ লাখের ব্যবস্থা; ১৮৬৯-এ প্যারিসের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে 'মিতব্যয়ী প্রজাতন্ত্রের' যে মনোরম ভবিষ্যতের দৃশ্যপট তিনি তুলে ধরেছিলেন, এই দাঁড়াল তাঁর প্রথম ও শেষ কথা। ১৮৩০ সালের প্রতিনিধি সভায় তাঁর ভূতপূর্ব সহকর্মীদের অন্যতম, যিনি নিজে পুঁজিপতি হওয়া সত্ত্বেও হয়েছিলেন প্যারিস কমিউনের একজন একনিষ্ঠ সদস্য, সেই

শ্রীযুক্ত বেলে কিছুদিন আগে এক প্রকাশ্য ঘোষণায় তাঁকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'সর্বদাই পুঁজির কাছে শ্রমের দাসত্ব হয়ে এসেছে আপনার নীতির মূলকথা। টাউন হলে শ্রমের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত দেখবার দিন থেকেই আপনি ফ্রান্সকে চিৎকার করে অবিরাম বলে এসেছেন, "এরা সব অপরাধী!"' ছোটখাট রাষ্ট্রিক শয়তানিতে সেয়ানা, মিথ্যাভাষণ ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে সুনিপুণ শিল্পী, পার্লামেন্টে দলগত লড়াইয়ের তুচ্ছ কলাকৌশল, ধূর্ত কুচক্র ও হীন প্রতারণায় ওস্তাদ; মন্ত্রিত্ব হারালেই বিপ্লবকে খুঁচিয়ে তুলতে, আবার রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ফিরে পেলেই রক্তগঙ্গা বইয়ে তাকে দমন করতে যাঁর চক্ষুলজ্জা নেই; ভাবনার বদলে শ্রেণী সংস্কার, হৃদয়ের জায়গায় আত্মম্ভরিতা; রাজনৈতিক জীবন যেমন ঘৃণ্য ব্যক্তিগত জীবনও তেমনই কলঙ্কময়; আজও যখন ইনি ফরাসী সুলার অভিনয় করছেন, তখনও এক লোক-হাসানো আড়ম্বর দিয়ে তাঁর ক্রিয়াকান্ডের জঘন্যতাটা ফুটিয়ে না তুলে তিনি পারেন না।

৪ঠা সেপ্টেম্বরের ক্ষমতা-দখলকারীরা ত্রশুর কথামত, ঠিক সেই দিন থেকেই শুরু করে দীর্ঘদিন ধরে শত্রুর সঙ্গে রাষ্ট্রদ্রোহিতার যে চক্রান্ত চালিয়েছিল, তার সমাপ্তি ঘটল প্যারিসের আত্মসমর্পণে, যেটা প্রাশিয়ার হাতে শুধু প্যারিস নয়, সমগ্র ফ্রান্স তুলে দিল। অপরপক্ষে, এর থেকেই শুরু হল গৃহযুদ্ধ, যা তারা চালাতে চাইল প্রাশিয়ার সাহায্যে প্রজাতন্ত্র ও প্যারিসের বিরুদ্ধে। ফাঁদটা পাতা হয়েছিল আত্মসমর্পণের শর্তেই। রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি তখন শত্রুর হাতে, রাজধানী প্রদেশগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন, আর যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে প্রস্তুতির জন্য প্রচুর সময় না দিলে ফ্রান্সের প্রকৃত প্রতিনিধিমন্ডলী নির্বাচন অসম্ভব ছিল। এসব বুঝেই, আত্মসমর্পণের শর্ত রইল, আট দিনের মধ্যে নূতন জাতীয় সভার নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে; ফলে, ফ্রান্সের বহু এলাকায় আসন্ন নির্বাচনের সংবাদ গিয়ে পেঁছল বির্নাচনের ঠিক পূর্বাহ্নে। তাছাড়াও আত্মসমর্পণ শর্তের এক সুস্পষ্ট বিশেষ ধারা অনুযায়ী এই সভা গঠিত হবে কেবল শান্তি, না যুদ্ধ, এই প্রশ্নের মীমাংসা এবং দরকার হলে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে। সমরবিরতি চুক্তির শর্তই যে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব করে দিচ্ছে, এ কথা লোকে না বুঝে পারে না, না বুঝে পারে না যে বিসমার্কের চাপিয়ে দেওয়া শান্তি কার্যকরী করতে ফ্রান্সের নিকৃষ্টতম লোকেরাই হল যোগ্যতম। এই সব সতর্কতা অবলম্বন করেও তিয়ের সন্তুষ্ট হলেন না, যুদ্ধবিরতির গোপন সংবাদটা প্যারিসবাসীদের কাছে ভাঙবার আগেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচন অভিযানে লেজিটিমিস্ট দলকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, কারণ অর্লিয়ান্সীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এদেরই এখন স্থান দখল করতে হবে বোনাপার্টপন্থীদেব — তাদের অবশ্য তখন আর কোন গতি ছিল না। লেজিটিমিস্টদের নিয়ে তাঁর কোনো ভয় ছিল না। আধুনিক ফ্রান্সে এদের রাজত্ব অসম্ভব, তাই প্রতিদ্বন্দ্বী

হিসাবে এরাঁ অবজ্ঞেয়; প্রতিবিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে আর কোন পার্টি এদের চেয়ে যোগ্যতর, যে পার্টি কাজ, তিয়েরের নিজের ভাষায় (প্রতিনিধি সভা, ৫ই জানুয়ারি, ১৮৩৩) 'সর্বদাই সীমিত থেকেছে তিনটি সূত্রে -- বৈদেশিক আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ আর নৈরাজ্যে;' তাদের দীর্ঘ প্রত্যাশিত অতীত স্বর্গরাজ্যের আসন্নতায় এরা সত্যই বিশ্বাস করল। বিদেশী আক্রমণের জুতোর তলায় ফ্রান্স তখন দলিত; পতন হয়েছে সাম্রাজ্যের, বন্দী হয়েছে বোনাপার্ট এবং স্বয়ং তারাও তো হাজির। ইতিহাসের চাকা স্পষ্টই পিছনে ঘুরে গিয়ে ১৮১৬ সালের সেই 'অভাবনীয় পরিষদে'* (Chambre introuvable) এসে দাঁড়াবে। ১৮৪৮ সাল থেকে ১৮৫১ অবধি প্রজাতন্ত্রের যে কয়টি বিধান সভা হয়েছিল তাতে এদের পার্লামেণ্টীয় প্রতিনিধিত্ব করে এদের শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ প্রবক্তারা; এখন যারা ছুটে এল, তারা হল দলের সাধারণ লোক, ফ্রান্সের যত সব পুর্সোনিয়াকেরা।**

বোর্দো-তে এই 'গ্রাম্য পরিষদ'*** বসবার সঙ্গে সঙ্গেই তিয়ের তাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, শান্তিচুক্তির প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলিতে এই মুহূর্তেই সম্মতি দিতে হবে, এমন কি পার্লামেণ্টী বিতর্কের মর্যাদা ছাড়াই; কারণ এই একটি শর্তেই প্রাশিয়া তাদের প্রজাতন্ত্র ও তার প্রধান ঘাঁটি প্যারিসের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে অনুমতি দেবে। সত্যই প্রতিবিপ্লবীদের সময় নষ্ট করার উপায় ছিল না। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য রাষ্ট্র-ঋণ করে তুলেছিল দ্বিগুণেরও বেশি, এবং বড় বড় শহরগুলিকে ডুবিয়ে গিয়েছিল বিপুল স্থানীয় ঋণভারে। যুদ্ধ এসে দায়ের পরিমাণ মারাত্মকভাবে ফুলিয়ে তুলেছিল আর নির্মমভাবে তছনছ করেছিল জাতির সম্পদের উৎসকে। সর্বনাশকে পূর্ণ করার জন্য ফ্রান্সের মাটিতে পাঁচ লক্ষ সৈন্যের ভরণপোষণ, পাঁচশত কোটি ক্ষতিপূরণ এবং তার অদত্ত কিস্তির উপরে শতকরা ৫ হারে সুদের শর্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রুশীয় শাইলক****। কে শুধবে এই বিল? ধনোৎপাদকদের ঘাড়ে ধনাধিকারীদের নিজেদেরই সৃষ্ট যুদ্ধের ব্যয়ভার চাপানো সম্ভব ছিল কেবল প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ করেই।

---

* অভাবনীয় পরিষদ — ১৮১৫—১৮১৬ সালের ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভা (পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমলের প্রথম বছরগুলিতে); তার সমস্ত সদস্যই ছিল চরম প্রতিক্রিয়াশীল। — সম্পাঃ

** পুর্সোনিয়াক — মলিয়েরের মিলনান্ত নাটকগুলির একটিতে এই চরিত্র আছে; সে চরিত্র হল রসবোধহীন, সঙ্কীর্ণচেতা ক্ষুদে জমিদারের প্রতিভূ। -- সম্পাঃ

*** ১৮৭১-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি বোর্দো-তে যে জাতীয় সভার অধিবেশন শুরু হয়, তাতে রাজতন্ত্রীরা এল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় (৭৫০ জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৪৫০ জন রাজতন্ত্রী) — এরা ছিল ভূস্বামী এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের প্রতিক্রিয়াশীল স্তরের প্রতিনিধি। এ কারণে এর নাম 'গ্রাম্য পরিষদ' অথবা 'জমিদার পরিষদ'। — সম্পাঃ

**** 'ভেনিসীয় বণিক' নামে শেক্সপিয়রের নাটকে সুদখোর। — সম্পাঃ

এইভাবে ফ্রান্সের এই ব্যাপক সর্বনাশ থেকেই জমি ও পুঁজির এইসব দেশপ্রেমিক প্রতিনিধিরা উৎসাহিত হল আক্রমণকারীর চোখের সামনে আর তারই পৃষ্ঠপোষকতায় বিদেশী যুদ্ধের উপর একটা গৃহযুদ্ধ চাপিয়ে দিতে, চাপিয়ে দিতে একটা দাসমালিকদের বিদ্রোহ।

এই ষড়যন্ত্রের পথে একটা মস্ত বাধা ছিল প্যারিস। সাফল্যের প্রথম শর্তই হল প্যারিসকে নিরস্ত্র করা। তাই তিয়ের আহ্বান করলেন প্যারিসকে অস্ত্রসমর্পণ করার জন্য। তারপর প্যারিসকে ক্ষুব্ধ করে তুলল 'গ্রাম্য পরিষদের' উন্মত্ত প্রজাতন্ত্রবিরোধী বিক্ষোভ এবং প্রজাতন্ত্রের বৈধতা সম্বন্ধে স্বয়ং তিয়েরের দ্ব্যর্থবোধক উক্তি; রাজধানীর আসন থেকে প্যারিসকে টেনে নামিয়ে তাকে মুণ্ডহীন করার হুমকি; অর্লিয়ান্সী রাষ্ট্রদূতদের নিয়োগ; বকেয়া ব্যবসায়িক বিল এবং বাড়িভাড়া সংক্রান্ত দুফোর আইন, যাতে প্যারিসের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতি অনিবার্য; সম্ভাব্য যে কোনো প্রকাশনের প্রতি কপির উপর পুয়ে-কের্তিয়ে-র দুই সাঁতিম ট্যাক্স; ব্লাঙ্কি এবং ফ্লুরাঁস-এর উপর মৃত্যুদণ্ড; প্রজাতন্ত্রী পত্রিকাগুলির দমন; প্যারিস থেকে ভার্সাইতে জাতীয় সভার স্থানান্তর; পালিকাও-ঘোষিত জরুরী অবস্থা ৪ঠা সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে যাবার পর তার পুনঃপ্রবর্তন; প্যারিস গভর্নরের পদে ডিসেম্বর-মার্কা ভিনয়-এর নিয়োগ, সাম্রাজ্যবাদী প্রহরী ভালাঁতেঁ-র নিয়োগ তার পুলিশ কর্তা হিসাবে, আর জেসুইট জেনারেল অরেল দ্য পালাদিনের নিয়োগ তার জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অধিনায়কত্বে।

এইবার আমরা শ্রীযুক্ত তিয়ের ও তাঁর অনুচর জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের লোকদের একটা প্রশ্ন করব। একথা জানা আছে যে, তিয়ের তাঁর অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত পুয়ে-কের্তিয়ে-র মারফৎ দুইশত কোটি ধারের ব্যবস্থা করেন। তাহলে একথা সত্য কি না যে,

১। ব্যাপারটার এমন ভাবেই আয়োজন হয় যে তিয়ের, জুল ফাভ্র, এর্নেস্ত পিকার, পুয়ে-কের্তিয়ে এবং জুল সিমোঁ-র ব্যক্তিগত উপকারের জন্যও বেশ কয়েককোটি টাকার ব্যবস্থা হয়েছিল? আর —

২। প্যারিসে 'শান্তিপ্রতিষ্ঠা' না হওয়া পর্যন্ত কোনো টাকা দেবার কথা থাকে না?

সে যাই হোক, ব্যাপারটার মধ্যে খুবই জরুরি কিছু নিশ্চয় ছিল, কেননা, বোর্দো পরিষদের সংখ্যাধিকের নামে তিয়ের ও জুল ফাভ্র অবিলম্বে প্যারিস দখলের জন্য নির্লজ্জভাবে অনুরোধ করেন প্রুশীয় সেনাদলকে। কিন্তু বিসমার্ক এ খেলা খেলতে রাজি হননি; জার্মানিতে ফিরবার পর তিনি শ্লেষভরে এবং প্রকাশ্যে একথাই বলেছিলেন ফ্রাংকফুর্তের ভক্ত কূপমণ্ডূকদের কাছে।

২

প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের পথে সশস্ত্র প্যারিসই ছিল একমাত্র গুরুতর প্রতিবন্ধক। তাই প্রয়োজন হল প্যারিসকে নিরস্ত্র করা। এ ব্যাপারে বোর্দো প্রতিনিধি সভা ছিল অকপটতারই প্রতীক। প্রতিনিধি সভার 'গ্রাম্য মাতব্বরদের' তর্জন-গর্জন যদি বা যথেষ্ট সোচ্চার না হয়ে উঠত, তাহলেও ডিসেম্বরমার্কা ভিনয়, বোনাপার্টপন্থী প্রহরী ভালাঁতে এবং জেসুইট জেনারেল অরেল দ্য পালাদিন, এই ট্রায়াম্ভিরাটের হাতে তিয়ের কর্তৃক প্যারিসকে সঁপে দেওয়াটা সন্দেহের শেষ আড়ালটুকুও ছিন্ন করে দিত। কিন্তু প্যারিসকে নিরস্ত্র করার আসল উদ্দেশ্যটি উদ্ধতভাবে প্রকাশ করলেও, ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে যে অজুহাতে অস্ত্র সমর্পণের জন্য আহ্বান করে, তা হল অতি জাজ্বল্যমান, অতি নির্লজ্জ এক মিথ্যা। তিয়ের বলেন, প্যারিস জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কামানাদি রাষ্ট্রের সম্পত্তি, তাই রাষ্ট্রকেই তা ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা হল এই: বিসমার্কের বন্দীরা যেদিন ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের চুক্তি সই করে, অথচ প্যারিসকে দমন করার পরিষ্কার মতলব নিয়ে বিপুল সংখ্যক দেহরক্ষী নিজেদের হাতে রাখে, ঠিক সেইদিন থেকেই প্যারিস ছিল সজাগ। জাতীয় রক্ষিবাহিনী নিজেদের পুনর্গঠিত করে নেয়, ও প্রাক্তন বোনাপার্টপন্থী কয়টি বাহিনী বাদ দিয়ে তাদের সকলের সম্মিলিত ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে তুলে দেয় তাদের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণভার। প্রুশীয়দের প্যারিসে প্রবেশের প্রাককালে, যতসব কামান এবং মিত্রেলিয়েজ আত্মসমর্পণকারীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলে রেখে দেয় ঠিক সেই পাড়ায় বা আশেপাশে যেটা প্রুশীয়রা দখল করবে, সেগুলি কেন্দ্রীয় কমিটি সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল মঁমার্ত্র, বেলভিল এবং লা ভিলেত অঞ্চলে। এই কামান বাহিনী জাতীয় রক্ষিবাহিনীর চাঁদাতেই সুসজ্জিত হয়েছিল। ২৮শে জানুয়ারির আত্মসমর্পণের সময় সরকারীভাবে এটা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবেই স্বীকৃত হয়, এবং বিজয়ীদের কাছে সরকারের সাধারণ অস্ত্রসমর্পণের আওতা থেকে এগুলি সেই ভিত্তিতেই বাদ পড়ে। আর তিয়েরের পক্ষে প্যারিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণের একেবারে সামান্যতম অজুহাতও এমন একান্তভাবেই অনুপস্থিত ছিল যে তাঁকে অবশেষে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কামানাদি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এই নির্জলা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়!

স্পষ্টতই, এই কামান দখল করে নেওয়া প্যারিসের এবং সে হেতু ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিপ্লবের সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবেই কল্পিত হয়েছিল। অথচ সেই বিপ্লবই হয়ে উঠেছিল ফ্রান্সের বৈধ ব্যবস্থা। আত্মসমর্পণের চুক্তির শর্তে বিজয়ীরা স্বীকার করে নিয়েছিল সেই বিপ্লবের সৃষ্টি, প্রজাতন্ত্রকে। আত্মসমর্পণের পর সমস্ত বৈদেশিক শক্তিই তাকে মেনে নেয় এবং তার নামেই আহূত হয় জাতীয় সভা। প্যারিসের

শ্রমজীবী জনগণের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের বিপ্লবই ছিল বোর্দো-তে অধিষ্ঠিত জাতীয় সভা এবং তার কার্যনির্বাহক ক্ষমতার একমাত্র বৈধ প্রতিষ্ঠা। একে বাদ দিলে, ১৮৬৯ সালে প্রুশীয় নয়, খোদ ফরাসী শাসনাধীনেই সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত এবং বিপ্লবেরই অস্ত্রাঘাতে সবলে উৎপাটিত আইন সংসদের কাছে জাতীয় সভাকে অবিলম্বে স্থান ছেড়ে দিতে হয়। তাহলে তিয়ের ও তাঁর ছাড়-টিকিটওয়ালা লোকদের লুই বোনাপার্ট স্বাক্ষরিত মার্জনাপত্র ভিক্ষা করতে হয় কায়েনে* সমুদ্রযাত্রার থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য। প্রাশিয়ার সঙ্গে শান্তিচুক্তির শর্তাদি নির্ধারণের জন্য ভারপ্রাপ্ত জাতীয় সভা ত' সেই বিপ্লবের একটা ঘটনা মাত্র; তার প্রকৃত প্রতিমূর্তি তখন পর্যন্ত সশস্ত্র প্যারিসই, যে প্যারিস বিপ্লবের সূত্রপাত করেছিল, তারই জন্য পাঁচ মাস দুর্ভিক্ষের বিভীষিকার মধ্যে দাঁড়িয়েও অবরোধ সহ্য করেছিল, ত্রশুর পরিকল্পনা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ প্রতিরোধ চালিয়ে প্রদেশগুলিতে জুগিয়েছিল একরোখা প্রতিরক্ষা যুদ্ধের ভিত্তি। সেই প্যারিসকে তাহলে এখন হয় বোর্দোর বিদ্রোহী দাসপ্রভুদের অপমানজনক উদ্ধত হুকুম তামিল করে অস্ত্রসমর্পণ করতে হয়, মেনে নিতে হয় যে ৪ঠা সেপ্টেম্বরের বিপ্লবের অর্থ লুই বোনাপার্টের হাত থেকে তাঁর রাজতন্ত্রী প্রতিপক্ষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়; আর নয়ত তাকে রুখে দাঁড়াতে হয় ফ্রান্সের আত্মত্যাগী মুখপাত্র হিসাবে, যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটায় ও তারই সযত্ন প্রশ্রয়ে একান্ত জঘন্যতায় পচে ওঠে, তার বিপ্লবী উচ্ছেদ ছাড়া সে ফ্রান্সের ধ্বংস থেকে উদ্ধার ও পুনরুজ্জীবন ছিল অসম্ভব। দীর্ঘ পাঁচ মাসের দুর্ভিক্ষে ক্ষীণকায় প্যারিস একমুহূর্তও ইতস্তত করেনি। তার নিজেরই দুর্গ থেকে যে প্রুশীয় কামানগুলি ভ্রূকুটি হানছিল তাকেও উপেক্ষা করেই ফরাসী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সমস্ত দুর্বিপাককে বরণ করে নেবার বীরোচিত সিদ্ধান্ত সে নেয়। তথাপি যে গৃহযুদ্ধের মধ্যে প্যারিসকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল তার প্রতি বিরাগবশত, জাতীয় সভার প্ররোচনা ও শাসনকর্তৃপক্ষের জবরদখল এবং প্যারিস ও তার চতুর্দিকে আশঙ্কাজনক সৈন্য সমাবেশ সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কমিটি নিছক আত্মরক্ষামূলক মনোভাবেই অবিচল রইল।

তিয়েরই গৃহযুদ্ধ শুরু করলেন ভিনয়ের নেতৃত্বে পুলিশদের একটা বড় দল এবং কিছু লাইনের রেজিমেণ্টকে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কামান আচমকা দখল করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে মঁমার্ত্রের বিরুদ্ধে নৈশ অভিযানে পাঠিয়ে। কী ভাবে এই অপচেষ্টা জাতীয় রক্ষিবাহিনীর প্রতিরোধের সামনে এবং জনসাধারণের সঙ্গে সেনাদলের সৌহার্দ্য স্থাপনের

* কায়েন — দক্ষিণ আমেরিকাস্থ ফরাসী গায়নার প্রধান নগরী, কারাদণ্ডভোগ ও নির্বাসনের স্থান। — সম্পাঃ

জন্য ভেঙে পড়ে তা সকলের সুবিদিত। অরেল দ্য পালাদিন আগেভাগেই বিজয় ঘোষণার বিবৃতি ছাপিয়েছিলেন এবং তিয়ের তৈরী রেখেছিলেন তার কুদেতা ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি প্ল্যাকার্ড। এখন তার বদলে তিয়েরকে আবেদন ছাড়তে হল এই মহানুভব সিদ্ধান্ত জানিয়ে যে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র তাদের দখলেই থাকবে যা দিয়ে, তিয়ের বললেন, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকারের পিছনে তারা এসে দাঁড়াবে বলে তিনি নিশ্চিত। নিজেদেরই বিপক্ষে ক্ষুদে তিয়েরের পিছনে দাঁড়াবার এই আহ্বানে ৩,০০,০০০ জাতীয় রক্ষিবাহিনীর মধ্যে মাত্র ৩০০ জন সাড়া দিল। শ্রমজীবী মানুষের ১৮ই মার্চের গৌরবমন্ডিত বিপ্লব প্যারিসের উপর তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। কেন্দ্রীয় কমিটিই ছিল তার অস্থায়ী সরকার। ইদানীংকার চাঞ্চল্যকর রাষ্ট্রিক ও সামরিক কীর্তিগুলির মধ্যে বাস্তব কিছু আছে, না সবটাই সুদূর অতীতের স্বপ্নমাত্র — ক্ষণিকের জন্য এই সংশয় যেন ইউরোপকে নাড়া দিয়ে গেল।

'উত্তম শ্রেণীদের' বিপ্লবে এবং আরো বেশি করে প্রতিবিপ্লবে যে হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রাচুর্য থাকে, ১৮ই মার্চ থেকে ভার্সাই সেনাদলের প্যারিসে প্রবেশ পর্যন্ত প্রলেতারীয় বিপ্লব তার থেকে এমনই বিমুক্ত ছিল যে বিপ্লবের শত্রুদের পক্ষে জেনারেল লেকোঁৎ ও ক্লেমাঁ তমার মৃত্যুদন্ড এবং প্লাস ভাঁদোমের ব্যাপারটা ছাড়া হৈচৈ করার মতন আর কিছুই জুটল না।

ম'মার্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত নৈশ অভিযানে নিযুক্ত অন্যতম বোনাপার্টপন্থী অফিসার, জেনারেল লেকোঁৎ পরপর চারবার একাশি নম্বর লাইন রেজিমেণ্টকে প্লাস পিগালে সমবেত নিরস্ত্র এক জনতার উপর গুলি-চালনার আদেশ দেন এবং সৈনিকেরা এই হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করাতে লেকোঁৎ তাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। তাঁর নিজের অধীনস্থ সৈন্যরা নারী ও শিশুদের গুলি না করে তাঁকেই গুলি করে মারে। শ্রমিক শ্রেণীর শত্রুদের শিক্ষাধীনে যে অভ্যাস সৈন্যবাহিনীর অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে, পক্ষ পরিবর্তনের মুহূর্তে থেকেই তা অবশ্য বদলাবে না। এই সৈন্যরাই হত্যা করে ক্লেমাঁ তমা-কে।

লুই ফিলিপের রাজত্বের শেষভাগে অসন্তুষ্ট এক প্রাক্তন কোয়ার্টারমাস্টার সার্জেণ্ট, 'জেনারেল' ক্লেমাঁ তমা প্রজাতন্ত্রী পত্রিকা *National* আফিসে নাম লেখান। তাঁর কাজ ছিল সেই জবরদস্ত কাগজটির জবাবদায়ী সাক্ষীগোপাল এবং হুমকিদার লড়ুয়ে (duelling bully) এই দ্বৈত ভূমিকা। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর যখন *National* পত্রিকার লোকেরা ক্ষমতাসীন হল, তখন তারা এই ধাড়ি কোয়ার্টারমাস্টার সার্জেণ্টকে জেনারেল বানিয়ে দেয় জুন হত্যাকান্ডের প্রাককালে। জুল ফাভ্রের মতন তমা-ও এই ব্যাপারে একজন জঘন্য ষড়যন্ত্রকারী এবং হয়ে ওঠেন নির্মম ঘাতকদের অন্যতম। এরপর ইনি এবং এঁর সেনাপতিত্ব বহুদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়, ফের ১৮৭০ সালের

১লা নভেম্বরে আবার ভেসে ওঠে। ঠিক তার আগের দিন প্রতিরক্ষা সরকার টাউন হলে আটক হয়ে ব্লাঙ্কি, ফ্লুরাঁস ও শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য প্রতিনিধিদের কাছে গুরুগম্ভীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে জবরদখল করা কর্তৃত্ব তারা স্বাধীনভাবে নির্বাচিত প্যারিসের এক কমিউনের কাছে সমর্পণ করবে। নিজেদের প্রতিশ্রুতি পালন দূরের কথা, তারা প্যারিসের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল ত্রশ্যুর ব্রেটন সৈন্যদের, যারা এবার বোনাপার্টের কর্সিকানদের জায়গা নিল। একমাত্র জেনারেল তামিজিয়ে এইভাবে বিশ্বাসভঙ্গ করে নিজের নাম কলঙ্কিত হতে দিতে অস্বীকার করে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর প্রধান সেনাপতিপদে ইস্তাফা দিয়েছিলেন; তাঁর পদে ক্লেমাঁ তমা আবার হয়ে বসলেন জেনারেল। তাঁর প্রধান সেনাপতিত্বের গোটা পর্যায় জুড়ে তিনি লড়েছিলেন প্রুশীয়দের বিরুদ্ধে নয়, প্যারিসের জাতীয় রক্ষিবাহিনীর বিরুদ্ধে। তাদের সাধারণ অস্ত্রসজ্জা তিনি ঠেকিয়ে রাখলেন, বুর্জোয়া ব্যাটেলিয়নগুলিকে লেলিয়ে দিলেন শ্রমিক ব্যাটেলিয়নের বিরুদ্ধে, ত্রশ্যু-'পরিকল্পনার' বিরোধী অফিসারদের বেছে বেছে বিদায় দিলেন, ভীরুতার অপবাদে ভেঙে দিলেন ঠিক সেইসব প্রলেতারীয় ব্যাটেলিয়নগুলোকে যাদের বীরত্ব তাদের ঘোর শত্রুদেরও আজ বিস্ময়ান্বিত করে তুলেছে। প্যারিসের শ্রমিক শ্রেণীর জাত শত্রু হিসাবে নিজের জুন মাসে অর্জিত পূর্বখ্যাতি ফিরে পেয়ে ক্লেমাঁ তমা বেশ গর্বই বোধ করলেন। ১৮ই মার্চের মাত্র দিন কয়েক আগে যুদ্ধমন্ত্রী ল্য ফ্লো-র সামনে 'প্যারিসীয় ছোটলোকদের সেরা অংশকে একেবারে নির্মূল করে দেবার' নিজস্ব পরিকল্পনা তিনি পেশ করেন। ভিনয় বিধ্বস্ত হবার পর রঙ্গমঞ্চে সৌখিন গুপ্তচরের বেশে তাঁকে যেন এগিয়ে আসতেই হল। ইংলণ্ডের যুবরাণীর লণ্ডন প্রবেশের দিনে ভিড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে যে লোকগুলি মারা পড়ে তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য যুবরাণী যতটুকু দায়ী, ক্লেমাঁ তমা ও লেকোঁৎ-এর হত্যার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্যারিসীয় শ্রমজীবীরাও ততটুকুই দায়ী।

প্লাস ভাঁদোমে নিরস্ত্র নাগরিকগণকে হত্যা করার কল্পকথাটি তিয়ের এবং 'গ্রাম্য মাতব্বররা' সভায় একটানা উপেক্ষা করে চলেন, তার প্রচারের ভার পুরাপুরি ছেড়ে দেন ইউরোপীয় সাংবাদিকতার নোকর-মহলে। ১৮ই মার্চের বিজয়ে প্যারিসের প্রতিক্রিয়াশীলদের 'শৃঙ্খলাপন্থী'দের হৃদকম্পন শুরু হয়। তাদের মনে হল এ যেন অবশেষে আসন্ন জনগণের প্রতিশোধগ্রহণেরই ইঙ্গিত। ১৮৪৮-এর জুন থেকে ১৮৭১-এর ২২শে জানুয়ারি পর্যন্ত যে মানুষগুলিকে তারা খুন করেছিল তাদের প্রেতাত্মারা যেন সামনে এসে হাজির হল। এই আতঙ্কটুকুই তাদের যা কিছু শাস্তি। যাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আটক করে রাখা উচিত ছিল, এমন কি সেই পুলিশদের নিরাপদে ভার্সাই ফিরে যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল প্যারিসের ফটক। 'শৃঙ্খলাপন্থীদের' যে শুধু অক্ষত রাখা হল তাই নয়, শক্তি সমাবেশ করে খোদ প্যারিসের কেন্দ্রস্থলেই একাধিক

ঘাঁটি নিশ্চিন্তে দখল করার সুযোগ পর্যন্ত তাদের দেওয়া হল। 'শৃঙ্খলা পার্টির' অভ্যস্ত রীতি থেকে আশ্চর্য তফাৎ এই কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশ্রয়, সশস্ত্র শ্রমিক শ্রেণীর এই মহানুভবতাকে তারা অপব্যাখ্যা করল সচেতন দুর্বলতার লক্ষণ বলেই। তাই কামান ও মিত্রেলিয়েজ প্রয়োগ করেও ভিনয় যাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, নিরস্ত্র মিছিলের ছদ্মবেশে তাই হাসিল করার এক নির্বোধ পরিকল্পনাই তারা করে। ২২শে মার্চ ছোকরা বাবুদের দলে টেনে অভিজাতদের এক দাঙ্গাবাজ দঙ্গল বিলাসের পাড়া থেকে পথে নামল হিকেরেন, কয়েতলগোঁ, আঁরি দ্য পেন প্রমুখ সাম্রাজ্যের কুখ্যাত পাণ্ডাদের নেতৃত্বে। শান্ত শোভাযাত্রার কাপুরুষসুলভ আবরণের আড়ালে এই উচ্ছৃঙ্খল লোকগুলি গুণ্ডাদের হাতিয়ারে গোপনে সজ্জিত হয়ে কুচ-কাওয়াজ চালাল; পথে যেতে যেতে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দল ও সান্ত্রীদের পাওয়া মাত্র এরা তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের প্রতি নানা দুর্ব্যবহার করল। শেষে দ্য লা পে রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসে 'কেন্দ্রীয় কমিটি ধ্বংস হোক! হত্যাকারীরা নিপাত যাক! জাতীয় সভা জিন্দাবাদ!' বলে চিৎকার দিয়ে এরা সেখানে অবস্থিত জাতীয় রক্ষিবাহিনীর সারি ভেদ করে এগোতে চেষ্টা করে ও এইভাবে আকস্মিক আক্রমণে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর প্লাস ভাঁদোমস্থ সদর দপ্তরটি দখল করে ফেলতে চায়। এদের পিস্তলের গুলির মুখে নিয়ম-মাফিক ছত্রভঙ্গ হবার আদেশ (sommations) পাঠ (ইংলণ্ডের দাঙ্গা আইনের ফরাসী প্রতিরূপ) করা হয় এবং সেটা ব্যর্থ হবার পরই জাতীয় রক্ষিবাহিনীর জেনারেল গুলি করার আদেশ দিয়েছিলেন। একদফা গুলিবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই নির্বোধ পোষাকি বাবুর দল পাগলের মতন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল; তারা ভেবেছিল যে তাদের 'আভিজাত্যের' ঠাট দেখা মাত্র প্যারিসীয় বিপ্লবের উপর তেমন প্রতিক্রিয়া ঘটবে জোশুয়ার শিঙ্গাধ্বনিতে যা হয়েছিল জেরিকোর দেওয়ালে। পলাতকেরা তাদের পিছনে রেখে গিয়েছিল দুইজন নিহত জাতীয় রক্ষিবাহিনীর সৈনিক ও গুরুতরভাবে আহত নয়জনকে (কেন্দ্রীয় কমিটির এক সদস্য সহ), এবং তাদের 'শান্তিপূর্ণ' বিক্ষোভের 'নিরস্ত্র' প্রকৃতিটির সাক্ষ্যস্বরূপ নিজেদের সমগ্র লীলাক্ষেত্র জুড়ে ছড়ানো বহু পিস্তল, ছোরা, ও লাঠিসোটা। ১৮৪৯-এর ১০ই জুন রোমের বিরুদ্ধে ফরাসী সৈন্যদের অপরাধী আক্রমণের প্রতিবাদে জাতীয় রক্ষিবাহিনী যখন একটি সত্যই শান্তিপূর্ণ মিছিল সংগঠিত করে, তখন এই নিরস্ত্র লোকদের ওপর চারিদিক থেকে সৈন্য চালিয়ে গুলি মারা, কচু-কাটা ও ঘোড়ার খুরে পিষে ফেলার জন্য শৃঙ্খলা পার্টির তদানীন্তন জেনারেল শাঙ্গার্নিয়েকে জাতীয় সভা, বিশেষ করে স্বয়ং তিয়েরে অভিনন্দিত করেছিলেন সমাজের ত্রাণকর্তা হিসাবে। তখন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয় প্যারিসে। দ্যুফোর জাতীয় সভায় নূতন নূতন দমনমূলক আইন তাড়াতাড়ি পাশ করিয়ে নেন; নিত্যনূতন গ্রেপ্তার এবং নির্বাসনের হিড়িক পড়ে যায় — শুরু হয় নূতন এক সন্ত্রাসের রাজত্ব। নিচের তলার লোকেরা কিন্তু এমন ক্ষেত্রে কাজ চালায় ভিন্নভাবে।

১৮৭১ সালের কেন্দ্রীয় কমিটি 'শান্ত মিছিলের' বীরদের স্রেফ উপেক্ষা করে এবং এতখানি উপেক্ষা করে যে মাত্র দুইদিন পরেই নৌ সেনাধ্যক্ষ সেসে-র নেতৃত্বে একটি **সশস্ত্র** মিছিলে ওদের সমবেত হওয়া সম্ভবপর হয়, যার পরিণতি ঘটে ছত্রভঙ্গ হয়ে সেই সুবিদিত ঊর্ধ্বশ্বাসে ভার্সাই পলায়নে। মঁমার্ত্রের উপর তিয়েরের চোরের মত আক্রমণে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তা চালিয়ে যেতে অনিচ্ছুক হওয়াতে কেন্দ্রীয় কমিটি সঙ্গে সঙ্গে তখন সম্পূর্ণ অসহায় ভার্সাই-এর বিরুদ্ধে যাত্রা না করে এবং তার মাধ্যমে তিয়ের ও তাঁর গ্রাম্য মাতব্বরদের ষড়যন্ত্র অবসান না করে এবার একটা চূড়ান্ত ভুলের অপরাধ করে বসল। তার বদলে শৃঙ্খলা পার্টিকে দেওয়া হল ২৬শে মার্চ কমিউন নির্বাচনের দিনে ভোটের বাক্সে আবার তার শক্তি পরীক্ষার সুযোগ। সে সময় প্যারিসের বিভিন্ন পাড়ার মেয়র দপ্তরে তারা তাদের পরম মহানুভব বিজেতাদের সঙ্গে মিটমাটের উদার বাণী বিনিময় করল, আর মনে মনে আওড়াতে থাকল তাদের যথাসময়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার কঠোর শপথ!

এখন ছবিটির ওপাশে দৃষ্টি ফেরানো যাক। এপ্রিলের গোড়ায় তিয়ের শুরু করলেন প্যারিসের বিরুদ্ধে তাঁর দ্বিতীয় অভিযান। প্যারিসীয় বন্দীদের প্রথম যে দলকে ভার্সাই নিয়ে আসা হয় তাদের উপর চলে বীভৎস অত্যাচার, এর্নেস্ত পিকার পাৎলুনের পকেটে হাত পুরে পায়চারি করতে করতে বন্দীদের উপর নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বর্ষণ করেন, আর শ্রীমতী তিয়ের ও শ্রীমতী ফাভ্র তাঁদের মাননীয়া (?) মহিলাদের মধ্য থেকে ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভার্সাই দঙ্গলের তান্ডবে বাহবা দিতে থাকেন। ধৃত লাইন সৈন্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হল। আমাদের নির্ভীক বন্ধু লোহার কারিগর জেনারেল দুভালকে একেবারে বিনা বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পানোৎসবগুলিতে উৎকট বেহায়াপনার জন্য কুখ্যাতা সেই স্ত্রীর রক্ষিত স্বামী গ্যালিফে একটা ঘোষণাপত্রে বড়াই করলেন এই বলে যে, তাঁর অশ্বারোহী সেনাদের দ্বারা আকস্মিকভাবে আক্রান্ত ও নিরস্ত্রীকৃত জাতীয় রক্ষিবাহিনীর ছোট একটি দলকে তার ক্যাপ্টেন ও লেফটেন্যান্ট সহ খুন করার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন। ধৃত ফেডারেল সৈন্যদের মধ্যে প্রতিটি লাইন সৈনিককে গুলি করে মারার ঢালাও হুকুম জারির জন্য পলাতক ভিনয়কে তিয়ের ভূষিত করলেন লিজিয়ন অব অনারের গ্র্যান্ড ক্রস পদকে। ১৮৭০ সালের ৩১শে অক্টোবর প্রতিরক্ষা সরকারের অধিকর্তাদের যে মহদাশয় বীর রক্ষা করেছিলেন সেই ফ্লুরাঁসকে বেইমানি করে খন্ড বিখন্ড করে জবাই করার জন্য পুলিশ বাহিনীর দেমারেকে সরকারী খেতাবে সম্মানিত করা হল। জাতীয় সভায় তিয়ের সোল্লাসে বিবৃত করলেন সেই হত্যাকান্ডের 'উদ্দীপনাময়ী খুঁটিনাটি তথ্য'। পার্লামেণ্টী এক বুড়ো-আঙ্গুলে বীর, তৈমুরলঙ্গের ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়ে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে ইনি সভ্যজনসুলভ যুদ্ধের কোনো অধিকার এমনকি এ্যাম্বুলেন্স-এর নিরপেক্ষতাটুকুও দেননি তাঁর ক্ষুদ্র

মহিমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের। ভল্টেয়ার তাঁর দূরদৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন*, বানর যদি ব্যাঘ্রোচিত প্রবৃত্তি কিছুক্ষণের জন্য অবাধে চরিতার্থ করবার সুযোগ পায় তবে সে বানরের চাইতে ভয়াবহ আর কিছু হতে পারে না! (৩৫ টীকা দ্রষ্টব্য।)**

অত্যাচার ও 'ভার্সাই-এর দস্যুদের নরঘাতী কর্ম থেকে প্যারিসকে রক্ষা করা এবং চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত দাবি করা' কর্তব্য, কমিউনের ৭ই এপ্রিল তারিখের নির্দেশে এই আদেশ দানের পরও তিয়ের বন্দীদের উপর বর্বর অত্যাচার বন্ধ তো করলেনই না, তদুপরি, তাঁর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিগুলিতে তাদের অপমানিত করা হল নিম্নলিখিত ভাষায়: 'সৎলোকের পীড়িত দৃষ্টিতে অধঃপতিত গণতন্ত্রের এর চেয়ে অধঃপতিত কোনো মুখ আর কখনো চোখে পড়েনি।' — স্বয়ং তিয়ের ও তাঁর ছাড়-টিকিটওয়ালা মন্ত্রীদের মতন সৎলোকদেরই অবশ্য। তবুও কিছু সময়ের জন্য বন্দীদের গুলি করে হত্যা করা বন্ধ রাখা হল। কিন্তু যেই তিয়ের এবং তাঁর ডিসেম্বরমার্কা জেনারেল কমিউনের প্রতিশোধগ্রহণের নির্দেশটা একটা ফাঁকা হুমকি মাত্র বলে বুঝতে পারলেন, জানতে পারলেন যে প্যারিসে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর ছদ্মবেশধারী ধৃত পুলিশী গুপ্তচরদের, এমন কি যেসব পুলিশী অগ্নিসংযোগকারী গোলাসহ ধরা পড়েছিল তাদের পর্যন্ত অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে, তখনই আবার শুরু হল বন্দীদের পাইকারী হারে গুলি করে হত্যা আর এটা চলল অবিরামভাবে শেষ পর্যন্ত। জাতীয় রক্ষিবাহিনীর লোকেরা যে সব বাড়িতে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তা সশস্ত্র পুলিশেরা ঘেরাও করে, পেট্রোল ঢেলে ভিজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয় (বর্তমান যুদ্ধে এই সর্বপ্রথম এ ব্যাপার ঘটল)। পরে দগ্ধ সেই মৃতদেহগুলি সংবাদপত্রের এ্যাম্বুলেন্স টেনে বের করে আনে তের্ন-এ। ২৫শে এপ্রিল বেল-এপিনে অশ্বারোহী সৈন্যের একটা দলের কাছে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর চারজন সৈনিক আত্মসমর্পণ করেছিল। পরে গালিফের যোগ্য চেলা একজন ক্যাপ্টেন একের পর এক তাদের গুলি করে হত্যা করে। এই হতভাগ্য চারজনের মধ্যে শেফের নামক একজনকে মৃত বলে ফেলে রাখা হয়; পরে হামাগুড়ি দিয়ে তিনি প্যারিসীয় ফাঁড়িতে ফিরে আসতে পারেন এবং কমিউনের একটি কমিশনের সামনে এই তথ্যটি জ্ঞাপন করেছিলেন। তলাঁ যখন যুদ্ধমন্ত্রীকে কমিশনের এই রিপোর্টের উপর প্রশ্ন করেন, তখন গ্রাম্য মাতব্বরেরা চিৎকার করে তাঁর কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে দেয় এবং ল্য ফ্লোকে জবাব দিতে নিষেধ করে। এদের 'গৌরবমণ্ডিত' সেনাবাহিনীর কীর্তির কথা বললে সে বাহিনীর অপমান হবে। যে হাল্কা সুরে তিয়েরের বিজ্ঞপ্তিগুলি মুলাঁ-সাকেতে ঘুমন্ত ফেডারেল

* ভল্টেয়ারের 'কানডিড' বইয়ের ২২শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** এই গ্রন্থের ২১১, ২১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

সৈন্যদের বেয়নেট-বিদ্ধ করা এবং ক্লামারে অনুষ্ঠিত পাইকারী হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছিল, তাতে লণ্ডন *Times*-এর অনতিসংবেদনশীল স্নায়ুতন্ত্রীও স্তম্ভিত না হয়ে পারেনি। কিন্তু প্যারিসের উপর গোলাবর্ষণকারী এবং বৈদেশিক আক্রমণের ছত্রছায়ায় দাসপ্রভুবিদ্রোহের প্ররোচকদের এই নিতান্ত প্রাথমিক নৃশংসতার ঘটনাগুলিকে আজ গণনা করতে বসা হাস্যকরই হবে। নিজের বামনসুলভ স্কন্ধে সাংঘাতিক গুরুদায়িত্বভার ন্যস্ত বলে তিনি যে পার্লামেণ্টী বিলাপ করেছিলেন তা ভুলে গিয়ে চারিদিকের এই বিভীষিকার মধ্যে তিয়ের তাঁর বুলেটিনে গর্ব করে বলেন যে **l'Assemblée siège paisiblement** (সভার বৈঠক চলছে শান্তিতে); আর কখনও ডিসেম্বরমার্কা জেনারেলদের সঙ্গে, আবার কখনও বা জার্মান রাজপুত্রদের সঙ্গে অবিরাম খানাপিনায় প্রমাণ করেন যে কোনোমতেই তাঁর পরিপাক ক্রিয়ায় মোটেই কোনই ব্যাঘাত হচ্ছে না, এমন কি লেকোঁৎ কিম্বা ক্লেমাঁ তমার প্রেতাত্মাদের কথা ভেবেও না।

৩

১৮ই মার্চের প্রত্যূষে 'কমিউন দীর্ঘজীবী হোক!' এই বজ্রনির্ঘোষে প্যারিস জেগে উঠল। কী জিনিস এই কমিউন, এই স্ফিন্‌ক্স, বুর্জোয়া মনের কাছে যা এত অস্বস্তিকর?

কেন্দ্রীয় কমিটি ১৮ই মার্চের ইশ্‌তেহারে ঘোষণা করেছিল: 'প্যারিসের প্রলেতারীয়রা শাসক শ্রেণীসমূহের ব্যর্থতা ও দেশদ্রোহিতা থেকে একথাই উপলব্ধি করেছে যে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে পরিস্থিতি ত্রাণের মুহূর্তটি আজ সমাগত ... সরকারী ক্ষমতা দখল করে আপন ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠা যে তাদের অবশ্য কর্তব্য এবং পরম অধিকার, একথা তারা অনুভব করেছে।' কিন্তু স্রেফ তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে দখল করেই নিজের কাজে তা লাগাতে পারে না শ্রমিক শ্রেণী।

ধারাবাহিক স্তরভিত্তিক শ্রমবিভাগের নীতি অনুযায়ী গঠিত সংস্থাসহ, — স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, আমলাতন্ত্র, পুরোহিত সম্প্রদায়, বিচার ব্যবস্থার সর্বত্র বিরাজমান সংস্থাসহ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হয় একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের আমলে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নবোদ্ভূত মধ্য শ্রেণী সমাজের পক্ষে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে তা। তাহলেও, নানাবিধ মধ্যযুগীয় আবর্জনা, অভিজাত স্বত্ব-স্বামিত্ব, আঞ্চলিক বিশেষ অধিকার, নগর ও গিল্ডের একচেটিয়া ক্ষমতা এবং স্বতন্ত্র প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় তার বিকাশ ছিল অবরুদ্ধ। আঠারো শতকের ফরাসী বিপ্লবের সুবিশাল সম্মার্জনী বিগত দিনের এই সমস্ত ভগ্নাবশেষকে নিঃশেষে ঝেঁটিয়ে দূর করে দেয়, এবং এইভাবে আধুনিক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সার্বিক আধাসামন্তবাদী ইউরোপের রাষ্ট্রগোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে ভূমিষ্ঠ যে প্রথম সাম্রাজ্য তার আওতায় গড়া

আধুনিক রাষ্ট্রসৌধের উপরিকাঠামো তোলার পথে শেষ প্রতিবন্ধকগুলিকেও সমাজ ভূমি থেকে একই সঙ্গে নির্মূল করে দেয়। পরের আমলগুলিতে পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন, অর্থাৎ বিত্তবান শ্রেণীসমূহের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন সরকার শুধু যে বিপুল জাতীয় ঋণ ও দুর্বহ করভারের লালন ক্ষেত্র হয়ে উঠল তাই নয়; পদ, অর্থ এবং মুরুব্বিয়ানার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ সহ শুধু যে তা শাসক শ্রেণীসমূহের বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী উপদল ও ভাগ্যান্বেষীদের কামড়াকামড়ির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল তাই নয়; সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রাজনৈতিক চরিত্রেরও পরিবর্তন হল। যে অনুপাতে আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থার অগ্রগতি পুঁজি ও শ্রমের মধ্যেকার শ্রেণী বিরোধকে বিকশিত, বিস্তৃত ও তীব্রতর করে তুলল, সেই অনুপাতেই রাষ্ট্রশক্তিও উত্তরোত্তর শ্রমের উপর পুঁজির জাতীয় শক্তি, সামাজিক দাসত্ব সংগঠনের মতো একটি সামাজিক শক্তি এবং শ্রেণী স্বৈরতন্ত্রের একটি যন্ত্রের চরিত্র* গ্রহণ করতে লাগল। শ্রেণী-সংগ্রামের অগ্রগতির ক্রমিক পর্যায়সূচক প্রতিটি বিপ্লবের পরই রাষ্ট্রশক্তির নিছক পীড়নমূলক প্রকৃতিটা আরো স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। ১৮৩০ সালের বিপ্লবের পরিণতি রূপে শাসনভার জমিদারদের হাত থেকে পুঁজিপতিদের হাতে চলে যাওয়ার মাধ্যমে তা শ্রমজীবী মানুষের অপেক্ষাকৃত দূরতর থেকে অধিকতর প্রত্যক্ষ বিরোধীদের হাতে আসে। যে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের নামে রাষ্ট্রশক্তি দখল করে, তারা তার ব্যবহার করল জুন মাসের হত্যাকাণ্ডে, শ্রমিক শ্রেণীকে এইটে বুঝিয়ে দেবার জন্য যে 'সামাজিক' প্রজাতন্ত্রের অর্থ শ্রমিকদের সামাজিক অধীনতা সুনিশ্চিত করার প্রজাতন্ত্র, এবং বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর অন্তর্ভূত বিরাট রাজতন্ত্রী অংশটাকে এইটে বুঝিয়ে দেবার জন্য যে তারা বুর্জোয়া 'প্রজাতন্ত্রীদের' হাতেই শাসনের দুশ্চিন্তা ও মাসোহারা নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিতে পারে। তবে, জুন মাসের সেই একদফা বীরত্বপনার পরই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের সম্মুখভাগ থেকে হটে এসে দাঁড়াতে হল 'শৃঙ্খলা পার্টির' পশ্চাতে, — উৎপাদক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে এবার প্রকাশ্যে ঘোষিত বিরোধিতায় দখলকারী শ্রেণীর বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী ও উপদলের জোট হল এ পার্টি। এদের জয়েণ্ট স্টক সরকারের সব চেয়ে যোগ্য রূপ হল **পার্লামেণ্টারী প্রজাতন্ত্র** যার রাষ্ট্রপতি ছিলেন লুই বোনাপার্ট। প্রকাশ্য শ্রেণীসন্ত্রাস এবং 'ঘৃণ্য জনতার' প্রতি ইচ্ছাকৃত অবমাননাই এদের রাজত্বের স্বরূপ। শ্রীযুক্ত তিয়ের যা বলেছেন, পার্লামেণ্টারী প্রজাতন্ত্র সে ভাবে যদি বা তাঁদের (শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন উপদলকে) 'সর্বাপেক্ষা কম বিভক্ত করে থাকে', তাহলে সেই শ্রেণী এবং তার বহির্ভূত বিরাট সমাজ দেহের মধ্যে এক অতল গহ্বর খুলে

---

* ১৮৭১ সালে এঙ্গেলস কৃত জার্মান অনুবাদে এই জায়গায় আছে 'শ্রম নিপীড়নের একটি সামাজিক শক্তি, শ্রেণী স্বৈরাচারের একটি যন্ত্রের চরিত্র।' — সম্পাঃ

দিয়েছে তা। এদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ ভেদবিভেদের যে বাধা পূর্বতন আমলগুলিতে রাষ্ট্রশক্তিকে সংযত রাখছিল, এদের মিলনে সে বাধা এখন দূর হয়ে গেল আর প্রলেতারিয়েতের অভ্যুত্থানের বিপদের মুখে এরা এখন নির্মমভাবে ও প্রকাশ্যে শ্রমের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করল পুঁজির একটি জাতীয় যুদ্ধ যন্ত্র হিসাবে। উৎপাদক জনগণের বিরুদ্ধে বিরামবিহীন জেহাদে এরা যে শুধু কার্যনির্বাহক শক্তিকে ক্রমাগত অধিকতর দমন ক্ষমতায় ভূষিত করতে বাধ্য হল তাই নয়; সেই সঙ্গে এদের নিজস্ব পার্লামেণ্টারী ঘাঁটি, জাতীয় সভার কাছ থেকে কার্যনির্বাহক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সমস্ত উপায়গুলিও একের পর এক ত্যাগ করতে হয়েছিল। লুই বোনাপার্টের মূর্তিতে কার্যনির্বাহক শক্তি এদের বিতাড়িত করে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য হল শৃঙখলা পার্টি মার্কা প্রজাতন্ত্রেরই স্বাভাবিক সন্তান।

কুদেতার জন্মপত্রিকা, সর্বজনীন ভোটাধিকারের অনুমোদনপত্র, এবং তলোয়ারের রাজদণ্ড নিয়ে সেই সাম্রাজ্য কথা দিল নির্ভর করবে কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর, উৎপাদকদের সেই বিপুল অংশের ওপর যারা পুঁজি ও শ্রমের সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে বিজড়িত নয়। পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিত্তবান শ্রেণীসমূহের নিকট সরকারের অনাবৃত অধীনতার অবসান ঘটিয়ে তা শ্রমিক শ্রেণীকে রক্ষা করবে বলে ঘোষণা করল। শ্রমিক শ্রেণীর উপর তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য সংরক্ষণ করে সে আবার বিত্তবান শ্রেণীসমূহকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিল; সর্বোপরি জাতীয় গৌরব নামক সেই আজব বস্তুটির পুনর্জন্মের মাধ্যমে সে সকল শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার ভাব করল। বস্তুতপক্ষে সমগ্র জাতিকে শাসন করার যোগ্যতা বুর্জোয়া শ্রেণী যখন হারিয়ে ফেলেছে এবং শ্রমিক শ্রেণী তখনও তা অর্জন করেনি — এমন একটা সময়ে এই হল সরকারের একমাত্র সম্ভাব্য রূপ। সমাজের পরিত্রাতা বলে বিশ্বময় অভিনন্দিত হল তা। এর ছত্রছায়ায় বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা রাজনৈতিক দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে এমন বিকাশলাভে সক্ষম হল যা তার নিজের কাছেই ছিল অপ্রত্যাশিত। এর শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেল বিপুলায়তনে; আর্থিক জোচ্চুরির উৎসব শুরু হল হরেক জাতির মিলিত পানসভায়; সাধারণ মানুষের দুঃখ দৈন্য ফুটে উঠল জাঁকালো, চোখ ঝলসানো, নীতিবিগর্হিত বিলাস-ব্যসনের নির্লজ্জ প্রদর্শনীতে। আপাতদৃষ্টিতে যে রাষ্ট্রশক্তি সমাজের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত বলে প্রতীয়মান হত, সেই রাষ্ট্রশক্তিই বস্তুত হয়ে দাঁড়াল সেই সমাজের বৃহত্তম কলঙ্ক এবং এর সকল দুর্নীতির উর্বর ক্ষেত্র। তার নিজস্ব অপদার্থতা এবং যে সমাজকে সে রক্ষা করে আসছিল আর অসারতাকে উদ্ঘাটিত করে দিল প্রুশীয় বেয়নেট, যে প্রাশিয়া নিজেই এ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পীঠস্থানকে প্যারিস থেকে বার্লিনে স্থানান্তরিত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। নবজাগ্রত মধ্য শ্রেণীর সমাজ যে রাষ্ট্রশক্তি বিকাশের সূচনা করেছিল সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে নিজের মুক্তির উপায় হিসাবে,

পূর্ণগঠিত বুর্জোয়া সমাজ শেষপর্যন্ত যাকে রূপান্তরিত করল পুঁজি কর্তৃক শ্রমকে দাসত্বশৃঙ্খলে বেঁধে রাখার উপায়ে, সেই রাষ্ট্রশক্তির একাধারে সর্বাপেক্ষা ব্যভিচারী এবং চূড়ান্ত রূপটাই হল সাম্রাজ্যবাদ।

কমিউন হল সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ বিপরীত। যে 'সামাজিক প্রজাতন্ত্রের' আওয়াজ তুলে প্যারিসের প্রলেতারিয়েত ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আবাহন করেছিল, সেটা ছিল এমন এক প্রজাতন্ত্রের অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা, যা শ্রেণী-শাসনের রাজতন্ত্রী রূপটিকেই শুধু অপসারিত করবে না, খাস শ্রেণী-শাসনকেই দূর করবে। কমিউন ছিল সেই প্রজাতন্ত্রেরই বাস্তব প্রত্যক্ষ রূপ।

পূর্বতন শাসন-শক্তির পীঠস্থান এবং একই সঙ্গে ফরাসী শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক ঘাঁটি প্যারিস সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার হিসাবে প্রাপ্ত সেই পুরানো শাসন-ব্যবস্থাকেই পুনপ্রতিষ্ঠিত ও চিরস্থায়ী করার জন্য তিয়ের ও গ্রাম্য মাতব্বরদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। অবরোধের ফলে খাস সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে, তার বদলে শ্রমিকদের সংখ্যাধিক্য সমেত জাতীয় রক্ষিবাহিনী প্রতিষ্ঠার দরুনই প্যারিসের পক্ষে প্রতিরোধ সম্ভবপর হয়েছিল। এবার এই বাস্তব ঘটনাটিকে প্রথায় রূপায়িত করার কথা। তাই কমিউনের প্রথম আদেশ ছিল স্থায়ী সৈন্যদলের অবলুপ্তি, তার স্থানে সশস্ত্র জনবলের প্রতিষ্ঠা।

সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শহরের বিভিন্ন পল্লী থেকে নির্বাচিত, নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়িত্বশীল ও স্বল্পমেয়াদে প্রত্যাহার যোগ্য পৌর প্রতিনিধিদের নিয়েই কমিউন গঠিত হয়েছিল। স্বভাবতই নির্বাচিতদের অধিকাংশই হল শ্রমিক বা শ্রমিক শ্রেণীর আস্থাভাজন প্রতিনিধিবর্গ। পার্লামেণ্টারী সংস্থা না হয়ে কমিউনকে হতে হল একটি কাজের সংস্থা, একই সঙ্গে কার্যনির্বাহক ও আইন প্রণয়নী সংস্থা। পুলিশকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতিয়ার না রেখে, তার রাজনৈতিক প্রকৃতির সবটাকে অবিলম্বে ঘুচিয়ে দিয়ে, তাকে রূপান্তরিত করা হল কমিউনের কাছে দায়ী, ও যে কোনো সময়ে প্রত্যাহার যোগ্য তার সংস্থা রূপে। প্রশাসনের অপর সকল শাখার কর্মকর্তাদের বেলাতেও একই ব্যবস্থা হয়। কমিউনের সদস্যগণ থেকে শুরু করে নিচে পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে সরকারী কাজ চালাতে হল **শ্রমজীবীদের মজুরিতে**। রাষ্ট্রের বড় বড় হোমরা-চোমরাদের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কায়েমী স্বত্ব ও প্রাপ্য ভাতা ইত্যাদিও হল বিলুপ্ত। সরকারী কর্মভার এখন আর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়নকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে রইল না। শুধু পৌর শাসন নয়, এযাবৎ রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত সমস্ত উদ্যোগই অর্পিত হল কমিউনের হাতে।

পূর্বতন সরকারের বাহুবলের উপাদান স্থায়ী সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর কবল থেকে উদ্ধার পাবার পর স্বত্বাধিকারী সংস্থা হিসাবে সমস্ত গির্জার সঙ্গে সরকারী সম্বন্ধ

উঠিয়ে দিয়ে ও তাদের স্বত্ব নাকচ করে কমিউন চাইল দমনের আধ্যাত্মিক বল, ‘পুরোহিত-শক্তি’কে চূর্ণ করতে। পুরোহিতদের পাঠিয়ে দেওয়া হল তাদেরই পূর্বগামী খ্রীষ্টের প্রিয়শিষ্যদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণে ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে সংগৃহীত ভিক্ষান্নের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগত সাধারণ জীবনযাত্রার অন্তরালে। ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সর্ববিধ হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বার জনগণের অবৈতনিক শিক্ষালাভের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। এর ফলে শিক্ষা সকলের আয়ত্তে এল শুধু তাই নয়, শ্রেণীগত কুসংস্কার ও সরকারী শক্তির আরোপিত শৃঙ্খল থেকে বন্ধনমুক্ত হয়ে উঠল বিজ্ঞান।

একের পর এক ক্ষমতাসীন সরকারের নিকট উচ্চারিত এবং যথারীতি লঙ্ঘিত আনুগত্যের শপথ গ্রহণে অভ্যস্ত বিচার-বিভাগীয় কর্মচারীরা সেই সব সরকারের কাছেই নিজেদের নির্লজ্জ দাসত্বটাকে আড়াল করে রাখার মুখোস হিসাবেই যা ব্যবহার করত, সেই মেকি স্বাধীনতা থেকে তাদের বঞ্চিত করতে হল। সমাজের অন্য কর্মচারীদের মতনই ম্যাজিস্ট্রেট ও জজেরাও হয়ে উঠল নির্বাচিত, দায়িত্বশীল এবং প্রত্যাহার্য।

অবশ্যই ফ্রান্সের সমস্ত বড়ো বড়ো শিল্পকেন্দ্রসমূহের কাছে প্যারিস কমিউনকে আদর্শ হতে হয়। প্যারিস ও মাঝারি আকারের শহরগুলিতে কমিউনী শাসন একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, প্রদেশে প্রদেশেও সাবেকী কেন্দ্রীয় সরকারকে পথ ছেড়ে দিতে হবে উৎপাদকদের আত্মশাসনের সামনে। জাতিজোড়া সাংগঠনিক বিন্যাস বিকশিত করে তোলার সময় হাতে না থাকলেও কমিউনের একটা প্রাথমিক খসড়ায় স্পষ্ট ভাষায় এটা ঘোষণা করা হয় যে ক্ষুদ্রতম একটি পল্লীগ্রামেরও রাজনৈতিক শাসনের রূপ হবে কমিউন আর গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলিতে স্থায়ী সেনাবাহিনীর বদলে গড়ে তুলতে হবে অত্যন্ত স্বল্প-মেয়াদী একটি জাতীয় মিলিশিয়া। প্রতি জেলায় গ্রাম্য কমিউনগুলি সদর শহরে অবস্থিত একটি প্রতিনিধি পরিষদ মারফৎ তাদের সাধারণ কাজ সম্পাদন করবে। এই জেলা পরিষদেরা আবার প্যারিসে জাতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীতে প্রতিনিধি পাঠাবে; প্রত্যেকটি প্রতিনিধিকে যে কোনও সময়ে ফিরিয়ে আনা চলবে, প্রত্যেকে বাধ্য থাকবে নিজ নির্বাচকদের অবশ্য পালনীয় নির্দেশ (mandat impératif) পালন করতে। এর পরেও যে স্বল্পসংখ্যক অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থেকে যাবে সেগুলি খারিজ করে দেওয়া হবে না — এমন উক্তি হল ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যা — সেগুলি চালাবার কথা কমিউনের এবং সেইহেতু কঠোর দায়িত্বশীল এজেন্ট দিয়ে। জাতীয় ঐক্য ভাঙার কথাই নেই, বরং পক্ষান্তরে ঐক্য সংগঠিত হবে কমিউনের কাঠামো অনুসারেই। নিজে জাতির একটি গজিয়ে-উঠা পরগাছা হয়ে যে রাষ্ট্র নিজেকে সেই জাতি থেকে স্বতন্ত্র ও ঊর্ধ্বে অবস্থিত জাতীয় ঐক্যের প্রতিমূর্তি বলে দাবি করে, সেই রাষ্ট্রশক্তির উচ্ছেদে জাতীয় ঐক্যই বাস্তব হয়ে উঠবে। সাবেকী রাষ্ট্রশক্তির নিছক নিপীড়ক

অঙ্গগুলিকে যেমন ছিন্ন করে ফেলতে হবে তেমনি সে শক্তির ন্যায্য কর্তব্যগুলি কেড়ে নেওয়া হবে সমাজের উপর অন্যায্যভাবে আধিপত্য দখলকারী একটা কর্তৃত্বের হাত থেকে ও ফিরিয়ে দেওয়া হবে সমাজেরই দায়িত্বশীল প্রতিনিধিদের হাতে। শাসক শ্রেণীর কোন লোকটি পার্লামেন্টে জনসাধারণের অপ-প্রতিনিধিত্ব করবে, তিন বা ছয় বৎসর পর পর সেই সিদ্ধান্ত নেবার পরিবর্তে সর্বজনীন ভোটাধিকার কমিউনে সংগঠিত জনগণের জন্য সেই কাজই করবে, অন্যান্য সকল মালিকদের বেলায় তার ব্যবসার জন্য শ্রমিক বা কার্যাধ্যক্ষ বেছে নেবার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নির্বাচনের ক্ষমতার মাধ্যমে যা সম্পন্ন হয়ে থাকে। একথা ত সকলেই জানে যে ব্যক্তিমানুষের মতো কোম্পানিগুলিও আসল ব্যবসার ব্যাপারে সাধারণত যোগ্য লোককেই যোগ্যস্থানে নিয়োগ করাতে পারে, আর কোনও ভুলভ্রান্তি হলে অবিলম্বে তা সংশোধনও করতে জানে। অন্যদিকে, সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিল করে দিয়ে তার জায়গায় উপরতলা থেকে নিয়োগ এর চাইতে কমিউনের আদর্শের অধিকতর পরিপন্থী আর কিছু হতে পারে না।

সাধারণত সম্পূর্ণ নূতন ঐতিহাসিক সৃষ্টির ভাগ্যে সমাজ জীবনের প্রাচীনতর এমন কি অচল যে সব রূপের সঙ্গে তার খানিকটা সাদৃশ্য থাকা সম্ভব তারই একটা রকমফের বলে ভুল বোঝার কারণ ঘটে। সেইজন্য এই যে নূতন কমিউন আধুনিক রাষ্ট্রশক্তিকে চূর্ণ করে দিচ্ছে তাকে এই রাষ্ট্রশক্তিরই পূর্বগামী অথচ পরবর্তীকালে এরই ভিত্তি হিসাবে রূপান্তরিত মধ্যযুগীয় কমিউনের পুনঃসৃষ্টি বলে ভুল করা হয়েছে। বৃহৎ জাতিগত যে ঐক্য আদিতে রাজনৈতিক শক্তির জোরে সংগঠিত হলেও আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক উৎপাদনের একটা শক্তিশালী অনুষঙ্গ, তাকে ভেঙে ফেলে মংতেস্ক্যু ও জিরণ্ডিনরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ফেডারেশন গঠনের প্রয়াস বলে কমিউনের ব্যবস্থাকে ভুল বোঝা হয়েছে। রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে কমিউনের বৈরিতাকে অতিকেন্দ্রীকরণ বিরোধী প্রাচীন সংগ্রামটারই অতিরঞ্জিত রূপ বলে ভুল করা হয়েছে। বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দরুন সরকারের বুর্জোয়া রূপের চিরায়ত বিকাশটা ব্যাহত হতে পারে, যেমন হয়েছিল ফ্রান্সে, আবার, ইংলণ্ডের মতো প্রধান কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-সংস্থাগুলি সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে দুর্নীতিগ্রস্ত গ্রামীণ যাজকসংস্থা (vestries), ধনসন্ধানী কাউন্সিলর, শহরের দুঃস্থ আইনের হিংস্র অভিভাবক, অথবা মফঃস্বলে কার্যত প্রায় বংশ পরম্পরাগত ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে। এতদিন যে সমস্ত শক্তিকে আত্মসাৎ করে রাষ্ট্ররূপী পরগাছা সমাজের ঘাড়ে খেয়ে সমাজেরই স্বচ্ছন্দ বিকাশ রুদ্ধ করে রেখেছে, কমিউনের কাঠামো সেই সমস্ত শক্তিকে সমাজদেহে পুনঃপ্রত্যর্পণ করত। এই একটিমাত্র কাজের দ্বারাই সূচিত হত ফ্রান্সের নবজাগরণ। ফ্রান্সের প্রাদেশিক মধ্য শ্রেণী কমিউনের মধ্যে দেখেছিল তাদের শ্রেণী লুই ফিলিপের আমলে গ্রামাঞ্চলের উপর যে প্রতিপত্তির অধিকারী হয় এবং লুই

নেপোলিয়নের শাসনকালে শহরের উপর গ্রামাঞ্চলের তথাকথিত শাসনের দ্বারা যার অপসারণ ঘটে, সেই প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠারই একটি প্রচেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কমিউনের কাঠামো গ্রাম্য উৎপাদকদের নিয়ে আসত নিজ নিজ জেলার কেন্দ্রীয় শহরগুলির বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বাধীনে, এতে করে তাদের স্বার্থের স্বাভাবিক অছিদার মিলত সেখানকার শ্রমিকদের মধ্যে। বস্তুত কমিউনের অস্তিত্বটারই স্বতঃসিদ্ধ অর্থই হল আঞ্চলিক পৌরস্বাধীনতা, কিন্তু সে স্বাধীনতা এখন আর অধুনা বর্জিত রাষ্ট্রশক্তির উপর আরোপিত একটা বাধা হিসাবে নয়। রক্ত ও ইস্পাত নিয়ে কুটিল চক্রান্তে ব্যস্ত না থাকলে যিনি স্বীয় মানসিক যোগ্যতার উপযোগী পুরানো বৃত্তির অনুসরণে *Kladderadatsch* (বার্লিনের *Punch*) পত্রিকার* লেখক হওয়াটাই পছন্দ করেন, সেই বিসমার্কের মাথাতেই কেবল এমন ধারণা আসতে পারে যাতে করে প্যারিস কমিউনের উপর আরোপ করা হয় প্রুশীয় পৌর ব্যবস্থার লক্ষ্যগুলি, যে প্রুশীয় ব্যবস্থা হল ১৭৯১ সালের পুরাতন ফরাসী পৌর ব্যবস্থার ব্যঙ্গচিত্র মাত্র, যে ব্যবস্থার মাধ্যমে পৌর শাসন পরিণত হয়েছে প্রুশীয় রাষ্ট্রের পুলিশী যন্ত্রের গৌণ কয়েকটি চাকাতে। মিতব্যয়ী শাসন — বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির এই ধ্বনিকে কমিউন বাস্তবে রূপায়িত করেছিল স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ও আমলাতন্ত্র — এই দুইটি সর্বাধিক ব্যয়বহুল ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে। কমিউনের অস্তিত্বের অর্থই হল সেই রাজতন্ত্রের অনস্তিত্ব অন্তত ইউরোপে যেটা হল শ্রেণী-শাসনের স্বাভাবিক দায় ও অপরিহার্য আচ্ছাদন। প্রজাতন্ত্রের জন্য কমিউন এনে দিল প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদির ভিত্তি। কিন্তু মিতব্যয়ী শাসন বা 'প্রকৃত প্রজাতন্ত্র', এ দুটির কোনোটাই কিন্তু তার চরম লক্ষ্য ছিল না, এরা হল তার আনুষঙ্গিক ঘটনা মাত্র।

কমিউনের উপর যে বহুবিধ ব্যাখ্যা চাপানো হয়েছে, বহুবিধ স্বার্থ যেভাবে স্বীয় অনুকূলে তার অর্থ খুঁজেছে, এর থেকেই বোঝা যায় যে কমিউন ছিল একটি একান্তই প্রসারমান রাজনৈতিক রূপ, যেখানে সরকারের পূর্বতন সকল রূপেই হল স্পষ্টতই নিপীড়নমূলক। এর গোপন রহস্যটা এই: এটা হল মূলত শ্রমিক শ্রেণীর সরকার, আত্মসাৎকারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে উৎপাদক শ্রেণীর সংগ্রামের ফল তা, অবশেষে আবিষ্কৃত সেই রাজনৈতিক রূপ যার আওতায় শ্রমের অর্থনৈতিক মুক্তিসাধন কার্যকর করতে হবে।

এই সর্বশেষ শর্তটি বাদ দিলে কমিউনের ব্যবস্থা একটা অসম্ভাব্য ও অবাস্তব ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়। উৎপাদকের সামাজিক দাসত্ব চিরস্থায়ীকরণের সঙ্গে তার

* *Kladderadatsch* — জার্মান ব্যঙ্গ রসাত্মক পত্রিকা, ১৮৪৮ সালে বার্লিন থেকে এর প্রকাশ শুরু হয়; *Punch* — ইংলণ্ডের ব্যঙ্গ রসাত্মক পত্রিকা, ১৮৪১ সালে লণ্ডনে প্রকাশ শুরু হয়েছিল। — সম্পাঃ

রাজনৈতিক আধিপত্যের সহাবস্থান সম্ভবপর নয়। কাজেই যে অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর বিভিন্ন শ্রেণীর তথা শ্রেণী আধিপত্যের অস্তিত্ব, তাকে নির্মূল করে দেবার একটা হাতল হিসাবেই কমিউনের কাজ করার কথা। শ্রমের বন্ধনমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ব্যক্তিই রূপান্তরিত হয় শ্রমজীবীতে এবং উৎপাদনী শ্রম আর নিছক একটি শ্রেণীর ধর্ম হয়ে থাকে না।

আশ্চর্য ঘটনাই বটে। বিগত ষাট বছর ধরে শ্রমের মুক্তি বিষয়ক লম্বা চওড়া কথার ছড়াছড়ি সত্ত্বেও এবং ঝুড়িঝুড়ি সাহিত্য রচনার পরও যেই কোথাও শ্রমিক শ্রেণী দৃঢ়সংকল্পে ব্যাপারটা স্বহস্তে গ্রহণ করতে যায়, অমনি পুঁজি ও মজুরি-দাসত্ব (জমির মালিক আজ পুঁজিপতির নিষ্ক্রিয় অংশীদার মাত্র) এই দুই প্রান্তশায়ী আধুনিক সমাজের মুখপাত্রদের যত ওকালতি বুলি উচ্ছল হয়ে ওঠে — যেন পুঁজিবাদী সমাজ এখনও কৌমার্যের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বজায় রেখেছে, যেন তার স্ববিরোধগুলি আজও অপরিণত, যেন তার বিভ্রমগুলি অদ্যাপি ফেটে যায়নি, উলঙ্গ হয়ে পড়েনি তার ব্যাভিচারী বাস্তবতা! চিৎকার করে তারা বলে, সমস্ত সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ যে সম্পত্তি, কমিউন তাকেই ধ্বংস করে দিতে চায়! হ্যাঁ, ভদ্রমহোদয়গণ, যে শ্রেণী-সম্পত্তি বহুর শ্রমকে পরিণত করে মুষ্টিমেয় লোকের সম্পদে, তাকে কমিউন উচ্ছেদ করতেই চেয়েছিল। উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ ছিল তার লক্ষ্য। উৎপাদনের উপায়, জমি ও পুঁজি, আজ যেটা মুখ্যত শ্রমকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধন এবং শোষণের উপায় মাত্র, তাকে মুক্ত ও যৌথ শ্রমের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বাস্তব সত্যে পরিণত করতে চেয়েছিল কমিউন। কিন্তু এ যে কমিউনিজম, 'অসম্ভাব্য' কমিউনিজম! কেন, বর্তমান ব্যবস্থাকে আর চালিয়ে যাওয়ার অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি করার মতন বুদ্ধি যাদের আছে — আর তেমন লোক প্রচুর — শাসক শ্রেণীগুলির তেমন সব সদস্যরাই তো হয়ে উঠেছে সমবায়ী উৎপাদনের অত্যুৎসাহী উচ্চকণ্ঠ উদ্‌গাতা। সমবায়ী উৎপাদনকে যদি একটা মেকি জিনিস বা ফাঁদমাত্র না হয়ে থাকতে হয়; যদি তাকে পুঁজিবাদী সমাজের জায়গা নিতে হয়; যদি সম্মিলিত সমবায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি একটি সাধারণ পরিকল্পনার ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদনকে পরিচালনা করে এবং এইভাবে তা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের যা অনিবার্য ভবিতব্য সেই অবিরাম নৈরাজ্য ও পর্যায়িক বিপর্যয়ের সমাপ্তি ঘটায় — তাহলে, ভদ্রমহোদয়গণ, সেটা হবে কমিউনিজম, 'সম্ভাব্য' কমিউনিজম ছাড়া আর কী?

শ্রমিক শ্রেণী কমিউনের কাছ থেকে কোনও ভোজবাজি প্রত্যাশা করেনি। জনগণের নির্দেশের জোরে প্রবর্তনের জন্য কোনো তৈরি ইউটোপিয়া তাদের নেই। একথা তারা জানে যে নিজেদের মুক্তি অর্জনের জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়ায় বর্তমান সমাজের অমোঘ প্রবণতা যে দিকে, সেই উচ্চতর রূপ অর্জনের জন্য

তাদের যেতে হবে সুদীর্ঘ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, ধারাবাহিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, যা পরিস্থিতি ও মানুষদের রূপান্তরিত করবে। প্রাচীন পতনোন্মুখ বুর্জোয়া সমাজ নবতর সমাজের যে সমস্ত উপাদান গর্ভে ধারণ করে আছে সেগুলিকেই বাধামুক্ত করে দেওয়া ছাড়া কার্যে পরিণত করার কোনও আদর্শ তাদের নেই। আপন ঐতিহাসিক ব্রত সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সচেতন, তা সাধনের বীরোচিত সংকল্পে অবিচল শ্রমিক শ্রেণী হেসে উড়িয়ে দিতে পারে মসীজীবী ভদ্রলোকদের অভদ্র গালিগালাজ আর শুভাকাঙ্ক্ষী বুর্জোয়া মতবাগিশদের পণ্ডিতম্মন্য মুরুব্বিয়ানা, বৈজ্ঞানিক অভ্রান্ততার দৈববাণীসুলভ সুরে যাঁরা তাঁদের অজ্ঞ মামুলিয়ানা ও গোষ্ঠীগত বুকনি ঝেড়ে থাকেন।

প্যারিস কমিউন যখন নিজ হস্তে বিপ্লব পরিচালনার ভার তুলে নিল; যখন সাধারণ শ্রমিকেরা প্রথম তাদের 'স্বাভাবিক ঊর্ধ্বতনদের' সরকারী বিশেষ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে সাহস পেল এবং অদৃষ্টপূর্ব সুকঠিন অবস্থার মধ্যেও বিনয়, বিবেক ও দক্ষতার সঙ্গে তাদের কাজ সম্পাদন করতে লাগল, কাজ করতে লাগল এমন বেতনে, যার সর্বোচ্চ হারও জনৈক বড় বিজ্ঞানীর* মতে কোন একটা মেট্রপোলিটান স্কুল বোর্ড সেক্রেটারীর ন্যূনতম প্রয়োজনেরও পাঁচ ভাগের এক ভাগ, তখন শ্রমিক শ্রেণীর প্রজাতন্ত্রের প্রতীক লাল পতাকাকে টাউন হলের শীর্ষে উড্ডীন দেখে প্রাচীন পৃথিবী রোষে ফুঁসছিল।

তথাপি, এই হল প্রথম বিপ্লব যখন শুধু বিপুল বিত্তবান পুঁজিপতিদের বাদ দিয়ে প্যারিসীয় মধ্য শ্রেণীর বিরাট অংশ পর্যন্ত — যেমন দোকানদার, ব্যবসায়ী, বণিক — প্রকাশ্যেই একথা মেনে নিয়েছিল যে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম। মধ্য শ্রেণীর নিজেদের মধ্যেই পৌনঃপুনিক বিরোধের যা কারণ সেই মহাজন ও খাতকের ব্যাপারে একটা বিজ্ঞোচিত নিষ্পত্তি করে কমিউন তাদের বাঁচায়।** মধ্য শ্রেণীর ঠিক এই অংশই ১৮৪৮-এর জুন মাসে শ্রমিকদের বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করার পর, তদানীন্তন সংবিধান সভা তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যে এদের বলি দেয় উত্তমর্ণদের কাছে। কিন্তু এখন শ্রমিক শ্রেণীর চারপাশে তাদের সমাবেশের এটাই একমাত্র কারণ নয়। তারা বুঝেছিল, হয় কমিউন নয় ত সাম্রাজ্য — অন্য যে নামেই তা আবার আবির্ভূত হোক না কেন, — এই দুইটির একটিকে বেছে নেওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। সাম্রাজ্য

* অধ্যাপক হাকসলি। (১৮৭১ সালের জার্মান সংস্করণের টীকা।)

** তিনবছরের কিস্তিবন্দিতে সমস্ত ঋণ পরিশোধ এবং তার সুদ বিলুপ্ত করার যে ডিক্রি প্যারিস কমিউন ১৮৭১ সালের ১৬ই এপ্রিল গ্রহণ করে, তার কথা বলা হচ্ছে। এ ডিক্রির ফলে পেটি বুর্জোয়াদের আর্থিক অবস্থা অনেক লঘুভার হয়ে ওঠে, এবং ঋণদাতা বড়ো বড়ো পুঁজিপতিদের পক্ষে তা অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। — সম্পাঃ

তাদের আর্থিক দিক দিয়ে সর্বনাশ করেছিল — সামাজিক সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, পাইকারী হারে আর্থিক জোচ্চুরির প্রশ্রয় দিয়ে, পুঁজির কেন্দ্রীভবনের কৃত্রিম ত্বরান্বয়নে সাহায্য জুগিয়ে, এবং তার ফলে এদের শ্রেণীভুক্তদের উচ্ছেদ সাধন করে। সাম্রাজ্য রাজনীতির দিক দিয়ে তাদের দমন করেছিল; তার উদ্দাম উচ্ছৃঙখলতা আহত করেছিল তাদের নীতিবোধকে; তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানকে 'অজ্ঞ পুরোহিতদের' হাতে তুলে দিয়ে সাম্রাজ্য অপমানিত করেছিল তাদের ভল্টেয়ার-প্রীতিকে; তাদের ফরাসী দেশপ্রেমকে ক্ষুব্ধ করেছিল যুদ্ধের অতলে তাদের নিক্ষেপ করে — যে যুদ্ধ তার ধ্বংসস্তূপের একমাত্র প্রতিমূল্যে রেখে গেল সাম্রাজ্যেরই তিরোভাবে। বস্তুত হোমরা-চোমরা বোনাপার্টপন্থী এবং উড়নচণ্ডী পুঁজিপতিদের প্যারিস থেকে পলায়নের পর, মধ্য শ্রেণীর সত্যকারের শৃঙখলা পার্টি Union Républicaine নামে বেরিয়ে এল, কমিউনের পতাকাতলে তাদের হল সমাবেশ, তিয়েরের ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তারা পক্ষ সমর্থন করল কমিউনের। অবশ্য মধ্য শ্রেণীর এই বিরাট অংশের কৃতজ্ঞতাবোধটুকু বর্তমানের কঠোর পরীক্ষায় টিকবে কিনা তা ভবিষ্যতেই দেখা যাবে।

কমিউন কৃষকদের ঠিকই বলেছিল, 'তার জয়লাভই তাদের একমাত্র ভরসা!' ভার্সাই থেকে যত মিথ্যা রটনা হয়েছিল, ইউরোপের জাঁকালো বাজারী লেখকেরা (penny-a-liner) যার প্রতিধ্বনি করত, তার মধ্যে সবচেয়ে জবরদস্ত একটা মিথ্যা এই যে, 'গ্রাম্য মাতব্বরেরাই' নাকি ফরাসী কৃষককুলের প্রতিনিধি। ১৮১৫ সালের পর কোটি কোটি টাকা খেসারৎ যাদের হাতে তুলে দিতে হয়েছিল, সেই লোকদের প্রতি ফরাসী কৃষকের ভালোবাসা কী হতে পারে তা একবার ভেবে দেখুন! ফরাসী কৃষকের চোখে বড় ভূস্বামীর অস্তিত্বটাই হল তাদের ১৭৮৯ সালের বিজয়ের উপর হস্তক্ষেপ। ১৮৪৮ সালে বুর্জোয়ারা কৃষকের জমিটুকুর উপর ফ্রাঁ পিছু প'য়তাল্লিশ সাঁতিম বাড়তি ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়েছিল; কিন্তু তখন তা করা হয়েছিল বিপ্লবের নামে, এ দিকে প্রুশীয়দের কাছে যে পাঁচশত কোটি ক্ষতিপূরণ দেবার কথা, তার মূল বোঝাটা কৃষকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্যই এখন তারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের উস্কানি দিল। অন্যদিকে কমিউন তার প্রথম দিককার এক ঘোষণাতেই জানিয়ে দিয়েছিল যে এই যুদ্ধের আসল স্রষ্টাদেরই যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য করা হবে। কমিউন কৃষকদের রক্তমোক্ষণকারী ট্যাক্সের হাত থেকে মুক্তি আনত: তাকে দিত একটা মিতব্যয়ী সরকার, — তাদের বর্তমানের রক্তশোষকদের, তাদের নোটারি, উকিল, হাকিম প্রভৃতি বিচার বিভাগীয় শকুনদের জায়গায় আনত কমিউনের বেতনভুক্ত, কৃষকদের নির্বাচিত এবং তাদেরই নিকট দায়ী ব্যক্তিদের। কমিউন কৃষকদের মুক্তি আনত জমির টহলদার, সশস্ত্র পুলিশ তথা প্রিফেক্টদের অত্যাচারের হাত থেকে; পুরোহিতদের ছাইপাঁশের

বদলে এনে দিত স্কুল শিক্ষকদের জ্ঞান-প্রচার। ফরাসী কৃষক, সর্বোপরি, বেশ হিসেবী মানুষ। পুরোহিতের মাহিনাটা ট্যাক্স আদায়কারীদের দিয়ে জবরদস্তি করে সংগ্রহ করার চাইতে এলাকার লোকদের ধর্মপ্রেরণার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের উপর নির্ভর করা উচিত — একথা তার কাছে অতি যুক্তিসঙ্গত বলেই বোধ হত। কমিউনের শাসন এবং একমাত্র এই শাসনই ফরাসী কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য অবিলম্বেই এইসব বৃহৎ কল্যাণের আশ্বাস তুলে ধরেছিল। সুতরাং এখানে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন যে জটিলতর অথচ গুরুত্বপূর্ণ অনেক সমস্যা কৃষকদের স্বার্থে সমাধান করতে পারত একমাত্র কমিউনই, সমাধান করতে বাধ্যও হত — যথা, জমিবন্ধকী ঋণ, যেটা তার জমির টুকরোটার উপর জোঁকের মতন এঁটে রয়েছে; তা থেকে দিনের পর দিন গ্রামাঞ্চলের প্রলেতারিয়েত বেড়ে চলেছে; বেড়ে চলেছে সে জমি থেকে তাদের ক্রমশই দ্রুততর গতিতে উচ্ছেদ, যা ঘটছে আধুনিক কৃষিকার্যেরই বিকাশ এবং পুঁজিবাদী চাষের প্রতিযোগিতায়।

ফরাসী কৃষকেরা লুই বোনাপার্টকে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেছিল বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেছিল শৃঙ্খলা পার্টি। সরকারী প্রিফেক্টের বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব মেয়রদের, সরকার নিযুক্ত ধর্মযাজকের বিপক্ষে তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের, এবং সরকারী সশস্ত্র পুলিশের পাল্টা হিসাবে নিজেদের উপস্থিত করে ফরাসী কৃষকেরা আসলে কী চায় তা বুঝিয়ে দিতে শুরু করেছিল ১৮৪৯ ও ১৮৫০ সালে। ১৮৫০-এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে শৃঙ্খলা পার্টি যত আইনকানুন রচনা করে, সে সব তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তিতেই ছিল কৃষক নিপীড়নের ব্যবস্থা। কৃষকেরা ছিল বোনাপার্টপন্থী কারণ সমস্ত কল্যাণ সহ মহাবিপ্লবের প্রতিমূর্তি তারা দেখত নেপোলিয়নেরই মধ্যে। এই বিভ্রম দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আওতায় যা অতিদ্রুত ভেঙে পড়ছিল (স্বভাবতই সে ধারণা ছিল 'গ্রাম্য মাতব্বরদের' প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন), অতীতের এই যে কুসংস্কার, তা কৃষক শ্রেণীর জীবন্ত স্বার্থ ও জরুরি দাবিগুলির প্রতি কমিউনের আবেদনকে কী করে ঠেকাতে পারত?

বস্তুত 'গ্রাম্য মাতব্বরদের' আসল ভয়টা ছিল এইখানেই, তারা জানত, যদি কমিউন-শাসিত প্যারিস মাত্র মাস তিনেকও প্রদেশগুলির সঙ্গে অবাধ যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে, তাহলে কৃষকদের একটা সর্বাত্মক অভ্যুত্থান ঘটবে; আর সেইজন্যই তারা ব্যগ্র হয়েছিল প্যারিসের চারধারে পুলিশ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যাতে মহামারীর প্রসার রুদ্ধ করা যেতে পারে।

একদিকে কমিউন যেমন এইভাবে ফরাসী সমাজের সমস্ত সুস্থ উপাদানের যথার্থ প্রতিনিধি ছিল, এবং সেই জন্যই ছিল খাঁটি জাতীয় সরকার, অন্যদিকে একই সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সরকার হিসাবে, শ্রম-মুক্তির সাহসিক যোদ্ধা হিসাবে সে ছিল

গভীরভাবেই আন্তর্জাতিক। প্রুশীয় যে সৈন্যবাহিনী ফ্রান্সের দুটি প্রদেশ অধিকার করে জার্মানির অন্তর্ভূত করে, তার চোখের সামনে দাঁড়িয়েই কমিউন সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে নিল ফ্রান্সের পক্ষে।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্য হরেকজাতির দালালবৃত্তির মহোৎসবে পরিণত হয়েছিল; তার মত্ত পানোৎসবে ও ফরাসী জনসাধারণের লুণ্ঠনে অংশ নিতে ডাকামাত্র সকল দেশের হীনচরিত্রেরা দলে দলে এসে জুটল। এই মুহূর্তে পর্যন্ত তিয়েরের দক্ষিণ হস্ত হল ভালাচিয়ার জঘন্য গানেস্কো, বাম হস্ত হল রুশ গুপ্তচর মারকোভস্কি। এক অমর আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণের সম্মান কমিউন দিয়েছিল সকল বিদেশীকে। নিজেদের দেশদ্রোহিতার জন্য বৈদেশিক যুদ্ধে পরাজয়বরণ এবং বৈদেশিক আক্রমণকারীদেরই সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে গৃহযুদ্ধের আবাহন, এই দুই-এর মধ্যেও বুর্জোয়া শ্রেণী ফ্রান্সে জার্মানদের বিরুদ্ধে পুলিশী হামলা সংগঠিত করে দেশপ্রেম জাহির করার সময় করে নেয়। কমিউন একজন জার্মান শ্রমিককে করল তার শ্রমমন্ত্রী। তিয়ের, বুর্জোয়া শ্রেণী, দ্বিতীয় সাম্রাজ্য উচ্চকণ্ঠে সহানুভূতির কথা ঘোষণা করে পোল্যাণ্ডকে ক্রমাগত বিভ্রান্ত করেছিল, অথচ আসলে পোল্যাণ্ডকে বিশ্বাসঘাতকের মতন রাশিয়ারই হাতে সঁপে দিয়ে রাশিয়ার নোংরা মতলব হাসিল করেছিল। এদিকে কমিউন পোল্যাণ্ডের বীরসন্তানদের প্রতি সম্মান দেখাল তাদের প্যারিসের প্রতিরক্ষাকারীদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করে। আর ইতিহাসের যে নূতন যুগের সূত্রপাত কমিউন করছিল সচেতন হয়ে, তাকে ব্যাপকভাবে উদযাপন করল সে একদিকে বিজয়ী প্রুশীয় সৈন্য ও অপরদিকে বোনাপার্টীয় জেনারেলদের নেতৃত্বাধীন বোনাপার্টী সেনাবাহিনীর চোখের সামনেই সামরিক গৌরবের বিশালকায় প্রতীক সেই ভাঁদোম স্তম্ভকে* ধূলিসাৎ করে।

কমিউনের কাজ আর সক্রিয় অস্তিত্বটাই হল তার শ্রেষ্ঠ সামাজিক কীর্তি। তার বিশেষ ব্যবস্থাগুলির মধ্যে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ছিল কেবল জনগণ কর্তৃক জনগণকে শাসনের প্রবণতা। এর দৃষ্টান্ত হল: রুটি কারিগরদের রাত্রে কাজের অবসান; নানা অজুহাতে শ্রমিকদের ঘাড়ে জরিমানা চাপিয়ে শ্রমিকদের মাহিনা কমিয়ে দেওয়ার মালিকী রেওয়াজকে দণ্ডনীয় বলে নিষিদ্ধকরণ, — শেষোক্ত রীতিতে মালিকেরা হয়ে ওঠে যুগপৎ আইন রচয়িতা, বিচারকর্তা ও শাস্তিদাতা, তদুপরি পকেটস্থ করে টাকাটাও। এই ধরনের অন্য একটা ব্যবস্থা হল বন্ধ করে দেওয়া সকল কারখানা ও ফ্যাক্টরি ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে শ্রমজীবী সমিতির হাতে সমর্পণ, তা সংশ্লিষ্ট পুঁজিপতিরা পলাতকই হোক বা কারখানা তালাবন্ধ করে থাকুক।

* ভাঁদোম স্তম্ভ — নেপোলিয়নী ফ্রান্সের বিজয়ের স্মৃতিতে স্থাপিত হয় ১৮০৬—১৮১০ সালে, প্যারিসের ভাঁদোম ময়দানে। ১৮৭১ সালের ১৬ই মে প্যারিস কমিউনের নির্দেশে ভাঁদোম স্তম্ভ অপসারিত হয়। — সম্পাঃ

সুবিবেচনা ও অনুগ্রতার দিক দিয়ে যা অতি উল্লেখযোগ্য কমিউনের সেই সব আর্থিক ব্যবস্থাবলীর পক্ষে কেবল তাই হওয়া সম্ভব যা একটা অবরুদ্ধ নগরীর পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায়। অসমাঁ-র* আশ্রয়ে বড় বড় ব্যবসায়ী কোম্পানি ও কণ্ট্রাক্টরেরা প্যারিসে যে বিপুল লুণ্ঠন চালিয়েছিল তাতে কমিউনের পক্ষে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার লুই নেপোলিয়ন কর্তৃক অরলিয়োঁ বংশের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার চাইতে অনেক বেশি ছিল। হয়েনৎসলার্ন-বংশীয়েরা এবং ইংরেজ অভিজাতেরা উভয়েই গির্জা ও মঠ লুট করে নিজেদের সম্পত্তির অনেকটা জুটিয়েছিল; কমিউন লোকায়তকরণের মাধ্যমে মাত্র ৮,০০০ ফ্রাঁ উপায় করেছিল জেনে তারা অত্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যায়।

একটু সাহস ও শক্তি ফিরে পেয়েই যখন ভার্সাই সরকার কমিউনের বিরুদ্ধে হিংস্রতম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করল: সারা ফ্রান্স জুড়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশকে তারা যখন স্তব্ধ করে দিল, এমন কি নিষিদ্ধ করল বড় বড় শহরের প্রতিনিধিদের বৈঠক পর্যন্ত; ভার্সাই এবং ফ্রান্সের আর বাকি অংশে যখন তারা চাপিয়ে দিল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি কঠোর গুপ্তচর ব্যবস্থা; প্যারিসে মুদ্রিত সমস্ত পত্রপত্রিকা যখন তাদের পুলিশী হামলাদাররা পুড়িয়ে দিতে লাগল, এবং প্যারিসে প্রেরিত ও প্যারিস থেকে আগত সমস্ত চিঠিপত্র গোপনে দেখে নেওয়ার ব্যবস্থা হল; জাতীয় সভায় প্যারিসের স্বপক্ষে একটি কথা বলার সামান্যতম চেষ্টা হলেও যখন তাকে এমন হল্লা করে ডুবিয়ে দেওয়া হতে লাগল যেটা ১৮১৬ সালের 'অভাবনীয় পরিষদেরও' কল্পনাতীত ছিল; যখন ভার্সাই বাইরে চালিয়েছিল বর্বর যুদ্ধ বিগ্রহ, আর প্যারিসের অভ্যন্তরে দুর্নীতি বিস্তার ও ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা — তখন অনাবিল শান্তির সময়েই যা শোভা পায় তেমন একটা উদারতার ঠাট ও শালীনতা বজায় রাখার ভান করলে কমিউন তার উপর অর্পিত আস্থা নির্লজ্জভাবেই ভঙ্গ করত না কি? কমিউনের সরকার যদি তিয়েরের সরকারেরই অনুরূপ হত, তাহলে ভার্সাইতে কমিউনের পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করার যা উপলক্ষ ঘটেছে, প্যারিসে শৃংখলা পার্টির পত্রপত্রিকা দমন করার উপলক্ষ তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন হত না।

ধর্মের ছত্রছায়ায় প্রত্যাবর্তনই ফ্রান্সের মুক্তির অনন্য পন্থা বলে 'গ্রাম্য মাতব্বরেরা' যখন ঘোষণা করছিল, ঠিক তখনই বিধর্মী কমিউন পিক্‌পুস সন্ন্যাসিনীদের এবং সাঁ লরাঁ গির্জার অদ্ভুত রহস্য ফাঁস করে দেওয়ায় তারা বিরক্ত হল বৈকি। যখন যুদ্ধে

* দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে ব্যারন অসমাঁ ছিলেন সেন জেলার অর্থাৎ প্যারিস শহরের প্রিফেক্ট। শ্রমিকদের অভ্যুত্থান ধ্বংস করা সহজসাধ্য করে তোলার জন্য তিনি নগরবিন্যাসে অনেকগুলি পরিবর্তন সাধন করেন। (লেনিন সম্পাদিত রুশ অনুবাদের টীকা।) — সম্পাঃ

পরাজয়বরণ ও আত্মসমর্পণের চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান, এবং ভিল্‌হেল্‌ম্‌স্‌হোয়েতে* বসে সিগারেট পাকানোর নৈপুণ্যের জন্য বোনাপার্টীয় জেনারেলদের উপর তিয়েরের গ্র্যান্ড ক্রস উপাধি বর্ষণ করছিলেন, তখন তাঁকে যেন বিদ্রূপ করার জন্যই কমিউন কর্তব্য পালনে ত্রুটির সন্দেহ হওয়া মাত্রই নিজ জেনারেলদের পদচ্যুত ও গ্রেপ্তার করছিল। নাম ভাঁড়িয়ে ঢুকে-পড়া কমিউনের জনৈক সদস্য সামান্য দেউলিয়াপনার দায়ে, লিয়োঁ-তে ছয় দিনের মেয়াদে দণ্ডিত হয়েছিল বলে কমিউন যখন তাকে বহিষ্কৃত ও গ্রেপ্তার করল, তখন সেটা কি জালিয়াৎ জুল ফাভ্‌রের উদ্দেশে ইচ্ছাকৃত অপমান ছুঁড়ে মারার সামিল ছিল না, যে ফাভ্‌র তখনও ছিলেন ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব, তখনও বিসমার্কের কাছে ফ্রান্সকে বিক্রয় করে চলেছেন, তখনও আদেশ জারি করছিলেন বেলজিয়মের রত্নসদৃশ ঐ সরকারের প্রতি? কিন্তু অভ্রান্ততার দাবি কমিউন বস্তুত কখনও করেনি, পুরাতন-মার্কা সকল সরকারের যেটা ছিল অপরিহার্য ধর্ম। কমিউন কৃতকার্যের বিবরণ ও বক্তব্যাদি প্রকাশ করত, নিজেদের সমস্ত ত্রুটির কথা জানাত জনসাধারণকে।

প্রতিটি বিপ্লবেই তার যথার্থ উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ভিন্ন ধরনের লোকও ঢুকে পড়ে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতীত বিপ্লবের দিনের লোক, তার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান, কিন্তু বর্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টিহীন, অথচ সুবিদিত সততা ও সাহসিকতার জন্য অথবা নিছক ঐতিহ্যের সুবাদেই এরা জনচিত্তে প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে; আবার অন্যরাও থাকে, যারা শুধু বাক্যবাগীশ, যারা বছরের পর বছর তদানীন্তন সরকারের বিরুদ্ধে একই ছকে বাঁধা অভিযোগ পুনরাবৃত্তি করে একেবারে পয়লাদরের বিপ্লবী হিসাবে নাম কিনেছে। ১৮ই মার্চের পর এ ধরনের কিছু লোকেরও আবির্ভাব ঘটেছিল; কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অভিনয়েরও তারা সুযোগ করে নিয়েছিল। এই জাতীয় লোকেরা পূর্বতন প্রতিটি বিপ্লবের পূর্ণবিকাশকেই যে ভাবে ব্যাহত করে এসেছে ঠিক সেই ভাবেই এরা যতটা পেরেছে শ্রমিক শ্রেণীর যথার্থ কার্যকলাপে বাধা সৃষ্টি করে। অপরিহার্য দুষ্টগ্রহের দল এরা; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের ঝেড়ে ফেলা হয়, কিন্তু কমিউন সে সময়টুকু পায়নি।

প্যারিসের বুকে কমিউন যে পরিবর্তন আনল তা সত্যিই বিস্ময়াবহ! দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সময়কার বারবিলাসিনী প্যারিসের কোনও চিহ্নই রইল না। প্যারিস আর রইল না বৃটিশ জমিদারদের, আয়র্ল্যান্ডের অ্যাবসেন্টিদের,** আমেরিকার প্রাক্তন দাসপ্রভু

---

* ভিল্‌হেল্‌ম্‌স্‌হোয়ে — (কাস্‌সেলের সন্নিকট) প্রুশীয় রাজার কেল্লা, ভূতপূর্ব সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এখানে প্রুশীয়দের হাতে বন্দী ছিলেন ১৮৭০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৭১ সালের ১০ই মার্চ পর্যন্ত। — সম্পাঃ

** ভূস্বামীরা যারা তাদের জমিদারীতে পদার্পণ করে না বললেই চলে। — সম্পাঃ

আর ভুঁইফোড় (shoddy) লোকদের, পূর্বতন বংশ ভূমিদাস মালিকদের, অথবা ভালাচিয়ার অভিজাতদের বিনোদনক্ষেত্র। লাশকাটা ঘরে মৃতদেহ নেই, রাত্রে ডাকাতির হিড়িক নেই, প্রায় নেই চুরি; বস্তুত ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম প্যারিসের রাস্তাঘাট হল নিরাপদ, তাও যে কোনও ধরনের পুলিশ পাহারা ব্যতীতই। কমিউনের একজন সদস্যের বক্তব্য হল: 'আমরা আর খুন, চুরি ও মারধরের কোনও অভিযোগ শুনতে পাই না; মনে হচ্ছে যেন পুলিশবাহিনী ভার্সাই চলে যাওয়ার সময় তাদের রক্ষণশীল সকল বন্ধুদেরই সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।' স্বীয় রক্ষকদের — পরিবার, ধর্ম এবং সর্বোপরি সম্পত্তিপরায়ণ পলাতকদের ফের সন্ধান পেয়ে গেছে বারবিলাসিনীরা। তাদের বদলে ফের ওপরে দেখা গেল প্যারিসের আসল নারীদের, সেই প্রাচীন অতীতের নারীদের মতনই যারা বীরাঙ্গনা মহিমময়ী, নিষ্ঠাপরায়ণা। একটা নূতন সমাজের জন্মায়োজনে দুয়ারে উপস্থিত নরঘাতকদের কথা প্রায় ভুলে গিয়েই কর্ম, ভাবনা, সংগ্রাম ও রক্তদান করে চলল প্যারিস, আপন ঐতিহাসিক উদ্যোগের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে!

প্যারিসের এই নতুন জগতের বিরুদ্ধে ভার্সাই-র সেই প্রাচীন পৃথিবীটার দিকে একবার চেয়ে দেখুন, যেখানে সমাবেত অচল আমলের যত ক্ষুধিত প্রেতের দল, লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সী যারা, জাতির মৃতদেহকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে উদরপূরণের জন্য ব্যগ্র, তাদের সঙ্গে মান্ধাতাযুগের প্রজাতন্ত্রীদের এক লেজুড় জাতীয় সভায় হাজির থেকে যারা দাসমালিকদের বিদ্রোহকেই সমর্থন যোগাচ্ছিল, তাদের পার্লামেণ্টারী প্রজাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য যারা নির্ভর করছিল শীর্ষে অবস্থিত স্থবির ক্যানভাসারটির দম্ভের উপর, ১৭৮৯ সালকে যারা ব্যঙ্গ করছিল Jeu de Paume-তে* তাদের প্রেত বৈঠকের আয়োজন করে। এই সেই সভা, ফ্রান্সে যা কিছু মৃত তা সবের প্রতিভূ, লুই বোনাপার্টের জেনারেলদের তলোয়ারই কেবল যাকে তুলে ধরে প্রাণের আভাসটুকু জোগাচ্ছিল। প্যারিস পরিপূর্ণ সত্য, আর ভার্সাই পুরোপুরি মিথ্যা — সেই মিথ্যা ভাষা পাচ্ছে তিয়েরের মুখে।

সেন ও উআস জেলার পৌরপ্রধানদের এক প্রতিনিধিদলের কাছে তিয়ের বলেন, 'আপনারা আমার কথার উপর আস্থা রাখতে পারেন, আমি **কখনও** কথার খেলাপ করিনি।' খাস সভাকে তিনি বলছেন, 'এই হল ফ্রান্সের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্বাধীনভাবে নির্বাচিত, সবচাইতে বেশি উদারনৈতিক সভা'; তাঁর পাঁচমিশেলী সৈন্যদের তিনি বলেন এরা নাকি 'বিশ্বের বিস্ময় এবং ফ্রান্সের ইতিহাসে সবচেয়ে সেরা সৈন্যবাহিনী';

* Jeu de Paume — ১৭৮৯ সালের জাতীয় সভা যে টেনিস কোর্টে সমবেত হয়ে তার বিখ্যাত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেছিল। (১৮৭১-এর জার্মান সংস্করণের টীকা।)

প্রদেশগুলিকে তিনি বলেন প্যারিসের উপর তাঁর গোলাবর্ষণ নাকি উপকথা মাত্র; 'দু-একটি কামানের গোলা যদি ছোঁড়া হয়েও থাকে, তবে তা ভার্সাই সৈন্যদের কাজ নয়, গোলা ছুড়েছে বিদ্রোহীদেরই কেউ কেউ এই ভান করে যেন তারা যথার্থই লড়াই করছে, যদিও সামনে দেখা দেবার হিম্মৎটুকু তাদের নেই।' প্রদেশগুলিকে তিনি আবার বলেন, 'ভার্সাই-র গোলন্দাজবাহিনী প্যারিসে গোলাবর্ষণ করছে না, কামান চালাচ্ছে মাত্র।' প্যারিসের প্রধান বিশপকে তিনি বলেন যে, ভার্সাই-বাহিনীর উপর চাপানো তথাকথিত হত্যাকান্ড ও উৎপীড়নের কথা(!) একদম আষাঢ়ে গল্প। প্যারিসকে তিনি বলেন, 'যে জঘন্য অত্যাচারীরা প্যারিসকে নিপীড়ন করছে তাদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্যই' তিনি ব্যাকুল, আর বস্তুত কমিউনের প্যারিস 'মুষ্টিমেয় অপরাধীর একটি দঙ্গল ছাড়া আর কিছু নয়।'

শ্রীযুক্ত তিয়েরের প্যারিস 'জঘন্য জনতার' বাস্তব প্যারিস নয় — প্রেত প্যারিস; পলাতকদের (francs-fileurs) প্যারিস; বুলভারের নরনারীর প্যারিস, — বিত্তবান, পুঁজিপতি, স্বর্ণমণ্ডিত, অলস যে প্যারিস তার অনুচরবর্গ, দালাল উড়নচন্ডী সাহিত্যিক, ও বারবিলাসিনীদের নিয়ে এখন ভিড় জমিয়েছে ভার্সাই-এ, সাঁ দেনি-তে, রুয়েই-তে আর সাঁ জের্মাঁ-তে, গৃহযুদ্ধ যাদের কাছে সময় কাটাবার মজাদার ব্যাপার মাত্র; লড়াই তারা দেখছে দূরবীন দিয়ে; কামানের গোলা গুণছে; আর নিজেদের এবং নিজ বেশ্যাদের নামে হলপ করে বলছে যে পোর্ত সাঁ মার্তাঁ-তে যেমনটি হত তার থেকে খেলাটা অনেক ভাল জমেছে। যাদের প্রাণ গেল তারা যে সত্যই মরল; আহতদের আর্তনাদটা একেবারেই খাঁটি আর্তনাদ। তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটাই ভারি প্রখর রকমের ঐতিহাসিক।

শ্রীযুক্ত তিয়েরের প্যারিস হল এই, যেমন কবলেন্‌ৎসের* দেশত্যাগীদের ভিড়টাই ছিল শ্রীযুক্ত কালোনের ফ্রান্স।

৪

প্রুশীয় সৈন্যদের দিয়ে প্যারিস দখলের মাধ্যমে প্যারিসকে দমন করার জন্য দাসপ্রভুদের ষড়যন্ত্রের প্রথম প্রচেষ্টা বিসমার্ক গররাজি হওয়ায় ব্যর্থ হয়ে গেল। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা. ১৮ই মার্চের প্রচেষ্টার শেষ হল সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় ও সরকারের ভার্সাইতে পলায়নের মধ্য দিয়ে; সরকার আদেশ দিল গোটা শাসন-যন্ত্রকে পাততাড়ি গুটিয়ে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে। প্যারিসের সঙ্গে শান্তি আলোচনার ভান করে

* ১৮ শতকের শেষে প্রথম ফরাসী বিপ্লবে অভিজাত প্রতিবিপ্লবী দেশত্যাগীদের কেন্দ্র ছিল জার্মানির কবলেন্‌ৎস শহর। — সম্পাঃ

তিয়ের প্যারিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য সময় জোটালেন। কিন্তু সৈন্যবাহিনী পাওয়া যাবে কী করে? লাইন বাহিনীগুলির ভগ্নাবশেষ ছিল সংখ্যায় অল্প, তাদের প্রকৃতিও নির্ভরযোগ্য নয়। প্রদেশসমূহের কাছে তাদের জাতীয় রক্ষিবাহিনী ও স্বেচ্ছাসৈনিক দিয়ে ভার্সাইকে সাহায্য করার জন্য তাঁর জরুরি আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য হল। একমাত্র ব্রিট্যানি পাঠাল মুষ্টিমেয় কিছু শুয়ান সৈন্য*, এরা একটা শ্বেত পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে লড়ত, প্রত্যেকের বুকে আঁটা থাকত সাদা কাপড়ে যিশুর হৃদয়, ধ্বনি দিত: 'রাজা দীর্ঘজীবী হউন!' তিয়ের তাই বাধ্য হলেন সাত তাড়াতাড়ি নাবিক, নৌসেনা, পোপের জুআব** দল, ভালাঁতে-র সশস্ত্র পুলিশ, পিয়েত্রি পুলিশ এবং গুপ্তচর ইত্যাদিদের নিয়ে একটা পাঁচমিশালী দলবল জড় করতে। যুদ্ধে বন্দী সাম্রাজ্যের সৈনিক কিস্তিতে কিস্তিতে ছাড়া পেয়ে না এলে এই সৈন্যবাহিনী হাস্যকরভাবে অকেজো হয়ে থাকত — বিসমার্ক তাদের ছাড়তে লাগলেন ঠিক এমন সংখ্যায় যাতে গৃহযুদ্ধ চালু রাখা চলে, আর ভার্সাই সরকার হয়ে পড়ে প্রাশিয়ার উপর চরম নির্ভরশীল। এমন কি যুদ্ধ চলবার সময়েও ভার্সাই পুলিশকে নজর রাখতে হয়েছিল ভার্সাই সেনাবাহিনীর উপর; এবং তাদের লড়াই-এ টেনে নিয়ে যেতে হলে সশস্ত্র পুলিশবাহিনীকেই এগুতে হত সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গাসমূহে। যে দুর্গগুলির পতন ঘটেছিল, সেগুলি অধিকৃত হয়নি, ক্রীত হয়েছিল। ফেডারেল সৈন্যদের বীরত্ব দেখে তিয়ের ভালভাবেই বুঝলেন যে প্যারিসের প্রতিরোধ ভেঙে ফেলা তাঁর নিজস্ব রণনৈতিক প্রতিভা ও আয়ত্তাধীন অস্ত্রের জোরে সম্ভব হবে না।

ইতিমধ্যে প্রদেশসমূহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উত্তরোত্তর জটিল হয়ে উঠতে লাগল। তিয়ের এবং তাঁর 'গ্রাম্য মাতব্বরদের' আনন্দবর্ধনের জন্য একটি সমর্থনসূচক পত্রও এল না। বরঞ্চ ঠিক বিপরীত। মোটেই শ্রদ্ধাসূচক বলা চলে না এমন ভাষায় দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করে, কমিউনের ঘোষিত স্বাধীনতাগুলো মেনে নিয়ে, বৈধ মেয়াদ পার হয়ে যাওয়া জাতীয় সভাকে ভেঙে দিয়ে প্যারিসেরই সঙ্গে আপোষরফার দাবি জানিয়ে প্রতিনিধিদল ও পত্রাদি সমস্ত দিক থেকে এমন হারে আসতে লাগল যে তিয়েরের বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী দ্যুফোর সরকারী অভিশংসকদের কাছে লিখিত তাঁর

* শুয়ান সৈন্য — ১৮ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সে প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের অংশগ্রহণকারীদের তুলনা টেনে কমিউনাররা প্যারিস কমিউনের সময় ভার্সাই সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ব্রিট্যানিতে সংগৃহীত রাজতন্ত্রী বাহিনীর এই নামকরণ করে। — সম্পাঃ

** জুআব — ফরাসী হাল্কা পদাতিক বাহিনী (একটি আলজেরীয় উপজাতির নাম অনুসারে তাদের নামকরণ হয় জুআব)। স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে জুআবদের আদি ইউনিট গঠিত হয় ১৯শ শতকের প্রথম তৃতীয়াংশে, আলজেরিয়ার উপনিবেশিক বাহিনী হিসাবে, পরে তা ফরাসী সৈন্য নিয়ে তৈরি হয়, কিন্তু তখনও তাদের সাবেকী প্রাচ্য উর্দি বজায় থাকে। — সম্পাঃ

২৩শে এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশ দিলেন যে 'আপোষের আওয়াজকে' একটা অপরাধ বলেই গণ্য করতে হবে! তাঁর অভিযানের নিরাশ পরিণতির কথা চিন্তা করে তিয়ের তাঁর কৌশল পরিবর্তন করা স্থির করলেন; জাতীয় সভায় নিজের খুসিমত যে নূতন মিউনিসিপাল আইন তিনি চাপিয়ে দিয়েছিলেন তারই ভিত্তিতে ৩০শে এপ্রিল দেশময় মিউনিসিপাল নির্বাচনের আদেশ দিলেন। কতকটা জেলা প্রিফেক্টদের কারসাজি আর কতকটা পুলিশের ভয়প্রদর্শনের জোরে তিনি আশ্বস্ত বোধ করলেন যে প্রদেশের রায় জুটিয়ে জাতীয় সভাকে তিনি এনে দিতে পারবেন সেই নৈতিক শক্তি যা তার কখনো ছিল না, এবং শেষ পর্যন্ত প্রদেশসমূহ থেকেই জোগাড় করতে পারবেন সেই কায়িক বল, প্যারিস বিজয়ের পক্ষে যা ছিল আবশ্যক।

প্যারিসের বিরুদ্ধে তাঁর দস্যুবৃত্তিসুলভ যে যুদ্ধটাকে তাঁর নিজস্ব ঘোষণাগুলিতে গৌরবময় রূপদান করা হয়েছিল এবং তাঁর মন্ত্রীরা সারা ফ্রান্স জুড়ে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে যে চেষ্টা করছিল, সেটা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিয়ের একেবারে শুরু থেকে কিছুটা আপোষরফার খেলার সঙ্গে চালিয়ে যেতে ব্যগ্র ছিলেন। উদ্দেশ্যটা ছিল প্রদেশগুলিকে প্রতারণা করা, প্যারিসস্থ মধ্য শ্রেণীর লোকদের ফুসলানি দেওয়া এবং সর্বোপরি জাতীয় সভায় প্রজাতন্ত্রী আখ্যাধারীদের একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া যাতে তারা তিয়েরের উপর আস্থা ঘোষণার আড়ালে প্যারিসের বিরুদ্ধে তাদের বিশ্বাসঘাতকতাকে চাপা দিতে পারে। নিজেদের সৈন্যদল বলতে কিছুই যখন ছিল না, তখন ২১শে মার্চ সভায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'যাই ঘটুক না কেন, প্যারিসের বিরুদ্ধে কোনো সৈন্যদল আমি পাঠাব না।' ২৭শে মার্চ আবার তিনি বলতে উঠলেন, 'প্রজাতন্ত্রকে আমি একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে দেখতে পাচ্ছি, এবং তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' আসলে লিয়োঁ ও মার্সেই-তে* বিপ্লবকে তিনি প্রজাতন্ত্রের নামেই দমন করেছিলেন, ঠিক যখন ভার্সাইতে তাঁর 'গ্রাম্য মাতব্বরেরা' সে নামের উল্লেখটুকু পর্যন্ত চিৎকার করে ডুবিয়ে দিচ্ছিল। এই কীর্তির পর তিনি 'প্রতিষ্ঠিত সত্যকে' একটি প্রকল্প সত্যে নামিয়ে নিয়ে এলেন। যে অর্লিয়ান্সী রাজপুত্রদের তিনি সাবধানে বোর্দো থেকে সরে যাবার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, তারাই এখন খোলাখুলি আইন ভেঙে দ্রু-এ ষড়যন্ত্র পাকাবার অনুমতি পেল। প্যারিস ও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর অনবরত সাক্ষাৎকারের সময় যে সমস্ত সর্তের কথা তিয়ের তুলে ধরতেন, তার সুর ও রং সময় ও পরিস্থিতি অনুসারে বদলালেও — প্রকৃতপক্ষে তা কোনসময়েই 'লেকোঁৎ ও ক্লেমাঁ তমার হত্যার সঙ্গে বিজড়িত মুষ্টিমেয়

---

* ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চের কয়েকদিন পরে কমিউন ঘোষণার লক্ষ্য নিয়ে বিপ্লব অভ্যুত্থান ঘটে লিয়োঁ ও মার্সেই-তে। তিয়ের সরকার এ আন্দোলনকে দমন করেন। — সম্পাঃ

অপরাধীদের' মধ্যেই প্রতিশোধ গ্রহণকে সীমাবদ্ধ রাখার সম্ভাব্যতার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না, যদিও এটা ধরে নেওয়া হত যে প্যারিস ও ফ্রান্স বিনাশর্তে শ্রীযুক্ত তিয়েরকে সম্ভাব্য সব প্রজাতন্ত্রের সেরা হিসাবে মেনে নেবে, ঠিক যেমন ১৮৩০ সালে তিনি নিজে মেনে নেন লুই ফিলিপকে। এই সর্তকেও আবার যে সন্দেহলিপ্ত করে তোলায় তিনি রত ছিলেন সভায় তাঁর মন্ত্রীদের এ সম্বন্ধে টীকা ভাষ্য করতে দিয়ে, শুধু তাই নয়। কাজের বেলায় তাঁর ছিল দ্যুফোর। এই পুরাতন অর্লিয়ান্সী আইনবিদ দ্যুফোর চিরদিনই ছিলেন জরুরি ব্যবস্থার বিচার-কর্তা -- এখন ১৮৭১ সালে যেমন তিয়েরের অধীনে ঠিক তেমনই ১৮৩৯ সালে লুই ফিলিপের আমলে, ও ১৮৪৯ সালে লুই বোনাপার্টের রাষ্ট্রপতিত্বের সময়। মন্ত্রিত্ব না থাকার সময়টাতে তিনি প্যারিসের ধনকুবেরদের মামলা চালিয়ে বিস্তর টাকা করেন, এবং নিজের উদ্ভাবিত আইনের বিরুদ্ধেই সওয়াল করে রাজনৈতিক পুঁজিও সঞ্চয় করেন। তিনি এখন জাতীয় সভায় তাড়াহুড়ো করে পাশ করিয়ে নিলেন একগোছা নিপীড়ক আইন, যে আইন প্যারিসের পতনের পর ফ্রান্স থেকে প্রজাতন্ত্রী স্বাধীনতার শেষ বিন্দু পর্যন্ত মুছে ফেলবে। শুধু তাই নয়; তাঁর বিবেচনায় যে সামরিক বিচার পদ্ধতি ছিল বড়ই মন্থরগতি তাকে সংক্ষিপ্ত করে, এবং নির্বাসনের নতুন এক নির্মম আইন বিধিবদ্ধ করে তিনি যেন আভাস দিলেন প্যারিসের আসন্ন ভবিতব্যের। ১৮৪৮-এর বিপ্লব রাজনৈতিক অপরাধে মৃত্যুদণ্ড রহিত করে তার বদলে নির্বাসনের বিধান করেছিল। লুই বোনাপার্ট অন্তত তত্ত্বগতভাবে গিলোটিনের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ভরসা পাননি। প্যারিসীয়রা বিদ্রোহীমাত্র নয়, তারা হত্যাকারী, আভাসে ইঙ্গিতেও একথা বলার মতো হিম্মৎ তখনো না থাকাতে 'গ্রাম্য মাতব্বরদের' পরিষদ প্যারিসের বিরুদ্ধে তাদের ভবিষ্যৎ প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনাটাকে দ্যুফোরের নূতন নির্বাসন বিধিতে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে স্বয়ং তিয়ের তাঁর আপোষরফার প্রহসনটি চালিয়ে যেতেন না, যদি না তিনি যা চেয়েছিলেন সেই ভাবে 'গ্রাম্য মাতব্বরেরা' এর জন্যে ক্রুদ্ধ চিৎকার না তুলত, তাদের রোমন্থন-প্রিয় মন না বুঝেছিল এই খেলার মর্ম, না বুঝেছিল এর ভণ্ডামি, মিথ্যাভাষণ ও দীর্ঘসূত্রতার প্রয়োজনীয়তা।

৩০শে এপ্রিলের আসন্ন মিউনিসিপাল নির্বাচনের প্রাক্কালে তিয়ের ২৭শে এপ্রিল আপোষরফার অন্যতম এক বিরাট দৃশ্যের অবতারণা করেন। ভাবাবেগের বক্তৃতাবন্যার উচ্ছ্বাসে সভার মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করলেন, 'প্যারিসে আয়োজিত ষড়যন্ত্র ছাড়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্য কোনও চক্রান্তের অস্তিত্বই নেই, এরই জন্য ফরাসী রক্তক্ষয় করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। বার বার একথা বলছি আমি। অস্ত্রধারীদের হাত থেকে ঐ সব পাপঅস্ত্র খসে পড়লেই মাত্র গুটিকয়েক অপরাধী ছাড়া আর সবার জন্যই শাস্তির ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ শান্তির অবসান এনে দেবে।' 'গ্রাম্য মাতব্বরেরা' তীব্র বাধা দেওয়াতে তিনি

বলে উঠলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি অনুনয় করছি, বলুন তো আমি কি ভুল বলেছি? অপরাধীরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এই সত্য জ্ঞাপন করেছি বলে কি আপনারা বাস্তবিক দুঃখিত? ক্লেমাঁ তমা ও জেনারেল লেকোঁতের রক্তপাত যারা করতে পেরেছে তারা অত্যল্প ব্যতিক্রম মাত্র — একথাটা কি আমাদের বহু দুর্ভাগ্যের মধ্যেও সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়?'

তিয়ের যেটা পার্লামেণ্টে মায়াবিনীদের মনোহরণ গান ভেবে নিজেকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তার ডাকে কিন্তু ফ্রান্স বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করল না। তখনও ফ্রান্সের বাকি ৩৫,০০০ কমিউন যে ৭,০০,০০০ মিউনিসিপাল সদস্য নির্বাচন করল, তার মধ্যে লেজিটিমিস্ট, অর্লিয়ান্সী ও বোনাপার্টপন্থীরা একজোট হয়েও ৮,০০০ আসনও দখল করতে পারল না। পরে যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার ফল হল আরও নিশ্চিতভাবেই প্রতিকূল। তাই প্রদেশসমূহের কাছ থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় কায়িক বল পাওয়ার পরিবর্তে, জাতীয় সভা সর্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত সমগ্র দেশের মুখপাত্র বলে নিজেকে জাহির করার সর্বশেষ নৈতিক বলটুকুও হারাল। পরাজয় যেন পূর্ণ করে তোলার জন্যই ফ্রান্সের সমস্ত শহরের নবনির্বাচিত মিউনিসিপাল কাউন্সিলগুলি প্রকাশ্যেই জবরদখলকারী ভার্সাই সভাকে শাসাতে লাগল যে তারা বোর্দোতে পাল্টা আরেকটি সভা গড়ে তুলবে।

অবশেষে বিসমার্কের চূড়ান্ত কার্যক্রম গ্রহণের বহুপ্রত্যাশিত মুহূর্তটি এসে পড়ল। তিনি কড়া স্বরে তিয়েরকে আদেশ দিলেন শান্তির সুনির্দিষ্ট নিষ্পত্তির জন্য ফ্রাঙ্কফুর্তে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি পাঠাতে। প্রভুর নির্দেশ বিনীতভাবে শিরোধার্য করে তিয়ের তাঁর পরমবিশ্বস্ত জুল ফাভ্রকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দিলেন, সঙ্গে পাঠালেন পুয়ে-কের্তিয়েকে। রুয়েঁ-র সুতাকলের 'বিশিষ্ট' মালিক এই পুয়ে-কের্তিয়ে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের একজন উৎসাহী এবং বলতে গেলে দাসোচিত সমর্থক। তাঁর নিজের ব্যবসায়ী স্বার্থের পরিপন্থী ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পাদিত বাণিজ্যচুক্তি ব্যতীত দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অন্য কোনো ত্রুটিই তাঁর নজরে পড়েনি। বোর্দোতে তিয়েরের অর্থমন্ত্রী হিসাবে গদিতে আসীন হতে না হতেই তিনি সেই 'অশুভ' চুক্তিটির তীব্র নিন্দা করলেন, ইঙ্গিত দিলেন যে তাকে শীঘ্রই বাতিল করে দেওয়া হবে; এমন কি আলসাসের বিরুদ্ধে সাবেকী সংরক্ষণ শুল্ক জারির চেষ্টা করার ব্যর্থ (বিসমার্কের মত জিজ্ঞেস না করাতে) দুঃসাহসও তাঁর হয়েছিল, তাঁর মতে এক্ষেত্রে পূর্বতন কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধা নাকি ছিল না। এই যে ভদ্রলোক প্রতিবিপ্লবকে দেখতেন রুয়েঁ-তে মজুরী কমাবার উপায় হিসাবে, ফরাসী প্রদেশগুলির শত্রুহস্তে সমর্পণকে দেখতেন ফ্রান্সে তাঁর পণ্যের দাম বাড়িয়ে তুলবার পন্থারূপে; সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জুল ফাভ্রের সহকারী হিসাবে এমন লোককেই তিয়েরের নির্বাচন অবধারিত ছিল না কি?

এই চমৎকার মানিকজোড় প্রতিনিধিদ্বয় ফ্রাঙ্কফুর্তে পৌঁছানো মাত্র হুমকিদার বিসমার্ক অবিলম্বে তাঁদের দুই-এর মধ্যে একটা বেছে নেবার হুকুম দিলেন — হয় সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নয়ত আমার নিজস্ব শান্তি শর্তগুলি নির্বিচারে গ্রহণ! শর্তগুলির মধ্যে ছিল যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ শোধে কিস্তিগুলির ব্যবধানকাল হ্রাস, এবং ফ্রান্সের পরিস্থিতি বিসমার্কের কাছে সন্তোষজনক বোধ না হওয়া পর্যন্ত প্যারিসীয় দুর্গসমূহের উপর প্রুশীয় দখল অব্যাহত রাখা; অর্থাৎ এইভাবে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাশিয়াই চূড়ান্ত সালিশ রূপে স্বীকৃতি পেল। এর বিনিময়ে তিনি প্যারিসকে ধ্বংস করার জন্য বন্দী বোনাপার্টীয় সৈন্যদলকে মুক্তি দেবার প্রস্তাব করলেন, এবং সম্রাট ভিলহেল্মের সৈন্যদলের প্রত্যক্ষ সাহায্যও দিতে চাইলেন। তাঁর সদুদ্দেশ্যের প্রমাণ হিসাবে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে প্যারিসকে 'ঠাণ্ডা করার' ওপরেই ক্ষতিপূরণের প্রথম কিস্তি নির্ভর করবে। তিয়ের এবং তাঁর দায়িত্বশীল প্রতিনিধিরা এমন একটি টোপ অবশ্যই গিলে ফেললেন সাগ্রহে। ১০ই মে তাঁরা শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করলেন এবং সেটা সভায় অনুমোদিত করিয়ে নিলেন ১৮ই মে।

শান্তিচুক্তি সম্পাদন এবং বোনাপার্টীয় বন্দীদের প্রত্যাবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ে আপোষরফার প্রহসন অভিনয় আবার চালিয়ে যেতে তিয়ের আরো বেশি বাধ্য অনুভব করলেন এইজন্য যে প্যারিসের আসন্ন হত্যাকাণ্ডের প্রস্তুতির প্রতি চোখ বন্ধ রাখার একটা উপলক্ষ তাঁর প্রজাতন্ত্রী ক্রীড়নকদের কাছে নিতান্ত দরকারী হয়ে পড়েছিল। এমন কি ৮ই মে তারিখে পর্যন্ত মধ্য শ্রেণীর আপোষপ্রয়াসী একটি প্রতিনিধিদলের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'যখনই বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণের জন্য মনস্থির করে ফেলবে, তখনই জেনারেল ক্লেমাঁ তমা ও লেকোঁতের হত্যাকারী ছাড়া অন্য সকলের জন্যই প্যারিসের সমস্ত ফটক এক সপ্তাহের জন্য পুরোপুরি খুলে রাখা হবে।'

এর কিছুদিন পরে, এই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে 'গ্রাম্য মাতব্বরদের' তীব্র প্রশ্নবাণের উত্তরে তিনি কোনও ব্যাখ্যা প্রদানে অস্বীকৃতি জানালেন; অবশ্য এই অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত তাদের দিতে তিনি ছাড়লেন না, 'আমি বলতে চাই আপনাদের মধ্যে বড় অধীর লোকেরা আছেন, যাঁরা বড় তাড়াতাড়ি চলতে চাইছেন। তাঁদের আরো আট দিন অপেক্ষা করতে হবে; এই আট দিন পরে আর কোনও বিপদ থাকবে না এবং কর্তব্যটা এঁদের সাহস ও কর্মতৎপরতার উপযোগীই হবে।' ম্যাকম্যাহন যেই তাঁকে জানালেন যে তিনি খুব শীঘ্রই প্যারিসে প্রবেশ করতে পারবেন, তখন তিয়ের সভায় ঘোষণা করলেন যে, 'তিনি প্যারিসে **আইন** হাতে নিয়েই প্রবেশ করবেন এবং যে হতভাগারা সৈন্যদের জীবনহানি ঘটিয়েছে, সরকারী স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করেছে তাদের কাছ থেকে পরিপূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত দাবি করবেন।' তারপর চূড়ান্ত মুহূর্ত নিকটবর্তী হয়ে এলে জাতীয় সভায় তিনি জানালেন, 'আমি হব নির্মম'; প্যারিসকে বললেন যে তার দণ্ডাজ্ঞা গৃহীত হয়ে

গেছে; আর বোনাপার্টীয় দস্যুদের জানতে দিলেন যে তাদের সাধ মিটিয়ে প্যারিসের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেওয়াতে রাষ্ট্রের অনুমতি রয়েছে। অবশেষে যখন ২১শে মে বিশ্বাসঘাতকতার কৃপায় জেনারেল দুয়ে-র কাছে প্যারিসের ফটক খুলে গেল, তখন তিয়েরর ২২শে মে 'গ্রাম্য মাতব্বরদের' কাছে খুলে ধরলেন তাঁর আপোষরফা প্রহসনের 'লক্ষ্য', যা তাঁরা এতদিন গোঁয়ারের মতো বুঝতেই চাননি। 'ক-দিন আগে আমি বলেছিলাম যে আমরা **আমাদের লক্ষ্যের** কাছে আসছি; আজ আপনাদের আমি বলতে এলাম যে **সেই লক্ষ্যে** আমরা উপনীত হয়েছি। অবশেষে শৃঙ্খলা, ন্যায় ও সভ্যতার বিজয় ঘটেছে!'

তাই বটে! যখনই বুর্জোয়া ব্যবস্থার গোলামবান্দার দল প্রভুদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়, অমনি সে ব্যবস্থার সভ্যতা ও ন্যায় ফুটে ওঠে তার বীভৎস আলোকে। এই সভ্যতা ও ন্যায় তখন দেখা দেয় উলঙ্গ বর্বরতা ও বেআইনী প্রতিহিংসা রূপে। অধিকারক ও উৎপাদকদের মধ্যেকার শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতিটি নূতন সংকট এই তথ্যকেই উজ্জ্বলতর রূপে প্রত্যক্ষ করে তোলে। ১৮৪৮-এর জুন মাসে বুর্জোয়াদের অত্যাচারের বীভৎসতা পর্যন্ত ১৮৭১-এর দুরপনেয় জঘন্যতার কাছে ম্লান হয়ে যায়। যে আত্মোৎসর্গী বীরত্বে স্ত্রীপুরুষ শিশু নির্বিশেষে প্যারিসীয় জনসাধারণ ভার্সাই দলের প্যারিসে প্রবেশের পরবর্তী আট দিন লড়াই করেছিল — তাতে তাদের আদর্শের মহনীয়তা প্রতিফলিত হয় সেই পরিমাণে, যে পরিমাণে ভার্সাই সৈন্যদের নারকীয় কাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল যে সভ্যতার তারা ভাড়াটে রক্ষক সেই সভ্যতারই সহজাত প্রকৃতি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর খুন করা লোকেদের স্তূপীকৃত মৃতদেহের কী গতি করা যায়, সেটাই যার কাছে হয়ে উঠেছে বিরাট এক সমস্যা, সে সভ্যতা মহিমাদীপ্তই বটে!

তিয়ের ও তাঁর রক্তপিপাসু কুকুরদের আচরণের তুলনীয় ব্যাপার খুঁজে পেতে হলে আমাদের সুলা এবং দুই ট্রায়ার্মভিরাটের* সময়ের রোমে ফিরে যেতে হয়। একই ধরনের ঠাণ্ডামাথায় পরিচালিত পাইকারী হত্যাকাণ্ড; হত্যাকালে বয়স এবং নরনারী সম্বন্ধে সেই একই ভেদাভেদ-জ্ঞানশূন্যতা; সেই একই কায়দায় বন্দীদের উপর উৎপীড়ন; একই রকমের নির্বাসন, শুধু এক্ষেত্রে সেটা ছিল একটি সমগ্র শ্রেণীর বিরুদ্ধে; কেউ যাতে পালাতে না পারে তাই আত্মগোপনকারী নেতাদের জন্য সেই একই বন্য হানা; রাজনৈতিক

* ট্রায়ার্মভিরাট — প্রথম ও দ্বিতীয় রোমক ট্রায়ার্মভিরাট (খৃঃ পূঃ ৬০—৫৩ এবং ৪৩—৩৬) হল সর্বাধিক প্রতিপত্তিশালী রোমক সেনানায়কদের একনায়কত্ব — সমস্ত রাষ্ট্র ক্ষমতা এরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়, প্রথম ক্ষেত্রে পম্পেই, সিজারিয়া আর ক্রাস দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অকতাভিয়ান, আন্তনি আর লিপিদ। রোম প্রজাতন্ত্রের বিলোপ ও রোমে একেশ্বর রাজতন্ত্রী শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একটি পর্যায় হল ট্রায়ার্মভিরাটের শাসন। বিপক্ষদের দৈহিক উচ্ছেদের পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে ট্রায়ার্মভিরাট। প্রথম ও দ্বিতীয় ট্রায়ার্মভিরাটের পতনের পর রক্তাক্ত অন্তর্যুদ্ধ শুরু হয়। — সম্পাঃ

ও ব্যক্তিগত শত্রুদের একই প্রকারের অবমাননা; লড়াইয়ের সঙ্গে সংশ্রবলেশশূন্য মানুষদের জবাইয়ের প্রতি সেই একই ঔদাসীন্য। কেবল তফাৎ এইটুকু যে, রোমানদের কোনও মিত্রেলিয়েজ ছিল না আইন-বহির্ভূতদের গাদায় গাদায় হত্যা করার জন্য; 'আইন হাতে' ছিল না তাদের; কণ্ঠে ছিল না 'সভ্যতার' ধ্বনি।

এই সমস্ত বিভীষিকার পর তার নিজস্ব সংবাদপত্রেই বর্ণিত সেই বুর্জোয়া সভ্যতার জঘন্যতর অন্য মুখটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখা যাক!

লণ্ডনের এক রক্ষণশীল সংবাদপত্রের প্যারিসস্থ প্রতিনিধি লিখছেন, 'তখনও দূর থেকে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে; পের লাশেজের কবর স্তম্ভের মাঝে মাঝে বিনা চিকিৎসায় আহত হতভাগ্যেরা মরছে; ভূগর্ভের গোলকধাঁধায় ৬,০০০ ভীতিসন্ত্রস্ত নিরাশায় নিমজ্জিত বিদ্রোহী ঘুরে বেড়াচ্ছে; ভাগ্যহীনদের রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দলে দলে মিত্রেলিয়েজের গুলিবিদ্ধ হবার জন্য। তখন দেখতে বীভৎস লাগে কাফে ভর্তি মদ, বিলিয়ার্ড বা ডোমিনো ভক্তদের ভিড়; বীভৎস লাগে বুলভারে স্বৈরিণী নারীদের ঘোরাফেরা, ফ্যাশনদুরস্ত রেস্তোরাঁতে বিশেষ ঘরগুলি থেকে রজনীর শান্তিভঙ্গ করে প্রমোদোৎসবের হট্টগোল।' কমিউন কর্তৃক নিষিদ্ধ ভার্সাই সমর্থক *Journal de Paris* পত্রিকায় শ্রীযুক্ত এদুয়ার এর্ভে লিখছেন, 'যেভাবে প্যারিসের জনগণ (!) গতকাল তাদের সন্তুষ্টির প্রকাশ দেখাল, সেটা চাপল্যের চেয়েও গুরুতর, এবং আমাদের ভয় হচ্ছে দিন দিন এটা আরও অবনতির দিকে যাবে। প্যারিসের চেহারা আজ উৎসবমুখর -- এটা অত্যন্ত বেমানান আর আমরা যদি "অবক্ষয়গ্রস্ত প্যারিসবাসী" বলে আখ্যাত না হই তার জন্য এ জাতীয় ব্যাপারের অবশ্যই অবসান চাই।' তারপর তিনি ট্যাসিটাস থেকে এই অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছেন, 'অথচ সেই বীভৎস সংগ্রামের পরের দিনই, এমন কি লড়াইটা সম্পূর্ণ অবসান হতে না হতেই অধঃপতিত দুর্নীতিগ্রস্ত রোম ফের গা ভাসাল সেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পাকে যা তার দেহকে ধ্বংস ও আত্মাকে কলুষিত করে তুলেছিল -- alibi proelia et vulnera; alibi balnea popinaeque' (এদিকে যুদ্ধবিগ্রহ ও ক্ষতচিহ্ন, ওদিকে স্নানাগার এবং ভোজসভার সমারোহ)। শ্রীযুক্ত এর্ভে শুধু বলতে ভুলে গেছেন যে তিনি যে 'প্যারিসের জনগণের' কথা বলছেন সেটা হল শুধু শ্রীযুক্ত তিয়েরের প্যারিসের লোকজন; যে পলাতকেরা ভার্সাই, সাঁ দেনি, রুয়েই অথবা সাঁ জের্মাঁ থেকে দলে দলে ফিরে আসছিল তাদের, 'অবক্ষয়ের' প্যারিস।

নতুন ও উন্নততর এক সমাজের আত্মোৎসর্গী যোদ্ধাদের উপর রক্তরঞ্জিত সব বিজয়ের মধ্যে, শ্রমের দাসত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই জঘন্য সভ্যতা তার বধ্যদের আর্তনাদ ডুবিয়ে দিল পৃথিবীময় প্রতিধ্বনিত কুৎসার ঢক্কানিনাদে। কমিউনের সেই শ্রমিক শ্রেণীর প্রশান্ত প্যারিসকে 'শৃঙ্খলার' ডালকুত্তারা মুহূর্তে বিশৃঙ্খলার হট্টমন্দিরে পরিণত

করল। এই প্রচণ্ড পরিবর্তনটা কী প্রমাণ করল সকল দেশের বুর্জোয়াদের কাছে? আর কিছু নয়, শুধু এই যে কমিউন সভ্যতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ফেঁদেছিল! প্যারিসের জনগণ উৎসাহভরে কমিউনের জন্য এত যে বিরাট সংখ্যায় প্রাণ দিল, ইতিহাসের জানা কোন সংগ্রামে যার তুলনা নেই, এতে প্রমাণ হল কী? কেন, প্রমাণ হল যে কমিউন জনসাধারণের নিজস্ব সরকার ছিল না, ও শুধু মুষ্টিমেয় কিছু অপরাধীর ক্ষমতা দখল! প্যারিসের নারীরা সানন্দে মৃত্যুবরণ করল ব্যারিকেডে ও বধ্যভূমিতে। তাতে কী প্রমাণ হল? হল এই যে, কমিউনরূপী দৈত্যটি তাদের পরিণত করেছিল মেগেরা ও হেকাটেতে!* দুইমাসব্যাপী অপ্রতিহত ক্ষমতার দিনে কমিউন যে সংযম দেখিয়েছিল তা তার প্রতিরক্ষার বীরত্বেরই সমতুল্য। এতে কী প্রমাণিত হল? শুধু এই যে, সংযম ও মানবতার মুখোসের আড়ালে মাসের পর মাস কমিউন ঢেকে রেখেছিল তার পাশবিক প্রবৃত্তির রক্তলোলুপতা, যা অবারিত হল তার মৃত্যু-যন্ত্রণার মুহূর্তে!

শ্রমিক শ্রেণীর প্যারিস তার বীরোচিত আত্মদহনের যে দাবাগ্নি জেবলেছিল তার অগ্নিশিখা হর্ম্য ও স্মৃতিস্তম্ভগুলিকেও স্পর্শ করল। যখন প্রলেতারিয়েতের রক্তমাংসের দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হচ্ছে, তখন তাদের শাসকেরা নিশ্চয় আর আশা করতে পারে না যে তারা বিজয় উল্লাসে ফিরে আসবে তাদের অক্ষত স্থাপত্যের নীড়ে। ভার্সাই-এর সরকার চিৎকার করে বলছে, 'এ যে অগ্নিসংযোজন!' আর কানে কানে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত তার সমস্ত দালালদের সংকেত পাঠাচ্ছে যে পেশাদার গৃহদাহকারী সন্দেহে সর্বত্র তার সকল শত্রুদের শিকার করতে হবে। আর সারা বিশ্বের যে বুর্জোয়ারা লড়াই-এর পর পাইকারী হত্যাকাণ্ড দেখে বিচলিত বোধ করে না, তারা আতঙ্কে শিউরে উঠল ইঁটের পলেস্তারার অপবিত্রকরণে!

যখন বিভিন্ন সরকার তাদের নৌবাহিনীকে 'হত্যা, দগ্ধ ও ধ্বংস করার,' রাষ্ট্রীয় অনুমতি দেয় তখন কি সেটা অগ্নিদানের অনুমতি? ব্রিটিশ সৈন্যেরা যখন ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রভবন অথবা চীন সম্রাটের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদে বেপরোয়া আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, তখন কি সেটা গৃহদাহ? প্রুশীয়রা যখন সামরিক কারণে নয়, নিছক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে পেট্রল দিয়ে শাতোদাঁ-র মতন শহর ও অসংখ্য গ্রাম পুড়িয়ে দিল, তখন কি সেটা অগ্নি? তিয়ের যখন ছয় সপ্তাহ ধরে শুধু যেসব গৃহে শত্রুপক্ষের লোক রয়েছে তা পুড়িয়ে ফেলার অছিলায় সারা প্যারিসের উপর গোলাবর্ষণ করেছিলেন, তখন সেটা কি আগুন লাগানো? যুদ্ধের সময় অন্য যে কোনও অস্ত্রের মতন আগুনও

* মেগেরা — প্রাচীন গ্রীকদের প্রতিশোধের এক দেবী।
হেকাটা — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথা অনুসারে পিশাচ, ডাকিনী ও প্রেতাত্মাদের অধিষ্ঠাত্রী। — সম্পাঃ

একটা বিধিসম্মত অস্ত্র। যেসব ঘরবাড়ি শত্রুপক্ষের হাতে তার উপর গোলাবর্ষণ করা হয় আগুন ধরিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য নিয়েই। যখন প্রতিরক্ষাকারীদের পিছু হঠতে হয়, তখন শত্রু যাতে সেই বাড়িঘর কাজে লাগাতে না পারে তার জন্য তারা নিজেরাই তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পৃথিবীর সমস্ত নিয়মিত সৈন্যদলের যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখস্থ সমস্ত ঘরবাড়িগুলির ভস্মীভবন সর্বদাই তাদের অনিবার্য নিয়তি হয়ে এসেছে। অথচ ইতিহাসের একমাত্র ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ, পদানতকারীদের বিরুদ্ধে পদানতদের যুদ্ধের বেলায় সেটি যেন কোনোমতেই চলে না! কমিউন আগুনকে ব্যবহার করেছিল একান্তই প্রতিরক্ষার হাতিয়ার হিসাবেই, যে বড়ো বড়ো সোজা এভেন্যুগুলিকে অসমাঁ গোলাগুলি বর্ষণের পরিষ্কার উদ্দেশ্য নিয়েই উন্মুক্ত রেখেছিলেন, ভার্সাই সৈন্যদের সেখানে ঢুকতে না দেবার জন্য কমিউন আগুন ব্যবহার করেছিল; তাদের পশ্চাদপসারণ আড়াল করতে তারা আগুন ব্যবহার করেছিল, ঠিক যেমন ভার্সাই-পক্ষীয়রা এগোবার সময় গোলা ব্যবহার করে যাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির সংখ্যা কমিউনের আগুনের ক্ষতির চাইতে অন্তত কিছু কম নয়। কোন কোন দালান কোঠায় প্রতিরক্ষাকারীরা আর কোথায় বা আক্রমণকারীরা আগুন লাগিয়েছিল আজ পর্যন্ত তা বিতর্কের বিষয় রয়ে গেছে। তাছাড়া প্রতিরক্ষাকারীরা আগুন ব্যবহার করতে আরম্ভ করল শুধু তখনই যখন ভার্সাই সৈন্যেরা ইতিমধ্যে তাদের বন্দীদের ব্যাপক হত্যা শুরু করে দিয়েছে। তাছাড়া কমিউন অনেক আগে থেকেই পরিষ্কারভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেছিল যে, চরমে যেতে বাধ্য হলে তারা প্যারিসের ধ্বংসস্তূপের নিচে মৃত্যুবরণ করবে, প্যারিসকে দ্বিতীয় মস্কোতে পরিণত করবে, যা করতে প্রতিরক্ষা সরকারও প্রতিশ্রুত ছিল, অবশ্য তার দেশদ্রোহকে আড়াল করে রাখার উদ্দেশ্যে। এরজন্য ত্রশ্যু পেট্রল পর্যন্ত জোগাড় করেছিলেন। কমিউনের এ কথা জানা ছিল যে শত্রুরা প্যারিসের লোকদের জীবনের জন্য কোনও পরোয়া করে না, করে প্যারিসস্থ তাদের নিজস্ব প্রাসাদসমূহের জন্য। অপরদিকে তিয়ের তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছিলেন যে প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে তিনি হবেন অনমনীয়। তিনি যেই তাঁর সৈন্যবাহিনীকে একদিকে প্রস্তুত করে নিলেন এবং প্রুশীয়রা অন্যদিকে এসে দ্বাররোধ করে দাঁড়াল — অমনি তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি হব ক্ষমাহীন। শাস্তি হবে পরিপূর্ণ, আর বিচার হবে কঠোর!' প্যারিসের শ্রমিক শ্রেণীর কার্যকলাপ যদি বা বর্বর ধ্বংসলীলা হয়ে থাকে, তবে তা ছিল মরীয়া প্রতিরক্ষার ধ্বংসলীলা, বিজয়ের ধ্বংসলীলা নয়, খ্রীষ্টানরা যার অনুষ্ঠান করেছিল পৌত্তলিক প্রাচীনকালের যথার্থই অমূল্য শিল্পসম্পদ সম্পর্কে; অথচ সেই বর্বরতাকেও ঐতিহাসিক ক্ষমার্হ বলেছেন, পতনোন্মুখ একটা প্রাচীন সমাজ এবং উত্থানশীল এক নূতন সমাজের মধ্যে সুবিপুল সংগ্রামের অপরিহার্য এবং তুলনামূলক বিচারে তুচ্ছ অনুষঙ্গ হিসাবে। কমিউনের ধ্বংসকাণ্ড তো অসমাঁ-র ধ্বংসকাণ্ডের চেয়েও আরো অল্প, যিনি

ভ্রমণবিলাসীদের দ্রষ্টব্য প্যারিস বানাতে গিয়ে ইতিহাসের প্যারিসকে ধূলিসাৎ করেছিলেন!

কিন্তু প্যারিসের আর্চবিশপ প্রমুখ চৌষট্টিজন জামিনকে যে কমিউন হত্যা করেছিল! ১৮৪৮-এর জুনে বুর্জোয়া শ্রেণী ও তার সৈন্যদল যুদ্ধের রীতিনীতির ক্ষেত্রে বহুকাল পরিত্যক্ত অসহায় বন্দীদের গুলি করে মারার প্রথাটা পুনঃপ্রবর্তিত করে। তারপর থেকে ইউরোপ ও ভারতের সমস্ত জনবিক্ষোভের দমনকারীরা এই পাশবিক প্রথা কম বেশি কঠোরভাবে পালন করে এসেছে, এইভাবে প্রমাণ করেছে যে এটা হল যথার্থই 'সভ্যতার অগ্রগমন!' অন্যদিকে ফ্রান্সে প্রুশীয়রা পুনঃপ্রচলন করেছে জামিনে আটক করে রাখার প্রথা, যাতে অন্যদের কৃতকর্মের জন্য প্রাণ দিয়ে জবাবদিহি করতে হয় নিরপরাধীদের। আমরা দেখেছি যে সংঘর্ষের একেবারে শুরু থেকেই তিয়ের কমিউনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বন্দীদের গুলি করে হত্যার মানবীয় রীতিটি চালু করলেন; তখন তাদের বাঁচাবার জন্য কমিউনকে জামিনে আটক রাখার প্রুশীয় প্রথাটি গ্রহণ করতে হয়। ভার্সাই-এর পক্ষ থেকে বন্দীদের যেভাবে অবিশ্রাম গুলি করে হত্যা করা হচ্ছিল, তাতে কমিউনের হাতে আটক লোকজনদের জীবন বহুবারই খোয়া যাওয়ার কথা। ম্যাকম্যাহনের প্রিটোরীয় বাহিনী* যে হত্যাকাণ্ড দিয়ে প্যারিসে প্রবেশের মহোৎসব করে তারপর আর আটক লোকদের রেহাই দেওয়া কি সম্ভব ছিল? বুর্জোয়া সরকারের গুলির নির্বিচার হিংস্রতার পথে যা সর্বশেষ প্রতিষেধক — জামিন রাখার সেই প্রথাকে কি আর নিছক একটা ভূয়া ঠাট করে রাখা যেত? আর্চবিশপ দারবুয়া-র প্রকৃত হত্যাকারী হলেন স্বয়ং তিয়ের। তিয়েরের হাতে সে সময়ে বন্দী একক ব্লাঙ্কির বিনিময়ে আর্চবিশপ এবং অন্য আরও বহু পুরোহিতকে ছেড়ে দেবার প্রস্তাব কমিউন করেছিল বারবার। একগুঁয়ের মতো তিয়ের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি জানতেন যে ব্লাঙ্কিকে দিলে দেওয়া হবে কমিউনের মাথাটাকে; আর আর্চবিশপ তাঁর কাজে লাগবে মৃতদেহ হিসাবেই বেশি। তিয়ের অনুসরণ করলেন কাভেনিয়াক-এর পদাঙ্কই। ১৮৪৮-এর জুনে কাভেনিয়াক এবং তাঁর অনুগত 'শৃঙ্খলার লোকেরা' আর্চবিশপ আফ্র-এর হত্যাকারী বলে বিদ্রোহীদের কলঙ্কিত করে আতঙ্কের কত না চিৎকার তুলেছিলেন! অথচ তাঁরা ভাল করেই জানতেন যে আর্চবিশপকে শৃঙ্খলার সৈনিকেরাই গুলি করেছে। সেখানে উপস্থিত আর্চবিশপের সহকারী শ্রীযুক্ত জাক্‌মে ঘটনার অব্যবহিত পরেই তাঁর প্রদত্ত সাক্ষ্যে একথা জানিয়ে দেন।

* প্রিটোরীয় বাহিনী — প্রাচীন রোমে অধিনায়ক বা সম্রাটের ব্যক্তিগত খাস বাহিনী, তাঁরা এদের ভরণপোষণ করতেন ও নানা সুবিধা দিতেন। এখানে প্রিটোরীয় বাহিনী বলতে ভার্সাই সৈন্যদলকে বোঝাচ্ছে। — সম্পাঃ

শৃঙ্খলা পার্টি তাদের রক্তপাতের মত্তোৎসবে বধ্যের বিরুদ্ধে এই যে অপবাদের ঐক্যতান তুলতে কখনই পিছপা হয় না, তার থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে আজকের বুর্জোয়া নিজেকে অতীতের সামন্তপ্রভুর ন্যায্য উত্তরাধিকারী বলে গণ্য করে, যে প্রভুদের কাছে সাধারণ লোকের বিরুদ্ধে উদ্যত নিজেদের হাতের সব অস্ত্রই ন্যায়সঙ্গত, অথচ জনসাধারণের হাতে যে কোনও অস্ত্রই অপরাধ।

বিদেশী আক্রমণকারীদের আনুকূল্যে পরিচালিত গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে বিপ্লবকে ভেঙে ফেলার জন্য শাসক শ্রেণীর যে ষড়যন্ত্রের ধারাটি ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে ম্যাকম্যাহনের প্রিটোরীয় সৈন্যদের সাঁ ক্লু-র ফটক দিয়ে প্যারিসে প্রবেশ পর্যন্ত আমরা অনুসরণ করে এসেছি, তার পরিণতি হল প্যারিসের হত্যাকাণ্ড। বিসমার্ক প্যারিসের ধ্বংসস্তূপ দেখে নয়ন সার্থক করলেন; ১৮৪৯ সালে প্রাশিয়ার 'অভাবনীয় পরিষদের' এক নগণ্য গ্রাম্য মাতব্বর হিসাবে তিনি মহানগরীসমূহের ব্যাপক ধ্বংসের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, মনে হয় এর মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন তার প্রথম কিস্তি। প্যারিস প্রলেতারিয়েতের মৃতদেহগুলি দেখে তিনি পরম আনন্দ পেলেন। তাঁর কাছে এটা ত' শুধু বিপ্লবের উৎসাদন মাত্র নয়, এটা হল ফ্রান্সেরই অবলুপ্তি, সত্যসত্যই তার শিরশ্ছেদ -- তাও আবার ফরাসী সরকারেরই হাতে। সফল রাষ্ট্রনায়কদের স্বভাবসুলভ অগভীরতায় তিনি দেখলেন এই বিশাল ঐতিহাসিক ঘটনার বহিরঙ্গটুকুই। ইতিহাসে এমন দৃশ্য এর আগে আর কবে দেখা গিয়েছিল, যেখানে এক বিজয়ী জয়লাভ সম্পূর্ণ করছে বিজিত সরকারের শুধু সশস্ত্র পুলিশে নয়, তার ভাড়াটে গুণ্ডায় নিজেকে রূপান্তরিত করে? প্যারিসের কমিউন ও প্রাশিয়ার মধ্যে কোনও যুদ্ধের অস্তিত্ব ছিল না। বরং ঠিক বিপরীত — কমিউন শান্তির প্রাথমিক শর্ত মেনে নিয়েছিল আর প্রাশিয়া ঘোষণা করেছিল তার নিরপেক্ষতা। সুতরাং প্রাশিয়া যুদ্ধের অংশীদার ছিল না। তার ভূমিকা হল গুণ্ডার, কাপুরুষ গুণ্ডার, কেননা বিপদের কোনও বালাই ছিল না; ভাড়াটে গুণ্ডার, কারণ প্যারিসের পতনের জন্য তার রক্তক্ষরণের দক্ষিণা বাবত নগদ ৫০ কোটির শর্ত সে আগেই চাপিয়েছিল। আর অবশেষে এইভাবে উদ্ঘাটিত হল যুদ্ধের আসল চরিত্র — ধর্মধ্বজ নীতিপরায়ণ জার্মানির হাতে নাস্তিক অধঃপতিত ফ্রান্সের বিধাতা-নির্দিষ্ট শাস্তি! এমন কি প্রাচীনপন্থী আইন বিশারদদের মতেও যেটা আন্তর্জাতিক আইনের এক অদৃষ্টপূর্ব লঙ্ঘন — তাতেও কিন্তু ইউরোপের 'সভ্য' সরকারসমূহ সেণ্ট পিটার্সবুর্গের মন্ত্রিমণ্ডলের নিতান্ত হাতের পুতুল, অপরাধী এই প্রুশীয় সরকারকে জাতিসমূহের দরবারে অপাঙ্‌ক্তেয় ঘোষণা না করে বরং ভাবতে বসল, প্যারিসের ডবল বেষ্টনী ভেদ করে মুষ্টিমেয় যে হতভাগ্যেরা পালিয়েছে তাদের ভার্সাই-এর জল্লাদের হাতে সমর্পণ করা হবে কি না।

আধুনিক কালের সবচেয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিজয়ী ও বিজিত দলবল একযোগে শ্রমিকদের হত্যা করার জন্য সৌভ্রাত্র গড়ে তুলল — এই তুলনাহীন ঘটনাটায় যা সূচিত হচ্ছে তা বিসমার্ক যা ভাবছেন সেইভাবে একটি উদীয়মান নতুন সমাজের চূড়ান্ত দমন নয় — বরং বুর্জোয়া সমাজের ধূলিসাৎভবন। সবচেয়ে বড়ো যে বীরোচিত প্রচেষ্টাটুকু প্রাচীন সমাজের পক্ষে এখনও সম্ভব, তা হল জাতীয় যুদ্ধ; আর এখন প্রমাণ হল যে সেটাও কেবল সরকারী বুজরুকি মাত্র, উদ্দেশ্য শ্রেণী-সংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখা; সেই শ্রেণী-সংগ্রাম গৃহযুদ্ধে বিস্ফোরিত হওয়া মাত্র এই বুজরুকিও দূরে ফেলে দেওয়া হয়। শ্রেণী-শাসন আর জাতীয় পোষাকের ছদ্মবেশের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারছে না, প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে সকল জাতীয় সরকারই এক।

১৮৭১ সালের হুইট সান্‌ডের পরবর্তীকালে ফরাসী শ্রমিক শ্রেণী এবং তাদের উৎপন্ন দখলকারীদের মধ্যে শান্তি বা সন্ধি আর সম্ভব নয়। ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর লৌহদৃঢ় মুষ্টি সাময়িকভাবে হয়ত উভয় শ্রেণীকেই একই পীড়নে বেঁধে রাখতে পারবে। কিন্তু ক্রমশ সম্প্রসারিত ব্যাপ্তি নিয়ে এই সংগ্রাম বারবার দেখা দেবে, আর শেষ পর্যন্ত কে যে জয়লাভ করবে — মুষ্টিমেয় দখলকারী না বিপুল সংখ্যাধিক শ্রমিকেরা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর ফরাসী শ্রমিক শ্রেণী সে তো বর্তমান যুগের প্রলেতারিয়েতের অগ্রবাহিনী মাত্র।

ইউরোপীয় সরকারেরা যখন এই ভাবে প্যারিসের সমক্ষে শ্রেণী-শাসনের আন্তর্জাতিক চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে তুলছে, ঠিক তখনই তারা পুঁজির বিশ্বজনীন ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধী আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর পাল্টা সংগঠন শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিকে ধিক্কার দিচ্ছে সকল সর্বনাশের মূল উৎস বলে। শ্রমের ত্রাণকর্তা সেজে শ্রমিকদের উপরই স্বেচ্ছাচারী বলে তাকে নিন্দা করেছেন তিয়ের। পিকার হুকুম দিলেন যে বাইরের সদস্যদের সঙ্গে আন্তর্জাতিকের ফরাসী সভ্যদের সকল সংযোগ ছিন্ন করে দিতে হবে; তিয়েরের ১৮৩৫ সালের অথর্ব সঙ্গী, কাউণ্ট জবের ঘোষণা করলেন যে আন্তর্জাতিককে নির্মূল করাই নাকি সমস্ত সভ্য সরকারের পক্ষেই প্রধান সমস্যা। 'গ্রাম্য মাতব্বরেরা' তার বিরুদ্ধে গর্জন করছে আর ইউরোপের সকল সংবাদপত্র সেই চিৎকারে কণ্ঠ মিলিয়েছে। আমাদের সংস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংশ্রবহীন একজন মাননীয় ফরাসী লেখক নিম্নোলিখিত কথাগুলি বলেছেন, 'জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং কমিউনের সদস্যদের বিরাট অংশ হল শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সর্বাপেক্ষা সক্রিয়, সবচেয়ে বুদ্ধিমান, সবচাইতে উদ্যোগী লোকেরা; ... এমন লোক যারা সম্পূর্ণ সৎ, ঐকান্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত, নিষ্ঠাবান, বিশুদ্ধচিত্ত এবং শব্দটির **ভাল** অর্থে গোঁড়া।' পুলিশ-প্রভান্বিত বুর্জোয়া

মন স্বভাবতই মেহনতী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিকে দেখে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সংস্থারূপে, এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নাকি থেকে থেকে বিভিন্ন দেশে বিস্ফোরণ ঘটাবার আদেশ পাঠায়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমিতি সভ্যজগতের বিভিন্ন দেশের সবচেয়ে অগ্রসর শ্রমিকদের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক মৈত্রীবন্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানেই, যে কোনও আকারে এবং যে কোনও অবস্থায় শ্রেণী-সংগ্রাম একটা সুসঙ্গত রূপ ধারণ করে, সেখানেই আমাদের সংস্থার সদস্যগণ তার পুরোভাগে এসে দাঁড়াবে, এটা ত' স্বাভাবিক। যে মাটিতে সংস্থাটি বেড়ে চলেছে সে মাটিটাই হল আধুনিক সমাজ। কোনও হত্যালীলা একে নির্মূল করতে পারবে না। একে নির্মূল করতে হলে সরকারসমূহকে উৎপাটিত করতে হবে শ্রমশক্তির উপর পুঁজির স্বেচ্ছাচারকে, যে স্বেচ্ছাচার হল তাদের পরগাছাসুলভ অস্তিত্বেরই শর্ত।

কমিউন-সমেত শ্রমিক শ্রেণীর প্যারিস চিরদিন এক নূতন সমাজের গৌরবদীপ্ত অগ্রদূত হিসাবে নন্দিত হবে। শ্রমিক শ্রেণীর বিশাল হৃদয়ে তার শহীদেরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইতিহাস তাদের জল্লাদদের ইতিমধ্যেই সেই শাশ্বত শাস্তিমঞ্চে আবদ্ধ করেছে, যেখান থেকে তাদের পুরোহিতদের যাবতীয় প্রার্থনাতেও তাদের নিষ্কৃতি মিলবে না।

লণ্ডন, ৩০শে মে, ১৮৭১

টীকা

১

'দলবদ্ধ বন্দীদের থামানো হল উরিখ এভেনুতে। রাস্তার মুখামুখি ফুটপাথে, সারিতে চার পাঁচজন করে তাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। জেনারেল মার্কুইস দ্য গালিফে এবং তাঁর সঙ্গীরা ঘোড়া থেকে নেমে সারির বাম দিক থেকে পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন। ধীর পদবিক্ষেপে বন্দীদের দিকে তাকাতে তাকাতে জেনারেল এক এক জায়গায় থেমে, কারও বা কাঁধে টোকা দিলেন, কাউকে বা পিছনের সারি থেকে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিনা বাক্যব্যয়ে নির্বাচিত তেমন লোককে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে যাওয়া হল; দেখতে দেখতে সেখানে এই ভাবে গড়ে উঠল ছোট একটি বিশেষ দল... স্পষ্টতই এখানে ভুলের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। ঘোড়ায় চড়া একজন অফিসার জেনারেল গালিফেকে কোনও বিশেষ অপরাধে অপরাধী বলে একটি পুরুষ ও স্ত্রীলোককে দেখিয়ে দিল। স্ত্রীলোকটি দল ছেড়ে ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে

হাতদুটি তুলে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে নিজের নির্দোষের কথা জানাল। জেনারেল একটু অপেক্ষা করলেন তার থামার জন্য, তারপর অত্যন্ত উদাসভঙ্গীতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, 'ম্যাডাম, প্যারিসের সবকটি থিয়েটারই আমার দেখা, আপনার অভিনয় আমার মনে বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করতে পারবে না...' পাশের লোকের চেয়ে সেদিন উল্লেখযোগ্য ভাবে লম্বা, নোংরা, পরিচ্ছন্ন, বয়োবৃদ্ধ বা কুশ্রী হওয়াটা কিছু শুভ ছিল না। বিশেষ একটা লোকের ব্যাপারে খুবই মনে হল — ভবযন্ত্রণা থেকে তার তাড়াতাড়ি মুক্তি লাভের কারণ তার ভাঙা নাক... শতাধিক লোককে এভাবে বাছাই করা হলে, তাদের গুলি করার দল ঠিক হল, তারপর এদের পিছনে ফেলে বাকিদের আবার যাত্রা শুরু হল। কয়েকমিনিট পরে পিছনে গুলির শব্দ শোনা যায় এবং চলতে থাকে পনেরো মিনিটেরও বেশি। ঢালাওভাবে যে হতভাগ্যেরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, তাদেরই প্রাণদণ্ড হচ্ছিল।' — *Daily News* পত্রিকার প্যারিসস্থ সংবাদদাতা, ৮ই জুন। — 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পানোৎসবগুলিতে চূড়ান্ত বেহায়াপনার জন্য কুখ্যাতা স্ত্রীর আশ্রিত পুরুষ' এই গালিফে যুদ্ধের সময় ফরাসী 'এন্‌সাইন পিস্তল' নামে পরিচিত হন।

'*Temps** একটি সতর্ক পত্রিকা, চাঞ্চল্যপ্রিয়তা তার অভ্যাস নয়, এ কাগজ অসম্পূর্ণভাবে গুলিবিদ্ধ এবং জীবন নির্বাণের পূর্বেই কবরস্থ লোকের বিষয়ে এক বীভৎস কাহিনী দিয়েছে। সাঁ জাক লা বুশিয়েরের চারপাশে স্কোয়ারে অনেককে কবর দেওয়া হয়, এদের মধ্যে কিছু লোক আবার ভাল করে মাটি চাপাও পড়েনি। দিনের বেলা কর্মব্যস্ত রাস্তার গর্জনে কিছু মনে হয়নি; কিন্তু রাত্রির নীরবতায় দূরাগত গোঙানির শব্দে নিকটবর্তী বাড়ির লোকেরা জেগে ওঠে আর সকালে দেখা গেল মাটির মধ্য থেকে একখানি মুষ্টিবদ্ধহাত উপরের দিকে উত্তোলিত হয়ে রয়েছে। এর ফলে কবর থেকে মৃতদেহগুলি খুঁড়ে বের করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল... অনেক আহত লোককে যে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে তাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। একটা ঘটনা আমি নিজেই বলতে পারি। গত মাসের ২৪শে তারিখ ব্রুনেল ও তার প্রণয়িনীকে প্লাস ভাঁদোমে এক বাড়ির প্রাঙ্গণে গুলি করা হয়; ২৭শে বিকাল পর্যন্ত দেহদুটি সেখানেই পড়ে ছিল। কবর দেওয়ার লোকেরা যখন মৃতদেহগুলি সরিয়ে নিতে এল, দেখা গেল স্ত্রীলোকটি তখনও বেঁচে আছে। তারা তাকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। গায়ে চার চারটি গুলি লাগলেও মহিলাটি এখন বিপন্মুক্ত।' — *Evening Standard* পত্রিকার প্যারিসস্থ সংবাদদাতা, ৮ই জুন।

* *Temps* — ১৮৬১ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত প্যারিস থেকে প্রকাশিত প্রভাবশালী উদারনৈতিক দৈনিক কাগজ। — সম্পাঃ

২

১৩ই জুন (লন্ডন) *Times** পত্রিকায় নিম্নলিখিত চিঠিখানি প্রকাশিত হয়:

Times পত্রিকার সম্পাদক সমীপেষু

'মহাশয়,

'১৮৭১ সালের ৬ই জুন শ্রীযুক্ত জুল ফাভ্র সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রের কাছে প্রেরিত একটি বিবৃতিতে তাদের আহ্বান জানিয়েছেন তারা যেন শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিকে কঠোর হস্তে তাড়না করে। সামান্য কয়টি মন্তব্যই এই দলিলটির প্রকৃতি নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করি।

'আমাদের নিয়মাবলীর একেবারে মুখবন্ধেই উল্লিখিত আছে যে আন্তর্জাতিকটি ১৮৬৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর লন্ডনের লঙ-একরে অবস্থিত সেণ্ট মার্টিন হলে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জুল ফাভ্র এই প্রতিষ্ঠা তারিখটিকে পিছিয়ে দিয়েছেন ১৮৬২ সালের পেছনে।

'আমাদের নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি "তাদের (অর্থাৎ আন্তর্জাতিকের) ১৮৬৯-এর ২৫শে মার্চ তারিখের পত্র থেকে" উদ্ধৃতি দেবার কথা বলেন। কিন্তু তারপর তিনি উদ্ধৃত করলেন কী? আন্তর্জাতিক নয়, অন্য একটি সংগঠনের পত্র। তিনি যখন বয়সে তরুণ আইনজীবী মাত্র, তখনই কাবে কর্তৃক আনীত মানহানির দায়ে অভিযুক্ত *National* পত্রিকার পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তিনি একই ধরনের প্যাঁচের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন কাবে লিখিত পুস্তিকা থেকে অংশবিশেষ পাঠ করার ভান করে তিনি আসলে নিজের প্রক্ষিপ্ত মন্তব্যই পড়ে যাচ্ছিলেন; আদালতের অধিবেশনকালে তাঁর এই চালাকি ফাঁস হয়ে যায়, এবং কাবে অনুকম্পা না দেখালে শাস্তি হিসাবে প্যারিসের উকিল মহল থেকে জুল ফাভ্রকে বহিষ্কারই করে দেওয়া হত। আন্তর্জাতিকের দলিল বলে যত দলিল থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার একটিও আন্তর্জাতিকের নয়। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক — তিনি বলেছেন, "১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে লন্ডনে গঠিত সাধারণ পরিষদ বলেছে, মৈত্রীবদ্ধ সঙ্ঘ (Alliance) নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা করেছে।" এই ধরনের কোন দলিলই সাধারণ পরিষদ কখনো প্রকাশ করেনি। বরং, ঠিক বিপরীত, সাধারণ পরিষদ প্রকাশ করেছে একটা দলিল যাতে করে জুল ফাভ্রের উদ্ধৃত "মৈত্রীবদ্ধ সঙ্ঘের" -- অর্থাৎ জেনেভার সমাজতন্ত্রী

* *Times* -- ১৭৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ প্রভাবশালী ইংরাজি সংবাদপত্র। উনিশ শতকের অষ্টম দশকে এর মতামত ছিল উদারনৈতিক। — সম্পাঃ

গণতন্ত্রীদের মৈত্রীবদ্ধ সঙ্ঘের আদি নির্ধারক নীতিগুলিকে (statutes) খণ্ডন করা হয়।

'খানিকটা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও লিখিত এরকম একটা ভান করলেও বিবৃতির আদ্যন্ত জুল ফাভ্র আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের আমলের অভিশংষকদের পুলিশী মিথ্যাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন, যে অভিযোগ সেই সাম্রাজ্যের আদালতের সামনেও শোচনীয়ভাবে টেকেনি।

'একথা সকলেই জানে যে বিগত যুদ্ধের উপর (গত জুলাই এবং সেপ্টেম্বর মাসের) দুই ভাষণেই আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ প্রুশীয়দের ফ্রান্স বিজয়ের পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা করেছিল। এরপরে জুল ফাভ্রের প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত রাইতলিংগার সাধারণ পরিষদের কয়েকজন সদস্যের কাছে আবেদন করেন, অবশ্য বৃথাই করেন, যাতে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের সমর্থনে বিসমার্কের বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়, প্রজাতন্ত্রের কথা যেন উল্লেখ করা না হয়, তাঁদের তখন বিশেষ করে এই অনুরোধও করা হয়েছিল। জুল ফাভ্রের প্রত্যাশিত লণ্ডন আগমন প্রসঙ্গে যে মিছিলের আয়োজন হয়, — সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হলেও — সেটা হয়েছিল সাধারণ পরিষদের মতের বিরুদ্ধে; সাধারণ পরিষদ তার ৯ই সেপ্টেম্বরের ভাষণে জুল ফাভ্র ও তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে প্যারিস শ্রমিকদের আগে থাকতেই পরিষ্কারভাবে সাবধান করে দেয়।

'এখন আন্তর্জাতিক যদি তার দিক থেকে পরলোকগত শ্রীযুক্ত মিলিয়ের কর্তৃক প্যারিসে প্রকাশিত দলিলগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে জুল ফাভ্র সম্বন্ধে একটি বিবৃতি ইউরোপের প্রতিটি মন্ত্রিসভার কাছে পাঠায়, তাহলে জুল ফাভ্র মহাশয় কী বলবেন?

'ইতি... আপনার একান্ত বিনীত সেবক

'জন্ হেল্স

'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক
সমিতির সাধারণ পরিষদের সম্পাদক

'লণ্ডন, ১২ই জুন ১৮৭১'

'আন্তর্জাতিক সমিতি ও তার লক্ষ্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ধর্মধ্বজী গোয়েন্দা লণ্ডনের *Spectator* পত্রিকা ২৪শে জুন, অনুরূপ নানা কারসাজির সঙ্গে সঙ্গে জুল

ফাভ্রের চেয়েও অধিকতর বিস্তারিতভাবে 'মৈত্রীবদ্ধ সঙ্ঘের' উপরে উল্লিখিত দলিলটি আন্তর্জাতিকেরই কাজ বলে চালিয়েছেন, তাও আবার *Times* পত্রিকায় অভিযোগ-খণ্ডন পত্র প্রকাশ হবার এগারো দিন পরে। আমরা এতে আশ্চর্য হইনি। মহান ফ্রিদরিখ বলতেন সকল জেসুইটের মধ্যে প্রটেস্টাণ্ট জেসুইটই হল সবচেয়ে খারাপ।

১৮৭১ সালে এপ্রিল-মে মাসে মার্কস কর্তৃক লিখিত এবং শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের ১৮৭১ সালের ৩০শে মে তারিখের অধিবেশনে অনুমোদিত

১৮৭১ সালে লণ্ডনে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসাবে ইংরেজীতে প্রথম প্রকাশিত

জার্মান ও ফরাসী সংস্করণ একই সময়ে প্রকাশিত। এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাদিত এবং তাঁর ভূমিকা সম্বলিত জার্মান বইটি একটি স্বতন্ত্র সংস্করণ হিসাবে ১৮৯১ সালে বার্লিনে প্রকাশিত হয়

১৮৭১ সালের ইংরেজী পুস্তিকার পাঠ অনুসারে মুদ্রিত লেখার ভাষান্তর

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

বাস-সংস্থান সমস্যা

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে লাইপজিগের *Volksstaat** পত্রিকার জন্য লেখা আমার তিনটি প্রবন্ধ এখানে একত্র পুনর্মুদ্রিত হল। ঠিক ঐ সময়ে জোয়ারের মতো ফ্রান্স থেকে জার্মানিতে অর্থের** আমদানি হয়: তখন সরকারী ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া হচ্ছিল, নির্মিত হচ্ছিল কেল্লা ও সেনানিবাস, অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক মালমশলার ভাণ্ডার নূতন করে নেওয়া হচ্ছিল। শুধু চালু মুদ্রার পরিমাণই নয়, লভ্য পুঁজির পরিমাণও হঠাৎ দারুণভাবে বৃদ্ধি পেল, আর এইসব কিছু ঘটতে থাকে এমন এক সময়ে, যখন জার্মানি শুধু 'সংযুক্ত সাম্রাজ্য' হিসাবেই নয়, বৃহৎ শিল্পায়িত দেশ হিসাবেও বিশ্বমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করছিল। এই অজস্র অর্থই দেশের নবীন বৃহদায়তন শিল্পকে জুগিয়েছিল প্রবল প্রেরণা। যুদ্ধোত্তর কালে রঙীন মোহজালপূর্ণ যে স্বল্পকালীন আর্থিক সমৃদ্ধি এসেছিল, তারও পেছনে প্রধানতম কারণ হল এই অর্থ। আবার এরই ফলে দেখা দিল ১৮৭৩-৭৪ সালে দারুণ ব্যবসা বিপর্যয়, আর তাতে করে দুনিয়ার বাজারে নিজস্ব আসন বজায় রাখতে সক্ষম, এমন একটি শিল্পায়িত দেশ হিসাবে জার্মানির পরিচয় পাওয়া গেল।

প্রাচীন সংস্কৃতিসম্পন্ন একটি দেশে হস্তশিল্প কারখানা ও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে বৃহদায়তন শিল্পে এরূপ উত্তরণের যুগটাই হল সেই দেশে প্রধানত 'বসতবাড়ির অভাবের' যুগ, বিশেষ করে যখন আবার সেই উত্তরণের গতিবেগ এমন

* *Volksstaat* (জনরাষ্ট্র) — ১৮৬৯-৭৬ খৃষ্টাব্দে লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির (আইজেনাখপন্থী) কেন্দ্রীয় মুখপত্র। — সম্পাঃ

** ১৮৭১ সালের ১০ই মে থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ত শান্তিচুক্তি অনুসারে ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানিকে যে ৫০০ কোটি ফ্রাঁ পরিশোধ করার শর্ত থাকে তার কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

অনুকূল পরিস্থিতির দরুন দ্রুততর হয়ে ওঠে। একদিকে গ্রামের মজুরেরা হঠাৎ বিপুল সংখ্যায় শহরের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে যে শহরগুলি গড়ে ওঠে শিল্পকেন্দ্র হিসাবে; অন্যদিকে পুরানো শহরগুলির ভবনাদি নতুন বৃহদায়তন শিল্প এবং আনুষঙ্গিক যানবাহনের পক্ষে অনুপযোগী হয়ে পড়ে; পুরানো রাস্তাঘাট চওড়া করা হয়, কেটে বার করা হয় নতুন নতুন রাস্তা, শহরের বুকের উপর দিয়ে চলতে থাকে রেলপথ। যে সময়ে শ্রমিকেরা স্রোতের মতো শহরে প্রবেশ করতে থাকে, ঠিক সেই সময়েই ব্যাপকভাবে শ্রমিকদের ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। এই কারণেই দেখা দেয় শ্রমিকদের এবং তাদের কেনাকাটার উপর নির্ভরশীল ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও ছোটখাট কারবারীদের গৃহ-সংস্থানের হঠাৎ অভাব। একেবারে গোড়া থেকেই যে সব শহর শিল্পকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে, সেই সকল জায়গায় এই সমস্যা নেই বললেই চলে; যেমন ম্যানচেস্টার, লিড্স, ব্র্যাডফোর্ড, বার্মেন-এল্‌বারফেল্দ। অন্যদিকে লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন ও ভিয়েনায় এক সময়ে গৃহাভাব তীব্রাকারে দেখা দিয়েছিল, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে সে সমস্যা এখনও থেকে গেছে।

জার্মানিতে যে শিল্প-বিপ্লব ঘটছিল, তারই লক্ষণস্বরূপ বাসস্থানের এই তীব্র অভাবের কথা তাই সেই সময়ে 'বাস-সংস্থান সমস্যা' সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধের রূপে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা জুড়ে থাকত এবং নানাবিধ সামাজিক হাতুড়ে চিকিৎসাবিধির উদ্ভব ঘটাত। ক্রমানুবর্তিত কয়েকটি এই ধরনের প্রবন্ধ *Volksstaat* পত্রিকাতেও স্থান করে নেয়। বেনামী লেখকটি — পরে তিনি ভ্যুর্তেমবের্গের ম্যুলবের্গার এম, ডি, রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন — এই সমস্যার মাধ্যমে প্রুধোঁর সর্বরোগহর চিকিৎসা-ব্যবস্থার অলৌকিক ফলাফল সম্বন্ধে জার্মান শ্রমিকদের জ্ঞানবৃদ্ধি করবার পক্ষে সুযোগটা অনুকূল বলে বিবেচনা করলেন। এই ধরনের অদ্ভুত প্রবন্ধ গ্রহণে সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট আমি বিস্ময় প্রকাশ করায়, তাঁরা এর জবাব দেবার জন্য আমাকে আহ্বান জানালেন এবং আমি তার জবাব দিই। (প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য: 'প্রুধোঁ কী ভাবে বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধান করেন'।) এই প্রথম পর্যায়ের অল্পকাল পরেই আমি দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধ লিখি — যাতে ডক্টর এমিল জাক্সের গ্রন্থের ভিত্তিতে এই সমস্যা সম্পর্কে হিতৈষীবাদী বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির বিচার করা হয়। (দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য: 'বুর্জোয়া শ্রেণী কী ভাবে বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধান করে'।) বেশ কিছুদিন বিরামের পর ডক্টর ম্যুলবের্গার আমার প্রবন্ধাবলীর একটা জবাব দিয়ে আমাকে সম্মানিত করলেন এবং তার ফলে আমিও প্রত্যুত্তর দিতে বাধ্য হলাম। (তৃতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য: 'প্রুধোঁ ও বাস-সংস্থান সমস্যা সম্পর্কে ক্রোড়পত্র'।) এইখানেই বাদানুবাদ এবং এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমার বিশেষ মনোযোগদান, উভয়েরই পরিসমাপ্তি ঘটল। স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসাবে পুনর্মুদ্রিত এই তিন পর্যায়ের প্রবন্ধের উদ্ভবের এই হচ্ছে ইতিহাস। পুস্তিকাটির যে

এখন নূতন মুদ্রণের প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে, তার জন্যে আমি নিঃসন্দেহে জার্মান সরকারের স্নেহপরবশ দৃষ্টিদানের নিকট ঋণী; তাঁরা রচনাটি নিষিদ্ধ করে দিয়ে চিরাচরিতের মতো এর বিক্রয় দারুণভাবে বাড়িয়ে দেন। এই সুযোগে আমি তাঁদের আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বর্তমান নতুন সংস্করণের জন্য আমি এই লেখা সংশোধন করেছি, কয়েকটি সংযোজন ও টীকা ঢুকিয়েছি এবং প্রথম ভাগে যে সামান্য অর্থতত্ত্বগত ভুল ছিল, তা আমার বিরোধীপক্ষ ডক্টর মুলবের্গার দুর্ভাগ্যবশত ধবতে পারেননি বলে আমি নিজেই সংশোধন করেছি। গত চোদ্দ বছরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে কী বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে, এই পুস্তিকা সংশোধনের সময় তা আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তখনো এ কথা সত্য ছিল যে 'বিশ বছর যাবং রোমান্স-ভাষাভাষী শ্রমিকদের একমাত্র প্রুধোঁর লেখা ছাড়া' অথবা নিদেনপক্ষে 'নৈরাজ্যবাদের' জন্মদাতা যে বাকুনিন প্রুধোঁকে 'আমাদের সকলের গুরু' (notre maître à nous tous) বলে গণ্য করতেন তাঁর উপস্থাপিত প্রুধোঁবাদের আরও একপেশে ভাষ্য ছাড়া আর কোনো মানসিক খাদ্য ছিল না। ফ্রান্সে প্রুধোঁপন্থীরা শ্রমিকদের মধ্যে সংকীর্ণ একটি গোষ্ঠী ছিল বটে, কিন্তু একমাত্র তাদেরই ছিল সুনির্দিষ্ট সূত্রবদ্ধ কর্মসূচী এবং তারা কমিউনের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়। বেলজিয়মে ভালোন শ্রমিকদের মধ্যে প্রুধোঁবাদের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য; আর স্পেন ও ইতালিতে সামান্য দু-চারটি বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম ছাড়া শ্রমিক আন্দোলনের সবকিছুই নৈরাজ্যবাদী না হলে নিশ্চিতভাবেই হত প্রুধোঁপন্থী। আর আজ? ফ্রান্সে প্রুধোঁ আজ শ্রমিকমহল থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত। তাঁর সমর্থন বজায় আছে শুধু র‍্যাডিকাল বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে, যারা প্রুধোঁবাদী হিসাবে নিজেদের 'সমাজতন্ত্রী' বললেও সমাজতন্ত্রী শ্রমিকেরা যাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালাচ্ছে। বেলজিয়মে ফ্লেমিশরা আন্দোলনেব নেতৃত্ব থেকে ভালোনদের হটিয়ে দিয়েছে, প্রুধোঁবাদকে স্থানচ্যুত করে আন্দোলনের মানকে অনেক ঊর্ধ্বে তুলেছে। স্পেন ও ইতালিতে অষ্টম দশকের নৈরাজ্যবাদী জোয়ারে ভাঁটা পড়েছে এবং সেই টানে প্রুধোঁবাদের অবশিষ্টাংশকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ইতালিতে নতুন পার্টি এখনও বোধ-স্বচ্ছতা অর্জন ও সংগঠনের স্তরে থাকলেও, স্পেনে 'মাদ্রিদীয় নূতন ফেডারেশন' নামে যে ক্ষুদ্র কেন্দ্রটি আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের অনুগত ছিল, আজ তা পরিণত হয়েছে এক শক্তিশালী দলে। তাদের পূর্বগামী হট্টগোলকারী নৈরাজ্যবাদীদের তুলনায় এই দল যে অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে শ্রমিকদের উপর বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের প্রভাব ধ্বংস করছে তা প্রজাতন্ত্রীদের কাগজপত্র থেকেই বুঝতে পারা যায়। লাটিন শ্রমিকদের মধ্যে প্রুধোঁর বিস্মৃত রচনাবলীর স্থান অধিকার করেছে 'পুঁজি' আর 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'

এবং মার্কসবাদী চিন্তাধারার অন্যান্য গ্রন্থ। একচ্ছত্র রাজনৈতিক ক্ষমতায় উন্নীত হয়ে প্রলেতারিয়েত গোটা সমাজের তরফে উৎপাদনের উপায়সমূহ দখল করবে — মার্কসের এই মূল দাবি বর্তমানে লাটিন দেশগুলিতেও সমগ্র বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর দাবিতে পরিণত হয়েছে।

আজ যখন শেষ পর্যন্ত লাটিন দেশগুলিতেও শ্রমিকদের মধ্য থেকে প্রুধোঁবাদ স্থানচ্যুত, সে মতবাদ যখন তার প্রকৃত ভবিতব্য অনুযায়ী বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া আকাঙ্খার প্রকাশ হিসাবে ফরাসী, স্পেনীয়, ইতালীয় ও বেলজিয়ান বুর্জোয়া র‍্যাডিকালদের শুধু কাজে লাগছে, তখন আবার নতুন করে এই প্রসঙ্গের অবতারণা কেন? এই প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণ করে গতায়ু বিরোধীর সঙ্গে নতুন সংঘাতের কারণ কী?

প্রথমত, কারণ এই যে, এই প্রবন্ধগুলি শুধুমাত্র প্রুধোঁ ও তাঁর জার্মান প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে বিতণ্ডাতেই সীমাবদ্ধ নয়। মার্কস ও আমার মধ্যে একটা শ্রমবিভাগ ছিল: মার্কস যাতে তাঁর মহান বনিয়াদী গ্রন্থ রচনার সময় পান, সেইজন্য আমার উপর দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন সাময়িকীতে, বিশেষ করে বিরোধী মতের সঙ্গে সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের মতামত পেশ করা। ফলে আমাকে অধিকাংশ সময়েই প্রধানত নানাধরনের মতের বিরোধিতা করে বিতর্কের মারফত আমাদের নিজস্ব মতবাদ পরিবেশন করতে হত। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় ভাগে শুধু যে সমস্যাটি সম্বন্ধে প্রুধোঁবাদী চিন্তাধারার সমালোচনা করা হয়েছে তাই নয়, আমাদের নিজেদের চিন্তাধারাও উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে প্রুধোঁ এতটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন যে তিনি শুধু নিঃশব্দে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে পারেন না। তত্ত্বগতভাবে খণ্ডিত এবং ব্যবহারিকভাবে পরিত্যক্ত হলেও প্রুধোঁর ঐতিহাসিক আকর্ষণ আজও অক্ষুণ্ণ। আধুনিক সমাজতন্ত্রের যাঁরা কিছুটা খুঁটিয়ে দেখতে চান, এই আন্দোলনে 'অতিক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির' সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকাটাও প্রয়োজন। প্রুধোঁ তাঁর সমাজ সংস্কারের কার্যকর প্রস্তাবাবলী পেশ করার কয়েক বছর আগেই মার্কসের 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রকাশিত হয়েছিল। প্রুধোঁর বিনিময়-ব্যাংককে ভ্রূণাবস্থায় আবিষ্কার করে তার সমালোচনা ছাড়া মার্কস এই বইটিতে আর বেশী কিছু করতে পারেননি। এইদিক থেকে তাই আমার বইটি দুর্ভাগ্যবশত যথেষ্ট অসম্পূর্ণভাবে মার্কসের রচনারই পরিপূরক স্বরূপ। মার্কস স্বয়ং এ কাজ করতে পারতেন অনেক ভালো এবং অনেক যুক্তিগ্রাহ্য রূপে।

তাছাড়া শেষত, আজ এই মুহূর্ত অবধিও জার্মানিতে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের দৃঢ় প্রতিনিধিত্ব বর্তমান। একদিকে রয়েছে ক্যাথিডার-সমাজতন্ত্র

(katheder-socialism)* ও নানা ধরনের মানবহিতৈষী যাদের কাছে শ্রমিকদের বাসগৃহের মালিকে পরিণত করার আকাঙ্খাটা এখনো প্রভাবশালী, তাই এদের বিরুদ্ধে আমার রচনা এখনও সময়োপযোগী। অন্যদিকে, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যেই, এমন কি রাইখ্‌স্টাগ গ্রুপের মধ্যেও একধরনের পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব আছে। ব্যাপারটা এই রকম: আধুনিক সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদি মতামত এবং উৎপাদনের সমগ্র উপায়গুলি সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করার দাবিকে ন্যায্য বলে স্বীকার করলেও, এই লক্ষ্য কেবল সুদূর ভবিষ্যতেই বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব বলে ঘোষণা করা হয় - যে ভবিষ্যৎ কার্যত দৃষ্টির অগোচরে। সুতরাং বর্তমানে নিতান্ত সামাজিক জোড়াতালির শরণাপন্নই হতে হবে, এমন কি অবস্থা বিশেষে 'মেহনতী শ্রেণীর উন্নয়নের' জন্যে অতীব প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টার প্রতিও সহানুভূতি দেখানো সম্ভব। প্রধানত পেটি বুর্জোয়া দেশ জার্মানিতে এই প্রবণতার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভাবী, বিশেষ করে যখন শিল্পের বিকাশের ফলে সবলে ও ব্যাপকভাবে এই পুরাতন ও বদ্ধমূল পেটি বুর্জোয়ার মূলোচ্ছেদ ঘটছে। বিশেষ করে গত আট বছর যাবৎ সমাজতন্ত্র-বিরোধী আইন, পুলিশ ও আদালতের বিরুদ্ধে লড়াইতে আমাদের শ্রমিকেরা যে আশ্চর্য সহজবুদ্ধির চমৎকার পরিচয় দিয়েছে, তার ফলে এই প্রবণতা অবশ্য আন্দোলনের ক্ষতি করতে পারবে না। তবুও এই ঝোঁক যে বিদ্যমান তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। ঝোঁকটা পরবর্তীকালে যদি আরও দৃঢ় রূপ ও সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে --- এবং তা অনিবার্য, এমন কি কাম্যও বটে — তাহলে তাকে কর্মসূচী সূত্রবদ্ধ করার জন্য পূর্বগামীদের শরণাপন্ন হতে হবে এবং তা করতে গেলে প্রুধোঁকে এড়ানো হবে প্রায় অসম্ভব।

'বাস-সংস্থান সমস্যার' বড় বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া উভয় সমাধানেরই মূলকথা এই যে, শ্রমিক হবে তার নিজ বাসগৃহের মালিক। গত বিশ বছর ধরে জার্মানিতে যে শিল্প বিকাশ হয়েছে, তাতে কিন্তু ব্যাপারটা এক অতি অদ্ভুত আলোকে প্রতিভাত হয়েছে। জার্মানি ছাড়া অন্য কোনো দেশে এত অধিকসংখ্যক মজুরি-শ্রমিককে শুধু বাসগৃহ নয়, এমন কি বাগান ও খামারের মালিক হতে দেখা যায় না। এই শ্রমিকেরা ছাড়াও আরও বহুলোক রয়েছে যারা বাস্তবপক্ষে মোটামুটি সুনিশ্চিত দখলের শর্তে প্রজা হিসাবে বাড়ি, বাগান বা খামারের অধিকারী। জার্মানির নতুন বৃহদায়তন শিল্পের ব্যাপক ভিত্তিই হল সব্‌জির চাষ বা ক্ষুদে কৃষি-খামারের সঙ্গে সম্মিলিত গ্রামীণ গৃহ-শিল্প। পশ্চিমাংশে শ্রমিকেরা সাধারণত নিজ বাসগৃহের মালিক, পূর্বাংশে তারা

* ক্যাথিডার-সমাজবাদ — ঊনিশ শতকের অষ্টম-নবম দশকে উদ্ভূত বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের একটি ধারা। এই ধারার প্রবক্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের মঞ্চ থেকে সমাজতন্ত্রের ভেক নিয়ে প্রচার করতেন বুর্জোয়া-উদারনৈতিক সংস্কারবাদ। — সম্পাঃ

প্রধানত প্রজা। রাইন অঞ্চলের উত্তরাংশে, ভেস্তফালিয়ায়, সাক্‌সন এর্ৎসগেবির্গে এবং সিলেসিয়ায়, যেখানে কলের তাঁতের বিরুদ্ধে হাতের তাঁত এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, শুধু সেখানেই নয়; যেখানেই কোন না কোন ধরনের গৃহশিল্প গ্রামীণ উপজীবিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, দৃষ্টান্তস্বরূপ থুরিংগীয়ান অরণ্যাঞ্চলে ও রোন এলাকাতে, সেখানেও গৃহশিল্পের সঙ্গে শাকসব্‌জির চাষ ও কৃষির সেই সম্মেলন এবং সেইহেতু একটা সুনিশ্চিত বাস-সংস্থান দেখতে পাওয়া যায়। চুরুট তৈরির কাজ যে কত ব্যাপকভাবে গ্রামীণ গৃহশিল্প হিসাবে চলছিল, সে কথা তামাকের একচেটিয়া সম্বন্ধে আলোচনার সময়ই দেখা গিয়েছিল। যখনই ক্ষুদে কৃষকদের মধ্যে দুর্দশা ছড়িয়ে পড়ে, যেমন হয়েছিল কয়েক বছর আগে আইফেল এলাকায়, তখনই বুর্জোয়া সংবাদপত্র এই বলে চেঁচাতে থাকে যে, উপযুক্ত গৃহশিল্পের প্রবর্তনই হল এর একমাত্র প্রতিষেধক। বস্তুত জার্মানিতে ক্ষুদে জমির কৃষকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অভাব অনটন এবং জার্মান শিল্পের সাধারণ পরিস্থিতি উভয়েই গ্রামীণ গৃহশিল্পের নিরবচ্ছিন্ন বিস্তারের প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে। এটা একান্তভাবেই জার্মানির বৈশিষ্ট্য। ফ্রান্সে এ ধরনের পরিস্থিতি কচিৎ-কদাচিত দেখা যায়, যেমন রেশম চাষের এলাকায়। ইংলণ্ডে যেখানে ক্ষুদে কৃষকই নেই, সেখানে গ্রামীণ গৃহশিল্প কৃষি-মজুরদের স্ত্রীপুত্রের শ্রমের উপর নির্ভরশীল। একমাত্র আয়র্ল্যাণ্ডেই দেখা যায় যে, জার্মানির মতো খাঁটি কৃষক পরিবারবর্গ পোশাক তৈরির গ্রামীণ গৃহশিল্পকে চালু রেখেছে। রাশিয়া ও অন্যান্য যে সব দেশ বিশ্বের শিল্প-বাজারের শরিক নয়, স্বভাবতই তাদের কথা আমরা এই প্রসঙ্গে তুলছি না।

সুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রে জার্মানির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে পরিস্থিতি আজ বিদ্যমান, তাকে, প্রথম নজরে, যন্ত্রপ্রবর্তনের পূর্বে সাধারণভাবে যে অবস্থা ছিল তার অনুরূপ বলে মনে হবে। কিন্তু শুধু প্রথম নজরেই একথা মনে হয়। শাকসব্‌জির বাগান ও কৃষির সঙ্গে অতীতকালের গ্রামীণ গৃহশিল্পের এই সম্মেলন, যে সকল দেশে শিল্পের প্রসার ঘটছিল অন্তত পক্ষে সেই সব দেশে, শ্রমিক শ্রেণীর মোটামুটি সহনযোগ্য, এমন কি কোথাও কোথাও খানিকটা সচ্ছল বৈষয়িক পরিস্থিতির ভিত্তিস্বরূপ ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে তা ছিল তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক অকিঞ্চিৎকরতারও ভিত্তি। হাতে তৈরী সামগ্রী এবং তার উৎপাদন-খরচই বাজারদর নির্ধারণ করত। আর আজকের তুলনায় শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা যৎসামান্য থাকায় জোগানের চাইতে বাজার সাধারণত বেড়ে চলত দ্রুততর তালে। ইংলণ্ডের এবং অংশত ফ্রান্সের ক্ষেত্রে, এ কথা বিগত শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি নাগাদ সত্য ছিল, বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পে। জার্মানি কিন্তু তখন সবেমাত্র ত্রিশ বছরের যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক ফলাফল কাটিয়ে উঠে চরম প্রতিকূল অবস্থায় একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছিল, তাই সেখানে অবস্থা ছিল অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন

ধরনের। জার্মানিতে সে সময়ে একটি মাত্র গৃহশিল্প ছিল, যা দুনিয়ার বাজারের জন্য উৎপন্ন করত — লিনেন বয়ন। সে শিল্প আবার কর এবং সামন্ততান্ত্রিক আদায়ের ভারে এতই ভারাক্রান্ত থাকে যে, কৃষক তন্তুবায়দের অবস্থা অন্যান্য কৃষকদের অতি নিচু মান থেকে বিশেষ উন্নত ছিল না। কিন্তু তাসত্ত্বেও সে সময় গ্রামের শিল্প শ্রমিকেরা জীবনে খানিকটা নিরাপত্তা ভোগ করত।

যন্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর সবকিছুই বদলে গেল। এখন বাজারদর নির্ধারিত হতে লাগল যন্ত্রজাত পণ্যের দ্বারা এবং এই দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে গৃহশিল্পের শ্রমিকদের মজুরিও পড়তে থাকে। যাই হোক, শ্রমিককে হয় এই পরিস্থিতি মেনে নিতে হত, নয় তো বার হতে হত অন্য ধরনের কাজ কর্মের খোঁজে। প্রলেতারিয়েতে পরিণত না হয়ে. অর্থাৎ, নিজস্বই হোক বা পত্তনী নেওয়াই হোক, কুটীরখানি এবং বাগান ও ক্ষেতটি না ছাড়লে তা করা যায় না। বিরলতম ক্ষেত্রেই শুধু সে এই পথ গ্রহণ করতে সম্মত হত। জার্মানিতে কলের তাঁতের বিরুদ্ধে হাতের তাঁতের লড়াই যে সর্বত্র এত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এবং আজও যে তার নিষ্পত্তি হয়নি, তার কারণই পুরানো গ্রামীণ তন্তুবায়দের শাকসব্জির বাগান ও কৃষি। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই এই সত্য প্রথম আত্মপ্রকাশ করে -- বিশেষ করে ইংলণ্ডে -- যে, উৎপাদনের উপায়ের উপর নিজের মালিকানা, এই যে পরিস্থিতি অতীতে এক সময়ে শ্রমিকদের আপেক্ষিক স্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তি হয়েছিল. ঠিক তাই বর্তমানে তাদের বিঘ্ন ও দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে কলের তাঁতের কাছে তাদের হাতের তাঁত পরাজিত হল, কৃষিক্ষেত্রে বৃহদায়তন খামার দ্বারা এদের ক্ষুদে চাষ হল বিতাড়িত। কিন্তু উৎপাদনের এই উভয় ক্ষেত্রেই বহু ব্যক্তির যৌথ শ্রম এবং যন্ত্র ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ সামাজিক প্রথায় পরিণত হলেও তখনও শ্রমিক তাদের কুটীরটি, বাগানটি, খামারটি ও হাতের তাঁতটি মারফৎ মান্ধাতার আমলের ব্যক্তিগত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কায়িক শ্রমের সঙ্গে শৃঙ্খলিত থাকছিল। চলাচলের পূর্ণ স্বাধীনতার (vogelfreie Beweglichkeit) তুলনায় বাড়ি-বাগানের মালিকানা অনেক কম সুবিধাজনক হয়ে পড়েছে। ধীরগতিতে, কিন্তু সুনিশ্চিতভাবেই অনাহারের সম্মুখীন এই ধরনের গ্রামীণ তন্তুবায়দের সঙ্গে কোনো কারখানা-মজুরই স্থান পরিবর্তনে রাজী হত না।

বিশ্ববাজারে জার্মানি অনেক বিলম্বে প্রবেশ করেছে। আমাদের বৃহদায়তন শিল্পের শুরু মাত্র পঞ্চম দশকে, তার প্রথম প্রেরণা আসে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব থেকে; ১৮৬৬ ও ১৮৭০* সালের বিপ্লব দুটি এর পথের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর রাজনৈতিক

* 'লৌহ ও রক্তের' নীতির মাধ্যমে, কূটচক্রান্ত ও যুদ্ধের সাহায্যে প্রাশিয়ার শাসক শ্রেণীগুলি কর্তৃক বলপ্রয়োগে জার্মানির ঐক্যবিধানের কথা বলা হচ্ছে। ১৮৬৬ সালে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রাশিয়ার

বাধাগুলি অপসারণ করে দেওয়ার পরই এর পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়। কিন্তু দেখা গেল যে, বিশ্ববাজারের অধিকাংশই ইতিমধ্যে দখল হয়ে আছে। ব্যাপক জনসাধারণের ভোগ্যবস্তুর জোগান দিচ্ছে ইংলন্ড, এবং রুচিরম্য বিলাসসামগ্রী আসছে ফ্রান্স থেকে। জার্মানি দরের দিক থেকে ইংলন্ডের সঙ্গে আর উৎকর্ষের ব্যাপারে ফ্রান্সের সঙ্গে এ'টে উঠতে পারেনি। অতি নগণ্য বলে ইংলন্ড এবং খুব বাজে বলে ফ্রান্স যা ধরবে না, সেই ধরনের জিনিসপত্র উৎপাদন করবার যে চিরাচরিত দস্তুর জার্মানিতে এতদিন চলে এসেছে, তাই নিয়ে বিশ্ববাজারে কোনক্রমে অনুপ্রবেশ করা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। প্রথমে ভাল নমুনা এবং পরে খারাপ মাল পাঠিয়ে প্রতারণার যে প্রথাটা জার্মানির প্রিয় সেটা অবশ্য অবিলম্বে বিশ্ববাজারে যথেষ্ট কঠোর সাজা পাওয়াতে মোটামুটিভাবে পরিত্যক্ত হল। পক্ষান্তরে অত্যুৎপাদনজনিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সম্ভ্রান্ত ইংরেজরাও জিনিসপত্রের উৎকর্ষহ্রাসের রাস্তা ধরে নামতে বাধ্য হয়; আর এর ফলে সুবিধা হয় জার্মানদেরই, এ ব্যাপারে যাদের জুড়ি নেই। এইভাবে অবশেষে আমরা বৃহদায়তন শিল্পের অধিকারী হলাম এবং বিশ্ববাজারে ভূমিকা গ্রহণ করাটাও সম্ভব হল। কিন্তু আমাদের **বৃহদায়তন** শিল্প প্রায় সম্পূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য উৎপাদনে নিযুক্ত (লৌহশিল্প এর ব্যতিক্রম, তার উৎপাদন আভ্যন্তরীণ চাহিদার চাইতে অনেক বেশী), আর আমরা ব্যাপকভাবে রপ্তানি করি শুধু অসংখ্য ছোটখাট জিনিস, যা আসে প্রধানত গ্রামীণ গৃহশিল্প থেকে — বৃহদায়তন শিল্প তাকে জোগান দেয় বড় জোর প্রয়োজনীয় অর্ধ সমাপ্ত মাল মাত্র।

আধুনিক শ্রমিকের পক্ষে বাড়ি এবং জমির মালিকানা যে কী 'আশীর্বাদ,' তার গৌরবোজ্জ্বল চিত্র এখানেই দেখা যাবে। জার্মান গৃহশিল্পে যে কুখ্যাত নিচু হারে মজুরি দেওয়া হয়, আর কোথায়ও, এমন কি সম্ভবত আইরিশ গৃহশিল্পেও, তা দেখা যায় না। শ্রমিকদের পরিবার নিজস্ব ক্ষুদ্র বাগান বা ক্ষেত থেকে যেটুকু আয় করে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে পুঁজিপতিরা শ্রমশক্তির দাম থেকে সেটুকু কেটে নিতে সক্ষম হয়। যে ফুরন মজুরি দিতে চাওয়া হয়, শ্রমিকেরা তাই গ্রহণ করতে বাধ্য, কেন না অন্যথায় তারা কিছুই পাবে না আর শুধু কৃষির উৎপাদন দিয়ে তারা বাঁচতে পারে না; আবার অন্যদিকে এই কৃষি ও জমির মালিকানাই তাদের এক জায়গায় শৃঙ্খলিত করে রাখে, অন্য কোন কাজের সন্ধানে তাদের ইতস্তত ঘোরাফেরার পথ রাখে বন্ধ করে। এক গাদা ছোটখাট জিনিসে বিশ্ববাজারে জার্মানির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সামর্থ্যের ভিত্তি এখানেই। **মুনাফার সবটাই হল স্বাভাবিক মজুরি থেকে কেটে নেওয়া একটি অংশ এবং উদ্বৃত্ত**

যুদ্ধের ফলে গড়ে ওঠে উত্তর-জার্মান ইউনিয়ন, আর ১৮৭০—১৮৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের পর স্থাপিত হয় জার্মান সাম্রাজ্য। — সম্পাঃ

মূল্যের সবটাই ক্রেতাকে উপঢৌকন দেওয়া যায়। জার্মানির অধিকাংশ রপ্তানিদ্রব্যের অসাধারণ সুলভ মূল্যের এই হল গূঢ় কারণ।

অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত জার্মান শ্রমিকদেরও মজুরি এবং জীবিকার মান যে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় নিম্নতর, তার জন্য অন্য যে কোন কারণ অপেক্ষা এই পরিস্থিতিই অধিকতর পরিমাণে দায়ী। শ্রমশক্তির মূল্যের অনেক নিচে চিরাচরিতভাবে দাবিয়ে রাখা শ্রমের এই বাজারদরের জগদ্দল বোঝা শহুরে শ্রমিকদের, এমন কি, মহানগরীর শ্রমিকদেরও মজুরিকে শ্রমশক্তির মূল্যের নিচে নামিয়ে দেয়; এইরকম ঘটবার আরও একটা বড় কারণ হল এই যে, নিম্ন মজুরির গৃহশিল্প শহরাঞ্চলেও প্রাচীন হস্তশিল্পের স্থান দখল করেছে এবং এক্ষেত্রেও মজুরির সাধারণ হারকে নীচে নামিয়ে দিচ্ছে।

এইখানেই আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, কৃষি ও শিল্পের সম্মিলন, বাড়ি, বাগান ও ক্ষেতের মালিকানা এবং বাসস্থানের নিশ্চয়তা, ইতিহাসের পূর্বতন স্তরে যা শ্রমিকদের আপেক্ষিক সচ্ছলতার ভিত্তি ছিল, তাই আজ বৃহদায়তন শিল্পের আধিপত্যের যুগে শ্রমিকটির পক্ষে শুধু জঘন্যতম বাধা মাত্র নয়, গোটা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষেই এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিদারুণ অভিশাপ, মজুরিকে তার স্বাভাবিক মানের অনেক নিচে নামিয়ে রাখার ভিত্তি এবং তা শুধু কোন বিচ্ছিন্ন জেলায় বা শিল্পে নয়, সমগ্র দেশেই। এই রকম অস্বাভাবিকভাবে মজুরি কেটে যারা বেঁচে থাকে এবং তা থেকে ধনী হয়, সেই বড় বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়ারা যে গ্রামীণ শিল্প ও শ্রমিকদের নিজস্ব বাড়ির মালিকানা সম্বন্ধে উৎসাহী হবে, তারা নতুন গৃহশিল্প প্রবর্তনকেই পল্লীজীবনের সকল দুর্দশার একমাত্র প্রতিষেধ হিসাবে গণ্য করবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

এ হল সমস্যার একটা দিক; এর বিপরীত দিকও আছে। গৃহশিল্প জার্মান রপ্তানি-বাণিজ্যের এবং তার ফলে সমগ্র বৃহদায়তন শিল্পেরই ব্যাপক ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে সেই গৃহশিল্প জার্মানির ব্যাপক এলাকায় বিস্তৃত হয়েছে এবং প্রতিদিন আরও প্রসারিত হয়ে চলছে। যখন থেকে সস্তা কাপড়-চোপড় ও মেশিনজাত জিনিসপত্র ক্ষুদে কৃষকের নিজের ভোগ্য সামগ্রীর গার্হস্থ্য উৎপাদন ধ্বংস করেছে; যখন মার্ক প্রথার ভাঙন আর সাধারণ মার্ক ও বাধ্যতামূলক ফসল আবর্তনের অবসানের ফলে তার গো-পালন ও তজ্জনিত সার উৎপাদন ধ্বংস হয়েছে, তখন থেকেই ক্ষুদে কৃষকের সর্বনাশ হয়ে পড়েছে অনিবার্য। সুদখোরের শিকারে পরিণত ক্ষুদে কৃষককে আধুনিক গৃহশিল্পের কোলে টেনে আনে এই সর্বনাশই। আয়র্ল্যান্ডের জমিদারের ভূমিখাজনার মতোই জার্মানির বন্ধকী সুদখোরদের-প্রাপ্য সুদটাও জমির ফলন থেকে পরিশোধ করা যায় না, শোধ করতে হয় গৃহশিল্পরত কৃষকের মজুরি থেকেই। এদিকে গৃহশিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটির পর একটি কৃষক-এলাকা আধুনিক শিল্প-

আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। ইংলন্ডে ও ফ্রান্সে যা ঘটেছিল তার চেয়ে অনেক বিস্তীর্ণতর অঞ্চলে জার্মানির শিল্পবিপ্লব ছড়িয়ে পড়ছে গৃহশিল্প মারফত গ্রাম এলাকার এই বিপ্লবীকরণের জন্যই; আমাদের শিল্পের স্তর অপেক্ষাকৃত নিচু বলেই এর এলাকাগত প্রসারলাভটা আরও বেশী প্রয়োজন। বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মতো শুধু মাত্র শহর অঞ্চলে সীমিত না থেকে জার্মানির ব্যাপকতম অংশে অমন প্রচন্ডভাবে যে ছড়িয়ে পড়েছে, তার ব্যাখ্যাও রয়েছে এর মধ্যে। তা থেকেও আবার আন্দোলনের প্রশান্ত, নিশ্চিত এবং অদম্য অগ্রগতিরও ব্যাখ্যা মিলছে। একথা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট যে জার্মানিতে অধিকাংশ ক্ষুদ্রতর শহর এবং গ্রামীণ জেলাগুলির বৃহদংশ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য সুপ্রস্তুত হয়ে উঠলেই একমাত্র তখনই রাজধানী ও অন্যান্য বড় শহরগুলিতে বিজয়ী অভ্যুত্থান সম্ভবপর। স্বাভাবিক ধরনের বিকাশ ধরে নিলে, ১৮৪৮ ও ১৮৭১ সালের প্যারিসীয়দের অনুরূপ শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়লাভের মতো অবস্থায় আমরা কখনই পেঁছিব না; ঠিক ঐ কারণেই আবার দুই দুই বার প্যারিসে যা ঘটেছে. প্রতিক্রিয়াশীল মফস্বল এলাকার কাছে বিপ্লবী রাজধানীর সেইরকম পরাজয়ও আমাদের ভোগ করতে হবে না। ফ্রান্সে আন্দোলন সর্বদাই রাজধানীতে শুরু হয়েছে: জার্মানিতে শুরু হয়েছে বৃহদায়তন শিল্পের, হস্তশিল্প কারখানার ও গৃহশিল্পের এলাকাগুলিতে, রাজধানী জয় করেছে পরে। সুতরাং ভবিষ্যতেও সম্ভবত উদ্যোগ থেকে যাবে ফরাসীদের হাতেই, কিন্তু ফয়সালার লড়াই জেতা সম্ভব কেবল জার্মানিতেই।

প্রসারের ফলে এই যে গ্রামীণ গৃহশিল্প ও হস্তশিল্প কারখানা আজ জার্মান উৎপাদনের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শাখায় পরিণত হয়েছে, এবং ক্রমশ বেশী বেশী করে এইভাবে সম্পন্ন করছে জার্মান কৃষকের বৈপ্লবিক পরিবর্তন, তা কিন্তু অধিকতর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। মার্কস ('পুঁজি' প্রথম খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৪৮৪—৪৯৫) ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছেন যে, ক্রমবিকাশের কোন এক বিশেষ স্তরে মেশিন ও ফ্যাক্টরি উৎপাদনের দরুন এ অবস্থার পতনের ক্ষণ ঘনিয়ে আসবে। সেই সময় মনে হয় আগতপ্রায়। কিন্তু জার্মানিতে মেশিন ও ফ্যাক্টরি উৎপাদন দ্বারা গ্রামীণ গৃহ ও হস্তশিল্প-কারখানার ধ্বংসের মানে হবে লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ উৎপাদকের জীবিকার ধ্বংস, জার্মান ক্ষুদ্র কৃষককুলের প্রায় অর্ধাংশের উচ্ছেদ; শুধু গৃহশিল্পের ফ্যাক্টরি শিল্পে রূপান্তর নয়, কৃষকের খোদ খামারের রূপান্তর বৃহদায়তন ধনতান্ত্রিক কৃষিতে, ছোট ছোট জোতজমির রূপান্তর বৃহদায়তন মহালে, — অর্থাৎ কৃষকের স্বার্থের মূল্যে পুঁজি ও ভূমিমালিকানার স্বার্থে শিল্প ও কৃষিবিপ্লব। যদি পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার আওতাতেই এই রূপান্তর জার্মানির ভাগ্যে থেকে থাকে, তবে তা নিঃসন্দেহেই হবে এক মোড়

পরিবর্তন। ততদিনে যদি অন্য কোন দেশের শ্রমিক শ্রেণী উদ্যোগ গ্রহণ না করে, তবে জার্মানিই প্রথম আঘাত হানবে আর 'গৌরবোজ্জ্বল সৈন্যবাহিনীর' কৃষকসন্তানগণ সে কাজে সহায়তা করবে বীরত্বের সঙ্গেই।

আর সেই সঙ্গে, প্রত্যেক শ্রমিককে তার নিজস্ব কুটীরটির মালিকানা দান করে আধা-সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় তাকে তার নির্দিষ্ট পুঁজিপতিটির সঙ্গে শৃঙ্খলিত করে রাখার বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া এই ইউটোপিয়ার এক ভিন্নতর তাৎপর্য প্রকাশ পাচ্ছে। এর বাস্তব রূপায়নের বদলে ঘটবে ছোট ছোট গ্রামীণ বাসগৃহ মালিকদের গৃহশিল্পের শ্রমিকে রূপান্তর; পুরানো বিচ্ছিন্নতার অবসান এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদে কৃষকের রাজনৈতিক অকিঞ্চিৎকরতার ধ্বংসসাধন, তাদের 'সামাজিক ঘূর্ণাবর্তের' মধ্যে আকর্ষণ; গ্রামাঞ্চলে শিল্প-বিপ্লবের প্রসারলাভ এবং তার ফলে জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা স্থিতিশীল ও সনাতনপন্থী অংশটার পরিণতি বিপ্লবের লালনাগারে; এবং এই সব কিছুর চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে গৃহশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মেশিন দ্বারা উচ্ছেদ, যে উচ্ছেদ তাদের জোর করে ঠেলে দেবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে।

বুর্জোয়া সমাজবাদী মানবহিতৈষীগণ যতদিন পুঁজিপতি হিসাবে তাদের সামাজিক কার্যক্রম মারফৎ, সমাজ বিপ্লবের উপকার ও অগ্রগতির জন্য তাদের আদর্শটাকে উপরোক্ত উল্টা কায়দায় রূপায়িত করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে, ততদিন ব্যক্তিগতভাবে তাদের সে আদর্শ উপভোগ করতে দিতে আমরা স্বতঃই রাজি থাকব।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১০ই জানুয়ারি, ১৮৮৭
জুরিখ থেকে ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত 'বাস সংস্থান সমস্যার' দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

পুস্তকের পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত
জার্মান থেকে অনুবাদের ভাষান্তর

বাস-সংস্থান সমস্যা

প্রথম ভাগ

প্রুধোঁ কী ভাবে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করেন

Volksstaat পত্রিকার ১০ম ও তার পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে বাস-সংস্থান সমস্যা সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত ছয়টি প্রবন্ধ দেখতে পাওয়া যাবে। প্রবন্ধগুলি শুধু এই কারণেই প্রণিধানযোগ্য যে, দীর্ঘকালবিস্মৃত পঞ্চম দশকের কিছু হবু-সাহিত্যিক রচনাবলীর কথা বাদ দিলে, এইগুলিই জার্মানিতে প্রুধোঁবাদী চিন্তাধারা আমদানির প্রথম প্রচেষ্টা। এমন কি পঁচিশ বছর আগেই ঠিক এই প্রুধোঁবাদের ধারণাকে চরম আঘাত হেনেছিল* যে জার্মান সমাজতন্ত্র, তার সমগ্র বিকাশ ধারার তুলনায় বর্তমান প্রচেষ্টা এতই বিরাট পশ্চাৎগতিস্বরূপ যে অবিলম্বে এর জবাব দেওয়া প্রয়োজন।

যে তথাকথিত বাসস্থানাভাবের কথা আজকাল সংবাদপত্রে এত বড় ভূমিকা গ্রহণ করছে, তার স্বরূপ কিন্তু এই নয় যে শ্রমিক শ্রেণী সাধারণত খারাপ, ঘিঞ্জি এবং অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করে। **এই** অভাব বর্তমান সময়ের কোনো একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়: এমন কি, পূর্বেকার সকল শোষিত শ্রেণীর তুলনায় আধুনিক প্রলেতারিয়েতকে যে সকল বিশিষ্ট দুঃখভোগ করতে হয়, এটা তারও অন্যতম নয়। বরং উল্টো, সব যুগে সকল উৎপীড়িত শ্রেণীই অনেকটা সমভাবেই এই দুর্দশা ভোগ করেছে। **এই** বাসস্থান-সঙ্কট অবসানের **একটিই** উপায় আছে: শাসক শ্রেণী দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ ও উৎপীড়নের সম্পূর্ণ অবসান। আজকের দিনে বাসস্থানের অভাব বোঝায় বড় বড় শহরের দিকে জনসংখ্যা হঠাৎ ধাওয়া করার ফলে মজুরদের বাসস্থানের শোচনীয় পরিস্থিতির বিশেষ ধরনের অবনতি; দারুণ ভাড়াবৃদ্ধি, প্রতিটি গৃহে আরও ঘেঁষাঘেঁষি,

* মার্কসের লেখা 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে, ব্রাসেল্স্ ও প্যারিস, ১৮৪৭। (এঙ্গেলসের টীকা।)

কারও কারও পক্ষে আদৌ মাথা গুঁজবার ঠাঁই পাবার অসম্ভাব্যতা। এবং **এই** বাসাভাব নিয়ে যে এত কথা বলা হচ্ছে, তার কারণ হল এটা আজ আর শুধু শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পেটি বুর্জোয়াকেও স্পর্শ করেছে।

আমাদের আধুনিক মহানগরীগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী ও পেটি বুর্জোয়ার একাংশ যে বাসস্থানের অভাবে ভুগছে, তা হল আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত অগণ্য, **ছোটখাট** গৌণ কুফলের অন্যতম। এটা মোটেই পুঁজিপতি দ্বারা শ্রমিক **হিসাবে** শ্রমিক শোষণের প্রত্যক্ষ ফল নয়। এই শোষণই হচ্ছে সেই মূল অভিশাপ, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে সমাজ-বিপ্লব যার অবসান আনতে চায়। আর পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিমূল হচ্ছে এই যে, আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ফলে পুঁজিপতির পক্ষে যথার্থ মূল্যে শ্রমিকের শ্রমশক্তি কিনে নিয়ে তা থেকে অনেক বেশী মূল্য আদায় করে নেওয়া সম্ভব হয় - শ্রমশক্তির ক্রয় বাবদ যে দাম দেওয়া হয়েছে তা পুনরুৎপাদন করতে যে সময় কাজ করতে হয়, তদপেক্ষা দীর্ঘতর কালের জন্যে তাকে খাটিয়ে। এইভাবে যে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন হচ্ছে, তা পোপ ও কাইজার থেকে শুরু করে নৈশ চৌকিদার ও অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত বেতনভুক্ ভৃত্যসহ সমগ্র পুঁজিপতি ও ভূস্বামী শ্রেণীর মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হয়। কী ভাবে এই ভাগবাটোয়ারা সম্পন্ন হয়, সেটা এই প্রসঙ্গে আমাদের বিবেচ্য নয়, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত: যারা কাজ করে না, তারা সকলেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে কেবল এই উদ্বৃত্ত মূল্যের উচ্ছিষ্টে, কোনো না কোনো ভাবে এ উচ্ছিষ্ট তাদের কাছে এসে পৌঁছয়। (সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব যেখানে বিবৃত করা হয়েছিল, মার্কসের সেই 'পুঁজি' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক উৎপাদিত এবং কোনরূপ পারিশ্রমিক না দিয়ে তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত এই উদ্বৃত্ত মূল্যের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে অ-শ্রমিক শ্রেণীগুলির মধ্যে যে ঝগড়াঝাঁটি ও পারস্পরিক প্রতারণা চলে, তা খুবই শিক্ষাপ্রদ। কেনাবেচার মাধ্যমে এই বাটোয়ারা যতখানি চলে, তার ভিতর বিক্রেতার দ্বারা ক্রেতাকে ঠকানো হল এর অন্যতম প্রধান পন্থা: খুচরা কেনাবেচায়, বিশেষ করে বড় বড় শহরগুলিতে এই ধরনের প্রবঞ্চনা বিক্রেতার অস্তিত্ব বজায় রাখবার অপরিহার্য শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন শ্রমিক যখন কেনা জিনিসের দর বা উৎকর্ষের ব্যাপারে মুদি বা রুটিওয়ালার দ্বারা প্রতারিত হয়, তখন কিন্তু সে ঠিক শ্রমিক হিসাবে প্রতারিত হচ্ছে না। পরন্তু, যখন কোথাও ঠকানোর গড়পড়তা পরিমাণ সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়, সেখানে শেষ পর্যন্ত একটা পাল্টা মজুরিবৃদ্ধি দিয়ে তার মীমাংসা হতে বাধ্য। দোকানদারের কাছে শ্রমিক ক্রেতা হিসাবে, অর্থাৎ অর্থের বা ক্রেডিটের মালিক হিসাবেই হাজির হয়, সুতরাং

সে সেখানে মোটেই শ্রমিক হিসাবে অর্থাৎ শ্রমশক্তির বিক্রেতারূপে উপস্থিত হচ্ছে না। এই ধরনের ঠকানি তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, অধিকতর ধনশালী সামাজিক শ্রেণীগুলির তুলনায় গোটা দরিদ্র সম্প্রদায় হিসাবে তাকে বেশী করে আঘাত করতে পারে; কিন্তু এটা এমন একটা অভিশাপ নয় যা কেবল তাকেই আঘাত করছে, যা তার শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য।

বাস-সংস্থানের অভাব সম্বন্ধেও এই একই কথা। আধুনিক বড় বড় শহরগুলির প্রসারের ফলে, শহরের কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত জমির দর কৃত্রিমভাবে এবং প্রায়ই প্রচণ্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সকল অঞ্চলে অবস্থিত দালানকোঠা কিন্তু বাড়ানোর পরিবর্তে এই মূল্যকে কমিয়ে দেয়, কেননা সেগুলি আর পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় না। এদের তখন ভেঙে ফেলে সে জায়গায় বানানো হয় নতুন ঘরবাড়ি। এমন ঘটনা সব থেকে বেশী ঘটে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত শ্রমিকদের বসতিস্থল নিয়ে, কেননা, যতই ঘিঞ্জি হোক না কেন, এদের ভাড়া বিশেষ একটা নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ পরিমাণের বেশী আর বাড়তে পারে না, বাড়লেও অতি ধীর গতিতে বাড়ে। এইসব ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলে সে জায়গায় নির্মিত হয় দোকান, গুদাম ও সামাজিক ভবন। প্যারিসে তার অসমাঁ-র মারফৎ বোনাপার্টপন্থা এর সুযোগ নিয়ে প্রচণ্ড প্রতারণা ও ব্যক্তিগত ধনবৃদ্ধি করে নিয়েছিল। কিন্তু অসমাঁ-র আত্মা বিচরণ করেছে বিদেশেও, লণ্ডন, ম্যানচেস্টার ও লিভারপুলে; বার্লিন বা ভিয়েনাতেও সে সমান স্বচ্ছন্দ বোধ করে। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, শ্রমিকেরা শহরের কেন্দ্র থেকে উপান্ত অভিমুখে বিতাড়িত হয়েছে; শ্রমিকদের বাসস্থান এবং সাধারণভাবে ছোট বাসাসমূহই দুষ্প্রাপ্য এবং ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠেছে, অনেকক্ষেত্রে পাওয়া হয়েছে একেবারে অসম্ভব; কেননা, এই পরিস্থিতিতে ব্যয়বহুল বাসভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে দাঁও মারার বেশী সুযোগ পাওয়ার ফলে গৃহনির্মাণ-শিল্প শ্রমিকদের জন্য বাড়ি বানায় শুধু ব্যতিক্রম হিসাবেই।

অতএব, বাসস্থানের এই অভাবটা অধিকতর সমৃদ্ধিশালী শ্রেণীর তুলনায় শ্রমিক শ্রেণীকে তীব্রতর ভাবে আঘাত করলেও, দোকানদার কর্তৃক প্রতারণার মতোই এতে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই ভারাক্রান্ত হয় না; আবার শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে এই অভিশাপ এক বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছলে এবং খানিকটা স্থায়ী চরিত্র ধারণ করলে তার একটা অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যবিধান হতে বাধ্য।

এ ধরনের যে দুর্দশাভোগে শ্রমিক শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর, বিশেষ করে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গী, পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র সেই ধরনের সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামানো পছন্দ করে, আর প্রুধোঁ এই পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের অন্তর্গত। বাস-

সংস্থান সমস্যা যে শ্রমিক শ্রেণীর একান্ত নিজস্ব কোনো সমস্যা নয়, তা আমরা দেখেছি; কিন্তু আমাদের জার্মান প্রুধোঁবাদী যে ঠিক এই সমস্যাটিই আঁকড়ে ধরছেন এবং একে সত্যই একান্তভাবে শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা বলে ঘোষণা করছেন, তা মোটেই আকস্মিক নয়।

'পুঁজিপতির সঙ্গে **মজুরি শ্রমিকের** যে সম্পর্ক, **বাড়ির মালিকের** সঙ্গে **ভাড়াটের** সম্পর্কটাও ঠিক তাই।'

কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য।

বাস-সংস্থান সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা দুই পক্ষকে মুখোমুখি দেখতে পাই: ভাড়াটে ও জমিদার বা বাড়ির মালিক। প্রথমোক্ত জন শেষোক্তের কাছ থেকে বাসগৃহটি সাময়িকভাবে ব্যবহারের অধিকার কিনতে চায়; ভাড়াটে অর্থ বা ক্রেডিটের মালিক, যদিও হয় তো বা বর্ধিত ভাড়ারূপে চড়া সুদ দিয়ে বাড়ির মালিকের কাছ থেকেই সে ক্রেডিট তাকে কিনে নিতে হয়। এ হল সরল পণ্য বিক্রয়; প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে, শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে লেনদেন এটা নয়। ভাড়াটে যদি শ্রমিকও হয়, তবু এ ক্ষেত্রে সে **পয়সাওয়ালা লোক** হিসাবেই আবির্ভূত হচ্ছে; বাসস্থান ব্যবহারের খরিদ্দার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে হলে, তাকে ইতিমধ্যেই তার পণ্য, তার একান্ত নিজস্ব পণ্য, অর্থাৎ তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করে টাকা আনতে হয়েছে, অথবা এই নিশ্চয়তাটুকু দিতে পারার মতো তার সামর্থ্য আছে যে অদূর ভবিষ্যতে সে তার শ্রমশক্তি বেচবে। পুঁজিপতির কাছে শ্রমশক্তি বেচার মধ্যে যে বিশিষ্ট ফলাফল দেখা দেয়, তা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। পুঁজিপতি প্রথমত ক্রীত শ্রমশক্তির নিজ মূল্য এবং অতঃপর উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করায়, সেই উদ্বৃত্ত মূল্য আবার পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে ভাগবাটোয়ারা সাপেক্ষে আপাতত তার হাতেই থাকে। সুতরাং এখানে একটা অতিরিক্ত মূল্য উৎপন্ন হচ্ছে, উপস্থিত মূল্যের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাড়া লেনদেনের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। বাড়ির মালিক ভাড়াটের কাছ থেকে ঠকিয়ে যতই আদায় করুক না কেন, সবকিছু সত্ত্বেও এখানে ইতিমধ্যে **বিদ্যমান** ও ইতিপূর্বে **উৎপন্ন মূল্যেরই হস্তান্তর** হচ্ছে, বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটের **মিলিত আয়ত্তে** যে মূল্য ছিল, তার যোগফল অপরিবর্তিতই আছে। তার শ্রমের জন্যে পুঁজিপতি কম, বেশি বা সমান যে মূল্যই দিক শ্রমিক সর্বদাই তার শ্রমজাত সামগ্রীর একাংশ থেকে প্রবঞ্চিত হয়। ভাড়াটে প্রবঞ্চিত হয় শুধু তখনই যখন সে বাসস্থানের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা বেশি দিতে বাধ্য হয়। সুতরাং বাড়ির মালিক ও ভাড়াটের সম্পর্ককে শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে সম্পর্কের সমতুল্য করে দেখাবার চেষ্টা করলে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিকৃত করে দেখানো হয়। পক্ষান্তরে এখানে আমরা দুইটি নাগরিকের মধ্যে অতি সাধারণ পণ্য

লেনদেনের দৃষ্টান্ত পাই; সাধারণভাবে কেনাবেচা, এবং বিশেষ করে 'ভূসম্পত্তির' ক্রয়বিক্রয় যা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, এই লেনদেন সেই সব অর্থনৈতিক নিয়ম অনুযায়ীই চলে। এই লেনদেনের হিসাবে প্রথমত গোটা বাড়িটার বা তার অংশবিশেষের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ধরা হয়; তারপর আসে জমির মূল্য, যা নির্ধারিত হয় বাড়িটির ভালো মন্দ অবস্থানের ওপর, সর্বশেষে ফয়সালা হয় সেই মুহূর্তে সরবরাহ ও চাহিদার পারস্পরিক সম্পর্ক দিয়ে। সরল এই অর্থনৈতিক সম্পর্কটি আমাদের প্রুধোঁপন্থীর মনে প্রতিভাত হয় নিম্নরূপে:

'ভাড়া হিসাবে বাড়িটির প্রকৃত মূল্য পর্যাপ্ত পরিমাণেরও বেশি করে মালিককে অনেক আগেই পরিশোধ করে দেওয়া সত্ত্বেও, একবার তৈরী হয়ে যাবার পর থেকে সে বাড়ি সামাজিক শ্রমের একটা নির্দিষ্ট ভগ্নাংশের উপর **চিরস্থায়ী আইনী স্বত্ব** হিসাবে কাজ করে। এইভাবে, যে বাড়ি, ধরা যাক, নির্মিত হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে, তা এই সময়ের মধ্যে ভাড়ার আয়ের মারফত তার আদি নির্মাণ ব্যয়ের দ্বিগুণ, তিনগুণ, পাঁচগুণ, দশগুণ, এমন কি তারও বেশি উশুল করে নেয়।'

এখানে আমরা একেবারেই গোটাগুটি প্রুধোঁকে পেয়ে যাচ্ছি। প্রথমত ভুলে যাওয়া হল যে বাড়িভাড়া থেকে শুধু নির্মাণের ব্যয়ের উপর সুদ তোলা হয় তা নয়; তার সঙ্গে সঙ্গে মেরামতী খরচ, গড়পড়তা হারে অনাদায়ী ঋণ, বাকি-পড়া ভাড়া, এবং মাঝে মাঝে ভাড়াটেহীন অবস্থায় পড়ে থাকার খেসারৎও তুলতে হয় এবং শেষত, যে বাড়ি ভঙ্গুর এবং কালক্রমে বাসের অযোগ্য ও মূল্যহীন হয়ে উঠতে বাধ্য তার নির্মাণে লগ্নীকৃত পুঁজিটাও বার্ষিক কিস্তিতে তুলে ফেলা চাই। দ্বিতীয়ত এ কথাও ভুলে যাওয়া হল যে, যে-জমির উপর বাড়িটি নির্মিত, তার বর্ধিত মূল্যের উপর সুদ দিতে হবে, তাই বাড়িভাড়ার মধ্যে ভূমি-খাজনার একাংশও নিহিত আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রুধোঁপন্থী অবশ্য ঘোষণা করেন যে, যেহেতু জমির এই মূল্যবৃদ্ধির পিছনে জমির মালিকের কোন অবদান নেই, সেই কারণে সে বৃদ্ধি ন্যায়ত তার নয়, সমগ্র সমাজের প্রাপ্য। এতে করে যে তিনি আসলে ভূসম্পত্তি লোপ করার দাবি করছেন, সেটা কিন্তু তার নজর এড়িয়ে যাচ্ছে; এই বিষয়ে আলোচনা এখানে শুরু করলে আমরা অনেকদূরে চলে যাব। এবং সর্বোপরি, তিনি এটাও লক্ষ্য করছেন না যে, এই লেনদেনের বিষয়বস্তু মালিকের কাছ থেকে বাড়ি কেনা একেবারেই নয়, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কেবল ব্যবহারের অধিকারটুকু কেনা। যে বাস্তব প্রকৃত পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক ঘটনা উদ্ভূত হয়, প্রুধোঁ তা নিয়ে কখনই মাথা ঘামাননি; সুতরাং স্বভাবতই তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেন না - পঞ্চাশ বছরে একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে গৃহনির্মাণের আদি ব্যয়ের দশগুণ কী করে ভাড়া হিসাবে আদায় হয়ে থাকে। এই একান্তই অজটিল প্রশ্নটির অর্থতাত্ত্বিক বিচারের পরিবর্তে এবং অর্থতাত্ত্বিক নিয়মের সঙ্গে বাস্তবিক এর বিরোধ আছে কিনা, থাকলে কী

ভাবে আছে, সে কথা নির্ধারণের বদলে প্রুধোঁ অর্থতত্ত্ব থেকে আইনশাস্ত্রে এক সাহসী ঝাঁপ দিলেন: 'একবার তৈরী হয়ে যাবার পর থেকেই বাড়ীটি' একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক পাওনার উপর '**চিরস্থায়ী আইনগত স্বত্ব** হিসাবে কাজ করে।' কী করে এই ঘটনা ঘটে, **কী করে** বাড়িটি আইনগত স্বত্বে **পরিণত হয়,** সে সম্বন্ধে প্রুধোঁ নীরব। অথচ ঠিক এই সমস্যাটিকেই তাঁর ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। এই প্রশ্নটিকে যদি তিনি বিচার করতেন, তাহলে দেখতে পেতেন যে, দুনিয়ায় কোনো আইনী স্বত্ব, তা যতই চিরস্থায়ী হোক না কেন, তা দিয়ে পঞ্চাশ বছরে ভাড়া হিসাবে বাড়ি বানাবার ব্যয়ের দশগুণ উশুল করবার ক্ষমতা পাওয়া যায় না; তা ঘটায় শুধু অর্থনৈতিক অবস্থা (যা আইনগত স্বত্ব হিসাবে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে থাকতে পারে)। আর সেক্ষেত্রে প্রুধোঁ যেখান থেকে শুরু করেছিলেন আবার সেখানেই ফিরে যাবেন।

অর্থনৈতিক বাস্তবতা থেকে আইনী বুলিতে লাফ দিয়ে ত্রাণলাভ -- এরই উপর প্রুধোঁবাদী সমগ্র শিক্ষা দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধুবর প্রুধোঁ যখনই কোন বিষয়ের অর্থনৈতিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ হন, — এবং প্রতিটি গুরুতর সমস্যার ক্ষেত্রেই তাই ঘটে -- তখনই তিনি আইনের জগতে আশ্রয় নেন এবং **চিরন্তন ন্যায়বিচারের** দোহাই পাড়েন।

'পণ্য উৎপাদনের সহগামী আইনগত সম্পর্ক থেকে তাঁর ন্যায়বিচারের আদর্শ, "চিরন্তন ন্যায়বিচারের" আদর্শ নিয়ে প্রুধোঁ শুরু করেন; লক্ষণীয় এই যে, তাতে করে তিনি সকল সৎ নাগরিকদের প্রবোধ দিয়ে প্রমাণ করে দেন যে উৎপাদনের রূপ হিসাবে পণ্য উৎপাদন ন্যায়বিচারের মতোই চিরস্থায়ী। অতঃপর তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বাস্তব পণ্য উৎপাদন এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বাস্তব আইন ব্যবস্থাকে তাঁর এই আদর্শ অনুযায়ী সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন। কোন রসায়নবিদ যদি পদার্থের গঠন ও ভাঙনের মধ্যে যে সকল আণবিক পরিবর্তন ঘটে থাকে, তার বাস্তব নিয়ম অধ্যয়ন না করে এবং সেই নিয়মের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান না করে, "স্বভাবধর্ম এবং সংসক্তির", "চিরন্তন ধারণা" দিয়ে পদার্থের গঠন ও ভাঙনকে নিয়ন্ত্রণ করবেন বলে দাবি তোলেন, তাহলে সেই রসায়নবিদ সম্পর্কে আমরা কী মনোভাব পোষণ করব? আমরা যদি বলি যে তেজারতি "চিরন্তন ন্যায়", "চিরন্তন সুবিচার", "চিরন্তন পারস্পরিক সম্পর্ক" এবং অন্যান্য "চিরন্তন সত্যের" বিরোধী, তাহলে তেজারতি "চিরন্তন কৃপা", "চিরন্তন ধর্মবিশ্বাস" অথবা "ভগবানের চিরন্তন ইচ্ছার" সঙ্গে সঙ্গতিহীন, এই বলায় ধর্মগুরুরা তেজারতি সম্পর্কে যা জেনেছিলেন তার থেকে আমরা সত্যই বেশি আর কী জানতে পারলাম?' (মার্কস, 'পুঁজি', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৫।)

আমাদের এই প্রুধোঁপন্থীটি তাঁর প্রভু ও গুরু অপেক্ষা বেশী সুবিধা করতে পারেননি:

'জীবদেহে রক্ত চলাচলের মতোই সমাজজীবনে যে হাজারো রকমের বিনিময় প্রয়োজন হয়, বাড়িভাড়ার চুক্তি তাদেরই অন্যতম। স্বভাবতই, এই বিনিময় সর্বক্ষেত্রে যদি **ন্যায়াধিকারের ধারণা** দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকত, অর্থাৎ সর্বত্র যদি তা কঠোরভাবে ন্যায়ের দাবি অনুসারেই পরিচালিত হত, তাহলে এই সমাজের পক্ষে তা শুভ হত। এক কথায়, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাকে প্রুধোঁর ভাষায় বলতে গেলে, **অর্থনৈতিক ন্যায়াধিকারের** স্তরে উন্নীত হতে হবে। বাস্তবে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, ঠিক তার বিপরীত ঘটনা ঘটছে।'

এ কথা কি বিশ্বাস্য যে, মার্কস ঠিক এই নির্ধারক দৃষ্টিকোণটার ক্ষেত্রেই ঐরূপ সংক্ষিপ্ত ও সন্দেহাতীতভাবে প্রুধোঁবাদের চরিত্রায়ন করার পাঁচ বছর পরেও জার্মানিতে এমন প্রলাপ ছাপা হচ্ছে? এই হ-য-ব-র-ল'র মানে কী? এর মানে আর কিছুই নয়, শুধু এই যে, বর্তমান সমাজের নিয়ামক অর্থনৈতিক নিয়মগুলির ব্যবহারিক ফলাফল লেখকের ন্যায়বোধের পরিপন্থী এবং তিনি মনে মনে এই সদাকাঙ্খা পোষণ করেন যে, এমন কোনো বন্দোবস্ত হোক যাতে এই অবস্থার প্রতিকার হয়। কোলা ব্যাঙের যদি লেজ থাকত, তাহলে সেটা আর কোলা ব্যাং থাকত না! আর পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিও কি একটা 'ন্যায়াধিকারের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত' নয়, অর্থাৎ শ্রমিকদের শোষণ করার নিজস্ব অধিকারের ধারণা দ্বারা। লেখক যদি আমাদের বলেন যে সেটা **তাঁর** ন্যায়াধিকারবোধ নয়, তাহলে কি আমরা এক ধাপও এগোতে পারছি?

যা হোক, এখন বাস-সংস্থান সমস্যায় ফেরা যাক। আমাদের প্রুধোঁপন্থী এবার তাঁর 'ন্যায়াধিকার ধারণার' বলগা ছেড়ে দিয়ে আমাদের সামনে এই আলোড়নকারী ঘোষণা পরিবেশন করছেন:

'একথা বলতে আমাদের কোন দ্বিধা নেই যে, বড় শহরে শতকরা ৯০ জন বা ততোধিক জনের নিজের বলতে কোনো যে আস্তানা নেই, আমাদের প্রশংসিত এই শতাব্দীর সমগ্র সংস্কৃতির পক্ষে এর চাইতে ভয়ঙ্কর বিদ্রূপও আর কিছু নেই। নৈতিক ও পারিবারিক অস্তিত্বের আসল গ্রন্থিবিন্দু, সেই ঘরসংসার সামাজিক ঘূর্ণাবর্তে ভেসে যাচ্ছে.. এই দিক থেকে আমরা অসভ্যদের অপেক্ষাও অনেক নিম্নস্তরে আছি। গুহাবাসীদের গুহা আছে, অস্ট্রেলীয়দের আছে তাদের মাটির কুঁড়েঘর, রেড ইন্ডিয়ানদেরও নিজের গৃহকোণ রয়েছে, অথচ আধুনিক প্রলেতারিয়েত কার্যত বায়ুভূত ইত্যাদি।

এই আর্তনাদের মধ্যে আমরা প্রুধোঁবাদের প্রতিক্রিয়াশীল চেহারাটা গোটা দেখতে পাই। প্রলেতারিয়েতের, আধুনিক বিপ্লবী শ্রেণীর জন্মের জন্য অতীতের শ্রমিককে যা জমির সঙ্গে বেঁধে রাখত, সেই গর্ভনাড়ী ছেদ করাটাই ছিল একান্ত অপরিহার্য। যে তন্তুবায়ের তাঁতের সঙ্গে সঙ্গে থাকত ছোট্ট ঘরবাড়ি, বাগান ও ক্ষেত, সে ছিল সর্বপ্রকার দুর্দশা ও সর্ববিধ রাজনৈতিক চাপ সত্ত্বেও শান্ত, তুষ্ট, 'ধর্মভীরু এবং

সম্মানাস্পদ'; সে ধনী, ধর্মযাজক, রাজপুরুষ দেখলেই টুপি তুলে সেলাম করত, মনের দিক থেকে সে ছিল সম্পূর্ণত দাস তুল্য। যে শ্রমিক আগে ছিল জমির সঙ্গে শৃঙ্খলিত, আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পই তাকে পুরোপুরি সম্পত্তিহীন প্রলেতারিয়েতে পরিণত করেছে, চিরাচরিত সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে তাকে করেছে **স্বাধীন আইনবহির্ভূত**; এই অর্থনৈতিক বিপ্লবই সেই অবস্থা সৃষ্টি করেছে, একমাত্র যে অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের চূড়ান্ত রূপ, পুঁজিবাদী উৎপাদনের রূপ উচ্ছেদ করা সম্ভব। অথচ প্রুধোঁপন্থীটি সজল চক্ষে এগিয়ে এসে শ্রমিকদের ঘরবাড়ি ছাড়া করা নিয়ে বিলাপ করছেন এমনভাবে, যেন এটা তাদের মানসিক মুক্তিলাভের সর্বপ্রথম শর্ত নয় বরং এক বিরাট পশ্চাদগতি।

আঠারো শতকের ইংলণ্ডে শ্রমিকদের ঘরবাড়ি ছাড়া করার ঠিক এই প্রক্রিয়া যেভাবে ঘটেছিল তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আমি সাতাশ বছর আগে 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইটিতে বর্ণনা করেছিলাম। সে কাজে জমি ও কারখানার মালিকরা যে কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েছিল, এবং এই বিতাড়নে সর্বাগ্রে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের উপর অনিবার্যভাবে যে সকল বৈষয়িক ও নৈতিক কুফল বর্তেছিল, তা উচিতমতো আমি সেখানে বর্ণনা করেছি। কিন্তু সেদিনের পরিস্থিতিতে একান্ত আবশ্যিক এই ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়াটাকে 'অসভ্যদের অপেক্ষাও অনেক নিম্নস্তরে' পশ্চাদগতি বলে বিচার করার কথা কি আমার মাথায় ঢুকতে পারত? অসম্ভব! ১৭৭২ সালের 'ঘরবাড়ির' মালিক গ্রামীণ তন্তুবায়ের তুলনায় ১৮৭২ সালের ইংরেজ প্রলেতারীয় ঢের বেশী উঁচু স্তরের। গুহার মালিক গুহাবাসী, মাটির কুঁড়ের মালিক অস্ট্রেলীয় বা গৃহকোণের সেই মালিক রেড ইণ্ডিয়ানরা কি কখনও জুনের সশস্ত্র অভ্যুত্থান অথবা প্যারিস কমিউন সংঘটিত করতে পারবে?

ব্যাপকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রবর্তনের পর থেকে শ্রমিকদের বৈষয়িক অবস্থা যে মোটের উপর খারাপ হয়েছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ শুধু বুর্জোয়ারাই করতে পারে। কিন্তু তার জন্য কি আমরা পেছন ফিরে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাব মিশরের (পরিমাণেও যৎসামান্য) মাংসের হাঁড়ির দিকে*, দাসত্বপ্রবণ আত্মার জন্মদাতা গ্রামীণ ছোট শিল্পের দিকে, বা 'অসভ্যদের' দিকে? ঠিক তার বিপরীত। আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের দ্বারা সৃষ্ট, জমির বন্ধনসমেত সর্বপ্রকার উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত, বড় বড় শহরে যূথবদ্ধ প্রলেতারিয়েতই একমাত্র সেই মহান সামাজিক রূপান্তর সাধন করতে পারে, যার ফলে সর্বপ্রকার শ্রেণী-শোষণ ও সকল শ্রেণী-শাসনের অবসান ঘটবে।

* বাইবেলের কাহিনী অনুসারে মিশরের বন্দী দশা থেকে পলায়নের সময় ইহুদীদের মধ্যেকার দুর্বলচিত্তরা পথের কষ্ট ও অনাহারে বন্দী দিনগুলোর কথা ভেবে আফশোস করতে শুরু করে এই বলে যে তখন অন্তত পেটের ক্ষিদেটা মিটত। — সম্পাঃ

ঘরবাড়ির মালিক পুরানো সেই গ্রামীণ তন্তুবায় এই কাজ কখনও সমাধা করতে পারত না, এই কাজ সমাধান করার আকাঙ্খা দূরে থাক, এমন ধারণা মনে আনাও তাদের কাছে ছিল অসম্ভব।

অপরপক্ষে, গত একশত বৎসরের গোটা শিল্পবিপ্লব, বাষ্পীয় শক্তি ও বৃহদায়তন ফ্যাক্টরি উৎপাদনের প্রবর্তন, কায়িক শ্রমের বদলে যা যন্ত্রপাতি নিয়োজন করে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিকে হাজারগুণ বৃদ্ধি করেছে, প্রুধোঁর কাছে সে সবকিছুই অতীব বিতৃষ্ণার ব্যাপার — যা সত্যি ঘটাই উচিত ছিল না। পেটি বুর্জোয়া প্রুধোঁর কাম্য হল এমন এক জগৎ, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি আশুভোগ্য এবং তৎক্ষণাৎ বাজারে বিনিময়যোগ্য ভিন্ন ভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ সামগ্রী উৎপাদন করে। তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য কোন সামগ্রীর মারফত তার শ্রমের পূর্ণ মূল্য ফেরৎ পাচ্ছে, ততক্ষণ 'চিরন্তন ন্যায়বিচারের' মর্যাদা বজায় থাকছে এবং গড়ে উঠছে যথাসম্ভব সেরা এক দুনিয়া। কিন্তু শিল্পের অগ্রগতি প্রুধোঁর এই যথাসম্ভব সেরা দুনিয়াটাকে অংকুরে বিনষ্ট ও পদদলিত করেছে, শিল্পের বড় বড় শাখায় ব্যক্তিগত শ্রমব্যবস্থা বহুদিন আগেই ধ্বংস করেছে, এবং দিন দিন ক্ষুদ্রতর এমন কি ক্ষুদ্রতম শিল্প শাখাতেও তার ধ্বংসসাধন করে চলেছে; তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করছে যন্ত্রপাতি এবং নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক শক্তির উপর নিভরশীল যৌথশ্রম; এই নতুন শিল্প-ব্যবস্থায় উৎপন্ন অবিলম্বেই বিনিময়যোগ্য আশুভোগ্য সামগ্রী হল বহুলোকের হাতে তৈরি হয়ে ওঠা তাদের সকলের যৌথ উৎপাদন। এবং বিশেষ করে এই শিল্প বিপ্লবই মানুষের শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিকে এমন উচ্চস্তরে তুলেছে যে, — মানব ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম -- এমন সম্ভাবনা সৃষ্টি হল যাতে সকলের মধ্যে যুক্তিগ্রাহ্য শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হলে, সমাজের সকলের প্রচুর ভোগ ও পর্যাপ্ত, সংরক্ষিত ভান্ডারের মতো যথেষ্ট উৎপাদন শুধু যে সম্পন্ন হবে তা নয়, প্রত্যেকের জন্যই যথেষ্ট অবকাশেরও ব্যবস্থা হবে, যাতে করে অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সংস্কৃতি, অর্থাৎ বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ভাববিনিময়ের বিভিন্ন পদ্ধতিরূপের মধ্যে যতটা রক্ষণযোগ্য তা শুধু বজায় থাকবে নয়, শাসক শ্রেণীর একচেটিয়া সম্পত্তি থেকে তাকে সমগ্র সমাজের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করা যাবে এবং আরও বিকাশসাধন সম্ভব হবে। আর গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল এই যে: মানুষের শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি এই স্তরে ওঠামাত্র শাসক শ্রেণীর অস্তিত্বের সব অজুহাতই লোপ পাচ্ছে। শ্রেণী পার্থক্যের সমর্থনে সব সময় শেষ পর্যন্ত যে যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে, তার মূল হল এই: এমন এক শ্রেণী থাকা প্রয়োজন যাকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না, যাতে সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কাজকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করার অবকাশ তারা পায়। এতদিন পর্যন্ত এই ধরনের বক্তব্যের একটা বড় ঐতিহাসিক

যৌক্তিকতা ছিল, কিন্তু গত একশ বছরের শিল্পবিপ্লব তাকে এক দফায় চিরতরে নির্মূল করেছে। শাসক শ্রেণীর অস্তিত্ব দিনের পর দিন শিল্পের উৎপাদিকা শক্তির পক্ষে ক্রমশ আরও বেশী বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমভাবেই বিজ্ঞান, কলা, এবং বিশেষ করে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের বিভিন্ন প্রকাশের পথেও। আমাদের আধুনিক বুর্জোয়াদের চাইতে বেশী রসজ্ঞানহীন লোক আর কোনদিন দেখা যায়নি।

বন্ধুবর প্রুধোঁর কাছে এ সব কিছু নয়। তিনি চান শুধু 'চিরন্তন ন্যায়বিচার', আর কিছুই নয়। প্রত্যেকের উৎপন্নের বিনিময়ে প্রত্যেকে তার শ্রমের পুরো ফল পাবে, পাবে তার শ্রমের পূর্ণ মূল্য। কিন্তু আধুনিক শিল্পের যে কোনো উৎপন্নের ক্ষেত্রে এই হিসাব খুবই জটিল ব্যাপার। কারণ আধুনিক শিল্প মোট উৎপন্নের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব অংশটাকে অস্পষ্ট করে রাখে, পুরানো হস্তশিল্পে যেটা স্পষ্টতই হল সুসম্পূর্ণ উৎপন্ন দ্রব্যটি। তাছাড়া, প্রুধোঁর বর্ণিত সমগ্র ব্যবস্থাটিই দুইজন উৎপাদকের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিনিময়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে একজন অপরের উৎপন্ন জিনিস ভোগের জন্য গ্রহণ করছে। বর্তমান শিল্প এই ধরনের ব্যক্তিগত বিনিময়কে ক্রমশ বিলুপ্ত করে দিচ্ছে। ফলত সমগ্র প্রুধোঁবাদের মধ্য দিয়ে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধারা বয়ে চলেছে: শিল্পবিপ্লবের প্রতি বিতৃষ্ণা, এবং স্টীম ইঞ্জিন, কলের তাঁত ইত্যাদি সহ সমগ্র আধুনিক শিল্পকে বেদীচ্যুত করে পুরানো সম্ভ্রান্ত কায়িক শ্রমে ফিরে যাবার কখনও প্রকাশ্য কখনও বা প্রচ্ছন্ন কামনা। এর ফলে আমরা যে হাজারের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই ভাগ উৎপাদন-শক্তি হারাব, সমগ্র মানবসমাজ যে কদর্যতম সম্ভব শ্রমদাসত্বের দণ্ডভোগ করবে, অনাহারই যে হয়ে উঠবে সাধারণ নিয়ম — তাতে কী-ই বা এসে যাবে যদি এমনভাবে বিনিময়-ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পারি যে, প্রত্যেকে তার 'শ্রমের পুরো ফল' পাচ্ছে এবং 'চিরন্তন ন্যায়বিচার' কায়েম হচ্ছে?

Fiat justitia, pereat mundus!

ন্যায়বিচার করা হোক, তাতে তামাম দুনিয়া রসাতলে যায় যাক!

আর প্রুধোঁবাদী প্রতিবিপ্লব যদি অনুষ্ঠিত করা আদৌ সম্ভব হত, তাহলে অবশ্য দুনিয়া যেত রসাতলেই।

কিন্তু এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের সর্তাধীন সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রেও 'শ্রমের পুরো ফল' কথাটির আদৌ যে অর্থ সম্ভব সে অর্থে প্রত্যেককে তা দেবার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা সম্ভব। প্রত্যেক শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে 'তার শ্রমের পুরো ফলের' অধিকারী হবে — এ রকম অর্থ নয়, কথাটার তাৎপর্য একমাত্র এই হতে পারে যে সকলেই, শ্রমিক নিয়ে গঠিত সমাজই সমগ্রভাবে মালিক হবে তাদের সকলের শ্রমের সামগ্রিক উৎপন্নের। এই মোট উৎপন্নের একাংশ সমাজ বণ্টন করবে

সদস্যদের ভোগের জন্য ও আরেক অংশ ব্যবহৃত করবে উৎপাদনের উপায়ের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ ও সম্প্রসারণের কাজে; অবশিষ্ট অংশটা থাকবে উৎপাদন ও ভোগের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত ভাণ্ডার হিসাবে।

* * *

উপরে যা বলা হল তা থেকে আমরা আগেই বুঝতে পারছি যে আমাদের প্রুধোঁপন্থী বাস-সংস্থানের মহা সমস্যার কী করে সমাধান করবেন। একদিকে এই দাবি দেখা গেল যে, আমরা যাতে **অসভ্যদের তুলনায়ও নিচের স্তরে নেমে না যাই,** তার জন্য প্রত্যেক শ্রমিকের বাড়ি ও বাড়ির মালিকানা চাই। অন্যদিকে আশ্বাস পাওয়া গেল যে, ভাড়া হিসাবে বাড়ি তৈরির আদি ব্যয়ের দুই, তিন, পাঁচ বা দশগুণ অর্থ আদায়, যা বাস্তবিকই ঘটে, তা **আইনগত স্বত্বের** উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই আইনী স্বত্ব **'চিরন্তন ন্যায়বিচারের'** পরিপন্থী। সমাধান খুব সহজ: আইনী স্বত্বটা উচ্ছেদ করা হোক এবং চিরন্তন ন্যায়ের নামে ঘোষণা করে দেওয়া যাক যে, ভাড়ার টাকাটা বাসস্থান নির্মাণের ব্যয় শোধ হিসাবে গণ্য হবে। পূর্বস্থিতিগুলিকে যদি এমনভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয় যে তাদের মধ্যেই আগে থাকতে সিদ্ধান্তটি নিহিত থাকে, তাহলে অবশ্যই থলে থেকে পূর্বনির্ধারিত ফলটি বার করতে, এবং যে অখণ্ডনীয় যুক্তি দিয়ে সে ফল পাওয়া গেল তার প্রতি সগর্ব অঙ্গুলি নির্দেশ করতে একজন হাতুড়ের চাইতে বেশি দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।

এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। বাড়িভাড়ার উচ্ছেদ অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে এই দাবির মাধ্যমে যে প্রত্যেক ভাড়াটেকে তার বাসস্থানের মালিকে পরিণত করতে হবে। কী করে তা করা যাবে? খুব সহজেই:

'ভাড়াবাড়িগুলির দায়মোচন করা হবে... পূর্বতন মালিককে তার বাড়ির মূল্য কড়াক্রান্তি হিসাবে শোধ করে দেওয়া হবে। যেহেতু ভাড়া হল, আগেকার মতই, পুঁজির কায়েমী স্বত্বের প্রতি ভাড়াটের দেয় সেলামি সেই কারণেই ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচন ঘোষণার দিন থেকে ভাড়াটে যে সুনির্দিষ্ট টাকাটা দিয়ে থাকে, তাকে গণ্য করা হবে তার মালিকানায় এসে যাওয়া বাসস্থানের বাবদ প্রদেয় বার্ষিক কিস্তি হিসাবে... সমাজ... এইভাবে মুক্ত ও স্বাধীন বাসস্থান-মালিকের সমষ্টিতে পরিণত হবে।'

বাড়ির মালিকেরা যে না খেটেই ভূমি-খাজনা এবং বাড়ির জন্য নিয়োজিত পুঁজির সুদ আদায় করে যায়, তা প্রুধোঁপন্থীর মতে চিরন্তন ন্যায়ের বিরুদ্ধে অপরাধ। তিনি ফর্মান দিচ্ছেন, এটা বন্ধ করতে হবে; বাড়ির বাবদ নিয়োজিত পুঁজির জন্য আর সুদ অর্জন করা যাবে না, ক্রীত ভূসম্পত্তির বাবদ ভূমি-খাজনাটাও পাবে না। এদিকে আমরা দেখেছি যে এর ফলে বর্তমান সমাজের যা ভিত্তি, সেই পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি

মোটেই ব্যাহত হচ্ছে না। শ্রমিক শোষণের মেরুদণ্ড হল শ্রমিক কর্তৃক পুঁজিপতির নিকট তার শ্রমশক্তি বিক্রয় এবং পুঁজিপতি কর্তৃক এ লেনদেনের ব্যবহার — শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য পুঁজিপতি যে দাম দিয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী পরিমাণে উৎপাদন করতে শ্রমিককে বাধ্য করা। শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যেকার এই লেনদেন থেকেই সমগ্র উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয়, যা পরে ভূমি-খাজনা, বাণিজ্যিক মুনাফা, পুঁজির সুদ, কর, ইত্যাদি রূপে বিভিন্ন গোত্রের পুঁজিপতি ও তাদের সেবকদের মধ্যে বণ্টিত হয়। এই যখন পরিস্থিতি, তখন আমাদের প্রুধোঁপন্থী এসে ভাবছেন যে শুধু এক ধরনের পুঁজিপতিদের, — তাও এমন এক ধরনের যারা সরাসরি শ্রমশক্তি ক্রয় করে না আর তাই উদ্বৃত্ত মূল্যও উৎপাদন করায় না — যদি মুনাফা অর্জন করতে বা সুদ আদায় করতে নিষেধ করা হয়, তা হলেই এক ধাপ অগ্রসর হওয়া যাবে! অথচ বাড়ির মালিকদের যদি আগামীকালই ভূমি-খাজনা ও সুদ আদায়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তা হলেও শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে অবৈতনিক আদায়ীকৃত শ্রমের মোট পরিমাণ পুরোপুরিই অক্ষুণ্ণ থাকবে। তা সত্ত্বেও অবশ্য আমাদের প্রুধোঁপন্থী এই ঘোষণা করতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না:

> 'বিপ্লবী ভাবধারার গর্ভজাত আজ পর্যন্ত যে সকল **সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ এবং সুমহান আদর্শ** দেখা গেছে, ভাড়াটে বাসা-প্রথার অবসান তাদের অন্যতম এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির **প্রাথমিক দাবিগুলির** মধ্যে এ দাবির স্থান পাওয়া উচিত।'

এ একেবারে স্বয়ং গুরুদেব প্রুধোঁর বাজারী হাঁকেরই অনুরূপ। চিরকালই তিনি যত বেশী প্যাঁকপ্যাঁক করেন, ডিম পাড়েন তত ছোট।

প্রত্যেক শ্রমিক, পেটি বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াকে যদি বার্ষিক কিস্তি শোধ মারফৎ তার বাসস্থানের প্রথমত আংশিক এবং পরে পূর্ণ মালিকে পরিণত করতে হয়, তাহলে অবস্থাটা কেমন চমৎকার দাঁড়াবে, একবার কল্পনা করুন! ইংলণ্ডের শিল্পাঞ্চলে যে সব জায়গায় বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের ছোট ছোট বাড়ি আছে এবং যেখানে প্রত্যেক বিবাহিত শ্রমিক একটা ছোট্ট বাসা নিয়ে থাকে, সেখানে হয়ত এ প্রস্তাবের কিছু একটা অর্থ হয়। কিন্তু প্যারিস ও ইউরোপীয় মহাদেশের অধিকাংশ বড় বড় শহরগুলিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে বড় বড় বাড়ি, যার প্রত্যেকটিতে দশ, বিশ, ত্রিশটি করে পরিবার বাস করে। ধরুন যেদিন ভাড়াটে বাড়িকে দায়মুক্ত ঘোষণা করা হল, সেই বিশ্বমুক্তির ফর্মানের দিনে পিটার বার্লিনের এক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় কাজ করছে। এক বছর পর সে হামবুর্গের টর অঞ্চলের কাছাকাছি এক বাড়ির ছয় তলায় তার একটি ছোট ঘর বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের ধরা যাক পনের ভাগের এক ভাগের মালিকানা পেল। কিন্তু তার পরেই সে তার কাজটি হারিয়ে হানোভারের

পটহফেঁর এক বাড়ির চার তলায় এক ফ্ল্যাটে ঠাঁই পেল, যেখান থেকে বাড়িটির ভিতরকার চত্বরের খুব ভালো দৃশ্য চোখে পড়ে। এখানে পাঁচ মাস থেকে যখন সে এই সম্পত্তির ১/৩৬ ভাগ মালিকানা অর্জন করল, তখন এক ধর্মঘটের ফলে তাকে চলে যেতে হল মিউনিকে। সেখানে সে এগারো মাস থেকে ওবার-অঙ্গারগাসেতের পিছনে মাটির নিচের তলায় এক অন্ধকারপ্রায় ঘরের ঠিক ১১/১৮০ ভাগ মালিকানা অর্জন করতে বাধ্য হল। আজকাল শ্রমিকদের ভাগ্যে যা এত বারবার ঘটে থাকে, পরবর্তী সেই রকম আরও বদলির ফলে বেচারীকে আগের জায়গার চাইতে কম কাম্য নয় এমন একটি সেণ্ট গালেন-স্থিত বাসগৃহের ৭/৩৬০ ভাগ, লিড্‌সে আরেকখানি বাসার ২৩/১৮০ ভাগ, এবং যাতে 'চিরন্তন ন্যায়বিচারের' তরফ থেকে কোনরূপ অভিযোগ না শোনা যায়, সেইরকম সূক্ষ্ম হিসাব অনুযায়ী সেরাই-এ তৃতীয় একটা ফ্ল্যাটের ৩৪৭/৫৬,২২৩ ভাগ মালিকানার বোঝা বইতে হবে। তাহলে এই ফ্ল্যাটগুলির এই রকম মালিকানার অংশীদার হয়ে আমাদের পিটারের কী লাভ হল? এইসব ভাগের প্রকৃত মূল্য তাকে কে দিচ্ছে? সে বিভিন্ন সময়ে যে সকল ফ্ল্যাটে কিছুদিনের জন্য বাস করেছে, সেই ফ্ল্যাটগুলির বাকি অংশের মালিক বা মালিকদের সে কোথায় খুঁজে পাবে? ধরুন একটা বড় বাড়িতে কুড়িটি ফ্ল্যাট আছে; দায়মোচনের মেয়াদ ও বাড়িভাড়ার অবসান হবার পরে দেখা গেল যে, সারা পৃথিবী জুড়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে, এইরকম হয়ত বা তিনশ' লোক বাড়িটির মালিক; এমন বাড়ি সংক্রান্ত সম্পত্তি-সম্পর্কটা তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? প্রুধোঁপন্থী জবাব দেবেন যে, ইতিমধ্যে প্রুধোঁর বিনিময় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং এই ব্যাঙ্ক যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে তার শ্রমসামগ্রীর পূর্ণ শ্রমমূল্য দেবে এবং সেই কারণেই তার ফ্ল্যাটের শেয়ারের পূর্ণ মূল্যও দিতে পারবে। কিন্তু প্রথমত এখানে প্রুধোঁর বিনিময় ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমাদের কোনও সংশ্রব নেই, কেননা বাস-সংস্থান সমস্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীতে কোথাও তার উল্লেখ পাই না, আর দ্বিতীয়ত, এ যুক্তি এই অদ্ভুত ধরনের ভ্রান্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে কেউ যদি কোন পণ্য বিক্রয় করতে চায়, তাহলে তার পূর্ণ মূল্য দিতে রাজি এমন ক্রেতা সে সর্বক্ষেত্রে অবধারিতভাবে পাবেই, এবং তৃতীয়ত, প্রুধোঁ উদ্ভাবন করার আগেই শ্রমবিনিময় বাজার* নামে এই জিনিসটা ইংলণ্ডে একাধিকবার দেউলিয়া হয়ে গেছে।

শ্রমিককে তার বাসস্থানের মালিকানা **কিনতে** হবে, এই সমগ্র ধারণাটির ভিত্তিই হল প্রুধোঁবাদের প্রতিক্রিয়াশীল সেই মৌল দৃষ্টিভঙ্গি যার ওপর আগেই জোর দেওয়া

* একঘণ্টার কাজকে হিসাবের একক ধরে শ্রম-নোট চালু করে, তারই মাধ্যমে সামগ্রী বিনিময়ের উদ্দেশ্যে রবার্ট ওয়েন যে শ্রমবাজার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, এখানে এঙ্গেলস তারই উল্লেখ করছেন। — সম্পাঃ

হয়েছে। প্রুধোঁবাদ অনুসারে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের দ্বারা সৃষ্ট সমগ্র পরিবেশটাই অস্বাস্থ্যকর দূষিত বস্তু মাত্র, তাই জোর করে অর্থাৎ গত একশ' বছরের অনুসৃত বিকাশের ধারার বিপরীতে সমাজকে এমন অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে, যেখানে সেই পুরানো স্থিতিশীল একক হস্তশিল্পই হল রেওয়াজ, এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে ক্ষুদে উদ্যোগ ধ্বংস হয়েছে ও এখনো ধ্বংস হচ্ছে তারই আদর্শায়িত পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া যা আর কিছু নয়। শ্রমিকদের যদি সেই স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ঠেলে দেওয়া হয়, যদি 'সামাজিক ঘূর্ণাবর্তের' শুভ অবসান ঘটানো যায়, তাহলে স্বভাবতই শ্রমিকেরা আবার 'ঘরবাড়ির' সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করতে পারবে এবং পূর্বোক্ত দায়মোচনের তত্ত্বকথা আর ততটা আজগুবি বলে মনে হবে না। প্রুধোঁ শুধু এইটুকুই ভুলে যান যে, এইসব সম্পন্ন করতে হলে তাঁকে প্রথমত বিশ্ব ইতিহাসের চাকা একশ বছর পিছনে ঘুরিয়ে দিতে হবে; আর যদি তিনি তা সত্যিই করতে পারতেন তাহলে আজকের দিনের শ্রমিকদেরও তিনি তাদের প্রপিতামহদের মতন সংকীর্ণচেতা মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ দাসোচিত জীবে পরিণত করে তুলতেন।

তবে, বাস-সংস্থান সমস্যার প্রুধোঁবাদী সমাধানের মধ্যে যেটুকু যুক্তিসহ এবং ব্যবহারযোগ্য সারবস্তু আছে, তা ইতিমধ্যেই বাস্তবে প্রযুক্ত হচ্ছে, কিন্তু তার রূপায়ণ আসছে 'বিপ্লবী ভাবধারার গর্ভ' থেকে নয়, আসছে — স্বয়ং বড় বুর্জোয়াদের কাছ থেকে। এই প্রসঙ্গে *Emancipacion,** মাদ্রিদের চমৎকার স্পেনীয় সংবাদপত্রটির ১৮৭২ সালের ১৬ই মার্চের বক্তব্য শোনা যাক:

'বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের আরও এক পন্থা আছে — প্রুধোঁ প্রস্তাবিত পন্থা; প্রস্তাবটি প্রথমে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলেই এর চরম অসারতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রুধোঁ প্রস্তাব করেছিলেন যে, কিস্তিবন্দি ব্যবস্থার ভিত্তিতে ভাড়াটেদের ক্রেতায় পরিণত করা হোক; ভাড়াটেদের দেয় বার্ষিক ভাড়াকে সংশ্লিষ্ট বাসস্থানের দায়মোচনের মূল্যের এক এক কিস্তি হিসাবে গণ্য করা হোক: কিছুকালের মধ্যে এতে ভাড়াটে বাড়ির স্বত্বাধিকারী হয়ে পড়বে। প্রুধোঁ কর্তৃক অতীব বিপ্লবী বলে বিবেচিত এই ব্যবস্থাটা সকল দেশে ফাটকাবাজ কোম্পানিগুলি কাজে পরিণত করে চলেছে। তারা এ পন্থায় ভাড়া বাড়িয়ে বাড়ির মূল্যের দ্বিগুণ, তিনগুণ দাম আদায় করে থাকে। শ্রীযুক্ত দলফুস এবং উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের অপরাপর বড় শিল্পপতিরা প্রস্তাবটি কাজে পরিণত করেছেন; উদ্দেশ্য শুধু অর্থোপার্জনই নয়, তার সঙ্গে রাজনৈতিক ফন্দিও তাঁদের মাথায় রয়েছে।

* *Emancipacion* (মুক্তি) —প্রথম আন্তর্জাতিকের স্পেনদেশস্থ মার্কসবাদী অংশের মুখপত্র, সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই পত্রিকাটী ১৮৭১ সালের জুন থেকে ১৮৭৩ সাল অবধি মাদ্রিদে প্রকাশিত হয়েছিল। — সম্পাঃ

'শাসক শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা সুচতুর নেতারা সর্বদাই ক্ষুদে সম্পত্তির মালিকদের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে, যাতে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং তাদের স্বপক্ষে এক বাহিনী তৈরী করা যায়। বর্তমান সময়ে স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রীগণ এখনও বিদ্যমান বড় বড় ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে ঠিক যে ধরনের প্রস্তাব করেন, বিগত শতাব্দীর বুর্জোয়া বিপ্লবসমূহ অভিজাত সম্প্রদায় ও গির্জার বড় বড় ভূসম্পত্তিগুলিকে সেইভাবেই ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ক্ষুদে ভূম্যধিকারী একটি শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল; এরা কালক্রমে পরিণত হয়েছে সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানে এবং শহরের প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের পথে একটা স্থায়ী বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী ঋণের এক একটা শেয়ারের পরিমাণ হ্রাস করে তৃতীয় নেপোলিয়ন শহরাঞ্চলেও অনুরূপ একটি শ্রেণী সৃষ্টির মৎলব করেছিলেন। এখন শ্রীযুক্ত দলফুস ও তাঁর সহকর্মীরাও শ্রমিকদের কাছে বার্ষিক কিস্তিবন্দি ব্যবস্থায় ছোট ছোট বাসগৃহ বিক্রয় করে তাদের বিপ্লবী মনোভাবকে দমন করতে এবং সেই সঙ্গে যে কারখানায় একবার তারা কাজে ঢুকবে, তার সঙ্গে এই সম্পত্তির শৃঙ্খলে তাদের বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করছেন। সুতরাং প্রুধোঁর পরিকল্পনা শ্রমিক শ্রেণীকে কোনোরূপ ত্রাণ করার পরিবর্তে তাদের স্বার্থের সরাসরি বিরুদ্ধেই যাচ্ছে।'*

তাহলে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান হবে কেমন করে? বর্তমান সমাজে অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সমাধান যেভাবে হয় সেইভাবেই, অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে উত্তরোত্তর অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য বিধান মারফৎ। এই ধরনের সমাধানের ফলে বার বার নতুন করে একই সমস্যা দেখা দেয়, সুতরাং আসলে এটা কোন সমাধানই নয়। সামাজিক বিপ্লব কেমন করে এই সমস্যা সমাধান করবে তা যে শুধু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে তাই নয়, তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে বহুবিধ সুদূরপ্রসারী প্রশ্ন, যার মধ্যে সবচেয়ে মূল প্রশ্ন হল শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈপরীত্যের অবসান। আমাদের উদ্দেশ্য যেহেতু ভবিষ্যৎ সমাজের ব্যবস্থাপনার জন্যে ইউটোপীয় ছক রচনা নয়, তাই এ প্রশ্নের আলোচনা এখানে নিরর্থক। কিন্তু একটা কথা সুনিশ্চিত: ইতিমধ্যেই বড় বড় শহরে যে সকল ঘরবাড়ি রয়েছে, যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতি অনুযায়ী তার সদ্ব্যবহার করলে বাস্তবে 'বাস-সংস্থানের **অভাব**' যা আছে তা এখনই দূর করা যায়। স্বভাবতই বর্তমান মালিকদের উচ্ছেদ করা হলেই একমাত্র এ কাজ সম্ভবপর, অর্থাৎ যে সব শ্রমিকদের ঘর নেই বা যারা তাদের বর্তমান বাড়িতে গাদাগাদি করে বাস করে,

* বড় বড় বা দ্রুত সম্প্রসারণশীল মার্কিন শহরগুলির আশেপাশেও কেমন করে শ্রমিককে নিজ 'গৃহের' সঙ্গে শৃঙ্খলিত করে ফেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে, তা ১৮৮৬ সালের ২৮শে নভেম্বর, ইণ্ডিয়ানাপোলিস থেকে লেখা এলেওনর মার্কস-এভেলিঙ-এর এক চিঠির নিম্নোক্ত অংশে দেখা যাবে: 'ক্যানসাস-সিটি শহরে, বলা ভালো শহরের উপকণ্ঠে, কাঠ দিয়ে বানানো শ্রীহীন কতগুলি ছোট ছোট কুটীর দেখতে পেলাম। একেকটি কুটীরে গুটি তিনেক

তাদের জায়গা করে দিতে হবে মালিকদের বাড়িতে। বর্তমান রাষ্ট্র যে রকমভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে উচ্ছেদ করে বা সৈনিকদের বাসস্থান নির্দেশ করে দেয়, তেমনই অনায়াসে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর জনস্বার্থে গৃহীত এ ব্যবস্থা প্রলেতারিয়েত কাজে পরিণত করতে পারবে।

* * *

আমাদের প্রুধোঁপন্থী কিন্তু বসা-সংস্থান সমস্যায় ইতিপূর্বে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট নন। তিনি প্রশ্নটিকে সমতল জমি থেকে উচ্চতর সমাজতন্ত্রের স্তরে তুলবেনই, যাতে সেখানেও প্রমাণ করা যায় যে এটি 'সামাজিক সমস্যার' এক অবিচ্ছেদ্য 'ভগ্নাংশ'।

'ধরে নেওয়া যাক যে সত্যিসত্যিই পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে আয়ত্তে আনা হল যা আজ না হোক কাল আনতেই হবে, ধরুন এমন কোনো অন্তর্বর্তী আইন মারফৎ যাতে **সব পুঁজির সুদকে শতকরা একটাকা হারে** নির্দিষ্ট করা গেল। মনে রাখবেন, এই হারকেও ক্রমশ হ্রাস করে শূন্যে নামিয়ে আনার ঝোঁক রাখতে হবে, যাতে শেষ পর্যন্ত **পুঁজির সংচালনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের** অতিরিক্ত আর কিছু দেয় না দাঁড়ায়। অন্যান্য সকল উৎপন্নের মতো ঘরবাড়িও স্বভাবতই এই আইনের আওতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ... বাড়ির মালিক নিজেই তখন যেচে বিক্রি করতে রাজি হবে, কেননা অন্যথায় তার বাড়ী অব্যবহৃত পড়ে থাকবে এবং তার মধ্যে নিয়োজিত পুঁজি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয়ে পড়বে।'

উপরোক্ত অংশটিতে প্রুধোঁবাদী প্রশ্নোত্তরিকার একটি প্রধান বিশ্বাসসূত্র নিহিত আছে এবং তার মধ্যে বিদ্যমান বিভ্রান্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এতে মিলছে।

'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তি' কথাটিই একটি আজগুবি ধারণা, বিচার বিবেচনা না করেই প্রুধোঁ বুর্জোয়া অর্থতত্ত্ববিদদের কাছ থেকে এটা ধার নিয়েছেন। সত্য বটে বুর্জোয়া অর্থতাত্ত্বিকেরা এই প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করেন যে শ্রমই সকল সম্পদের উৎস এবং সকল পণ্যমূল্যের মানদণ্ড; সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কিন্তু ব্যাখ্যা করতে হয়, শিল্প বা হস্তশিল্পগত ব্যবসায়ে অগ্রিম পুঁজি ঢেলে পুঁজিপতি শেষে শুধু পুঁজিটাই নয় সঙ্গে

ঘর, চারদিকটা এখনও বুনো। কোনক্রমে কুঁড়েটুকু ধরতে পারে, এইটুকুন জমির দাম ৬০০ ডলার, কুঁড়ে তুলবার খরচ আরও ৬০০ ডলার, অর্থাৎ শহর থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ, জনহীন জলাভূমির মধ্যে এই শ্রীহীন ছোট্ট বাড়ির জন্য ৪,৮০০ মার্ক।' এইভাবে এইরকম ঘরটুকু পাবার জন্যও শ্রমিকদের মর্গেজ ঋণের গুরু বোঝা ঘাড়ে নিতে হবে এবং তার ফলে তারা পরিণত হবে মালিকদের খাঁটি গোলামে। তারা বাড়িটুকুর সঙ্গে বাঁধা পড়বে, বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারবে না, সুতরাং কাজের সর্ত যাই হোক, তাদের তা মেনে নিতে হবে। (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

সঙ্গে অতিরিক্ত একটা মুনাফাও পায় কী উপায়ে। ফলে তাঁরা নানাবিধ স্ববিরোধিতার জালে জড়িয়ে পড়তে এবং পুঁজিতেও কিছুটা উৎপাদিকা শক্তি আরোপ করতে বাধ্য হন। প্রুধোঁ যে পুঁজির উৎপাদিকা শক্তি বাক্যাংশটি গ্রহণ করেছেন, এই সত্যই সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট করে প্রমাণ করে যে তিনি কত পুরোপুরি বুর্জোয়া ভাবাদর্শের জালে জড়িয়ে রয়েছেন। আমরা একেবারে গোড়াতেই দেখেছি যে, 'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তি' মজুরি শ্রমিকদের অবৈতনিক শ্রমকে আত্মসাৎ করার ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয় (বর্তমান সমাজ-সম্পর্কের আওতায়, যে সম্পর্কের অভাবে তা পুঁজিই হতে পারে না)।

তবে বুর্জোয়া অর্থতত্ত্ববিদদের সঙ্গে প্রুধোঁর একটা তফাৎ আছে এই যে 'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে' তিনি অনুমোদন করেন না; বরং এর মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন 'চিরন্তন ন্যায়বিচারের' লংঘন। এই উৎপাদিকা শক্তিই শ্রমিককে তার শ্রমের পূর্ণ মূল্য পেতে বাধা দেয়; সুতরাং এর অবসান ঘটাতে হবে। কিন্তু কী করে? বাধ্যতামূলক আইন করে **সুদের হারকে** কমাতে কমাতে শেষ পর্যন্ত নামিয়ে আনতে হবে শূন্যে। আমাদের প্রুধোঁপন্থীর মতে তখন পুঁজির আর উৎপাদিকা শক্তি থাকবে না।

ঋণ দেওয়া **মুদ্রা** পুঁজির উপর যে সুদ তা মুনাফার একটা অংশ মাত্র; শিল্পের পুঁজির উপরই হোক, বা বাণিজ্যিক পুঁজির উপরেই হোক, মুনাফা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে অবৈতনিক শ্রমরূপে পুঁজিপতি শ্রেণী যে উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করে তারই একাংশ। সুদের হার ও উদ্বৃত্ত মূল্যের হার যে অর্থনৈতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয় সে নিয়ম দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, — অবশ্য কোনও নির্দিষ্ট সমাজের বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে যতদূর পর্যন্ত সম্পর্করহিত হওয়া সম্ভবপর ততখানিই। বিভিন্ন পুঁজিপতির মধ্যে এই উদ্বৃত্ত মূল্যের বণ্টন ব্যাপারে কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, যে-সব শিল্পপতি ও বণিকেরা তাদের ব্যবসায়ে অন্য পুঁজিপতির কাছ থেকে ঋণ করা মোটা রকমের পুঁজি নিয়োগ করেছে তাদের মুনাফার হার, অন্যান্য বিষয় সমান থাকলে, ততখানিই বাড়বে, যতখানি নামবে সুদের হার। সুতরাং সুদের হার হ্রাস বা শেষ পর্যন্ত লোপ করলেও কোনক্রমেই 'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে আয়ত্তে আনা' হবে না। এর ফলে শুধু শ্রমিকদের কাছ থেকে দাম না দিয়ে আদায় করা উদ্বৃত্ত মূল্যটার নূতনতর বণ্টন হবে বিভিন্ন পুঁজিপতিদের মধ্যে, তার বেশী কিছু নয়। এর ফলে শিল্প পুঁজিপতির বিরুদ্ধে শ্রমিকের কোন সুবিধা হবে না, সুবিধা হবে শুধু লভ্যাংশজীবীর বিরুদ্ধে শিল্প পুঁজিপতির।

আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রুধোঁ যেমন অন্যান্য অর্থনৈতিক ঘটনার ক্ষেত্রে, তেমনই সুদের হারের ব্যাপারটাকে সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থা দিয়ে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে, এই সামাজিক ব্যবস্থার সাধারণ অভিব্যক্তি যে রাষ্ট্রীয় আইন তা দিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন।

রাষ্ট্রীয় আইন ও সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে যে পারস্পরিক যোগসূত্র রয়েছে, সে সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই; ধরে নেওয়া হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয় আইন সম্পূর্ণ মর্জিমাফিক হুকুম মাত্র; যে কোন মুহূর্তে তাই তা পাল্টে দিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো হুকুমও জারি করা সম্ভব। অতএব — প্রুধোঁর হাতে ক্ষমতা আসা মাত্র — হুকুম জারি করে সুদের হারকে শতকরা এক ভাগে হ্রাস করার মতো সহজ কাজ আর কিছুই হতে পারে না। অথচ যদি সমাজের অন্য সব পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকে, তবে প্রুধোঁবাদী এই হুকুম কাগজেই পর্যবসিত থাকবে। যতই ডিক্রি জারি হোক না কেন, সুদের হার বর্তমানে যে অর্থনৈতিক নিয়মে শাসিত, সেই নিয়মেই তা চলবে। ক্রেডিট আছে এমন লোকেরা অবস্থানুযায়ী শতকরা দুই, তিন, চার, বা আরও চড়া হারের সুদে ধার নিতে থাকবে আগের মতোই। তফাৎ হবে শুধু এই যে কুসীদজীবীরা ঋণ দেবার সময়ে খুব হুঁশিয়ার হবে, এমন লোক দেখে দেবে, যাদের সঙ্গে মামলার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া পুঁজির 'উৎপাদিকা শক্তি' বিলোপ করার এই মহৎ পরিকল্পনাটিও পাহাড় পর্বতের মতোই সুপ্রাচীন, সুপ্রাচীন সেই সব **মহাজনী আইনগুলোর** মতোই যার উদ্দেশ্য ছিল সুদের হার সীমিত করা অথচ যেগুলি ইতিমধ্যে সর্বত্রই নাকচ করে দেওয়া হয়েছে, কেননা কার্য ক্ষেত্রে তাদেরকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করে ও এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে আর সামাজিক উৎপাদনের নিয়মগুলোর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছে তার নিজের অক্ষমতা স্বীকার করতে। আজ সেই মধ্য যুগীয় ও অকেজো আইনগুলি পুনঃপ্রবর্তনই করেই কি 'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে আয়ত্তে' আনতে হবে? দেখা যাচ্ছে যে যতই সূক্ষ্মভাবে প্রুধোঁবাদকে যাচাই করা যায়, ততই বেশি করে তার প্রতিক্রিয়াশীল রূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তারপর যখন এই উপায়ে সুদের হারকে নামিয়ে আনা হবে শূন্যে এবং তার ফলে পুঁজির উপর সুদও উঠে যাবে, তখন 'পুঁজির সংচালনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের অতিরিক্ত আর কিছু দেয়' আর থাকবে না। এখানে বলতে চাওয়া হচ্ছে যে সুদের উচ্ছেদ এবং মুনাফা, এমন কি উদ্বৃত্ত মূল্যের উচ্ছেদ একই কথা। কিন্তু **বাস্তবিকই** যদি হুকুম দিয়ে সুদ লোপ করা যেত, তাহলে তার ফলাফল কী দাঁড়াত? তখন কুসীদজীবী শ্রেণীর আর কোন প্রেরণা থাকত না তাদের পুঁজিকে ঋণ হিসাবে আগাম দেবার। এর পরিবর্তে তারা নিজেদের অ্যাকাউণ্টে নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিম্বা জয়েণ্ট স্টক কোম্পানিতে টাকা খাটাত। শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে পুঁজিপতি শ্রেণী যে মোট উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করে তার মোট পরিমাণটা থাকত অপরিবর্তিতই; পরিবর্তন হত শুধু তার বণ্টনের ক্ষেত্রে এবং তাও খুব বেশী কিছু নয়।

আসলে প্রুধোঁপন্থী ভদ্রলোকটি দেখতে পাচ্ছেন না যে, ইতিমধ্যে এখনই বুর্জোয়া সমাজে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে গড়পড়তায় 'পুঁজি সংচালনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের' (বলা

উচিত পণ্যবিশেষ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম) অতিরিক্ত আর কিছু দাম দেওয়া হয় না। সর্ববিধ পণ্যের মূল্য নির্ধারণের মানদণ্ডই হচ্ছে শ্রম এবং বর্তমান সমাজে বাজারের উঠতি-পড়তির কথা বাদ দিলে পণ্যের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মোট শ্রমের চেয়ে গড়পড়তা হিসাবে সেই পণ্যের বেশি দাম দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। না, না হে প্রুধোঁপন্থী, মুশকিলটা অন্যত্র। মুশকিলটা রয়েছে এই সত্যে যে (আপনাদের বিভ্রান্তিকর ভাষায় বলতে গেলে) 'পুঁজির সংচালনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের' **পুরো দামটি** একেবারে **মেটানো হয় না**। কী করে তা হয় জানতে হলে মার্কস খুলে দেখতে পারেন। ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২৮—১৬০।

এখানেই শেষ নয়। যদি **পুঁজির উপর** সুদ *(Kapitalzins)* উঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে **বাড়িভাড়াও** (Mietzins) লোপ পাবে, কেননা, 'অন্যান্য সকল উৎপন্নের মতো ঘরবাড়িও স্বভাবতই এই নিয়মের আওতা-ভুক্ত'। এটা ঠিক সেই বৃদ্ধ মেজরের বক্তব্যের মতো, যিনি বছরমেয়াদী স্বেচ্ছাসেবক এক রিক্রুটকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন:

'ওহে, শুনছি, তুমি নাকি একজন ডাক্তার; তা মাঝে মাঝে আমার কোয়ার্টারে এসে হাজিরা দিও—স্ত্রী ও সাত সাতটা ছেলেপিলে নিয়ে সংসার, সর্বদাই কিছু না কিছু একটা লেগে থাকে।'

রিক্রুট, 'মাপ করবেন, মেজর, আমি দর্শনশাস্ত্রের ডক্টর।'

মেজর, 'আরে, আমার কাছে ও একই কথা। ডাক্তার একটা হলেই হল।'

আমাদের প্রুধোঁপন্থীর ব্যাপারটাও ঐ একই রকমের: বাড়িভাড়া (Mietzins) বা পুঁজির সুদ (Kapitalzins) তাঁর কাছে সবই এক। সুদ সব সময়ই সুদ; ডাক্তার সবই ডাক্তার। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, যাকে সাধারণত বাড়িভাড়া (Mietzins) বলা হয়, সেই ভাড়ার দরটা (Mietpreis) গঠিত হয় এই ভাবে: ১। একাংশ হল ভূমি-খাজনা; ২। আরেক অংশ হচ্ছে নির্মাতার মুনাফাসহ গৃহনির্মাণ পুঁজির সুদ; ৩। একটা অংশ যায় বাড়িটির মেরামত ও বীমার জন্য; ৪। আর এক অংশ হবে বাড়ির ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ক্ষতির হার অনুযায়ী মুনাফাসহ বাড়ি নির্মাণের পুঁজির পুনরুদ্ধারের (amortize) উদ্দেশ্যে বার্ষিক কিস্তি।

এখন কথাটা চরম অন্ধের কাছেও নিশ্চয় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, 'বাড়ির মালিক নিজেই তখন যেচে বিক্রি করতে রাজি হবে, কেননা, অন্যথায় তার বাড়ি অব্যবহৃত পড়ে থাকবে এবং তার মধ্যে নিয়োজিত পুঁজি সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হয়ে পড়বে।' ঠিক কথা। ধার-নেওয়া পুঁজির উপর সুদ তুলে দিলে, তারপর কোনো বাড়িওয়ালাই তার বাড়িভাড়া বাবদ এক কপর্দকও আদায় করতে পারবে না, তার সোজা কারণ, বাড়িভাড়াকে (Miete) বলা যায় বাড়িভাড়ারূপ সুদ (Mietzins) এবং এই বাড়িভাড়া

সুদের একাংশ সত্যিই হল পুঁজির উপর সুদ। ডাক্তার হলেই হল। পুঁজির উপর সাধারণ সুদ সম্পর্কিত মহাজনী আইনকে শুধু পাশ কাটিয়েই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করা যেত, তবুও তেমন আইন কখনও পরোক্ষেও বাড়িভাড়াকে স্পর্শ করেনি। এই কল্পনা প্রুধোঁর জন্যই মজুত ছিল যে, তাঁর নতুন মহাজনী আইন সহজ পুঁজির সুদের ব্যাপারটিকেই শুধু নয়, নির্বিবাদে জটিল বাড়িভাড়ার (Mietzins) ব্যবস্থাকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে ক্রমশ লোপ করে দেবে। কেনই বা তাহলে এই রকম 'সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল' বাড়িটা লোকে কাঁচা পয়সা খরচ করে বাড়িওয়ালার কাছ থেকে কিনবে, এবং এই পরিস্থিতিতে মেরামতের ব্যয়টা অন্তত বাঁচাবার জন্য বাড়িওয়ালাই বা কেন এই 'সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল' বাড়ির হাত থেকে অব্যাহতির জন্য উল্টো নিজেই পয়সা দিতে চাইবে না — এমন সব প্রশ্ন সম্পর্কে অবশ্য আমাদের অন্ধকারে রাখা হয়েছে।

উচ্চতর সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে [গুরুদেব প্রুধোঁর ভাষায় এটা হল ঊর্ধ্ব-সমাজবাদ (Suprasocialism)] এই বিজয়ী কীর্তির পর এই প্রুধোঁপন্থী আরও উঁচুতে উড়বার জন্য নিজেকে যোগ্য বিবেচনা করলেন:

> 'এখন করবার মধ্যে রইল শুধু কয়েকটি সিদ্ধান্ত টানা যাতে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর চতুর্দিক থেকে পরিপূর্ণ আলোকপাত করা যায়।'

সেই সিদ্ধান্তগুলি তাহলে কী কী? পূর্বেকার বক্তব্যের সঙ্গে এসব সিদ্ধান্তের ঠিক ততটুকুই সঙ্গতি, সুদ উচ্ছেদের সঙ্গে বসতবাড়ির নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার যতটুকু সঙ্গতি। আমাদের লেখকপ্রবরের সাড়ম্বর গুরুগম্ভীর বাক্যচ্ছটা বাদ দিলে কথাটা যা দাঁড়ায় তা' হল এই যে -- ভাড়াটে বসতবাড়ির দায়মোচনের ব্যাপারটার পথ সুগম করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি বাঞ্ছনীয়: ১। বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক সংখ্যাতথ্য; ২। ভাল স্বাস্থ্য পরিদর্শক কর্মচারীর দল; ৩। নতুন বসতবাড়ি বানাবার ভার নেবার জন্য নির্মাণ-শ্রমিকদের সমবায়সমূহ। ব্যবস্থাগুলি নিঃসন্দেহে ভারি চমৎকার ও ভালো, কিন্তু যতই গলাবাজির ভাষায় এদের সজ্জিত রাখা হোক না কেন, কোনক্রমেই তাতে প্রুধোঁপন্থী মানসিক বিভ্রান্তির অন্ধকারের উপর 'পরিপূর্ণ আলোকপাত' হচ্ছে না।

যিনি এরম্প্রকার বৃহৎ কীর্তি অর্জন করেছেন, তাঁর নিশ্চয়ই জার্মান শ্রমিকদের কাছে গম্ভীর আহ্বান জানাবার অধিকার আছে:

> 'এই ধরনের এবং অনুরূপ সমস্যাগুলি সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মনোযোগের যোগ্য বলেই আমাদের ধারণা ... বাস-সংস্থানের এই সমস্যার মতোই **ক্রেডিট, রাষ্ট্রীয় ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ, কর-ব্যবস্থা** ইত্যাদি অন্যান্য সমান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও তারা যেন পরিষ্কার হয়ে নেয়।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই প্রুধোঁপন্থীটি 'অনুরূপ সমস্যাগুলি' সম্পর্কে প্রবন্ধ-ধারার সম্ভাবনা হাজির করেছেন। এই প্রবন্ধগুলিতেও যদি তিনি বর্তমানের 'এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির' মতো সমান বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করেন, তা'হলে *Volksstaat* পত্রিকার পুরো বছরের মত খোরাক জুটে যাবে। আমরা কিন্তু আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারছি যে, ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে তাই দাঁড়াবে: পুঁজির উপর সুদ তুলে দিতে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ও ব্যক্তিগত ঋণের সুদও লোপ পাবে, বিনা সুদেই ঋণ পাওয়া যাবে, ইত্যাদি। প্রতিটি ব্যাপারে সেই একই যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করা হবে এবং প্রতিক্ষেত্রেই অকাট্য যুক্তি দিয়ে সেই একই বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হবে যে, পুঁজির উপর সুদ উচ্ছেদ হলে ধার-করা টাকার উপর আর সুদ দিতে হবে না।

প্রসঙ্গত, প্রুধোঁপন্থী আমাদের ভয় দেখিয়ে চমৎকার সব প্রশ্ন তুলেছেন: **ক্রেডিট!** হপ্তায় হপ্তায় যা প্রাপ্য অথবা বন্ধকী দোকান থেকে মেলে, তাছাড়া শ্রমিকের আর কোন ক্রেডিটের দরকার? এই ক্রেডিট সে সুদ ছাড়া বা সুদ দিয়ে, যেভাবেই পাক না কেন, এমন কি বন্ধকী দোকান থেকে গলাকাটা সুদেই হোক না কেন, তাতে তার কতটা আসে যায়? আর সাধারণভাবে বলতে গেলে এ থেকে যদি কোনো সুবিধাও হয়, অর্থাৎ শ্রমশক্তি উৎপাদনের ব্যয়টা যদি হ্রাস পায় তাহলে কি শ্রমশক্তির দামও কমতে বাধ্য হবে না? কিন্তু বুর্জোয়া ও বিশেষ করে পেটি বুর্জোয়ার কাছে ক্রেডিট একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যে কোনো সময় যদি চাইলেই, এবং বিশেষ করে বিনা সুদে ক্রেডিট পাওয়া যেত, তাহলে বিশেষত পেটি বুর্জোয়ার পক্ষে তা বড়ই ভালো হত। 'রাষ্ট্রীয় দেনা!' শ্রমিক শ্রেণী জানে যে এই দেনা তাদের কীর্তি নয়, এবং ক্ষমতা হাতে পেলে এ দেনা শোধ করার ভার ছেড়ে দেওয়া হবে যারা দেনা করেছিল তাদের উপর। 'ব্যক্তিগত ঋণ!' — ক্রেডিট প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। 'কর!' ব্যাপারটা সম্বন্ধে বুর্জোয়াদের যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও শ্রমিকদের আগ্রহ যৎসামান্য। শ্রমিকেরা কর হিসাবে যা দেয়, তা শেষ পর্যন্ত শ্রমশক্তি উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে, অতএব শেষ পর্যন্ত পুঁজিপতিকে তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে। শ্রমিকদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী বলে এই যত প্রশ্নকে আমাদের সামনে এখানে তুলে ধরা হয়েছে, সে সব আসলে শুধু বুর্জোয়াদের, আরও বেশী করে পেটি বুর্জোয়াদের আগ্রহের বিষয়বস্তু। আর প্রুধোঁ যাই বলুন না কেন, আমাদের অভিমত এই যে, এ সব শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার দায় শ্রমিক শ্রেণীর নয়।

যে বৃহৎ প্রশ্নে সত্যসত্যই শ্রমিকদের স্বার্থ সে সম্বন্ধে এই প্রুধোঁপন্থী লেখকের কোনো কথাই বলার নেই, অর্থাৎ পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকের মধ্যেকার সম্পর্ক, কী করে পুঁজিপতি তার নিযুক্ত শ্রমিকদের শ্রম দিয়ে নিজের ধনবৃদ্ধি করতে পারে

এই প্রশ্ন। একথা সত্য যে তাঁর প্রভু ও গুরুদেব এ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলেন, কিন্তু বিষয়টিতে তিনি বিন্দুমাত্রও স্বচ্ছতা আনতে পারেননি। এমন কি তাঁর সর্বশেষ রচনাগুলিতেও তিনি তাঁর 'দারিদ্র্যের দর্শন' থেকে মূলত এগোতে পারেননি — যে বইটির শূন্যগর্ভতা মার্কস ১৮৪৭ সালেই অত চমকপ্রদভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

এটাই যথেষ্ট আক্ষেপের কথা যে, গত পঁচিশ বছর ধরে ল্যাটিন দেশগুলির শ্রমিকদের ভাগ্যে এই 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সমাজতন্ত্রীর' রচনা ভিন্ন সমাজতন্ত্রী মানসিক পুষ্টি প্রায় কিছুই জোটেনি এবং যদি আজকের দিনে জার্মানিকেও প্রুধোঁবাদী তত্ত্ব প্লাবিত করে তাহলে দ্বিগুণ দুর্ভাগ্যের কথা। অবশ্য এ আশঙ্কার কোনো ভিত্তি নেই। জার্মান শ্রমিকদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রুধোঁবাদকে পিছনে ফেলে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গিয়েছে এবং বাস-সংস্থান সমস্যার মতো এই একটি সমস্যার দৃষ্টান্ত রাখলেই আর ভবিষ্যতে এদিক থেকে বেগ পেতে হবে না।

দ্বিতীয় ভাগ

বুর্জোয়ারা কী করে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করে

১

বাস-সংস্থান সমস্যার **প্রুধোঁবাদী** সমাধান আলোচনার অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে পেটি বুর্জোয়াদের স্বার্থ কত বেশী প্রত্যক্ষভাবে এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। পরোক্ষভাবে হলেও, বড় বুর্জোয়াদেরও এ ব্যাপারে খুব আগ্রহ আছে। আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, শহরগুলি মাঝে মাঝেই যে মহামারীর আক্রমণে জর্জরিত হয়, তার সব কটারই জন্মস্থান হল সেই তথাকথিত 'দরিদ্র পাড়াগুলি' যেখানে শ্রমিকেরা গাদাগাদি করে বাস করে। কলেরা, টাইফাস, টাইফয়েড জ্বর, বসন্ত ইত্যাদি সর্বনেশে রোগগুলি শ্রমিক শ্রেণীর এইসব এলাকার সংক্রামক বাতাসে এবং বিষাক্ত জলেই তাদের রোগবীজাণু ছড়ায়। সেখানে এ বীজাণুগুলি প্রায় কখনই সম্পূর্ণ মরে না, সুযোগ পেলেই মহামারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং নিজেদের জন্মস্থান অতিক্রম করে পুঁজিপতিদের অধ্যুষিত শহরের অধিকতর আলো হাওয়াযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে মহামারীর উদ্ভব হওয়ার তৃপ্তিটুকু পুঁজিবাদী শাসনের পক্ষে বিনা শাস্তিতে উপভোগ করা সম্ভব নয়, তার ফলাফল ভোগ করতে হয় পুঁজিপতিদেরও, এবং যেমন মজুরদের মধ্যে তেমনই এদের ভিতরেও যমদূত সমান নির্মমভাবেই অবাধ বিচরণ করে।

এই তথ্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতেই বুর্জোয়া মানবহিতৈষীরা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে মহানুভবতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উদ্দীপিত হয়ে পড়েছেন। পৌনঃপুনিক মহামারীর উৎস নির্মূল করার উদ্দেশ্যে বহুবিধ সমিতি সংগঠিত হয়েছে, পুস্তক লিখিত হয়েছে, রচিত হয়েছে প্রস্তাব, আলোচিত ও গৃহীত হয়েছে আইন। শ্রমিকদের বসবাসের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করা হয়েছে এবং চেষ্টা হয়েছে চরমতম দুর্দশার প্রতিবিধান করার। বড় বড় শহরের সংখ্যা ইংলন্ডে সর্বাধিক, সুতরাং বিপদের আশঙ্কাটাও এখানকার বুর্জোয়াদেরই সব থেকে বেশী; তাই এখানেই বিশেষ করে

ব্যাপক কার্যকলাপ শুরু হল। শ্রমিক শ্রেণীর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য নিযুক্ত হল একাধিক সরকারী কমিশন। এইসকল কমিশনের রিপোর্ট ইউরোপ-মহাদেশীয় সকল তথ্যসংগ্রহের তুলনায় যথার্থতা, সমগ্রতা এবং নিরপেক্ষতার দিক থেকে অনেক বেশী সম্মানজনক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নতুন নতুন, কমবেশী আমূল সব আইনের ভিত্তি জোগায়। দোষত্রুটি থাকলেও, আজ পর্যন্ত মহাদেশে এই ধরনের যা কিছু করা হয়েছে, তার তুলনায় এসব আইন বহুগুণেই শ্রেষ্ঠ। এ সত্ত্বেও পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা বারংবার প্রতিবিধেয় অমঙ্গলের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে, এবং তা দিচ্ছে এমন অনিবার্য আবশ্যিকতায় যে ব্যাধি প্রতিবিধানের কাজ এমন কি ইংলণ্ডে প্রায় এক ধাপও এগোয়নি।

জার্মানিতে বরাবরের মতো এ ব্যাপারেও সেখানকার বারোমেসে সংক্রমণের উৎসগুলির পক্ষে মারাত্মক স্তরে পৌঁছে তন্দ্রালু বড় বুর্জোয়াদের ঘুম ভাঙাতে অনেক বেশী সময় লাগল। কিন্তু যে ধীরে চলে, সে নিশ্চিত হয়েই চলে। সুতরাং আমাদের দেশেও শেষ পর্যন্ত জনস্বাস্থ্য ও বাস-সংস্থান সমস্যা সংক্রান্ত একটা বুর্জোয়া সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে, যা হল তার বিদেশী, বিশেষ করে ইংরেজ পূর্বসূরীদের একটা জোলো নির্যাস, অবশ্য তার মধ্যে গুরুগম্ভীর ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে উচ্চতর মননশীলতার ছাপ দেবার একটা শঠ প্রচেষ্টাও আছে। ১৮৬৯ সালে ভিয়েনা থেকে প্রকাশিত ডক্টর এমিল জাক্স রচিত 'শ্রমিক শ্রেণীর বাস-সংস্থানের অবস্থা ও তার সংস্কার'* এই সাহিত্যের অন্তর্গত।

বাস-সংস্থান সমস্যার বুর্জোয়া আলোচনা পদ্ধতির পরিচয় দেবার জন্যে এই বইটি আমি বেছে নিয়েছি এই কারণেই যে, এখানে এই বিষয়ক বুর্জোয়া সাহিত্যের যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্তসার দেবার চেষ্টা হয়েছে। আর যে সাহিত্য এই লেখকের 'উৎস' হিসাবে কাজ করেছে, তাকে চমকপ্রদই বলতে হয়! এ ব্যাপারে যা কিনা আসল উৎস, সেই ইংরেজ পার্লামেণ্টীয় রিপোর্টের মধ্যে মাত্র তিনটি, তাও সব থেকে পুরানো রিপোর্টের নামোল্লেখ করা হয়েছে মাত্র; গোটা বই থেকেই প্রমাণ হয় যে লেখক **তার একটিরও পাতা কখনো উল্টে দেখেননি।** অপরদিকে ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে রাজ্যের যত মামুলী বুর্জোয়া, সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত কূপমণ্ডূক, আর ভণ্ড লোকহিতৈষী রচনাসমূহের: দ্যুকপেসিয়ে, রবার্ট্স্, হোল, হুবার; সমাজবিজ্ঞান (বরঞ্চ বলা উচিত সামাজিক ছাইপাঁশ) সম্বন্ধীয় ইংরেজ কংগ্রেসগুলোর কার্যবিবরণী; প্রাশিয়ার শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহের কল্যাণ সমিতির পত্রিকা; প্যারিস বিশ্ব প্রদর্শনী সম্বন্ধে অস্ট্রিয়ার সরকারী

* E. Sax, *Die Wohnungszustände der arbeitenden Klassen und ihre Reform.* Wien, 1869. — সম্পাঃ

রিপোর্ট, ঐ একই বিষয়ে বোনাপার্টীয় সরকারী রিপোর্ট; *Illustrated London News**, *Über Land und Meer***; এবং সর্বোপরি সেই 'স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ', 'তীক্ষ্ম ব্যবহারিক বোধসম্পন্ন' ব্যক্তি, 'প্রত্যয়সাধক হৃদয়গ্রাহী বক্তা' অর্থাৎ — **ইউলিউস ফাউখার!** উৎসের এই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে শুধু *Gartenlaube,**** *Kladderadatsch* এবং বন্দুকবাজ কুচকে****।

শ্রীযুক্ত জাক্সের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে ভুল বুঝবার কোনও অবকাশ যাতে থাকতে না পারে, তারজন্য তিনি ২২ পৃষ্ঠায় ঘোষণা করেছেন:

'সামাজিক অর্থনীতি বলতে আমরা বোঝাতে চাই সামাজিক প্রশ্ন সম্পর্কে প্রযুক্ত জাতীয় অর্থনীতির তত্ত্ব, অথবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, **বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে প্রচলিত 'লৌহদৃঢ়' নিয়মাবলীর ভিত্তিতে, তথাকথিত (!) সম্পত্তিবিহীন শ্রেণীকে সম্পত্তিসম্পন্ন শ্রেণীর স্তরে উন্নীত করবার** জন্য এই বিজ্ঞান নির্দেশিত সমুদয় উপায় পন্থার সমষ্টি।'

অর্থশাস্ত্র বা 'জাতীয় অর্থনীতির তত্ত্ব' 'সামাজিক' প্রশ্ন ছাড়া সাধারণত অন্য ব্যাপারেরই কারবার করে কিনা, এই বিভ্রান্তিকর ধারণা নিয়ে আমরা আলোচনা করব না। আমরা সরাসরি চলে আসব মূল প্রশ্নটিতে। ডক্টর জাক্স দাবি করছেন যে, বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের 'লৌহদৃঢ় নিয়মাবলী', 'বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো', অর্থাৎ অন্য কথায় পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি অপরিবর্তিত হয়ে চালু থাকবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'তথাকথিত সম্পত্তিবিহীন শ্রেণীকে' 'সম্পত্তিসম্পন্ন শ্রেণীর স্তরে' তুলতে হবে। অথচ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির এক অনিবার্য প্রাথমিক শর্তই হল এই যে, তথাকথিত নয়, সত্যসত্যই সম্পত্তিবিহীন একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে, থাকবে এমন এক শ্রেণী যার শ্রমশক্তি ছাড়া বিক্রয় করার আর কিছু নেই এবং যাকে সুতরাং বাধ্য হয়ে শিল্প পুঁজিপতির কাছে নিজের শ্রমশক্তিটাই বিক্রয় করতে হয়। শ্রীযুক্ত জাক্স কর্তৃক উদ্ভাবিত সামাজিক অর্থনীতির এই নতুন বিজ্ঞানের কর্তব্য তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, একদিকে সকল কাঁচামাল, উৎপাদনের যন্ত্র ও প্রাণ ধারণের উপকরণের মালিক পুঁজিপতি, আর

* *Illustrated London News* — ১৮৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যাপক প্রচলিত সচিত্র বুর্জোয়া সাপ্তাহিক। — সম্পাঃ

** *Über Land und Meer* (জলে স্থলে) — ১৮৫৮ সালে স্টুটগার্টে প্রকাশিত সচিত্র সাহিত্য পত্রিকা। — সম্পাঃ

*** *Gartenlaube* (কুঞ্জ) অর্বাচীন গার্হস্থ্য পত্রিকা বিশেষ। — সম্পাঃ

**** *Fusilier August Kutschke* (বন্দুকবাজ আউগস্ত কুচকে) — কবি গতহেল্ফ হফ্মান, ১৮৭০-৭১ ফরাসী-জার্মান যুদ্ধের সময় জনপ্রিয় স্বদেশপ্রেমিক গান লিখেছিলেন। — সম্পাঃ

অন্যদিকে সম্পত্তিবিহীন মজুরি-শ্রমিক, শ্রমশক্তি ছাড়া যাদের নিজের বলতে আর কিছু নেই — এই দুই শ্রেণীর বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই, সকল মজুরি-শ্রমিককেই তাদের মজুরি-শ্রমিক অবস্থাতেই পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত করার উপায় উদ্ভাবন করা। শ্রীযুক্ত জাক্সের বিশ্বাস যে তিনি এই সমস্যার সমাধান করেছেন। তিনি দয়া করে আমাদের তাহলে দেখিয়ে দিন কী উপায়ে যারা সেই আদি নেপোলিয়নের সময় থেকেই নাকি তাদের কাঁধের থলিতে একটা মার্শালের দণ্ড নিয়ে রেখেছে, সেই ফরাসী বাহিনীর সৈনিকেরা সবাই সাধারণ সৈনিক থেকে গিয়েও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে এক একজন ফিল্ড মার্শালে পরিণত হতে পারে। অথবা জার্মান রাষ্ট্রের চার কোটি নাগরিকের প্রত্যেককেই জার্মান সম্রাট বানানো যায় কী করে।

বর্তমান সমাজের সবকিছু অমঙ্গলের ভিত্তিটা বজায় থাকবে, কিন্তু অমঙ্গলগুলি লোপ পাবে, এই কামনাই বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের মূলকথা। 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারে' ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীরা 'বুর্জোয়া সমাজের নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করার জন্যই সামাজিক অভাবঅভিযোগের প্রতিকার' প্রয়াসী; তারা চায় **'প্রলেতারিয়েতকে বাদ দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী'**। আমরা দেখেছি যে, শ্রীযুক্ত জাক্স-ও সমস্যাটিকে ঠিক এইভাবেই উপস্থিত করেছেন। বাস-সংস্থান প্রশ্নের সমাধানের মধ্যে তিনি এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর অভিমত হল এই যে, 'মেহনতী শ্রেণীগুলির বাসস্থানের উন্নতিসাধন দ্বারা উপরে বর্ণিত বৈষয়িক ও আত্মিক দুর্দশার সফল প্রতিকার সম্ভব এবং এতদ্বারা — **শুধুমাত্র** বাস-সংস্থান পরিস্থিতির আমূল উন্নতির ভিতর দিয়েই — এই সকল শ্রেণীর অধিকাংশকে তাদের প্রায় অমানবিক জীবন-পরিস্থিতির পংক থেকে উদ্ধার করে বৈষয়িক ও আত্মিক সচ্ছলতার নির্মল শিখরে তোলা যায়' (১৪ পৃষ্ঠা)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক দিয়েই যে প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়, এবং সেই উৎপাদন-সম্পর্কের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই যে প্রলেতারিয়েতের প্রয়োজন, এই সত্য ঢেকে রাখাটাই বুর্জোয়ার স্বার্থ। সুতরাং শ্রীযুক্ত জাক্স বলেছেন যে, (২১ পৃঃ) মেহনতী শ্রেণীগুলি কথাটিতে সকল 'সম্পত্তিহীন সামাজিক শ্রেণীগুলিকেই' বোঝায়, এবং প্রকৃত শ্রমিক ছাড়াও 'সাধারণভাবে স্বল্প রোজগেরে লোক যথা হস্তশিল্পী. বিধবা, পেন্‌সনভোগী(!), অধস্তন কর্মচারী ইত্যাদি' সকলেই এর মধ্যে পড়ে। বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র পেটি বুর্জোয়া প্রকারভেদের দিকেও হাত বাড়ায়।

তাহলে বাস-সংস্থানের অভাবটা আসছে কোথা থেকে? কী করে এই সমস্যার উদ্ভব হল? খাঁটি বুর্জোয়া হিসাবে শ্রীযুক্ত জাক্সের এটা জানার কথা নয় যে, সমস্যাটি বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার অপরিহার্য ফল, যে সমাজে ব্যাপক শ্রমজীবী জনতা একান্তভাবে মজুরির উপর, অর্থাৎ কিনা তাদের প্রাণধারণের এবং বংশবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের

উপকরণটুকুর উপর নির্ভরশীল; যে সমাজে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উন্নতি প্রতিনিয়ত ব্যাপক সংখ্যায় শ্রমিকদের চাকুরি থেকে উৎখাত করছে; যে সমাজে শিল্পোৎপাদনের নিয়মিত পুনঃপুনঃ তীব্র উত্থানপতন একদিকে বেকার শ্রমিকের বিরাট মজুত বাহিনীর অস্তিত্ব নির্দিষ্ট করছে এবং অন্যদিকে সময় সময় বহুসংখ্যক শ্রমিকদের বেকার করে ফেলে পথে বার করে দিচ্ছে; যে সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থায় শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্মিত হওয়ার গতিবেগ থেকে দ্রুততর গতিতে দলে দলে শ্রমিক বড় বড় শহরে এসে ভিড় করে; যে পরিস্থিতিতে সুতরাং অতি জঘন্য শুয়োরের খোঁয়াড়ের জন্যও ভাড়াটে জুটতে বাধ্য; এবং যে পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত বাড়ির মালিক পুঁজিপতি হিসাবে শুধু যে বাড়ি ভাড়ার ভিতর দিয়ে তার সম্পত্তি থেকে নির্মমভাবে যথাসম্ভব উসুল করে নেবার অধিকারটুকু পায় তাই নয়, প্রতিযোগিতার চাপে এটা কিছু পরিমাণে তার কর্তব্যও হয়ে দাঁড়ায় — তেমন সমাজে এমন সমস্যা বিদ্যমান না থেকে পারে না। এমন ধারা সমাজে বাস-সংস্থানের অভাব কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; এটা এই সমাজের একটা অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান; এবং স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপরে এর সমস্ত কুফল সমেত এই সমস্যার অবসান তখনই হতে পারে যখন যে সমাজ-ব্যবস্থা থেকে এর জন্ম সেই সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থাটারই আমূল পুনর্গঠন করা হচ্ছে। অবশ্য এ কথাটা জানার সাহস বুর্জোয়া সমাজবাদের নেই। তার **সাহস** নেই এই সত্য ব্যাখ্যা করার যে, বর্তমান ব্যবস্থা থেকেই বাসস্থান অভাবের জন্ম। সুতরাং এটা মানুষের দুষ্প্রবৃত্তির ফল, আদি পাপের ফল, এই নীতি বাক্য আউড়ে বাসস্থানের অভাবের কারণ বর্ণনা ছাড়া তার উপায় নেই।

'এবং এই প্রসঙ্গে আমরা এ কথা না দেখে পারি না এবং সুতরাং অস্বীকারও করতে পারি না' (কী দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত!) 'যে, দোষ... খানিকটা যারা বাড়ি চায় **সেই শ্রমিকদের নিজেদেরই,** এবং খানিকটা, অবশ্য অনেক বেশির ভাগটা তাদেরই, যারা এই চাহিদা পূরণ করার দায়িত্ব **নেয়** অথবা তাদেরই যারা হাতে যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও এই চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে না, অর্থাৎ কিনা **সম্পত্তিবান উচ্চতর সামাজিক শ্রেণীগুলির।** শেষোক্ত শ্রেণীগুলি এই জন্য নিন্দার্হ... যে তারা উপযুক্ত পরিমাণে ভাল বাসগৃহ সরবরাহের দায়িত্ব নেয় না।'

ঠিক যেমন প্রুধোঁ অর্থতত্ত্বের আওতা থেকে আমাদের আইনী বুলির রাজ্যে নিয়ে যান, এই বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীও তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে আমাদের নৈতিকতার মহলে নিয়ে যাচ্ছেন। এর চাইতে স্বাভাবিক আর কিছু হতে পারে না। কেউ যদি একদিকে এই কথা ঘোষণা করে যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি, বর্তমান বুর্জোয়া সমাজের 'লৌহ দৃঢ় নিয়মাবলী' অলংঘনীয়, অথচ সঙ্গে সঙ্গে চায় যে এই সমাজ-ব্যবস্থার অপ্রীতিকর কিন্তু অপরিহার্য ফলাফলগুলির অবসান হোক, তার পক্ষে পুঁজিপতিদের প্রতি নীতি-উপদেশ বর্ষণ ছাড়া গত্যন্তর নেই, যে নীতিবাক্যের ভাবাকুল প্রতিক্রিয়াটা

অবশ্য ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং প্রয়োজন হলে প্রতিযোগিতার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ উবে যায়। তা দিয়ে ফোটানো হাঁসের বাচ্চার দলকে পুকুরের জলে উল্লাসভাবে ভাসতে দেখে পাড়ে উপবিষ্ট মুরগী-মায়ের সাবধান-বাণীর মতনই নীতি উপদেশ নিষ্ফল। জলে যদিও কড়িকাঠ নেই তবু হাঁসের বাচ্চার স্বভাবজাত টান সেই দিকেই; মুনাফা নিষ্করুণ, কিন্তু পুঁজিপতি মাত্রেই তার উপর ছোঁ মারবে। 'টাকা পয়সার ব্যাপারে হৃদয়বৃত্তির কোন স্থান নেই' -- বলেছিলেন বুড়ো হানজেমান, যিনি শ্রীযুক্ত জাক্স অপেক্ষা এই ব্যাপারে অনেক বেশী অভিজ্ঞ।

'ভালো বাসগৃহ এতই ব্যয়সাধ্য যে অধিকাংশ শ্রমিকের পক্ষে তা ভোগ করা **একান্তই অসম্ভব।** বৃহৎ পুঁজি ... মেহনতী শ্রেণীর জন্য বাসগৃহ নির্মাণে লগ্নি করতে কুণ্ঠিত ... ফলে এই শ্রেণীগুলি তাদের বাসস্থানের চাহিদা মেটাতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফাটকাবাজদের শিকারে পরিণত হয়।'

জঘন্য ফাটকাবাজি -- বৃহৎ পুঁজি স্বভাবতই কখনও ফাটকাবাজি করে না! কিন্তু শ্রমিকদের বাসগৃহ নিয়ে বৃহৎ পুঁজি যে ফাটকাবাজি করছে না তার কারণ তাদের অসদিচ্ছা নয়, কারণ তাদের অজ্ঞতা মাত্র:

'বাড়ির মালিকরা মোটেই **জানেন** না, গৃহসংস্থানের চাহিদার স্বাভাবিক পূরণের ... কী বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; সাধারণত এমন দায়িত্বহীনভাবে খারাপ ও ক্ষতিকর বাসগৃহ সরবরাহ করে **তাঁরা লোকের কী করছেন, তা তাঁরা জানেন না**; পরিশেষে তাঁরা তাতে করে নিজেদেরই কী ক্ষতিসাধন করছেন, তাও তাঁরা **জানেন** না।' (পৃঃ ২৭)

তবু পুঁজিপতি শ্রেণীর অজ্ঞতার সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর অজ্ঞতা যোগ না হলে কিন্তু বাসস্থান অভাবের সৃষ্টি হয় না। শ্রীযুক্ত জাক্স স্বীকার করেছেন যে শ্রমিক শ্রেণীর 'দরিদ্রতম অংশ' 'একেবারে যাতে খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকতে না হয় তার জন্য যেখানেই পাক এবং যেভাবেই পাক রাত্রির আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য(!) হয় আর এই ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত এবং অসহায়।' এর পরেই তিনি আমাদের বলছেন:

'কারণ এ কথা সুবিদিত সত্য যে, তাদের (শ্রমিকদের) অনেকেই কিছুটা অসাবধানতাবশত, অথচ প্রধানত অজ্ঞতাবশত, বলতে ইচ্ছা হয় বিশেষ পারদর্শিতাসহ, তাদের দেহকে স্বাভাবিক বিকাশ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত করে, কারণ যুক্তিসঙ্গত স্বাস্থ্যবিধান এবং বিশেষ করে এই স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপারে বাস-সংস্থানের অসীম গুরুত্ব সম্বন্ধে তাদের **বিন্দুমাত্র ধারণা পর্যন্ত নেই।'** (২৭ পৃষ্ঠা)

এইখানে অবশ্য বুর্জোয়া গাধার কানটা বেরিয়ে আসছে। পুঁজিপতিদের ক্ষেত্রে 'অপরাধ' উবে গিয়ে অজ্ঞতা হল, কিন্তু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অজ্ঞতাটাই তাদের অপরাধের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আরও শুনুন:

'এই ভাবেই দেখা যায় (অবশ্য অজ্ঞতাবশত) যে, তারা ভাড়া বাবদে কিছু বাঁচাতে পারার খাতিরে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের চাহিদাগুলিকে সরাসরি ব্যঙ্গ করে অন্ধকার, স্যাঁৎস্যাঁতে এবং অপরিসর বাসগৃহে উঠে যায়... প্রায় এ রকম ঘটে যে, একই ফ্ল্যাটে, এমন কি একই ঘর কয়েকটি পরিবার মিলে ভাড়া নেয় — উদ্দেশ্যটা হল শুধু বাড়ি ভাড়ার জন্য যতটা সম্ভব কম খরচ করা, অথচ অন্যদিকে **মদ্যপান এবং অন্যান্য নানাবিধ অলস প্রমোদে সত্যসত্যই পাতকীর মতো** তাদের আয়কে **উড়িয়ে দেয়** তারা।'

শ্রমিকেরা 'মাদক পানীয় এবং তামাকের খাতে যে অর্থ অপচয়' করে (২৮ পৃষ্ঠা), 'শুঁড়িখানার যে জীবন তার দুঃখজনক ফলাফলসহ পাথরের মতো তাদের পাঁকে আবার টেনে নামায়', তা সত্যিই শ্রীযুক্ত জাক্সের পাকস্থলীতে পাথরের মতন বোঝা হয়ে রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মদ্যাসক্তি যে শ্রমিকদের জীবন যাত্রার অবস্থার অপরিহার্য ফল; যেমন অপরিহার্য টাইফাস রোগ, অপরাধপ্রবণতা, উকুন পোকা, আদালতের পেয়াদা এবং অন্যান্য সামাজিক কুফল; এমনই অপরিহার্য যে গড়পড়তা কতজন শ্রমিক মাতলামোর শিকার হবে তা পর্যন্ত আগে থাকতে গুণে বলা যায় — এগুলি ফের এমন কথা যা শ্রীযুক্ত জাক্স নিজেকে জানতে দিতে পারেন না। আমার পাঠশালার বৃদ্ধ গুরুমশাই কথাচ্ছলে বলতেন, 'সাধারণ লোক শুঁড়িখানায় যায় আর বাবুরা যান ক্লাবে।' আমি নিজে দুই জায়গাতেই গিয়েছি বলে বলতে পারি যে, কথাটা একেবারে খাঁটি।

উভয়পক্ষের 'অজ্ঞতা' সম্বন্ধে বাগাড়ম্বরটুকু সম্পূর্ণতই শ্রম ও পুঁজির স্বার্থ সমন্বয় সম্পর্কে পুরানো বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। পুঁজিপতিরা যদি তাদের প্রকৃত স্বার্থ বুঝতে পারত তাহলে তারা শ্রমিকদের ভাল ভাল বাসগৃহের ব্যবস্থা করত আর সাধারণভাবে তাদের অবস্থার উন্নতি করে দিত; আবার শ্রমিকেরা যদি তাদের প্রকৃত স্বার্থ বুঝত তাহলে তারা ধর্মঘট করতে যেত না, সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিতে ভিড়ত না, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাত না, শিষ্টভাবে তারা তাদের ঊর্ধ্বতন পুঁজিপতিদের অনুসরণ করে চলত। দুঃখের বিষয় উভয়পক্ষই শ্রীযুক্ত জাক্স এবং তাঁর অগণিত পূর্বগামীদের নীতিবাক্যের এলাকা থেকে একেবারেই অন্যত্র তাদের স্বার্থ দেখে। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সমন্বয়ের বাণী প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে প্রচারিত হয়েছে, এবং বুর্জোয়া জনহিতৈষীরা আদর্শ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে এই সমন্বয় প্রমাণ করবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। তবুও পঞ্চাশ বছর আগে যেখানে ছিলাম আজও আমরা যে ঠিক সেখানেই আছি তা পরে দেখা যাবে।

লেখক বন্ধু এবার সমস্যার বাস্তব সমাধানের দিকে যাচ্ছেন। শ্রমিকদের তাদের বাসগৃহের **মালিকে** পরিণত করা সম্বন্ধে প্রুধোঁর প্রস্তাব যে কত কম বিপ্লবী, তা এই থেকেই বোঝা যায় যে বুর্জোয়া সমাজবাদ প্রুধোঁর আগে থেকে তাকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করেছে এবং এখনও করছে। শ্রীযুক্ত জাক্সও ঘোষণা করছেন যে বাসগৃহের

মালিকানাস্বত্ব শ্রমিকদের হাতে হস্তান্তরিত করেই মাত্র বাস-সংস্থান সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করা যায় (৫৮ ও ৫৯ পৃষ্ঠা)। শুধু তাই নয়, এই পরিকল্পনা নিয়ে তিনি কবিসুলভ পুলকে পুলকিত হয়ে তাঁর অনুভূতিকে নিম্নলিখিত ভাবোচ্ছ্বাসে রূপ দিয়েছেন:

'জমির মালিকানা অর্জনের জন্য মানুষের অন্তর্নিহিত আকাঙ্খার মধ্যে একটা অদ্ভুত কিছু জিনিস আছে; বর্তমান যুগের **ক্ষিপ্তস্পন্দিত কারবারী জীবনও** এ আবেগ প্রশমিত করতে পারেনি। জমির মালিকানার মধ্যে যে অর্থনৈতিক সার্থকতা প্রতিফলিত, এটা তার তাৎপর্য সম্বন্ধে একটা অচেতন উপলব্ধি। এর মধ্যেই ব্যক্তি একটা পাকা প্রতিষ্ঠা পায়; মাটির ভিতরে সে যেন একটা দৃঢ় শিকড় গাড়ে; প্রতিটি উদ্যোগের(!) সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ভিত্তি এর মধ্যেই। জমির মালিকানার সুফল কিন্তু এইসব বৈষয়িক সুখ-সুবিধা অতিক্রম করে আরও অনেকদূর চলে যায়। কেউ যদি ভাগ্যক্রমে একখণ্ড জমি নিজের বলে দাবি করতে পারে, তাহলে সে **অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কল্পনীয় সর্বোচ্চ স্তরে পেঁছে যায়**; তার এমন একখণ্ড জমি রইল যেখানে সে **সার্বভৌমশক্তি** রূপে রাজত্ব করতে পারে; সে-ই তখন **তার নিজের প্রভু**; সে তখন খানিকটা ক্ষমতার অধিকারী, প্রয়োজনের সময় নির্ভর করবার মতন তার **নিশ্চিত সহায়** রইল; তার আত্মবিশ্বাস আর সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক বলও বৃদ্ধি পায়। এইজন্যই বর্তমান সমস্যায় সম্পত্তির গভীর তাৎপর্য ... অর্থনৈতিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মুখে বর্তমানে অসহায়ভাবে উন্মুক্ত, এবং নিয়তই মালিকদের উপর নির্ভরশীল শ্রমিকেরা উপরোক্ত উপায়ে এই দুরূহ অবস্থা থেকে খানিকটা রেহাই পেতে পারে; **সে হয়ে দাঁড়াবে পুঁজিপতি**; স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা তাকে যে ক্রেডিটের পথ খুলে দেবে তা দিয়ে বেকার ও কর্মক্ষমতাহীন অবস্থায় যে বিপদের সম্মুখীন তাকে হতে হত, তার হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করবে। **সম্পত্তিবিহীনদের স্তর থেকে এইভাবে সে সম্পত্তিশালী শ্রেণীর স্তরে উন্নীত হবে'** (৬৩ পৃষ্ঠা)।

মনে হচ্ছে যে শ্রীযুক্ত জাক্স মানুষকে মূলত কৃষক বলে ধরে নিয়েছেন, নতুবা তিনি আমাদের বড় বড় শহরের শ্রমিকদের উপর মিছেমিছি জমির মালিকানার জন্যে আকাঙ্খা আরোপ করতেন না, যে আকাঙ্খা আর কেউ তাদের মধ্যে দেখতে পায়নি। আমাদের বড় বড় শহরের শ্রমিকদের পক্ষে চলাচলের স্বাধীনতাটাই অস্তিত্বের প্রধান শর্ত, জমির মালিকানা তাদের পক্ষে শুধু শৃঙ্খলস্বরূপ। তাদের যদি নিজেদের ঘরবাড়ি করে দাও, আবার নতুন করে জমির সঙ্গে শৃঙ্খলিত করে ফেল, তাহলে কারখানার মালিকগণ কর্তৃক মজুরি কাটবার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিরোধের শক্তিকে ভেঙে দেওয়া হবে। ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো শ্রমিক কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার বাড়ি বিক্রি করতে সক্ষম হতে পারে, কিন্তু বড় কোন ধর্মঘটের অথবা সর্বাত্মক শিল্পসংকটের সময়ে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রমিকদেরই বাড়ি বিক্রয়ের প্রয়োজন হবে, ফলে হয় কোন ক্রেতাই পাওয়া যাবে না নয়ত বেচে দিতে হবে নির্মাণ ব্যয়ের অনেক কম মূল্যে। আর যদি সকল শ্রমিক ক্রেতা পেয়েও যায় তাহলেও শ্রীযুক্ত জাক্সের এই চমৎকার বাস-সংস্থান সংস্কারটা

গোটাগ্লুটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং তাঁকে আবার শ্লুরু করতে হবে গোড়া থেকে। কিন্তু কবিরা বাস করেন কল্পলোকে, জাক্স মহাশয়ও তাই। তাঁর কল্পনাতে জমির মালিক 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সর্বোচ্চ স্তরে পেঁছে যায়'; তাব 'নিশ্চিত সহায়' থাকে; 'সে **হয়ে দাঁড়াবে প্লুঁজিপতি,** স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা তাকে যে ক্রেডিটের পথ খ্লুলে দেবে তা দিয়ে বেকার ও কর্মক্ষমতাহীন অবস্থায় যে বিপদের সম্মুখীন তাকে হতে হত, তারই হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করবে,' ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত জাক্সের উচিত ফরাসী দেশের ও আমাদের নিজেদের রাইন অঞ্চলের ক্ষ্লুদে কৃষকদের দিকে তাকিয়ে দেখা। তাদের ঘরবাড়ি ও ক্ষেতখামার মর্গেজের বোঝায় ভাড়াক্রান্ত; তাদের ফসল কাটা হবার আগেই উত্তমর্ণদের সম্পত্তিতে পরিণত; এই কৃষকেরা তাদের 'এলাকার' উপর সার্বভৌম শক্তিরূপে রাজত্ব করে না, রাজত্ব করে মহাজন, উকিল ও আদালতের পেয়াদারা। এই পরিস্থিতি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সর্বোচ্চ-কল্পনীয় স্তরের প্রতীকই বটে তবে তা — মহাজনদেরই জন্য। আর শ্রমিকেরাও যাতে যতদ্রুত সম্ভব তাদের ছোট ছোট ঘরবাড়িগ্লুলি মহাজনদের সেই সার্বভৌমিকতার অধীনে নিয়ে আসতে পারে, তারই জন্য আমাদের শ্লুভব্লুদ্ধি প্রণোদিত জাক্স মহাশয় সযত্নে নির্দেশ করছেন সেই **ক্রেডিটের** প্রতি, যাতে করে তারা বেকারি ও কর্মক্ষমতাহীনতার সময় দেশের দরিদ্রভাণ্ডারের উপর বোঝা না হয়ে সহায়তা পাবে **স্থাবর সম্পত্তি** থেকে।

সে যাই হোক, শ্রীযুক্ত জাক্স গোড়াতে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তার সমাধান করে দিয়েছেন: শ্রমিক ছোট একটি বাড়ির মালিকানা অর্জন করে **'হয়ে দাঁড়াবে প্লুঁজিপতি'।**

প্লুঁজি হচ্ছে অপরের অবৈতনিক শ্রমের উপর কর্তৃত্ব। শ্রমিকের ছোট বাড়িটা তাই তখনই প্লুঁজিতে পরিণত হতে পারে, যখন সে তা একটি তৃতীয় ব্যক্তির কাছে ভাড়া দিয়ে ভাড়া আদায়ের মারফৎ ঐ তৃতীয় ব্যক্তির শ্রমফলের একাংশ নিজে আত্মসাৎ করে। কিন্তু তার বাড়ি প্লুঁজিতে পরিণত হবার পথে বাধাটি ঠিক এইখানে যে শ্রমিক স্বয়ং সে বাড়িতে বাস করে, যেমন যে ম্লুহূর্তে দর্জির কাছ থেকে কিনে কোটটি গায়ে চড়াই, ঠিক সেই ম্লুহূর্ত থেকে কোটটি আর প্লুঁজি নয়। একহাজার টেলার ম্লুল্যের ছোট্ট বাড়িটার মালিক যে শ্রমিক সে অবশ্য সত্যিই আর প্রলেতারীয় নয়, কিন্তু তাই বলে শ্রীযুক্ত জাক্স ছাড়া আর কেউ তাকে প্লুঁজিপতি বলবে না।

আমাদের শ্রমিকের মধ্যে এই যে প্লুঁজিবাদী অবয়ব, এর কিন্তু আর একটি দিকও আছে। ধরে নেওয়া যাক কোনো একটি শিল্পাঞ্চলে এই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে প্রত্যেকটি শ্রমিকেরই নিজস্ব একটি করে ছোট্ট বাড়ি আছে। সেই ক্ষেত্রে ঐ **এলাকার শ্রমিক শ্রেণী বিনা ভাড়ায় থাকতে পাচ্ছে;** তাদের শ্রমশক্তির ম্লুল্যের মধ্যে তাহলে বাস-সংস্থান ব্যয় আর অন্তর্ভুক্ত হবে না। 'জাতীয় অর্থনীতির তত্ত্বের লৌহদৃঢ় নিয়মাবলীর ভিত্তিতে' শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস হলেই, অর্থাৎ কিনা শ্রমিকের জীবনধারণের

জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য স্থায়ীভাবে হ্রাস পেলেই তা শ্রমশক্তির মূল্য হ্রাসের সামিল, সুতরাং শেষ পর্যন্ত তদনুযায়ী মজুরি হ্রাসে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। ভাড়ার দরুন গড়পড়তা যে পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হবে সেই পরিমাণে গড়পড়তা মজুরিও হ্রাস পাবে, অর্থাৎ কিনা শ্রমিক ঠিক আগের মতো টাকা আনা পাইতে বাড়ির মালিককে ভাড়া গুণে না দিলেও, যে কারখানায় সে কাজ করে সেই কারখানার মালিককে সে অবৈতনিক শ্রমের আকারে বাড়িভাড়া তুলে দিতে থাকবে। এইভাবে ছোট্ট বাড়িটিতে নিয়োজিত শ্রমিকের সঞ্চয় একটি বিশেষ অর্থে পুঁজিতে পরিণত হবে বটে, তবে সেটা শ্রমিকের জন্য নয়, তার নিয়োগকর্তা পুঁজিপতিটির জন্য পুঁজি।

সুতরাং শ্রীযুক্ত জাক্স কাগজ কলমে পর্যন্ত তাঁর শ্রমিককে পুঁজিপতিতে পরিণত করতে অক্ষম।

প্রসঙ্গত যে সব তথাকথিত সমাজ সংস্কারকে সঞ্চয় পরিকল্পনা বা শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণের মূল্য হ্রাসে দাঁড় করানো যায় তাদের সকলের ক্ষেত্রে উপরের মন্তব্য প্রযোজ্য। হয় এইসব পরিকল্পনা সাধারণভাবে প্রযুক্ত হবে, আর তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে মজুরি হ্রাস হবে; নয়ত তা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন একটা পরীক্ষা হয়ে থাকবে, এবং সে ক্ষেত্রে তাদের বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম-সত্তাটা এই কথাই প্রমাণ করবে যে ব্যাপক আকারে তাকে কার্যে পরিণত করা বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খায় না। ধরে নেওয়া যাক কোন একটি অঞ্চলে সাধারণভাবে ক্রেতাদের সমবায় প্রবর্তনের ফলে শ্রমিকদের জীবনধারণের উপকরণের ব্যয় শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস করতে পারা গেল। তাহলে শেষ পর্যন্ত ঐ এলাকায় মজুরিও মোটামুটি শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পাবে, অর্থাৎ কিনা যে পরিমাণে জীবনধারণের ঐ সকল উপকরণ শ্রমিকদের বাজেটের অন্তর্ভুক্ত সেই অনুপাতে। উদাহরণস্বরূপ কোন শ্রমিক যদি সাপ্তাহিক মজুরির তিন চতুর্থাংশ ঐ সকল সামগ্রীর জন্য ব্যয় করে তবে মজুরি শেষ পর্যন্ত শতকরা $৩/৪ \times ২০ = ১৫$ ভাগ কমবে। অর্থাৎ যখনই এই ধরনের কোন সাশ্রয়ী সংস্কার ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়, তখনই যতটা পরিমাণে এই সাশ্রয়ের দরুন জীবনধারণের ব্যয় হ্রাস হল সেই পরিমাণে শ্রমিকদের মজুরিও হ্রাস পাবে। **প্রত্যেক** শ্রমিক যদি সাশ্রয়ের দ্বারা বছরে ৫২ টেলার স্বতন্ত্র আয় করতে পারে, তাহলে তার সাপ্তাহিক মজুরি শেষ পর্যন্ত হ্রাস পাবে এক টেলার। সুতরাং সে যতই সঞ্চয় করবে সেই অনুপাতে তার মজুরি কমতে থাকবে। সে তাই সঞ্চয় করছে নিজ স্বার্থে নয়, পুঁজিপতির স্বার্থে। 'তার মনের মধ্যে সব থেকে প্রবলভাবে... প্রাথমিক অর্থনৈতিক গুণ, সঞ্চয়প্রবৃত্তি... জাগাবার জন্য' এ ছাড়া আর কী দরকার? (৬৪ পৃষ্ঠা)।

অধিকন্তু, শ্রীযুক্ত জাক্সও একটু পরে আমাদের বলছেন যে, শ্রমিকেরা বাড়ির মালিক হবে ততটা নিজেদের স্বার্থে নয় যতটা পুঁজিপতিদের স্বার্থে:

'সেই যাই হোক, যথাসম্ভব বেশী সংখ্যক লোক জমির সঙ্গে বাঁধা থাক (!) এটা শুধু শ্রমিক শ্রেণীর নয়, **সমগ্র সমাজেরই সর্বাধিক স্বার্থ'** (আমার ইচ্ছে হয় একবার অন্তত স্বয়ং শ্রীযুক্ত জাক্সকে এই অবস্থায় দেখি) ... 'শ্রমিকেরা যদি এই পদ্ধতিতে নিজেরাই সম্পত্তিবান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় ... তাহলে আমাদের পদতলে ধূমায়মান সামাজিক সমস্যা নামে কথিত আগ্নেয়গিরিতে যা কিছু অগ্নি সংযোগ করে সেইসব গূঢ় শক্তি, প্রলেতারীয় তিক্ততা, বিদ্বেষ ... ভাবধারার বিপজ্জনক বিভ্রান্তি ... সমস্ত কিছু প্রভাত সূর্যের আলোকে অপসৃয়মান কুয়াসার মতন বিদূরিত হয়ে যাবে' (৬৫ পৃষ্ঠা)।

অন্য ভাষায় বলতে গেলে শ্রীযুক্ত জাক্স আশা করছেন যে, বাড়ির মালিকানা অর্জনের ফলে শ্রমিকদের প্রলেতারীয় অবস্থিতির যে পরিবর্তন ঘটবে তার ফলে তারা প্রলেতারীয় চরিত্রটুকুও হারিয়ে পুনরায় তাদের বাড়ি-মালিক পূর্বপুরুষদের মতো বশংবদ তাঁবেদারে পরিণত হবে। প্রুধোঁপন্থীরা কথাটা যেন হৃদয়ঙ্গম করেন।

শ্রীযুক্ত জাক্সের বিশ্বাস তিনি এইভাবে সামাজিক সমস্যা সমাধান করে ফেলেছেন:

'দ্রব্যসামগ্রীর ন্যায্যতর ভাগবাটোয়ারা, এই যে স্ফিংসের ধাঁধার সমাধানে অতীতে এত লোক ব্যর্থ চেষ্টা করেছে, তা কি এখন একটা প্রত্যক্ষ বাস্তব হিসাবে বোধ হচ্ছে না? তাকে কি আদর্শের কল্পলোক থেকে এইভাবে বাস্তবের রাজ্যে আনা হচ্ছে না? আর এটা যদি কাজে পরিণত হয়, তবে তার অর্থ কি সেই উচ্চতম লক্ষ্য সিদ্ধি নয়, যাকে **চরমপন্থী সমাজতন্ত্রীরা** পর্যন্ত **তাদের তত্ত্বের চরম কথা বলে উপস্থিত করে থাকে?'** (৬৬ পৃষ্ঠা)।

আমাদের সত্যই সৌভাগ্য যে আমরা এতদূর অবধি উঠেছি, কেননা এই জয়ধ্বনিই জাক্সের পুস্তকের 'শীর্ষদেশ'। এখন থেকে আমরা আবার 'আদর্শের কল্পলোক' থেকে বাস্তবতার সমতলভূমিতে ধীরে ধীরে অবতরণ করব এবং অবতরণ করার পর দেখতে পাব যে আমাদের অনুপস্থিতিকালে কিছুই পরিবর্তিত হয়নি, একেবারে কিছুই না।

পথপ্রদর্শক আমাদের প্রথম ধাপ অবতরণ করাচ্ছেন এই জানিয়ে যে, শ্রমিকদের বাসগৃহের মধ্যে দুইটি ধরন আছে: কুটীর প্রথা, যাতে প্রত্যেকটি শ্রমিক পরিবারের একটি করে ছোট বাড়ি এবং সম্ভব হলে ছোট্ট একটি বাগানও থাকে, যেমন ইংলন্ডে রয়েছে; আর বড় বড় ভাড়াটে বাড়ির ব্যারাক-প্রথা, যেখানে অসংখ্য শ্রমিক বাস করে, যেমন প্যারিস, ভিয়েনা ইত্যাদিতে আছে। উত্তর জার্মানিতে যে ব্যবস্থা প্রচলিত তা এই দুই প্রথার মাঝামাঝি। জাক্স মহাশয় আমাদের এ কথা বলছেন সত্যি, যে কুটীর প্রথাটাই একমাত্র সঠিক প্রথা, **একমাত্র প্রথা** যার মধ্যে প্রত্যেকটি শ্রমিক তার নিজ গৃহের মালিকানা অর্জন করতে পারে; তাছাড়া তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ব্যারাক-প্রথার ভিতর স্বাস্থ্যরক্ষা, নৈতিক জীবন এবং গার্হস্থ্য শান্তির ব্যাপারে অনেক গুরুতর অসুবিধাও থাকে। কিন্তু হায়, হায়! তিনি বলছেন যে গৃহসংকটের কেন্দ্রস্থলে বড় বড় শহরে জমির চড়া দামের জন্য কুটীর প্রথা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়; অতএব এই সকল

জায়গায় যদি বড় বড় ব্যারাকের পরিবর্তে চার থেকে ছয়টি ফ্ল্যাট যুক্ত বাড়ি নির্মাণ করা যায়, অথবা যদি নানাবিধ সুচতুর নির্মাণ কৌশল প্রয়োগে ব্যারাক-প্রথার প্রধান প্রধান অসুবিধাগুলির কিছুটা উপশম করা যায়, তাহলেই খুশি হওয়া উচিত (৭১-৯২ পৃষ্ঠা)।

আমরা ইতিমধ্যেই খানিকটা নেমে এসেছি, নয় কি? শ্রমিকের পুঁজিপতিতে রূপান্তর, সামাজিক সমস্যার সমাধান, প্রত্যেকটি শ্রমিকের জন্য নিজস্ব একখানা বাড়ি — এ সবই পেছনে 'আদর্শের কল্পলোকে', উঁচুতে ফেলে আসা হল। এখন আমাদের করণীয় শুধু গ্রামাঞ্চলে কুটির প্রথার প্রবর্তন এবং শহরাঞ্চলে শ্রমিক ব্যারাকগুলিকে যতটা সম্ভব সহনযোগ্য করে তোলা।

সুতরাং বাস-সংস্থান সমস্যার বুর্জোয়া সমাধান তাদের নিজেদের স্বীকৃতিতেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, কারণ হল **শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈপরীত্য**। এইখানেই আমরা সমস্যার মূল কেন্দ্রে উপনীত হচ্ছি। আজকের পুঁজিবাদী সমাজ শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈপরীত্যকে যে চরম বিন্দুতে এনে ফেলেছে, তার অবসানের দিকে অগ্রসর হবার উপযোগী সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হলেই বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান হতে পারে। এই বৈপরীত্যের অবসান দূরে থাক, পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিদিন একে তীব্রতর করতে বাধ্য হয়। প্রথম আধুনিক ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা, যথা ওয়েন এবং ফুরিয়ে, এটা তখনই সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন। তাঁদের আদর্শ কাঠামোয় শহর ও গ্রামের বৈপরীত্য লোপ পেয়েছিল। সুতরাং শ্রীযুক্ত জাক্স যে মত প্রচার করছেন, তার বিপরীতটাই ঘটে; বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমস্যারও সমাধান করে, একথা সত্য নয়; বরং সামাজিক সমস্যার সমাধান হলে পরেই, অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অবসান ঘটাতে পারলেই, শুধু বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। আধুনিক বড়ো বড়ো শহর বজায় রাখবার সঙ্গে সঙ্গে বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের আকাঙ্খা আজগুবি। অথচ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অবসান হলেই কিন্তু আধুনিক মহানগরীর অবসান হবে, আর তা একবার সুরু হলে প্রত্যেক শ্রমিককে ছোট্ট একটা বাড়ি দেবার প্রশ্ন নয় একেবারেই পৃথক সব সমস্যা দেখা দেবে।

গোড়াতে প্রত্যেক সমাজ বিপ্লবকেই অবশ্য তদানীন্তন পরিস্থিতি থেকে সুরু করতে হয়, এবং হাতের কাছে যা উপায় থাকে তা দিয়েই দূর করতে হয় সবচাইতে জরুরি ব্যাধিগুলিকে। আর আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে বাসস্থান সংকটের সমাধান এখনই হতে পারে, যদি সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির বিলাসভবনের একাংশ থেকে তাদের অধিকারচ্যুত করা যায় এবং বাকি অংশে করা হয় বাধ্যতামূলকভাবে অপরের বসতির ব্যবস্থা।

শ্রীযুক্ত জাক্স যদি এরপর আরেকবার বড় বড় শহরগুলিকে বাদ দিয়ে শহরের কাছাকাছি শ্রমিক উপনিবেশ নির্মাণ সম্পর্কে বাক্যবহুল বক্তৃতা করতে থাকেন; তিনি যদি এ ধরনের শ্রমিক উপনিবেশের সকল মাধুরীর বর্ণনা করতে থাকেন — যেখানে থাকছে সকলের জন্য 'জল সরবরাহ, গ্যাসের আলো, বায়ুপ্রবাহ অথবা জল গরমের ব্যবস্থা, ধোপাখানা, কাপড় শুকোবার ঘর, স্নানাগার ইত্যাদি', প্রতি উপনিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, স্কুল, প্রার্থনাগৃহ (!), পাঠাগার, লাইব্রেরি ... সুরা ও বিয়র হল, যথাবিহিত মর্যাদাযুক্ত নাচগানের ঘর'; প্রত্যেকটি বাড়িতে সংযুক্ত বাষ্পশক্তি, যা দিয়ে 'কিছু কিছু পরিমাণে কারখানা থেকে ফের গার্হস্থ্য কর্মশালায় উৎপাদনের কাজ টেনে আনা যেতে পারে' — তাহলেও কিন্তু পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। তিনি যে উপনিবেশের বর্ণনা করলেন তা সমাজতন্ত্রী ওয়েন ও ফুরিয়ের কাছ থেকে শ্রীযুক্ত হুবার সরাসরি ধার করা, কেবল সমাজবাদী প্রত্যেকটি ব্যাপার বাদ দিয়ে তাকে তিনি দিয়েছেন পুরোপুরি একটা বুর্জোয়া চরিত্র। ফলে অবশ্য পরিকল্পনাটা বাস্তবিকই ইউটোপিয়ায় পরিণত হয়েছে। কোন পুঁজিপতিরই এইরকম উপনিবেশ স্থাপনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। ফ্রান্সের গিজ্-এ ছাড়া দুনিয়ার কোথায়ও বাস্তবে এই ধরনের উপনিবেশের অস্তিত্বও নেই; আর সেটিও নির্মিত হয়েছিল সমাজবাদী পরীক্ষা হিসাবে ফুরিয়েের এক অনুগামীর দ্বারা, মুনাফার খাতিরে নয়।* তাঁর বুর্জোয়া প্রকল্প-জল্পনার সমর্থনে শ্রীযুক্ত জাক্স পঞ্চম দশকের গোড়াতে ওয়েন কর্তৃক হাম্পশিরে প্রতিষ্ঠিত এবং বহুদিন বিলুপ্ত কমিউনিস্ট উপনিবেশ 'হার্মনি হলের' দৃষ্টান্তও উল্লেখ করতে পারতেন।

যা হোক, উপনিবেশ গঠনের এইসব বুলি কিন্তু 'আদর্শের কল্পলোকে' ফের উড়ে যাবার পঙ্গু প্রচেষ্টার চাইতে বেশি কিছু নয়, আবার সঙ্গে সঙ্গেই সে চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হয়। আমরা পুনরায় দ্রুতবেগে নিচে নামতে থাকি। এবার সহজতম সমাধান হচ্ছে এই যে, 'নিয়োগকর্তাদের, ফ্যাক্টরি মালিকদের উচিত শ্রমিকদের যথাযোগ্য বাসগৃহ সংগ্রহ করতে সাহায্য করা, তা তাঁরা নিজেরাই বাড়ি বানিয়ে দিন, অথবা জমি জোগান দিয়ে এবং গৃহ নির্মাণের পুঁজি আগাম দিয়ে নিজেদের বাসগৃহ বানাতে শ্রমিকদের সাহায্যই করুন, ইত্যাদি' (১০৬ পৃষ্ঠা)। এই কথা বলার মানে হল আমরা আবার শহর থেকে বার হয়ে গ্রামে ফিরে গেলাম, কেননা শহরে তার প্রশ্নই ওঠে না। এরপর শ্রীযুক্ত জাক্স প্রমাণ করছেন যে শ্রমিকদের বাসযোগ্য গৃহ সংগ্রহ করতে সাহায্য করাটা মালিকদেরই স্বার্থ, কেননা একদিকে এটা হল লাভজনক পুঁজি বিনিয়োগ, এবং

* এটিও অবশ্য শেষ পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর শোষণেরই এক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ১৮৮৬ সালের প্যারিসের *Socialiste* পত্রিকাটি দেখুন। (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

অন্যদিকে অবশ্যম্ভাবী 'ফলস্বরূপ শ্রমিকদের উন্নয়নে... তাদের মানসিক ও শারীরিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যা স্বভাবতই ... মালিকদের পক্ষেও কম :.. সুবিধাজনক হবে না। এতে করে বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মালিকদের অংশগ্রহণের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিটা দেওয়া হচ্ছে। এটা দেখা দিচ্ছে **অন্তর্নিহিত সংযোগের** ফলস্বরূপ, শ্রমিকদের শারীরিক, আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য মালিকদের প্রযত্নের ফলস্বরূপ যা সাধারণত ঢাকা থাকে মানবহিতৈষী প্রচেষ্টার আবরণে আর যা নিজেই নিজের আর্থিক পুরস্কারস্বরূপ, কারণ তার সুফল হল পরিশ্রমী, দক্ষ, কর্মেচ্ছুক, সন্তুষ্ট এবং **অনুগত** শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি ও পালন' (১০৮ পৃষ্ঠা)।

হুবার 'অন্তর্নিহিত সংযোগ' এই বাক্যাংশটি দিয়ে বুর্জোয়া হিতবাদী প্রলাপে যে 'উন্নত তাৎপর্য" আরোপ করার চেষ্টা করেছেন তাতে পরিস্থিতির কোনই পরিবর্তন হয় না। সে বাক্যাংশ ছাড়াই বড় বড় গ্রামীণ ফ্যাক্টরির মালিকেরা, বিশেষ করে ইংলণ্ডে, বহুপূর্বেই বুঝতে পেরেছিল যে, শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ শুধু প্রয়োজনই নয়, শুধু ফ্যাক্টরির সাজ সরঞ্জামের অঙ্গই নয়, লাভজনকও বটে। ইংলণ্ডে অনেক গ্রাম গোটাটাই এইভাবে গড়ে উঠেছিল, কয়েকটা পরে শহরেও পরিণত হয়েছে। শ্রমিকেরা কিন্তু এর দরুন মানবহিতৈষী পুঁজিপতিদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে এই 'কুটীর প্রথার' বিরুদ্ধে সর্বদাই রীতিমত আপত্তি জানিয়ে এসেছে। ফ্যাক্টরির মালিকদের প্রতিযোগী না থাকাতে ঘরবাড়ির জন্য শ্রমিকেরা শুধু যে একচেটিয়া দাম দিতে বাধ্য হয় তাই নয়, ধর্মঘট শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা গৃহচ্যুত হয়ে পড়ে, কেননা ফ্যাক্টরির মালিক তাদের বিনা বাক্যব্যয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেয় যার ফলে প্রতিরোধ হয়ে ওঠে কঠিন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আমার 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' পুস্তকে ২২৪ এবং ২২৮ পৃষ্ঠা থেকে অধ্যয়ন করা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত জাক্স অবশ্য মনে করেন যে, এই সকল 'আপত্তি বলতে গেলে খণ্ডন করারও যোগ্য নয়' (১১১ পৃষ্ঠা)। কিন্তু তিনি কি শ্রমিককে তার ছোট্ট বাড়িটির মালিকে পরিণত করতে চান না? নিশ্চয় চান। কিন্তু যেহেতু 'নিয়োগকর্তার পক্ষে সর্বদাই বাসগৃহ বিলিবণ্টনের অধিকার থাকা দরকার, যাতে বরখাস্ত শ্রমিকের পরিবর্তে যে শ্রমিক আসবে তাকে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়', তাই ... 'এই ধরনের ক্ষেত্রে **মালিকানা প্রত্যাহারযোগ্য, এই সর্তটা আরোপ করা'** ছাড়া আর কিছু করার নেই* (১১৩ পৃষ্ঠা)।

* এই ব্যাপারেও ইংরেজ পুঁজিপতিরা শ্রীযুক্ত জাক্সের বাঞ্ছিত কামনা যে অনেক পূর্বেই পূরণ করেছে তাই নয়, তাকে অতিক্রম করে অনেকদূর এগিয়েও গিয়েছে। ১৮৭২ সালে ১৪ই অক্টোবর সোমবার মরপেথ্-এ পার্লামেণ্টীয় নির্বাচনে ভোটদাতাদের তালিকা স্থির করার আদালতকে এই তালিকায় নাম তুলবার জন্য ২,০০০ খনি শ্রমিকদের তরফ থেকে এক দরখাস্ত বিচার করতে হয়। এই প্রসঙ্গে প্রকাশ পেল যে এই শ্রমিকদের অধিকাংশ, যে খনিতে নিযুক্ত সেই খনির নিয়ম অনুযায়ী,

এবার আমরা হঠাৎ ধপ করে নেমে পড়েছি। প্রথমে বলা হয়েছিল যে শ্রমিকদের নিজস্ব ছোট্ট বাড়িটির মালিক হওয়া উচিত, পরে আমরা অবগত হলাম যে শহরে তা অসম্ভব এবং শুধু গ্রামাঞ্চলেই সম্ভব হতে পারে এবং এখন আমাদের বলা হল যে গ্রামাঞ্চলেও এই মালিকানা 'চুক্তির দ্বারা **প্রত্যাহারযোগ্য**' হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত জাক্স কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য এই নতুন ধরনের সম্পত্তি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিকদের 'চুক্তির দ্বারা প্রত্যাহারযোগ্য' পুঁজিপতিতে এই রূপান্তরণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার সমতল ভূমিতে নিরাপদে পেঁাছে গেছি। এইবার আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে, বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের জন্য পুঁজিপতি এবং অন্যান্য মানবহিতৈষীরা বাস্তবে কী করেছে।

২

আমাদের ডক্টর জাক্সকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে এই ভদ্রমহোদয়গণ অর্থাৎ পুঁজিপতিরা বাসস্থান অভাবের প্রতিকারে ইতিমধ্যে অনেক কিছু করেছেন এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে যে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান সম্ভব তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

সর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত জাক্স বোনাপার্টীয় ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন! এ কথা সুবিদিত যে, প্যারিস বিশ্বপ্রদর্শনীর সময়ে লুই বোনাপার্ট এক কমিশন নিয়োগ করেছিলেন বাহ্যত ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট করবার জন্য, কিন্তু আসলে সাম্রাজ্যের গৌরববৃদ্ধির জন্য তাদের অবস্থাকে পরম সুখময় বলে বর্ণনা করবার উদ্দেশ্যে। বোনাপার্টপন্থার চরমতম দুর্নীতিপরায়ণ সেবকদের নিয়ে গঠিত **এই** কমিশনের রিপোর্টেরই শ্রীযুক্ত জাক্স উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে এই কারণে যে, কমিশনের অনুসন্ধানের ফলাফল 'ভারপ্রাপ্ত কমিশনের **নিজের বিবৃতি** অনুযায়ী সমগ্র ফরাসী দেশের ক্ষেত্রে মোটামুটি সুসম্পূর্ণ।' এবং কী সেই ফলাফল? যে ঊননব্বইজন বড় বড় শিল্পপতি বা জয়েণ্ট্-স্টক কোম্পানি তথ্য সরবরাহ করেছেন, তার মধ্যে একত্রিশ জন শ্রমিকদের জন্য **কোনোরূপ** বাসগৃহই নির্মাণ করেননি। জাক্সের নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী যে বাড়িগুলি তৈরী হয়েছে তাতে বড়জোর ৫০,০০০ থেকে

যে বাড়িতে বাস করে তার **ইজারাদার বলে** গণ্য হতে পারে **না**, তাদের বসবাস হল বাড়ির মালিকদের **দয়া সাপেক্ষ**; এবং যে কোন সময় বিনা নোটিসে তাদের উচ্ছেদ করা চলে। (খনি মালিক এবং বাড়ির মালিক অবশ্য স্বভাবতই এক ব্যক্তি।) বিচারক রায় দিলেন যে এরা ইজারাদার নয়, **ভৃত্য** মাত্র, এবং সেই কারণে এরা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকারী নয়। (*Daily News*, ১৫ই অক্টোবর, ১৮৭২।) (এঙ্গেলসের টীকা।)

৬০,০০০ লোক থাকে, আর প্রায় কোনোটিতেই পরিবার পিছু দুই কামরার বেশী জায়গা নেই!

এ কথা সুস্পষ্ট যে স্বীয় শিল্পের পরিস্থিতির দরুন — জলশক্তি, কয়লাখনি, লৌহ-আকর এবং অন্যান্য খনিজের অবস্থিতি ইত্যাদির কারণে — কোন একটি গ্রামীণ অঞ্চলে যে পুঁজিপতিদের বাঁধা থাকতে হয়, তাদের প্রত্যেককেই ঘরবাড়ির অন্য ব্যবস্থা না থাকলে নিজের শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ বানাতে হবে। এর মধ্যে 'অন্তর্নিহিত সংযোগ', 'এই প্রশ্ন এবং তার ব্যাপক তাৎপর্যের ক্রমবর্ধমান উপলব্ধির মুখর সাক্ষ্য', 'আশাপ্রদ সূচনা' (১১৫ পৃষ্টা) — এ সবের প্রমাণ পেতে হলে আত্মপ্রবঞ্চনার অত্যন্ত সুপটু অভ্যাস প্রয়োজন। তাছাড়া এই ব্যাপারেও বিভিন্ন দেশের শিল্পপতিদের মধ্যে তাদের জাতীয় চরিত্র অনুযায়ী তফাৎ আছে। উদাহরণস্বরূপ শ্রীযুক্ত জাক্স আমাদের জানাচ্ছেন (১১৭ পৃষ্ঠা):

'**ইংলণ্ডে অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালেই** মালিকদের তরফ থেকে এই ব্যাপারে বর্ধিত ক্রিয়াকলাপ দেখা গেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় দূরবর্তী পাড়াগাঁ সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য ... শ্রমিকদের জন্য মালিকেরা যে বাসগৃহ **নির্মাণ করছে** তার প্রধান **প্রেরণা** হল এই যে, অন্যথায় শ্রমিকেরা নিকটবর্তীতম গ্রাম থেকে কারখানা অবধি এতদূর হেঁটে আসতে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ত যে তারা যথেষ্ট কাজ করতে পারত না। তবে অবশ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে **গভীরতর উপলব্ধিসম্পন্ন** লোকের সংখ্যা, যারা বাসস্থান **সংস্কারের সঙ্গে** অন্তর্নিহিত সংযোগের মোটামুটি অন্যান্য সব উপাদানগুলিকেও মিলিয়ে নেয়, তাদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে আর বর্ধিষ্ণু উপনিবেশগুলির প্রতিষ্ঠার গৌরব এই লোকগুলিরই প্রাপ্য ... হাইড-এর অ্যাশটন, টার্টন-এর অ্যাশওয়ার্থ, বুরির গ্র্যান্ট, বলিংটনের গ্রেগ, লিড্স-এর মার্শাল, বেলপার-এর স্ট্রাট, সলটেয়ার-এর সল্ট, কোপলির অ্যাক্রয়েড প্রভৃতিদের নাম এই কারণেই গোটা যুক্তরাজ্যে সুপরিচিত।'

ধন্য সরলতা এবং আরো ধন্য অজ্ঞতা! ইংরেজ গ্রামীণ ফ্যাক্টরি-মালিকেরা, নাকি শুধু 'অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালে' শ্রমিকদের বাসগৃহ বানাতে শুরু করেছে! না, প্রিয় বন্ধু জাক্স, ইংরেজ পুঁজিপতিরা শুধু টাকার থলির দিক দিয়ে নয়, মগজের হিসাবেও সত্যই বৃহৎ শিল্পপতি। জার্মানিতে সত্যকারের বৃহদায়তন শিল্প উদ্ভবের অনেক আগেই তারা বুঝতে পেরেছিল যে, গ্রামীণ জেলাগুলিতে কারখানার উৎপাদন চালাতে হলে শ্রমিকদের বাসগৃহের জন্য টাকা খরচটা হল নিয়োজিত মোট পুঁজির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অত্যন্ত লাভজনকও বটে। বিসমার্ক ও জার্মান বুর্জোয়াদের মধ্যেকার সংগ্রাম জার্মান শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার এনে দেবার অনেক আগেই, ইংরেজ ফ্যাক্টরি, খনি ও ঢালাই কারখানার মালিকদের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, একই সঙ্গে শ্রমিকদের বাড়িওয়ালা হতে পারলে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপরে কী চাপ দেওয়া সম্ভব। গ্রেগ, অ্যাশটন ও অ্যাশওয়ার্থের 'বর্ধিষ্ণু উপনিবেশগুলি' এতই

'সাম্প্রতিক' যে চল্লিশ বছর আগেই বুর্জোয়ারা এগুলিকে আদর্শ বলে অভিনন্দিত করেছিল, যে কথা আমি নিজেই আঠাশ বছর আগে লিখেছি। ('ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২২৮-৩০, টিকা।) মার্শাল এবং অ্যাক্‌রয়েডের (তিনি Akroyd বানান করেন, Ackroyd নয়) উপনিবেশগুলিও প্রায় সমান প্রাচীন; আর স্ট্রাটেরটি আরও বেশী পুরনো, তার শুরু গত শতাব্দীতে। ইংলণ্ডে যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর বাসগৃহের গড়পড়তা আয়ু চল্লিশ বছর বলে ধরা হয়, তাই শ্রীযুক্ত জাক্স আঙ্গুল গুণেই হিসেব করে দেখতে পারেন এই 'বর্ধিষ্ণু উপনিবেশগুলির' আজ কী ভগ্নদশা। তাছাড়া এই উপনিবেশগুলির অধিকাংশেরই অবস্থিতি আজ আর গ্রামাঞ্চলে নয়। শিল্পের বিপুল প্রসার এদের বেশির ভাগকে চারদিক থেকে ফ্যাক্টরি ও বাড়িঘর দিয়ে এমন করে ঘিরে ফেলেছে যে এরা আজ ২০,০০০ বা ৩০,০০০, এমন কি ততোধিক অধিবাসীর দ্বারা অধ্যুষিত নোংরা, ধূম্রমলিন শহরের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত। কিন্তু এত সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত জাক্স যার প্রতিনিধি সেই জার্মান বুর্জোয়া বিজ্ঞানের পক্ষে আজ ১৮৪০ সালের ইংরেজ মহলে প্রচলিত সেই প্রশংসা গাথার ভক্তিপ্লুত পুনরাবৃত্তি আটকায় না যা আজ আর প্রযোজ্য নয়।

আর, দৃষ্টান্ত কি না বুড়ো অ্যাক্‌রয়েডের! এই গুণী ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই সেরা হিতৈষীবাদী ছিলেন। তিনি তাঁর শ্রমিকদের, বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের এতই ভালবাসতেন যে ইয়র্ক্‌শায়ারে তাঁর অপেক্ষাকৃত কম হিতৈষীবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর সম্বন্ধে বলে বেড়াত যে তিনি শুধুমাত্র নিজের সন্তানদের দিয়েই কারখানা চালু রাখছেন! একথা সত্য যে শ্রীযুক্ত জাক্স মত প্রকাশ করেছেন যে, এইসব বর্ধিষ্ণু উপনিবেশগুলিতে 'জারজ সন্তানের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে' (১১৮ পৃষ্ঠা)। হ্যাঁ, **বিবাহ বন্ধনের বাইরে** জাত জারজ সন্তানের সংখ্যা কমেছে বটে, কেননা ইংলণ্ডের শিল্পাঞ্চলে সুন্দরী মেয়েদের অতি অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়।

ইংলণ্ডে গত ষাট বছর বা ততোধিক কাল ধরে প্রতিটি বড় গ্রামীণ ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার **সঙ্গে সঙ্গেই** তার কাছাকাছি শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ফ্যাক্টরি-গ্রামের অনেকগুলি পরবর্তীকালে এক একটা গোটা ফ্যাক্টরি-শহরের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, এবং ফ্যাক্টরি শহর যতকিছু কুফল নিয়ে আসে তা সবই এসেছে। সুতরাং এই সব উপনিবেশ গৃহসংস্থান সমস্যার সমাধান তো করেইনি, বরং এই সমস্ত অঞ্চলে **সমস্যাটার সৃষ্টিই ঘটিয়েছে আসলে** এরাই **প্রথম।**

অন্যদিকে, বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে যে সব দেশ কোনক্রমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ইংলণ্ডের বহু পেছনে চলেছে, বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে যাদের বাস্তব পরিচয় কেবল ১৮৪৮ সালের পরেই, সেই ফ্রান্সে এবং বিশেষ করে জার্মানিতে অবস্থাটা সম্পূর্ণ পৃথক। এই সব দেশে শুধুমাত্র সুবৃহৎ ইস্পাত কলকারখানা শ্রমিকদের বাসগৃহ কিছুটা

নির্মাণ করেছে, তাও অনেক দ্বিধার পর যেমন করেছে ক্রেজো-তে শ্‌নাইদার এবং এসেন-এ ক্রুপের কারখানা। গ্রাম্য শিল্পপতিদের অধিকাংশই গরম, বর্ষা ও তুষারের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের মাইলের পর মাইল হেঁটে প্রতিদিন সকালে কারখানায় আসা এবং সন্ধ্যা বেলায় বাড়ি ফিরে যাওয়া চলতে দিচ্ছে। এইরকম ব্যবস্থা বিশেষ করে দেখা গিয়েছে পাহাড়ী এলাকায়, ফরাসী এবং আলসাসিয়ান ভগেজ জেলাগুলিতে, ভুপার, জিগ, আগার, লেন, এবং রাইনল্যান্ড ভেস্তফালীয় অপর নদীগুলির উপত্যকায়। এর্ৎসগেবির্গে অঞ্চলেও সম্ভবত পরিস্থিতি কিছুতেই এর চাইতে ভাল নয়। জার্মান এবং ফরাসী, উভয়ের মধ্যেই একই তুচ্ছ কঞ্জুষতা দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত জাক্স ভাল করেই জানেন যে, এই অতি আশাপ্রদ সূচনা তথা বর্ধিষ্ণু উপনিবেশগুলির প্রায় কোনই তাৎপর্য নেই। তাই তিনি এখন পুঁজিপতিদের কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন যে তারা শ্রমিকদের জন্যে বাসগৃহ বানিয়ে মোটা ভাড়া আদায় করতে পারে। অর্থাৎ তিনি শ্রমিকদের প্রবঞ্চনা করার নতুন রাস্তা এদের বাতলে দেবার চেষ্টায় আছেন।

প্রথমত তিনি এদের কাছে তুলে ধরেছেন লন্ডনের আধা জনহিতৈষী এবং আধা ফাটকাবাজ কয়েকটি গৃহনির্মাণ সমিতির দৃষ্টান্ত, যারা শতকরা চার থেকে ছয় ভাগ বা তারও বেশি হারে নিট মুনাফা অর্জন করেছে। আমাদের কাছে শ্রীযুক্ত জাক্সের এটা প্রমাণ করার কোনই দরকার নেই যে, শ্রমিকদের বাড়ি বানানোর পেছনে নিয়োজিত পুঁজি থেকে ভাল মুনাফা পাওয়া যায়। পুঁজিপতিরা যে শ্রমিকদের গৃহনির্মাণের জন্য আরও বেশি করে পুঁজি নিয়োগ করে না, তার কারণ হচ্ছে এই যে, অধিকতর ব্যয়সাধ্য বাসগৃহ নির্মাণ করলে মুনাফা জোটে আরও চড়া হারে। ধনিকদের কাছে শ্রীযুক্ত জাক্সের আবেদন তাই ফের নীতিউপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এবার যাদের উজ্জ্বল সাফল্য সম্পর্কে শ্রীযুক্ত জাক্স এত জোরে জয়ঢাক বাজালেন সেই লন্ডন গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি তাঁর দেওয়া হিসাব মতই, সবরকমের গৃহনির্মাণী ফাটকা এর মধ্যে ধরে, মোট ২,১৩২টি পরিবার ও ৭০৬টি একক ব্যক্তি অর্থাৎ ১৫,০০০ এরও কম লোকের জন্য গৃহসংস্থান করেছে! যখন কিনা লন্ডনের একমাত্র ইস্ট্ এন্ড্-এই দশ লক্ষাধিক শ্রমিক জঘন্যতম বাসস্থানে বাস করছে, তখন এই ধরনের ছেলেমানুষীকে দারুণ সাফল্য হিসেবে জার্মানিতে পেশ করাটা কি গুরুত্ব দিয়ে করা হচ্ছে? মানবহিতৈষী এই সব প্রচেষ্টা সব মিলিয়ে বাস্তবে এতই শোচনীয় আর তুচ্ছ যে, শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে ইংলন্ডে পার্লামেন্টীয় রিপোর্টে এ সবের উল্লেখটুকু পর্যন্ত করা হয় না।

সমগ্র অধ্যায়টিতেই লন্ডন সম্পর্কে যে হাস্যকর অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে সে সম্বন্ধে এখানে আমরা আলোচনা করতে চাই না। শুধু একটি কথা। শ্রীযুক্ত জাক্সের মতে

সোহোতে একক ব্যক্তিদের জন্য আবাসগৃহ ব্যবসা গোটাতে বাধ্য হয়েছে কেননা নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে 'ব্যাপক সংখ্যায় খদ্দের পাবার কোন আশাই ছিল না'। জাক্স মহাশয়ের ধারণা এই যে লণ্ডনের ওয়েস্ট্ এণ্ড্ অঞ্চলটি গোটাটাই এক বিরাট বিলাস নগরী, সেখানে শোভনতম রাজপথের পেছনেই যে সব থেকে নোংরা শ্রমিক বসতি দেখা যায়, সোহো যার অন্যতম, তা তিনি জানেন না। সোহোর যে আদর্শ আবাসগৃহটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তার সম্বন্ধে তেইশ বছর আগেই আমি অবহিত ছিলাম। গোড়াতে অনেকেই সেখানে যাতায়াত করত, তবু এটা উঠে যাবার কারণ এই যে, সেখানে কেউ একে বরদাস্ত করতে পারল না যদিও এটাই ছিল উৎকৃষ্টদের অন্যতম।

কিন্তু আলসাসের অন্তর্গত ম্যুল্‌হাউজেন-এর শ্রমিক নগরীটী নিশ্চয় সাফল্য অর্জন করেছে, নয় কি?

অ্যাশটন, অ্যাশওয়ার্থ, গ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্ধিষ্ণু উপনিবেশ যেমন ইংরেজ বুর্জোয়াদের দেখাবার মতন বস্তু ছিল, তেমনই ম্যুল্‌হাউজেন-এর শ্রমিক নগরীটী হল ইউরোপ মহাদেশীয় বুর্জোয়াদের সেরা দ্রষ্টব্য। দুঃখের বিষয় ম্যুল্‌হাউজেন দৃষ্টান্তটি 'অন্তর্নিহিত' সংযোগের নয়, দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্য এবং আলসাসের পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রকাশ্য মিলনেরই ফল। এটি লুই বোনাপার্টের সমাজবাদী নিরীক্ষাগুলির অন্যতম, এর এক তৃতীয়াংশ পুঁজি রাষ্ট্রের দ্বারা লগ্নী করা হয়েছিল। চৌদ্দ বছরে (১৮৬৭ পর্যন্ত) এখানে ৮০০টি ছোট বাড়ি তৈরী হয়েছে, তাও ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা অনুযায়ী, যা ইংলণ্ডে হওয়া অসম্ভব, কেননা তারা এই বিষয়ে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল, তের থেকে পনর বছর ধরে বর্ধিত হারে ভাড়া আদায় করার পর এই বাড়িগুলিকে শ্রমিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয় তাদের সম্পত্তি হিসাবে। সম্পত্তি অর্জনের পন্থারূপে আল্‌সাসের বোনাপার্টপন্থীদের এই পদ্ধতি আবিষ্কার করার কোন প্রয়োজন ছিল না, আমরা দেখতে পাব যে ইংরেজ সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি এই প্রথা প্রবর্তন করেছিল অনেক আগেই। এই বাড়িগুলি কেনার জন্য যে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয়েছে তা আবার ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক চড়া। উদাহরণস্বরূপ, পনর বছর ধরে কিস্তিবন্দী হারে মোট ৪,৫০০ ফ্রাঁ শোধ করবার পর শ্রমিক যে বাড়ির অধিকার পেল, পনর বছর আগে তার দাম ছিল মাত্র ৩,৩০০ ফ্রাঁ। যদি কোন শ্রমিক চলে যেতে চায়, অথবা সে যদি একমাসের কিস্তিও বাকি ফেলে (সে ক্ষেত্রে তাকে উচ্ছেদ করা যেতে পারে), তবে বাড়ির আদিমূল্যের উপরে শতকরা ৬⅔ ভাগ বার্ষিক ভাড়া হিসাবে ধার্য করা হয় (অর্থাৎ ৩,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের বাড়ির জন্য মাসিক ১৭ ফ্রাঁ) আর বাকিটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, অবশ্য **সুদ হিসাবে এক কপর্দকও না দিয়ে।** এ কথা স্পষ্ট যে 'রাষ্ট্রীয় সাহায্যের' কথা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেও এই পরিস্থিতিতে গৃহনির্মাণ সমিতিটির তহবিল ভারি হতে পারে। এ কথাও অবশ্য সমপরিমাণে স্পষ্ট যে, এই ব্যবস্থায় পাওয়া বাড়ি শহরের পুরান

বহুফ্ল্যাটযুক্ত বাড়িগুলির তুলনায় ভাল, আর কোন কারণে না হোক শুধুমাত্র শহরের বাইরে আধা-গ্রামীণ অঞ্চলে নির্মিত বলেই।

জার্মানির মধ্যে যে কয়েকটি নগণ্য নিরীক্ষা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা বলারও প্রয়োজন নেই; শ্রীযুক্ত জাক্স পর্যন্ত ১৫৭ পৃষ্ঠায় তার শোচনীয়তা স্বীকার করেছেন।

তাহলে এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে কী প্রমাণ হল? প্রমাণ হল শুধু এই যে, স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়ম পদদলিত না করলেও শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ পুঁজিপতিদের দৃষ্টিকোণ থেকে লাভজনক। কিন্তু সে কথা কখনও অস্বীকৃত হয়নি, কথাটা অনেক আগে থাকতেই আমাদের জানা। যাতে একটা বর্তমান চাহিদা মেটে এমন **যে-কোনো** পুঁজি লগ্নিই লাভজনক যদি তা যুক্তিসহ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। প্রশ্নটা কিন্তু এই যে **তাসত্ত্বেও** বাস-সংস্থানের অভাব বজায় থাকে কেন, পুঁজিপতিরা কেন তাসত্ত্বেও শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যকর বাসস্থান জোগায় না। এখানেও আবার পুঁজিপতিদের প্রতি আবেদন ছাড়া শ্রীযুক্ত জাক্সের আর কিছু বক্তব্য নেই, তিনি আমাদের কাছে প্রশ্নটার জবাব দিতে অপারগ। আসল জবাব অবশ্য আমরা উপরেই দিয়েছি।

পুঁজি যদি বাসস্থানের অভাব অবসান করতে সক্ষম হয়, তবুও তা সমাধান করতে **চায়** না; কথাটা এতক্ষণে পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং আর দুটি মাত্র উপায় রইল: শ্রমিকদের আত্মত্রাণ আর রাষ্ট্রীয় সাহায্য।

শ্রীযুক্ত জাক্স আত্মত্রাণের উৎসাহী পূজারী, বাস-সংস্থান সমস্যার ব্যাপারেও এর সম্বন্ধে তিনি অলৌকিক ব্যাপার বিবৃত করতে সক্ষম। দুঃখের বিষয়, তিনি একেবারে গোড়াতেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, যে সব অঞ্চলে কুটীর প্রথা বিদ্যমান রয়েছে কিংবা তার প্রবর্তন সম্ভবপর, অর্থাৎ আবার কিনা সেই গ্রামীণ এলাকাতেই শুধু আত্মত্রাণ কিছুটা ফলপ্রসূ হতে পারে। বড় বড় শহরে, এমন কি ইংলণ্ডেও, সে চেষ্টা কার্যকর হতে পারে অত্যন্ত সীমিত পরিমাণে। অতঃপর শ্রীযুক্ত জাক্স দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলছেন, 'এই পন্থায় (আত্মত্রাণের পথে) সংস্কার সম্পন্ন হতে পারে শুধু **ঘুরপথে, সুতরাং** সর্বদাই **ত্রুটিপূর্ণভাবে,** অর্থাৎ যে অনুপাতে বাসগৃহের গুণাগুণের উপরে প্রতিক্রিয়া ফেলার মতো করে ব্যক্তিগত মালিকানা নীতি শক্তিশালী হচ্ছে সেই অনুপাতে।' অবশ্য এটুকুও সন্দেহের কথা; যা হোক 'ব্যক্তিগত মালিকানার নীতি' কিন্তু গ্রন্থকারের লিখনরীতির 'গুণাগুণের' উপর কোনরূপ সংস্কারক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এইসব সত্ত্বেও নাকি ইংলণ্ডে স্বাবলম্বন এমন অসাধ্যসাধন করেছে যে, 'বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অন্যান্য পন্থায় সেখানে যা কিছু করা হয়েছে এই উপায়টা তাকে **অনেক ছাড়িয়ে গিয়েছে।**' শ্রীযুক্ত জাক্স এখানে ইংরেজ 'গৃহনির্মাণ

সমিতিগুলির' কথাই বলছেন। এ সম্পর্কে এত বিশদভাবে তিনি আলোচনা করছেন বিশেষ করে এইজন্য যে, 'এদের চরিত্র এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে সাধারণত হয় অ-পর্যাপ্ত অথবা ভ্রান্ত ধারণা চালু আছে। ইংরেজ গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি কোনক্রমেই গৃহনির্মাণের জন্য সমিতি বা সমবায় নয়; তাদের বর্ণনা করা যায়... জার্মান ভাষায় Hauserwerbvereine হিসাবে (গৃহ অর্জন সমিতি ধরনের সংগঠন)। সমিতিগুলির উদ্দেশ্য হল সদস্যদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহ করে তহবিল সঞ্চয় করা, যাতে তা থেকে তহবিলের পরিমাণ অনুযায়ী বাসগৃহ ক্রয় করার জন্য সদস্যদের ঋণ মঞ্জুর করা যায়... নির্মাণ সমিতি সুতরাং কাজ করে সদস্যদের একাংশের জন্য সেভিংস্ ব্যাংক হিসাবে, আর অপরাংশের পক্ষে ঋণ দেবার ব্যাংক হিসাবে। অতএব এই নির্মাণ সমিতিগুলি প্রধানত শ্রমিকদের চাহিদা মেটাবার জন্য মর্গেজ ঋণ প্রতিষ্ঠানস্বরূপ; এরা প্রধানত... শ্রমিকদের সঞ্চয়কে ব্যবহার করে... গৃহ ক্রয় অথবা নির্মাণের জন্য আমানতকারীদের সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করে। এ কথা অনুমেয় যে, এই ঋণ সংশ্লিষ্ট স্থাবরসম্পত্তিটুকু বন্ধক রেখেই মঞ্জুর করতে হয় এবং এই শর্তে যে অল্পদিনের মধ্যে কিস্তিবন্দী হিসাবে সুদ ও আসলসহ তা ফেরৎ দিতে হবে... প্রাপ্য সুদ আমানতকারীদের তুলতে দেওয়া হয় না, **তাদের নামে তা চক্র বৃদ্ধি হারে জমা হয়**... যে কোন সময়ে একমাসের নোটিস দিয়ে সদস্যরা তাদের দেওয়া টাকা সুদসহ ফেরৎ পাবার দাবি করতে পারে' (১৭০—১৭২ পৃষ্ঠা)। 'ইংলণ্ডে ২,০০০-এরও বেশি এ রকম সমিতি আছে... তাদের সঞ্চিত মোট পুঁজির পরিমাণ প্রায় দেড় কোটি পাউন্ড। এইভাবে প্রায় ১,০০,০০০ **শ্রমিক** পরিবার ইতিমধ্যেই তাদের নিজস্ব গৃহকোণের অধিকার অর্জন করেছে — এমন সামাজিক সাফল্যের তুলনা মেলা ভার' (১৭৪ পৃষ্ঠা)।

দুর্ভাগ্যবশত এই ক্ষেত্রেও ঠিক পেছনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এক 'কিন্তু' এসে হাজির:

'কিন্তু এই উপায়ে সমস্যাটার একটা নিখুঁত সমাধান **কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি**, আর কোনও কারণে না-হোক অন্তত এই কারণেই যে একমাত্র **বেশী অবস্থাপন্ন** শ্রমিকের পক্ষেই বাড়ির অধিকার অর্জন সম্ভবপর... বিশেষ করে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা প্রায়শই যথেষ্ট পরিমাণে বিবেচিত হয় না।' (১৭৬ পৃষ্ঠা)। মহাদেশে 'এই ধরনের সমিতির... বিকাশের বিশেষ সুযোগ নেই।' এদের পূর্বসর্ত হল কুটীর প্রথার অস্তিত্ব, যা মহাদেশে শুধু গ্রাম অঞ্চলেই বিদ্যমান, এবং গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকেরা স্বাবলম্বনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পরিণত হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে শহরে যেখানে প্রকৃত গৃহনির্মাণ সমবায় গড়ে উঠতে পারত, সেখানে তারা 'নানা ধরনের বৃহৎ ও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন' (১৭৯ পৃষ্ঠা)। এরা শুধু কুটীরই নির্মাণ করতে পারে, যেটা বড় বড় শহরে চলবে না। সংক্ষেপে 'বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং বলতে গেলে নিকট ভবিষ্যতেও — এই

ধরনের সমবায়ী স্বাবলম্বন আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন তার সমাধানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে' পারবে না। দেখতেই পাচ্ছেন, এই গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি এখন অবধি 'তাদের প্রারম্ভিক, অপরিণত স্তরে রয়েছে।' 'কথাটা এমন কি ইংলণ্ড সম্বন্ধেও সত্য' (পৃঃ ১৮১)।

সুতরাং পুঁজিপতিরা **চায়** না এবং শ্রমিকেরা **পারে** না। আমরা এইখানেই এই অধ্যায়ের ইতি করতে পারতাম, যদি শুলৎসে-দেলিচ মার্কা বুর্জোয়ারা আমাদের শ্রমিকদের সামনে সবসময়েই যে আদর্শ তুলে ধরেন সেই ইংলণ্ডের গৃহনির্মাণ সমিতি সম্পর্কে অল্প একটু খবর দেওয়া একান্ত অপরিহার্য না হত।

এই গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি শ্রমিকদের সমিতিও নয়, শ্রমিকদের নিজস্ব গৃহসংস্থান করাও তাদের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। উল্টো, আমরা দেখতে পাব যে এই কাজ তারা ক্বচিৎ ব্যতিক্রম হিসাবে করে থাকে। গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির চরিত্র মূলত ফাটকাবাজ, যেমন সেই আদি ছোট সমিতিগুলি তেমনই তাদের অনুগামী বড়গুলি পর্যন্ত। যে সরাইখানায় পরে সমিতির সাপ্তাহিক বৈঠক বসে, সাধারণত তারই মালিকের তাগিদে কয়েকজন নিয়মিত খদ্দের ও তাদের বন্ধুবান্ধব, দোকানদার, অফিসকেরাণী, ঘুরে-ঘুরে-জিনিসপত্রের অর্ডার সংগ্রহকারী, ওস্তাদ কারিগর ও অন্যান্য পেটি বুর্জোয়া এবং কখনো কখনো বা স্বশ্রেণীর অভিজাত-স্তরভুক্ত কোনো মেকানিক বা অন্য কোনো শ্রমিক একত্রিত হয়ে একটা গৃহনির্মাণ সমবায় প্রতিষ্ঠা করে। এর আশু উপলক্ষ সাধারণত এই যে সরাইখানার মালিক কাছাকাছি কোনও জায়গায় অথবা অন্যত্র অপেক্ষাকৃত সস্তায় একখণ্ড জমি আবিষ্কার করেছে। অধিকাংশ সদস্য আবার পেশার দরুন কোন বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে বাঁধা নয়। এমন কি, অনেক দোকানদার ও কারিগরেরও কর্মস্থানটাই শহরে, সেখানে তাদের বাসস্থান নেই। সকলেই ধোঁয়াভরা নগর কেন্দ্রের বদলে পারলে উপকণ্ঠে বাস করাটাই পছন্দ করে। বাড়ি বানাবার জমিটা কেনা হয়; যতগুলি সম্ভব কুটীরও তার উপর নির্মিত হয়। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন সদস্যদের ক্রেডিটেই জমি কেনা সম্ভবপর হয়েছে আর অল্প স্বল্প কিছু ঋণ ও সাপ্তাহিক চাঁদা মিলিয়ে বাড়ি বানাবার সাপ্তাহিক খরচটুকু মেটে। যে সব সদস্য নিজস্ব একটি বাড়ি পেতে চায়, এক একটা কুটীর তৈরী সম্পূর্ণ হলে লটারি করে তাদের তা দেওয়া হয়। যথাযোগ্য অতিরিক্ত ভাড়াটা ক্রয়মূল্য শোধের কাজে লাগে। বাকি কুটীরগুলি তারপর হয় ভাড়া নইলে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ভাল ব্যবসা চালাতে পারলে গৃহনির্মাণ সমিতিটির হাতে মোটামুটি ভালই পয়সা জমে থাকে। নিয়মিত চাঁদা চালিয়ে গেলে এটা সদস্যদেরই সম্পত্তি রূপে থাকে; এবং কিছুদিন পর পর অথবা সমিতি তুলে দেবার সময় তা ভাগ করে দেওয়া হয় সভ্যদের মধ্যে। এই হল শতকরা নব্বইটি ইংরেজ গৃহনির্মাণ সমিতির জীবনের ইতিহাস। বাকিগুলি হচ্ছে বড় বড় প্রতিষ্ঠান, কখনও রাজনৈতিক কখনও বা

জনহিতৈষী অজুহাত নিয়ে গঠিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের প্রধান লক্ষ্য সবসময়ই হল **পেটি বুর্জোয়াদের** সঞ্চয়ের জন্য অপেক্ষাকৃত লাভজনক বন্ধকী লগ্নির ব্যবস্থা, ভালরকম সুদের হার আর ভূসম্পত্তি নিয়ে ফাটকাবাজী থেকে ভাল রকম লভ্যাংশের আশা।

কী ধরনের মক্কেলদের নিয়ে এই সমিতিগুলি ফাটকাবাজি করে, তা বৃহত্তম না হলেও বড় বড় সমিতিগুলির অন্যতম একটির প্রসপেক্টাস থেকে দেখা যেতে পারে। লণ্ডনের '২৯ ও ৩০ চান্সারি লেনস্থিত, সাদাম্পটন বিল্ডিংস-এ অবস্থিত দি বার্ক্‌বেক বিল্ডিং সোসাইটি,' প্রতিষ্ঠার পর থেকে যার মোট আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০৫,০০,০০০ পাউণ্ডের বেশী (৭ কোটি টেলর), ব্যাঙ্ক এবং সরকারী ঋণপত্রে যার ৪,১৬,০০০ পাউণ্ডেরও বেশী লগ্নী রয়েছে, এবং যার সদস্য ও আমানতকারীর সংখ্যা আজ ২১,৪৪১, সেই সমিতি জনসাধারণের কাছে নিম্নলিখিতভাবে আত্মপরিচয় দিচ্ছে:

'অধিকাংশ লোক পিয়ানো কারবারীদের তথাকথিত তিনসালা বন্দোবস্তের সঙ্গে পরিচিত আছেন; এই ব্যবস্থা অনুযায়ী যে কেউ তিন বছরের জন্য একটা পিয়ানো ভাড়া নিলে ঐ সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর সেই পিয়ানোটীর মালিকে পরিণত হন। এই প্রথা প্রবর্তনের পূর্বে সীমাবদ্ধ আয়ের লোকদের পক্ষে ভাল পিয়ানো কেনা প্রায় বাড়ি কেনার মতন কঠিন ছিল। তেমন লোক পিয়ানোর ভাড়া গুণে যেতেন বছরের পর বছর এবং এইভাবে খরচ করতেন পিয়ানোটার দামের দুই বা তিনগুণ অর্থ। পিয়ানো সম্বন্ধে যা প্রযোজ্য বাড়ি সম্বন্ধেও তাই... অবশ্য বাড়ির দাম পিয়ানোর চাইতে বেশি হওয়ার দরুন... তার ক্রয়মূল্য ভাড়া হিসাবে শোধ করতে দীর্ঘতর সময় লাগে। সেইজন্য ডিরেকটারগণ লণ্ডন ও শহরতলীতে বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ি মালিকদের সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত করেছেন, যার ফলে তারা বার্কবেক বিল্ডিং সোসাইটির সদস্য এবং অন্যান্যদের শহরের বিভিন্ন পাড়ায় অবস্থিত অনেকগুলি বাড়ির মধ্য থেকে পছন্দ করে নেবার বিস্তৃত সুযোগ দিতে পারে। বোর্ড অব ডিরেক্টারস যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চান তা হল এই: এই বাড়িগুলি সাড়ে বারো বছরের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে, নিয়মিত ভাড়া দেওয়া হলে এই সময়ের পরে ভাড়াটে আর কোন কিছু না দিয়েই বাড়ীটার সম্পূর্ণ মালিকানা পাবেন... ভাড়াটে স্বল্পতর সময়ের জন্য বেশি ভাড়া দিয়ে অথবা দীর্ঘতর সময়ের জন্য কম ভাড়া দিয়েও চুক্তি করতে পারেন... **সীমিত আয়ের লোকেরা, কেরাণীবৃন্দ, দোকান কর্মচারীগণ** এবং অন্যেরা অবিলম্বে বার্ক্‌বেক বিল্ডিং সোসাইটির সভ্য হয়ে বাড়িওয়ালার হাত থেকে মুক্ত হতে পারবেন।'

খুবই স্পষ্ট কথা। এতে শ্রমিকদের নাম উল্লেখ নেই, আছে কেরাণী এবং দোকান কর্মচারী প্রভৃতি সীমিত আয়ের লোকজনদের কথা, তার উপর আবার ধরে নেওয়া হয়েছে যে, দরখাস্তকারীদের সাধারণত **ইতিমধ্যে একটি করে পিয়ানো আছেই।** প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষেত্রে কারবার হচ্ছে মোটেই শ্রমিকদের সঙ্গে নয়, হচ্ছে পেটি বুর্জোয়া বা যারা পেটি বুর্জোয়ায় পরিণত হতে ইচ্ছুক **এবং সক্ষম** তাদের সঙ্গে। কারবার সেই লোকদেরই সঙ্গে যাদের আয় কেরাণী বা অনুরূপ কর্মচারীদেরই মতন নির্দিষ্ট সীমার

মধ্যে হলেও ক্রমশ বেড়ে চলে। অন্যদিকে শ্রমিকদের আয় খুব বেশি হলেও টাকার অঙ্কে অপরিবর্তিত থাকে, এবং আসলে পরিবারের আয়তন এবং প্রয়োজনের বৃদ্ধির অনুপাতে কমে যায়। প্রকৃতপক্ষে অতি অল্পসংখ্যক শ্রমিকই ব্যতিক্রম হিসাবে এই ধরনের সমিতির সভ্য হতে পারে। একদিকে তাদের আয় এতই সামান্য এবং অন্যদিকে তা এত অনিশ্চিত যে আগে থাকতে সাড়ে বার বছরের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে তারা সক্ষম নয়। অল্প যে কটি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে তা খাটে না, সেটা হল সর্বোচ্চ বেতনভুক্ শ্রমিক বা ফোরম্যানদের ক্ষেত্রে।*

তাছাড়া, এ কথাটা সকলের কাছেই স্পষ্ট যে ম্যুল্‌হাউজেন-এর শ্রমিক-নগরীর বোনাপার্টপন্থীরা এই পেটি বুর্জোয়া ইংরেজ গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির করুণ অনুকারক ব্যতীত আর কিছু নয়। একমাত্র তফাৎ হল এই যে, পূর্বোক্তরা রাষ্ট্রীয় সাহায্য সত্ত্বেও গৃহনির্মাণ সমিতিদের তুলনায় অনেক বেশী লোক ঠকিয়ে থাকে। মোটের উপরে এদের শর্ত ইংলণ্ডের গড়পড়তা শর্তের তুলনায় অনেক কম উদার। ইংলণ্ডে সাধারণ সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রতিটি আমানতের উপর আলাদা আলাদা হিসাব করা হয় এবং টাকা তোলা যায় একমাসের নোটিস দিয়ে। ম্যুল্‌হাউজেনের ফ্যাক্টরি-মালিকেরা কিন্তু সাধারণ সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদ দুই-ই পকেটস্থ করে এবং শ্রমিকেরা নগদ পাঁচ-ফ্রাঁ মুদ্রায় যে টাকা জমা দেয় তার উপরে এক পয়সাও বেশি তাদের

* এই ধরনের গৃহনির্মাণ সমিতি এবং বিশেষ করে লণ্ডনের গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি কী পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, সে সম্বন্ধে এখানে আমরা কিছু সামান্য তথ্য যোগ করতে চাই। একথা সুবিদিত যে, যে-জমিতে লণ্ডন শহরটি গড়ে উঠেছে তার প্রায় সমস্ত ডজনখানেক অভিজাত ব্যক্তির সম্পত্তি, যাদের মধ্যে প্রধান হলেন ডিউক অব ওয়েস্টমিনস্টার, ডিউক অব বেডফোর্ড, ডিউক অব পোর্টল্যাণ্ড ইত্যাদি। গোড়ার দিকে এ'রা এক একটি বাড়ি বানাবার জন্য জমি নিরানব্বই বছরের মতন ইজারা দিতেন এবং ঐ সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দখল করে নিতেন ঘরদোরশুদ্ধ জমিটি। তারপরে এ'রা বাড়িগুলি ভাড়া দিতে লাগলেন স্বল্প মেয়াদে, যথা ঊনচল্লিশ বছরের জন্যে তথাকথিত মেরামতী ইজারার সর্তে, যাতে ব্যবস্থা থাকত যে ইজারাদার বাড়ি মেরামত করে সারিয়ে নেবে এবং ভাল অবস্থায় রাখবে। চুক্তিটী এতখানি অগ্রসর হলেই বাড়ির মালিক তার স্থপতি এবং জেলা জরিপকারকে (সার্ভেয়ার) পাঠিয়ে দিত বাড়ি পরীক্ষা করে কী কী মেরামত প্রয়োজন নির্দ্ধারণ করবার জন্য। মেরামতের কাজ প্রায়ই খুব ব্যাপক হয়ে দাঁড়াত, এবং সম্মুখভাগ, ছাদ প্রভৃতি পুনর্বিন্যাস করতে হত। ইজারাদার এর পরে ইজারার দলিলটা কোনও গৃহনির্মাণ সমিতির কাছে বন্ধক রেখে তার নিজ ব্যয়ে বাড়ি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ধরে নিত — বার্ষিক বাড়ি ভাড়া ১৩০ পাউণ্ড থেকে ১৫০ পাউণ্ড হলে এরূপ ঋণের পরিমাণ দাঁড়াত ১,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত বা তারও বেশি। এই গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি এইভাবে অভিজাত ভূস্বামীদের শিরঃপীড়ার কারণ না ঘটিয়ে জনসাধারণের খরচে তাদের লণ্ডনস্থ গৃহগুলির বারংবার নবায়ন এবং বসবাসযোগ্য অবস্থায় রাখবার ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী যোগসূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর একেই ধরা হচ্ছে শ্রমিকদের জন্য বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান বলে! (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলস-এর টীকা।)

ফেরৎ দেওয়া হয় না। এই তফাৎ দেখে শ্রীযুক্ত জাক্সই সব থেকে বেশি অবাক হবেন, যদিও তাঁর বইতেই তাঁর অজ্ঞাতে এইসব তথ্য রয়েছে।

সুতরাং, শ্রমিকদের আত্মত্রাণও কোন কাজের কথা নয়। বাকি থাকল রাষ্ট্রীয় সাহায্য। এই ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত জাক্স আমাদের কী প্রস্তাব দিচ্ছেন? তিনটি জিনিস:

'সর্বপ্রথম, রাষ্ট্রের বিধান ও প্রশাসন ক্ষেত্রের যে সব কারণে শ্রমিক শ্রেণীগুলির মধ্যে বাসস্থানের অভাব কোনও ক্রমে তীব্রতর হতে পারে, তার অবসান বা যথাযথ প্রতিকারের জন্য যত্ন নিতে হবে রাষ্ট্রকে' (পৃঃ ১৮৭)।

অতএব চাই গৃহনির্মাণ যাতে সুলভতর হতে পারে তার জন্য গৃহনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন এবং নির্মাণ-শিল্পের স্বাধীনতা। কিন্তু ইংলণ্ডে ত নির্মাণ-নিয়ন্ত্রণ-আইন স্বল্পতম গণ্ডিতে পর্যবসিত, গৃহনির্মাণ-শিল্পও আকাশের বিহঙ্গের মতই স্বাধীন; অথচ সেখানে তাসত্ত্বেও বাসস্থানের অভাব বজায় রয়েছে। উপরন্তু, ইংলণ্ডে বাড়ি আজকাল এত সস্তায় বানানো হয় যে গাড়ি গেলে তা কাঁপতে থাকে এবং প্রতিদিনই কোনো না কোনো বাড়ি ধ্বসে পড়ে। গতকালই ২৫শে অক্টোবর, ১৮৭২ ম্যানচেস্টারে একই সঙ্গে ছয়খানা বাড়ি ধ্বসে পড়েছে এবং গুরুতর রূপে আহত করেছে ছয়জন শ্রমিককে। সুতরাং এটাও কোন সমাধান নয়।

'দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বশবর্তী হয়ে ব্যক্তিবিশেষ এই বিপদ ছড়িয়ে দিতে গেলে, বা নতুন করে সৃষ্টি করতে গেলে রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়ে তাকে বাধা দিতে হবে।'

অতএব চাই স্বাস্থ্যবিভাগ ও গৃহনির্মাণ-পুলিশ কর্তৃক শ্রমিক বসতিগুলির পরিদর্শন; ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে ১৮৫৭ সাল থেকে যা করা হচ্ছে কর্তৃপক্ষের হাতে সেইরূপ ক্ষমতা অর্পণ, যাতে তারা জীর্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর গৃহে বসবাস নিষিদ্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু সেখানে কী ঘটল? এই ব্যাপারে ১৮৫৫ সালের প্রথম আইন (আবর্জনা স্থানান্তর আইন) শ্রীযুক্ত জাক্স নিজেই যা স্বীকার করছেন একটা 'চোঁতা কাগজ' হয়ে থাকে, যেমন হয় ১৮৫৮ সালের দ্বিতীয় আইনও (স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আইন) (পৃঃ ১৯৭)। অপর পক্ষে, শ্রীযুক্ত জাক্সের মতে, শুধু দশ হাজারের বেশি লোক দ্বারা অধ্যুষিত শহরগুলিতে প্রযোজ্য তৃতীয় আইনটি (কারিগরদের বাসস্থান আইন) 'অবশ্যই সামাজিক ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গভীর উপলব্ধির অনুকূল সাক্ষ্য দিচ্ছে' (১৯৯ পৃষ্ঠা)। আসলে কিন্তু এই উক্তিটি ইংরেজদের 'ব্যাপারে' শ্রীযুক্ত জাক্সের নিদারুণ অজ্ঞতা সম্বন্ধে 'অনুকূল সাক্ষ্য দেওয়া' ছাড়া আর কিছু করছে না। এ কথা অবিসংবাদী যে 'সামাজিক ব্যাপারে' সাধারণভাবে ইংলণ্ড ইউরোপ মহাদেশের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর। ইংলণ্ডই হল আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের মাতৃভূমি; পুঁজিবাদী উৎপাদন-

পদ্ধতি এদেশে সর্বাপেক্ষা অবাধে এবং ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করেছে; তার ফলাফল সর্বাপেক্ষা প্রখরভাবে এখানেই দেখা দিয়েছে; সুতরাং অনুরূপভাবে এদেশেই প্রথম আইনের ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়েছে। এর সেরা প্রমাণ হল ফ্যাক্টরি বিধান। কিন্তু শ্রীযুক্ত জাক্স যদি মনে করে থাকেন পার্লামেন্টের বিধান আইনত চালু হলেই সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যক্ষেত্রেও পালিত হবে, তাহলে তিনি দারুণভাবেই ভুল করছেন। এবং অন্য যে কোন আইন অপেক্ষা (অবশ্য ওয়ার্কশপ আইনটির ব্যতিক্রম ছাড়া) এ কথা স্থানীয় শাসনের আইন সম্পর্কে সব থেকে বেশি প্রযোজ্য। এই আইন পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছিল নগর কর্তৃপক্ষদের হাতে, যারা ইংলন্ডের সর্বত্র সর্বপ্রকার দুর্নীতি স্বজন-পোষণ এবং jobbery*র জন্য সুপরিচিত। নগর কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা নানারূপ পারিবারিক বিবেচনার খাতিরে তাদের কাজ পেয়ে থাকে; সুতরাং তাদের পক্ষে এ ধরনের সামাজিক আইন কার্যকরী করা হয় সম্ভব নয়, নয়তো তারা তা করতেই অনিচ্ছুক। পক্ষান্তরে এই ইংলন্ডেই সামাজিক আইনকানুন রচনা ও কাজে পরিণত করার জন্য ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা তাদের কর্তব্যপরায়ণতার জন্য সাধারণত সুপরিচিত — যদিও বিশ ত্রিশ বছর পূর্বে যতটা ছিল আজকে তার চাইতে কম মাত্রায়। বিপজ্জনক আর জীর্ণপ্রায় বাড়ির মালিকদের প্রায় সর্বত্র নগর কাউন্সিলগুলিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেশ প্রতিনিধিত্ব আছে। ছোট ছোট পাড়ার ভিত্তিতে নগর কাউন্সিলগুলি নির্বাচন প্রথার ফলে নির্বাচিত সদস্যরা ক্ষুদ্রতম স্থানীয় স্বার্থ ও প্রভাবের মুখাপেক্ষী; পুনর্নির্বাচনকামী কোন কাউন্সিলারের পক্ষে তার নির্বাচন কেন্দ্রে এই আইন কার্যকরী করার পক্ষে ভোট দেবার সাহস করা কঠিন, সম্ভব নয়। সুতরাং এ কথা বোধগম্য যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রায় সর্বত্রই এই আইনকে কী রকম বিতৃষ্ণার চোখে দেখেছে; আজ অবধি অত্যন্ত লজ্জাকর ক্ষেত্রেই মাত্র এ আইন কার্যকরী হয়েছে — এবং তাও সাধারণত ম্যানচেস্টার ও স্যালফোর্ডে গত বছর যে বসন্ত মহামারী দেখা দিয়েছিল, ঐ রকম কোন মহামারীর প্রাদুর্ভাবের ফলে। আজ অবধি কেবল মাত্র এই ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আবেদন সফল হয়েছে, কারণ ইংলন্ডের প্রতিটী **উদারপন্থী** সরকারের নীতি হচ্ছে কেবল বাধ্য হলেই কোনরূপ সমাজ সংস্কার আইন

* Jobbery — কথাটির মানে হচ্ছে কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থে সরকারী পদাধিকারকে ব্যবহার করা। উদাহরণস্বরূপ যদি কোন দেশের সরকারী তার-বিভাগের অধিকর্তা একটি কাগজ তৈরীর কারখানার নিষ্ক্রিয় অংশীদার হয়ে তাঁর বন থেকে ঐ কারখানাকে কাঠ সরবরাহ করেন এবং তার-অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহের অর্ডার ঐ কারখানাকেই দেন, তাহলে ব্যাপারটা ছোট হলেও বেশ খাসা একটা job, কেননা এর মধ্যে দিয়ে jobbery নীতি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে; প্রসঙ্গত সে জিনিসটা বিসমার্কের আমলে স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত ছিল। (এঙ্গেলসের টীকা।)

প্রস্তাব করা এবং যে সব আইন ইতিমধ্যে পাশ হয়েছে যতটা সম্ভব তা কার্যকরী না করা। ইংলণ্ডে অন্যান্য অনেক আইনের মতন উল্লিখিত আইনটিরও গুরুত্ব এইখানে যে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা তাদের চাপে চালিত যে সরকার এই আইন অবশেষে সত্যসত্যই কাজে পরিণত করবে, তার হাতে এটা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ফাটল ধরাবার শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে।

'তৃতীয়ত', শ্রীযুক্ত জাক্সের মতে রাষ্ট্রশক্তির উচিত হল 'বর্তমান বাসস্থানাভাব সমাধানের জন্য তার হাতে যা কিছু বাস্তব পন্থা আছে যথাসম্ভব তার ব্যাপকতম সদ্ব্যবহার করা।'

অর্থাৎ কিনা রাষ্ট্রশক্তির উচিত তার 'অধস্তন কেরাণী ও কর্মচারীদের জন্য' (কিন্তু এরা যে শ্রমিক নয়!) ব্যারাক, বা 'সত্যিকারের আদর্শগৃহ নির্মাণ করা', আর ইংলণ্ডে পূর্তকার্য ঋণ আইন অনুযায়ী যা করা হয়, এবং প্যারিস ও মুল্‌হাউজেনে লুই বোনাপার্ট যা করেছেন, সেই রকমভাবে 'শ্রমিক শ্রেণীর বাসস্থান পরিস্থিতির উন্নতির জন্য মিউনিসিপালিটী, সমিতি ও ব্যক্তিবিশেষদেরও... ঋণ দেওয়া' (পৃঃ ২০৩)। অথচ পূর্তকার্য ঋণ আইনটিও কাগজেই পর্যবসিত। সরকার কমিশনারদের জন্য বড় জোর ৫০,০০০ পাউণ্ড বরাদ্দ করে, যা দিয়ে নির্মাণ করা চলে বড় জোর ৪০০ কুটীর। অর্থাৎ চল্লিশ বছরে মোট আশী হাজার লোকের জন্য ষোল হাজার কুটীর বা বাসা নির্মাণ — চৌবাচ্চায় বারিবিন্দুর মতন। আমরা যদি ধরেও নিই যে, পরিশোধ হওয়ার ফলে কুড়ি বছরে কমিশনগুলোর হাতের তহবিল দ্বিগুণিত হয়েছে, অর্থাৎ গত কুড়ি বছরে বাসা বানানো হয়েছে আরও চল্লিশ হাজার লোকের জন্য, তাহলেও ব্যাপারটা হল চৌবাচ্চায় বারিবিন্দু মাত্র। এবং যেহেতু কুটীরগুলির গড়পড়তা জীবনকাল চল্লিশ বছরের বেশি নয়, তাই চল্লিশ বছর পরে বাৎসরিক ৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ পাউণ্ড নগদ সম্পদ ব্যয় করতে হবে সব থেকে জীর্ণ ও পুরানো কুটীরগুলির বদলির জন্য। শ্রীযুক্ত জাক্সের ঘোষণা অনুযায়ী (২০৩ পৃষ্ঠা): এই হচ্ছে সঠিকভাবে এবং 'অপরিসীম ব্যাপকতায়' নীতিটিকে কাজে পরিণত করা! এমন কি ইংলণ্ডেও রাষ্ট্র 'অপরিসীম ব্যাপকতায়' প্রায় কিছুই সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, কার্যত এই স্বীকারোক্তি করে শ্রীযুক্ত জাক্স তাঁর গ্রন্থ শেষ করেছেন, অবশ্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আরেকবার উপদেশামৃত বর্ষণ করার পরেই।*

* ইংরেজ পার্লামেণ্টের সাম্প্রতিক আইনগুলিতে লণ্ডন নির্মাণ কর্তৃপক্ষদের নতুন রাস্তা তৈরীর উদ্দেশ্যে উচ্ছেদের অধিকার দেবার সঙ্গে সঙ্গে এর ফলে যারা বাস্তুহারা হল তেমন শ্রমিকদের প্রতি কিছুটা বিবেচনা দেখানো হয়েছে। একটি ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে, কোনও অঞ্চলে আগে যে সব শ্রেণীর জনসাধারণ বাস করত নতুন বাড়ি তাদের বাসের উপযোগী করেই তৈরী করতে হবে। সুতরাং সুলভতম জমিতে শ্রমিকদের জন্য পাঁচ ছয় তলা বড় বড় ভাড়াটে বাড়ি তোলা হচ্ছে, তাতে

এ কথা একেবারে সুস্পষ্ট যে আজকের দিনে যা বর্তমান সেরূপ রাষ্ট্র গৃহসংস্থান বিপর্যয়ের প্রতিকারে কিছু করতে সমর্থও নয়, ইচ্ছুকও নয়। শ্রমিক ও কৃষক — এই শোষিত শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে বিত্তবান শ্রেণীগুলির, ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের সংগঠিত যৌথ শক্তি ছাড়া রাষ্ট্র আর কিছুই নয়। ব্যক্তি পুঁজিপতিরা (এ ক্ষেত্রে শুধু পুঁজিপতিদেরই কথা ওঠে, কেননা ও ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ভূস্বামীরাও প্রধানত পুঁজিপতি হিসাবে কাজ করে) যা অপছন্দ করবে, তাদের রাষ্ট্রও সেটা চাইবে না। সুতরাং **ব্যক্তি** পুঁজিপতিরা বাসস্থানাভাব সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করলেও তার সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ফলাফলগুলির উপর বাহ্যত প্রলেপ লাগাবার কাজে পর্যন্ত যখন তাদের নাড়ানো প্রায় সম্ভব নয়, তখন **যৌথ** পুঁজিপতি যে রাষ্ট্র সে তার চাইতে বেশি কিছু করবে না। বড় জোর রাষ্ট্র শুধু এইটুকু দেখবে যে বাহ্যিক প্রলেপের যে কাজটা রেওয়াজ দাঁড়িয়েছে, সেটা যেন সর্বত্র সমভাবে কাজে পরিণত হয়। আর পরিস্থিতিটা যে এই, তা আমরা দেখেছি।

কেউ কেউ আপত্তি করতে পারে জার্মানিতে তো এখনও বুর্জোয়ারা রাজত্ব করছে না; জার্মানিতে রাষ্ট্র এখনও কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র শক্তিরূপে সমাজের ঊর্ধ্বে বিরাজমান, সুতরাং জার্মান রাষ্ট্র কোন একটি মাত্র শ্রেণী-স্বার্থের বদলে সমগ্র সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে। **এমনিধারা** রাষ্ট্র নিশ্চয়ই বুর্জোয়া রাষ্ট্র অপেক্ষা বেশি কিছু করতে পারে, তাই সামাজিক ক্ষেত্রেও এমন রাষ্ট্রের কাছ থেকে অন্যতর কিছু আশা করা উচিত।

এ হল প্রতিক্রিয়াশীলদের ভাষা। আসলে জার্মানির বর্তমানে বিদ্যমান রাষ্ট্রও যে সামাজিক ভিত্তি থেকে তার উৎপত্তি, তারই অপরিহার্য ফলমাত্র। প্রাশিয়াতে -- এখন প্রাশিয়ার গুরুত্বই চূড়ান্ত -- এখনও অবধি ক্ষমতাশালী ভূম্যাধিকারী অভিজাত শ্রেণীর পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত তরুণ আর অতি কাপুরুষ এক বুর্জোয়া শ্রেণী রয়েছে। এই বুর্জোয়া শ্রেণী এখন অবধি ফ্রান্সের মতন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে পারেনি, পারেনি ইংলন্ডের মতন কম বেশি পরোক্ষ আধিপত্য কায়েম করতে। এই দুই শ্রেণীর পাশাপাশি দ্রুত বর্ধনশীল প্রলেতারিয়েতও অবশ্য রয়েছে, যে শ্রেণী মননশীলতার দিক থেকে খুব বিকশিত এবং প্রতিদিন উত্তরোত্তর সংগঠিত হয়ে উঠছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে এ ক্ষেত্রে পুরানো একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের বুনিয়াদী ভিত্তি

করে আইনের আক্ষরিক মর্যাদা রক্ষা হচ্ছে। ভবিষ্যতেই দেখা যাবে এই ব্যবস্থা কতটা কার্যকরী হল, কেননা শ্রমিকেরা এতে একেবারেই অভ্যস্ত নয় এবং লন্ডনের সনাতনী পরিমণ্ডলের মধ্যে এই বাড়িগুলি সম্পূর্ণ বিসদৃশ এক ব্যাপার। নতুন নির্মাণ কার্যের ফলে যত শ্রমিক বাস্তবপক্ষে স্থানচ্যুত হচ্ছে তার বড়োজোর এক চতুর্থাংশের মাত্র নতুন বাসগৃহেব সংস্থান হতে পারে এতে। (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

অর্থাৎ অভিজাত ভূস্বামী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্যের পাশাপাশি আছে আধুনিক বোনাপার্টবাদের বুনিয়াদী ভিত্তি অর্থাৎ বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে ভারসাম্য। কিন্তু পুরানো একচ্ছত্র রাজতন্ত্র এবং আধুনিক বোনাপার্টবাদী রাজতন্ত্র — এই উভয়ক্ষেত্রেই আসল শাসন ক্ষমতা থাকে সামরিক অফিসার এবং সরকারী কর্মচারীদের এক বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে। প্রাশিয়ার এই গোষ্ঠীর নতুন সদস্য আসে অংশত এদের নিজেদের ভিতর থেকে, অংশত জ্যেষ্ঠাধিকারানুবর্তী অধস্তন অভিজাতদের মধ্য থেকে, শীর্ষস্থানীয় অভিজাতদের ভিতর থেকে আসে অনেক কম, এবং সব থেকে কম আসে বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে। গোষ্ঠীটার স্থান মনে হয় যেন সমাজের বাইরে এবং বলতে গেলে সমাজের ঊর্ধ্বে। তার এই স্বাতন্ত্র্যের ফলে রাষ্ট্রও সমাজ থেকে একটা স্বাতন্ত্র্যের রূপ পায়।

স্ববিরোধী এই সামাজিক পরিস্থিতির মধ্য থেকে প্রাশিয়াতে (এবং প্রাশিয়ার অনুকরণে জার্মানির নতুন রাইখ ব্যবস্থাতে) যে রূপের রাষ্ট্র অপরিহার্য ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে বিকাশ লাভ করেছে, তা হল একটা মেকি-সংবিধানানুবর্তিতা। এর মধ্যে একই সঙ্গে বিদ্যমান আছে পুরানো একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের বর্তমানকালীন ভাঙ্গনের রূপ এবং বোনাপার্টবাদী রাজতন্ত্রের অস্তিত্বের রূপ। প্রাশিয়াতে ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত মেকি-সংবিধানানুবর্তিতা একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের মন্থর পচনকে আবৃত ও সাহায্য করছিল। কিন্তু ১৮৬৬ সাল থেকে, আরও বিশেষ করে ১৮৭০ সালের পর সামাজিক পরিস্থিতির ওলটপালট এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পুরানো রাষ্ট্রের ভাঙ্গন সকলের চোখের সামনেই দ্রুতবর্ধমান বেগে ঘটছে। শিল্পের, বিশেষত স্টক এক্‌স্‌চেঞ্জের ঠকবাজির দ্রুত প্রসার সমস্ত শাসক শ্রেণীগুলিকে ফাটকা খেলার ঘূর্ণাবর্তে টেনে নামিয়েছে। ১৮৭০ সালে ফ্রান্স থেকে আমদানী করা পাইকারী দুর্নীতি অভূতপূর্ব তীব্র গতিতে বিস্তার লাভ করছে। স্ট্রুসবের্গ এবং পেরেইর — কেউ কারও থেকে কম যান না। মন্ত্রীবর্গ, জেনারেল, প্রিন্স, এবং কাউণ্টরা শেয়ার বাজারের ধূর্ততম নেকড়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফাটকাবাজিতে নেমেছে। আর রাষ্ট্রশক্তি শেয়ার বাজারের এই নেকড়েদের পাইকারীভাবে ব্যারন উপাধি বর্ষণ করে এদের সমমর্যাদা স্বীকার করে নিচ্ছে। গ্রামীণ অভিজাত শ্রেণী দীর্ঘকাল ধরে বীটচিনি তৈরি এবং ব্র্যাণ্ডি চোলাইয়ের শিল্পপতি হয়ে ছিল; তারা তাদের সেই সম্মানীয় পুরানো দিনগুলি বহুকাল হল ফেলে এসেছে এবং নানারকম ভালমন্দ জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর ডিরেক্‌টারদের তালিকা এদের নামে স্ফীত হতে দেখা যাচ্ছে। আমলাতন্ত্র নিজের আয় বৃদ্ধির একমাত্র উপায় হিসাবে ক্রমশ তহবিল তছরুপকে বেশী করে তাচ্ছিল্য করতে শুরু করছে; রাষ্ট্রযন্ত্র পরিত্যাগ করে এরা সুরু করেছে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনেক বেশী লাভজনক পরিচালক পদের জন্য কাড়াকাড়ি। যারা সরকারী পদে এখনও পড়ে রয়েছে, তারাও তাদের

উপরওয়ালাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শেয়ারের ফাটকাবাজিতে নেমেছে এবং রেলওয়ে প্রভৃতিতে 'স্বার্থ-অর্জন' করছে। কেউ যদি ধরে নেয় যে লেফ্‌টেনাণ্টরা পর্যন্ত কোন না কোন ধরনের ফাটকা খেলায় ভাগ নিচ্ছে, তাহলেও কিছু অন্যায় হবে না। এক কথায় পুরাতন রাষ্ট্রের সব কয়টা উপাদানই পচনের মুখে এবং একচ্ছত্র রাজতন্ত্র থেকে বোনাপার্টীয় রাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া চলছে পুরাদমে। পরবর্তী বড় গোছের ব্যবসা ও শিল্প সংকট এলে শুধু যে বর্তমান ঠকবাজি ধ্বসে পড়বে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে যাবে পুরানো প্রাশিয়া রাষ্ট্রও।*

যার অ-বুর্জোয়া অংশগুলিও দিনের পর দিন বেশি বুর্জোয়া হয়ে উঠছে সেই রাষ্ট্র কিনা 'সামাজিক সমস্যা', অন্ততপক্ষে বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধান করবে? ঠিক তার বিপরীত। প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক প্রশ্নে প্রাশিয়া রাষ্ট্র ক্রমশ বেশি করে বুর্জোয়াদের হাতে চলে যাচ্ছে। আর ১৮৬৬ সাল থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আইনকানুন বুর্জোয়াদের স্বার্থে যতটা অভিযোজিত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি করে যে হয়নি, সেটা কার দোষে? এর জন্য বুর্জোয়ারাই প্রধানত দায়ী, প্রথমত এই কারণে যে এই শ্রেণী এতই ভীরু যে নিজেদের দাবি নিয়ে উদ্যোগ সহকারে অগ্রসর হতে পারে না এবং দ্বিতীয়ত, এরা এমন প্রত্যেকটি সুবিধাতেই বাধা দেয় যদি তা সেই সঙ্গেই বিপন্নকারী প্রলেতারিয়েতকেও নতুন অস্ত্র সরবরাহ করে। আর রাষ্ট্রশক্তি অর্থাৎ বিস্‌মার্ক যদি বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সংযত রাখার জন্য নিজের দেহরক্ষী প্রলেতারিয়েত বাহিনী সংগঠন করার চেষ্টায় থাকেন, তাহলে তা অপরিহার্য এবং সুপরিচিত সেই বোনাপার্টীয় দাওয়াই ছাড়া আর কিছুই নয় — যে দাওয়াই শ্রমিকদের জন্য কিছু কিছু মিষ্ট কথা এবং বড় জোর লুই বোনাপার্ট মার্কা গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির জন্য নিম্নতম রাষ্ট্রীয় সাহায্য ছাড়া বেশি কিছু প্রতিশ্রুতিতে রাষ্ট্রকে আবদ্ধ করে না।

শ্রমিকেরা প্রাশিয়া রাষ্ট্রের কাছ থেকে কী আশা করতে পারে তার সেরা প্রমাণ পাওয়া যাবে শত শত কোটি ফরাসী মুদ্রা ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে, যে টাকাটা সমাজের দিক থেকে প্রুশীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বাধীনতার আয়ু স্বল্পকালের জন্য নূতন করে বাড়িয়ে দিয়েছে। বার্লিনের যে সব শ্রমিক পরিবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য কি এই কোটি কোটি মুদ্রা থেকে এক কপর্দকও ব্যয়িত হল? ঠিক তার বিপরীত। গ্রীষ্মকালে যে কয়টি খুপরি শ্রমিকদের মাথার উপরে সাময়িক আচ্ছাদন রূপে কাজ

* এমন কি আজকে ১৮৮৬ সালে, পুরানো প্রাশিয়া রাষ্ট্র ও তার ভিত্তিকে সংরক্ষণ শুল্কের দ্বারা জোড় দেওয়া বড় বড় ভূমিমালিকানা ও পুঁজির মৈত্রীবন্ধনকে একসঙ্গে যা ধরে রেখেছে তা হল প্রলেতারিয়েত সম্পর্কে আতঙ্ক, ১৮৭২ সাল থেকে যে প্রলেতারিয়েত সংখ্যায় শ্রেণী-চেতনায় প্রচণ্ড বেড়ে উঠেছে। (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

করেছিল, হেমন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তি তাও ভেঙে দেবার আদেশ দিয়েছে। এই পাঁচশ কোটি টাকা দ্রুতগতিতে যাচ্ছে সাভ্যস্ত পথে: কেল্লা, কামান ও ফৌজের খাতে। লুই বোনাপার্ট কর্তৃক ফ্রান্স থেকে অপহৃত লক্ষ লক্ষ টাকা থেকে ফরাসী শ্রমিকদের জন্য যেটুকু বরাদ্দ হয়েছিল, ভাগনারের গাধামো ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে স্টীবারের এত বৈঠক* সত্ত্বেও, এই কোটি কোটি মুদ্রা থেকে জার্মান শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ হবে তারও কম।

৩

বাস্তবে বুর্জোয়াদের **নিজস্ব** কায়দায় বাসস্থান সমস্যা সমাধানের একটিমাত্র পদ্ধতি আছে — অর্থাৎ কিনা এমনই পন্থায় সমাধান যাতে ক্রমাগত নতুন করে সমস্যাটির উদ্ভব হয়। এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় 'অসমাঁ'।

'অসমাঁ' কথাটি দিয়ে আমি শুধু প্যারিসীয় অসমাঁ-র বিশিষ্ট বোনাপার্টীয় পদ্ধতিকে বোঝাতে চাইনি যার বৈশিষ্ট্য ছিল ঘনসন্নিবিষ্ট শ্রমিক বসতির ঠিক মধ্য দিয়ে দীর্ঘ, সিধা এবং প্রশস্ত রাস্তা চালিয়ে দেওয়া এবং তার দুধারে বড় বড় প্রাসাদোপম অট্টালিকার সারি নির্মাণ। ব্যারিকেড লড়াইকে দুরূহ করে তোলার রণকৌশলগত লক্ষ্য ছাড়াও এর অভিপ্রায় ছিল সরকারের উপরে নির্ভরশীল, এক বিশেষ বোনাপার্টীয় গৃহনির্মাণী একদল প্রলেতারিয়েতের বিকাশ এবং নগরীটিকে সোজাসুজি বিলাস নগরে পরিণত করা। 'অসমাঁ' শব্দটি দিয়ে আমি বোঝাতে চেয়েছি আমাদের বড় বড় শহরগুলির শ্রমিক বসতিতে, বিশেষ করে যেগুলি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, তাতে ফাটল সৃষ্টি করার রেওয়াজ, যা বর্তমানে ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে — তা সে জনস্বাস্থ্য বা শহরের রূপসজ্জার খাতিরেই হোক, বা কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বড় বড় ব্যবসা-ভবনের চাহিদার জন্যই হোক, অথবা রেলওয়ে, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি যানবাহন চলাচলের প্রয়োজনানুযায়ীই হোক। কারণের মধ্যে যতই তফাৎ থাক না কেন, ফলাফল সর্বত্র একই প্রকারের: জঘন্যতম অলিগলি দূর হয়ে যায় আর বুর্জোয়ারা তখন এই দারুণ সাফল্যের জন্য প্রচুর আত্মগরিমায় মগ্ন হয়, কিন্তু — সেই জঘন্য অলিগলি আবার পরক্ষণেই অন্য জায়গায় দেখা দেয়, এবং প্রায় দেখা দেয় ঠিক পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই।

১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে ম্যানচেস্টার কেমন ছিল তার চিত্র আমি দিয়েছি 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইটিতে। তারপর থেকে শহরের মাঝখান দিয়ে রেলপথ প্রস্তুত,

* প্রথম আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার অবলম্বনের জন্য ১৮৭১ সালের আগস্ট মাসে গাস্তাইনে জার্মান ও অস্ট্রীয় সম্রাট ও তাঁদের প্রধান মন্ত্রীদের যে বৈঠক হয়েছিল, এখানে তার উল্লেখ করা হচ্ছে। — সম্পাঃ

নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরী এবং বড় বড় সরকারী ও বেসরকারী অট্টালিকা নির্মাণের ফলে এই পুস্তকে বর্ণিত কয়েকটি জঘন্যতম এলাকা ভাঙা হয়েছে, উন্মুক্ত এবং উন্নীত হয়েছে, কতকগুলি অঞ্চল সম্পূর্ণ উঠেই গিয়েছে; অথচ স্বাস্থ্যবিভাগীয় পুলিশী পরিদর্শনের কাজ আগের চাইতে কঠোরতর হওয়া সত্ত্বেও, অন্যান্য অনেক এলাকা একই রকম থেকে গেছে, এমন কি তাদের অবস্থা হয়েছে আগের চাইতেও জীর্ণতর। পক্ষান্তরে, শহরের বিশাল বিস্তৃতির দরুন — তার লোকসংখ্যা সে সময়ের তুলনায় অর্ধেকেরও বেশী বেড়ে গেছে — তখন পর্যন্ত যে সব এলাকা আলোবাতাসযুক্ত এবং পরিচ্ছন্ন ছিল, সে সব আজ অতীত শহরের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত অংশগুলির মতই ঘিঞ্জি, নোংরা এবং ভিড়াক্রান্ত। মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: আমার বই-এর ৮০ পৃষ্ঠা থেকে সুরু করে আমি ক্ষুদে আয়র্ল্যান্ড নামে পরিচিত, বহু বছর ধরে ম্যান্‌চেস্টারের কলংকস্বরূপ মেড্‌লক নদীর উপত্যকার গভীরে অবস্থিত এক গোছা বাড়ির বর্ণনা দিয়েছিলাম। ক্ষুদে আয়র্ল্যান্ড অনেকদিন হল লোপ পেয়েছে এবং তার জায়গায় এখন উঁচু ভিতের উপর নির্মিত একটি রেলওয়ে স্টেশন বিদ্যমান। বিরাট এক জয় কীর্তির মতো করে বুর্জোয়ারা ক্ষুদে আয়র্ল্যান্ডের সানন্দ এবং চূড়ান্ত অবলুপ্তির কথা গর্বভরে উল্লেখ করত। তারপর গত গ্রীষ্মকালে বিপুল বন্যা এল — আমাদের বড় বড় শহরগুলির তীর বাঁধানো নদীগুলিতে বছরের পর বছর সাধারণত যে ধরনের ক্রমশ ব্যাপকতর বন্যা ঘটে তেমনি, তার কারণ অবশ্য সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। তখন প্রকাশ পেল যে ক্ষুদে আয়র্ল্যান্ড মোটেই লোপ পায়নি; শুধু অক্‌সফোর্ড রোডের দক্ষিণ ধার থেকে উত্তর ধারে উঠে গিয়েছে এবং এখনও তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। ম্যান্‌চেস্টারের র‍্যাডিকাল বুর্জোয়াদের মুখপত্র, ম্যান্‌চেস্টারের *Weekly Times* ১৮৭২ সালের ২০শে জুলাই সংখ্যায় কী বলছে শোনা যাক:

'মেড্‌লকের নিম্ন উপত্যকার অধিবাসীদের গত শনিবার যে দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে, আশা করা যেতে পারে যে তার থেকে **একটা** সুফল ফলবে, অর্থাৎ, আমাদের পৌরশাসন কর্তৃপক্ষ এবং পৌরশাসন স্বাস্থ্য কমিটির নাকের ডগায় স্বাস্থ্যবিধির সকল আইনের প্রতি যে প্রকাশ্য বিদ্রূপকে এতদিন অবধি সেখানে সহ্য করা হয়েছে তার দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। আমাদের গতকালের মধ্যাহ্ন সংস্করণের একটি তীক্ষ্ম প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে (তাও যথেষ্ট জোরের সঙ্গে নয়) যে, চার্ল্‌স স্ট্রীট ও ব্রুক স্ট্রীটের নিকটে যে কয়েকটা তলকুঠরী বাসায় (cellars) বানের জল ঢুকেছিল, সেগুলির অবস্থা কী জঘন্য। প্রবন্ধে উল্লিখিত বাসাগুলির মধ্যে একটিকে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করে দেখার ফলে এদের সম্বন্ধে যে সব উক্তি করা হয়েছিল তার সত্যতা আমরা সমর্থন করতে পারি, ঘোষণা করতেও পারি যে, এই সমস্ত তলকুঠরী বাসগৃহ অনেক আগেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল, অথবা বরং, কোনোদিনই সেখানে মানুষের বসবাস সহ্য করা উচিত হয়নি। চার্ল্‌স স্ট্রীট এবং ব্রুক স্ট্রীটের মোড়ে স্কোয়ার্স্ কোর্ট্ সাতটি কি আটটি বাসাবাড়ি নিয়ে গঠিত। ব্রুক

স্ট্রীটের নিম্নতম ভাগে পর্যন্ত রেলওয়ে পোলের নিচ দিয়ে কোনো পথচারী দিনের পর দিন যাতায়াত করলেও কখনও কল্পনা করতে পারে না যে, তার পায়ের তলায়, অনেক নিচে গুহার মধ্যে জনমানব বাস করে। গোটা কোর্ট্‌টাই জনসাধারণের দৃষ্টির বাইরে লুকিয়ে আছে এবং যারা দারিদ্র্যের পীড়নে এর কবরের নির্জনতায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয় একমাত্র তারাই শুধু এখানে প্রবেশ করে থাকে। দুই দিকে লক্‌ (lock) দিয়ে আটকানো মেড্‌লক নদীর সাধারণত বদ্ধজল যখন নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম নাও করে, তখনও এই বাসাগুলির মেঝে নদীটির উপরিভাগ থেকে কয়েক ইঞ্চির বেশি উঁচু থাকে না। ভালো রকম এক পশলা বৃষ্টি নর্দমা দিয়ে দুর্গন্ধ ও ন্যক্কারজনক জল ঠেলে ওঠাতে পারে, ঘরগুলি মারাত্মক গ্যাসে ভরে দিতে পারে, সব বন্যাই যা স্মৃতিচিহ্ন রূপে রেখে যায় ... বুক স্ট্রীটের বসতিহীন তলকুঠরীগুলির চাইতেও নিম্নতর স্তরে স্কোয়ার্স্‌ কোর্ট্‌ অবস্থিত ... রাস্তার লেভেল থেকেও বিশ ফুট নিচে; শনিবার দিন বিষাক্ত জল ড্রেন দিয়ে ঠেলে উঠে ছাদ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কথাটা জানতাম বলে ভেবেছিলাম যে আমরা জায়গাটা জনহীন দেখব অথবা দেখতে পাব শুধু স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্মচারীদেরই দখলে, যারা দুর্গন্ধময় দেয়াল সাফ করছে ও বাসাগুলিকে সংক্রামনমুক্ত করছেন। তার পরিবর্তে আমরা এক নাপিতের তলকুঠরী বাসায় একজন লোককে দেখতে পেলাম ... সে ব্যস্ত রয়েছে কোণে স্তূপীকৃত পচা আবর্জনা একটা ঠেলাগাড়ীতে তুলতে। নাপিতের ঘর প্রায় সাফ হয়ে এসেছিল; সে আমাদের পাঠিয়ে দিল আরও নিচে কতগুলি বস্তি দেখতে; সে বলল যে যদি সে লিখতে পারত, তাহলে সংবাদপত্রে সব প্রকাশ করে দিয়ে দাবি জানাত যে এগুলি তুলে দেওয়া হোক। এইভাবে শেষ পর্যন্ত স্কোয়ার্স্‌ কোর্টে পৌঁছে আমরা দেখতে পেলাম যে মোটাসোটা স্বাস্থ্যবতী গোছর এক আইরিশ মহিলা কাপড়চোপড় ধোওয়ার গামলা নিয়ে ব্যস্ত। রাতের পাহারাদার তার স্বামী আর সে এক গাদা ছেলেপিলে নিয়ে এই বাসাতে ছয় বছর ধরে বসবাস করছে ... যে বাসা তারা সবে ছেড়ে এসেছে, সেখানে জল প্রায় ছাদ অবধি পৌঁছেছিল, জানালাগুলি ভেঙে গেছে এবং আসবাবপত্র সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। লোকটি বলল যে বাড়ির বাসিন্দা দুই মাস অন্তর অন্তর চুণকাম করে বলেই দুর্গন্ধ অসহ্য হয়ে ওঠেনি ... এরপর ভিতরের মহলে গিয়ে আমাদের সংবাদদাতা তিনটি বাসা দেখতে পেলেন, যাদের পিছনের দেয়াল গিয়ে মিশেছে উপরে বর্ণিত গৃহের পিছনের দেয়ালের সঙ্গে। তিনটি বাসার মধ্যে দুইটিতে মানুষ বাস করছে। সেখানে এতই সাংঘাতিক দুর্গন্ধ যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থতম মানুষেরই নাড়ি উল্টে বমি আসবে ... এই বীভৎস গর্তে বাস করে সাতজনের এক পরিবার; তারা সকলেই বৃহস্পতিবার রাতে (প্রথম যেদিন জল বাড়তে শুরু করে) এখানে ঘুমিয়েছিল। ঘুমিয়ে ছিল কথাটা ঠিক নয়, স্ত্রীলোকটি সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল সংশোধন করে বলল, কেননা সে আর তার স্বামী দারুণ দুর্গন্ধের জন্য রাতের বেশির ভাগ সময় ক্রমাগত বমি করেছিল। শনিবার দিন তারা বুক-সমান-জল ভেঙে ছেলেমেয়েদের বাইরে বয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তাছাড়া স্ত্রীলোকটির মত হল যে এ জায়গা শুকরের বসবাসেরও যোগ্য নয়, কিন্তু ভাড়া অত্যন্ত সস্তা বলেই — সপ্তাহে এক শিলিং ছয় পেন্স্‌ — সে এটা নিয়েছে, কেননা, অসুস্থতার দরুন ইদানীং তার স্বামী প্রায়ই বেকার থাকতে বাধ্য হয়েছে। এই কোর্ট্‌ এবং এর মধ্যে যেন অকালে সমাধিস্থ অধিবাসীদের দেখে দর্শকের মনে এক চূড়ান্ত অসহায়তার মনোভাব জাগে। এইসঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা উচিত যে, আমাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে আমাদের স্বাস্থ্য কমিটি যে বাসস্থানের অস্তিত্ব বজায় রাখার কোন সাফাই দিতে পারে না, স্কোয়ার্স্‌ কোর্ট্‌ আশেপাশের সেই ধরনের আর পাঁচটা বাড়ির নিদর্শন বই কিছু নয়, যদিও হয় ত বা এটি এক চূড়ান্ত নিদর্শন। যদি এমন জায়গায় ভবিষ্যতে

ভাড়াটেদের বসতে দেওয়া হয়, তাহলে কমিটি দায়ী থাকবে, এবং সমগ্র পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে এমন সংক্রামক মহামারীর বিপদের সম্মুখীন করা হবে, যার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা আর আলোচনা করব না।'

বুর্জোয়ারা কার্যক্ষেত্রে কী করে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করে, এই হল তার জ্বলন্ত উদাহরণ। রোগ বিস্তারের ক্ষেত্র, জঘন্য গুহা এবং তলকুঠরী — যার মধ্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি রাতের পর রাত ধরে শ্রমিকদের থাকতে বাধ্য করছে — তার অবলোপ হয় না; শুধু **এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়** তার **স্থানান্তর ঘটে!** যে অর্থনৈতিক আবশ্যিকতায় এদের এক জায়গায় জন্ম, তাই আবার পরবর্তী জায়গাতেও এদের জন্ম দেয়। যতদিন পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি বজায় থাকবে, ততদিন বিচ্ছিন্নভাবে বাস-সংস্থান সমস্যা বা শ্রমিকদের ভাগ্যজড়িত অন্য কোনো সামাজিক সমস্যার সমাধান আশা করা মূর্খতা। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অবসান করে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক জীবিকার উপাদান ও শ্রমের হাতিয়ার সমস্ত দখল করার মধ্যেই সমস্যার সমাধান।

তৃতীয় ভাগ

প্রুধোঁ ও বাস-সংস্থান সমস্যা সম্পর্কে পরিশিষ্ট

১

Volksstaat পত্রিকার ৮৬নং সংখ্যায় এ. ম্যুল্‌বের্গার প্রকাশ করলেন যে, সে পত্রিকার ৫১নং ও পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে আমার দ্বারা সমালোচিত প্রবন্ধগুলির লেখক তিনিই। তিনি তাঁর জবাবে আমাকে ক্রমান্বয়ে এমনই গালাগাল দিয়ে অভিভূত করেছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রশ্নগুলিকেই এতখানি গুলিয়ে ফেলেছেন যে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আমি তাঁর উত্তর দিতে বাধ্য হচ্ছি। আমার আফশোষ এই যে ম্যুল্‌বের্গার স্বয়ং আমাকে বহুল পরিমাণে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করেছেন, তাসত্ত্বেও আমি আমার জবাবটাকে সাধারণের কাছে আকর্ষক করতে চেষ্টা করব আরেকবার এবং সম্ভবপর হলে আগের চাইতে আরও পরিষ্কার করে মূলকথাগুলি উপস্থিত করে, যদিও আশংকা আছে যে ম্যুল্‌বের্গার আরেকবার বলবেন যে, এই সবের মধ্যে 'তাঁর বা *Volksstaat*-এর অন্যান্য পাঠকদের পক্ষে মূলত নতুন কিছুই নেই।'

ম্যুল্‌বের্গার আমার সমালোচনার ধরন ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন। ধরন সম্পর্কে এটুকু জবাব দিলেই যথেষ্ট হবে যে, সে সময়ে আলোচ্য প্রবন্ধগুলি কে লিখেছেন, তা পর্যন্ত আমি জানতাম না। সুতরাং প্রবন্ধগুলির লেখক সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যক্তিগত 'বিদ্বেষের' প্রশ্ন উঠতেই পারে না; প্রবন্ধগুলিতে বাস-সংস্থান সমস্যার যে সমাধান দেওয়া হয়েছে, সে সম্বন্ধে অবশ্য আমি 'বিদ্বেষভাবাপন্ন' ছিলাম, এই দিক থেকে যে বহুপূর্বে প্রুধোঁর মারফৎ সে সমাধানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এ বিষয়ে দৃঢ় অভিমত গঠন করে ফেলেছিলাম।

আমার সমালোচনার 'সুর' সম্বন্ধে বন্ধুবর ম্যুল্‌বের্গারের সঙ্গে আমি কলহ করতে চাই না। আমি যতদিন হল আন্দোলনে আছি, ততদিন থাকলে আক্রমণের বিরুদ্ধে চামড়া মোটা হয়ে যায়; সুতরাং সহজেই অন্যদেরও তাই হয়ে থাকবে বলে ধরা যায়।

ম্যুল্‌বের্গারের ক্ষতিপূরণ করবার জন্য আমি এবার আমার সুরকে তাঁর চামড়ার স্পর্শকাতরতার সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে আনবার চেষ্টা করব।

ম্যুল্‌বের্গার বিশেষ তিক্ততার সঙ্গে অভিযোগ করেছেন যে আমি তাঁকে প্রুধোঁপন্থী বলেছি এবং তিনি তার প্রতিবাদে জানাচ্ছেন যে তিনি তা নন। স্বভাবতই তাঁকে আমার বিশ্বাস করা উচিত, কিন্তু তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধাবলী থেকে — এবং শুধু প্রবন্ধগুলি নিয়েই আমার কারবার — প্রমাণ সংগ্রহ করে দেখাব যে তাতে নির্জলা প্রুধোঁবাদ ছাড়া আর কিছুই নেই।

অবশ্য ম্যুল্‌বের্গারের মতে আমি প্রুধোঁকেও 'হাল্কাভাবে' সমালোচনা করেছি, তাঁর প্রতি গুরুতর অবিচার করেছি। 'পেটি বুর্জোয়া প্রুধোঁর তত্ত্ব জার্মানিতে একটা আপ্তবাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; তাঁর এক লাইনও পড়েনি, এমনও অনেকে তা প্রচার করে থাকে।' আমি যে আফশোষ করেছিলাম যে গত কুড়ি বছর যাবৎ রোমান্স্‌-ভাষাভাষী শ্রমিকদের প্রুধোঁর রচনা ছাড়া অন্য কোন মানসিক খাদ্য জোটেনি, ম্যুল্‌বের্গার তারই জবাবে বলছেন যে, ল্যাটিন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে 'প্রুধোঁ কর্তৃক সূত্রায়িত নীতিই প্রায় সর্বত্র আন্দোলনের চালিকা শক্তি।' আমাকে এ কথার প্রতিবাদ করতেই হবে। সর্বপ্রথম, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের 'চালিকা শক্তি' কোনক্ষেত্রেই 'নীতির' মধ্যে নিহিত নয়; তা সর্বত্রই বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশ ও তার ফলাফল, একদিকে পুঁজি ও অপরদিকে প্রলেতারিয়েতের সঞ্চয় ও কেন্দ্রীভবনের মধ্যে নিহিত। দ্বিতীয়ত, ল্যাটিন দেশগুলিতে প্রুধোঁবাদী তথাকথিত 'নীতি'র উপর ম্যুল্‌বের্গার যে নির্ধারক ভূমিকা আরোপ করেছেন, 'নৈরাজ্যবাদ, অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের সংগঠন, সামাজিক বিলোপ ইত্যাদি যে নীতিসমূহ বিপ্লবী আন্দোলনের সত্যকারের বাহক হয়ে উঠেছে' এমন কথা বলাও সঠিক নয়। প্রুধোঁবাদী সর্বরোগহরণ বাকুনিনের হাতে আরো বিকৃত হয়ে ওঠা আকারে যেখানে খানিকটা প্রভাব অর্জন করেছিল সেই স্পেন ও ইতালির কথা ছেড়ে দিলেও, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে যার কিছু জ্ঞান আছে তারই এ কথা জানা আছে যে, ফ্রান্সে প্রুধোঁপন্থীরা সংখ্যার দিক থেকে নগণ্য গোষ্ঠী মাত্র; সামাজিক বিলোপ এবং অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের সংগঠন — এই শিরোনামা দিয়ে প্রুধোঁ সমাজ সংস্কারের যে পরিকল্পনা রচনা করেছেন, ফ্রান্সের ব্যাপক শ্রমিক শ্রেণী তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। অন্যান্য প্রমাণ ছাড়াও তার একটা প্রমাণ কমিউন। যদিও কমিউনে প্রুধোঁপন্থীদের শক্তিশালী প্রতিনিধিদল ছিল, তবুও প্রুধোঁর প্রস্তাবানুযায়ী পুরানো সমাজের অবলোপ অথবা অর্থনৈতিক শক্তি সংগঠনের কোনই প্রচেষ্টা হয়নি। পক্ষান্তরে, এটা কমিউনের পরম গৌরবের কথা যে তার সর্ববিবিধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পিছনে 'চালিকা শক্তি' হিসাবে কোনো 'নীতি'র তালিকা ছিল না, ছিল সোজাসুজি ব্যবহারিক প্রয়োজন। আর সেইজন্যই রুটির দোকানে রাতের কাজ

নিষেধ, কারখানায় অর্থ জরিমানা বন্ধ, তালাবন্ধ ফ্যাক্টরি ও কারখানা বাজেয়াপ্ত করে শ্রমিক সঙ্ঘের হাতে অর্পণ ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলি মোটেই প্রুধোঁবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী হয়নি, হয়েছিল নিশ্চিতই জার্মান বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারার অনুসরণে। একটিমাত্র সামাজিক ব্যবস্থা প্রুধোঁপন্থীরা গ্রহণ করিয়েছিল, ব্যাংক অফ ফ্রান্স বাজেয়াপ্ত **না** করার সিদ্ধান্ত, এবং সেটাই কমিউনের পতনের জন্য অংশত দায়ী। একইভাবে, তথাকথিত ব্লাঙ্কিপন্থীরাও যখন নিছক রাজনৈতিক বিপ্লবী থেকে নিজেদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী সম্বলিত সমাজতন্ত্রী শ্রমিক উপদলে পরিণত করার চেষ্টা করল — 'আন্তর্জাতিক এবং বিপ্লব'* নামক ইশ্‌তেহারে লন্ডনে ব্লাঙ্কিবাদী পলাতকগণ যে চেষ্টা করে, তখনও তারা সমাজ বাঁচাবার জন্য প্রুধোঁবাদী পরিকল্পনার 'নীতি' প্রচার করেনি, তারা গ্রহণ করল, আর তাও প্রায় আক্ষরিকভাবেই, প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং শ্রেণীসমূহের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেরও বিলোপে পেঁছিবার জন্য প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জার্মান সমাজতন্ত্রের অভিমত, যে অভিমত 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারে' ও তারপরেও অসংখ্য উপলক্ষে ব্যক্ত হয়েছে। প্রুধোঁর প্রতি জার্মানদের তাচ্ছিল্য থেকে ম্যুল্‌বের্গার যদি এই সিদ্ধান্তও টানেন যে, 'প্যারিস কমিউন সমেত' ল্যাটিন দেশগুলির আন্দোলন সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির অভাব আছে, তাহলে তিনি এই অভাবের প্রমাণ হিসাবে আমাদের বলুন যে, ল্যাটিন পক্ষ থেকে কোন্ রচনাটিতে জার্মান মার্ক্‌সের লেখা — ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের ভাষণের মতো প্রায় ততটা সঠিকভাবে কমিউনকে উপলব্ধি এবং বর্ণনা করা হয়েছে।

একটিইমাত্র দেশ আছে যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন সরাসরি প্রুধোঁবাদী 'নীতি'র প্রভাবাধীন — তা হল বেলজিয়াম এবং ঠিক তারই ফলস্বরূপ, হেগেলের ভাষায় বলতে গেলে বেলজিয়ান আন্দোলন 'শূন্য থেকে উঠে শূন্য মারফৎ গিয়ে শূন্যে' পরিণত হচ্ছে।

গত বিশ বছর ধরে ল্যাটিন দেশগুলির শ্রমিকেরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শুধু প্রুধোঁ থেকে তাদের মানসিক খাদ্য সংগ্রহ করেছে, তা আমি দুর্ভাগ্য বিবেচনা করি বলাতে ম্যুল্‌বের্গার যাকে 'নীতি' বলে আখ্যা দেন প্রুধোঁর সেই সংস্কার দাওয়াইয়ের একান্ত কাল্পনিক আধিপত্য বোঝাইনি, বোঝাই এই যে, বর্তমান সমাজ সম্বন্ধে তাদের অর্থনৈতিক সমালোচনা পুরোপুরি ভ্রান্ত প্রুধোঁবাদী বুলি দ্বারা কলুষিত হয়েছিল

* এঙ্গেলস এই ইশ্‌তেহারের বিশ্লেষণ করেছিলেন 'কমিউনের ব্লাঙ্কিবাদী পলাতকদের কর্মসূচী' প্রবন্ধে (Programm der blanquistischen Kommune Flüchtlinge), Internationales aus dem Volksstaat, S. 40-46, Berlin, 1894. — সম্পাঃ

এবং তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রুধোঁবাদী প্রভাব দ্বারা ভণ্ডুল হত। এইভাবে 'ল্যাটিন দেশের প্রুধোঁপ্রভাবিত শ্রমিকেরা' জার্মান শ্রমিকদের চাইতে 'বেশী পরিমাণে বিপ্লবে অবস্থিত' কিনা — সে জার্মান শ্রমিকেরা অন্তত ল্যাটিনেরা তাদের প্রুধোঁকে যতটা বোঝে, তার চাইতে ঢের বেশী ভাল করে বিজ্ঞানসম্মত জার্মান সমাজবাদ বোঝে, — সেই প্রশ্নের আমরা তখনই জবাব দিতে পারব যখন আমরা বুঝতে পারব 'বিপ্লবে **অবস্থিত হওয়া**' কথাটার আসল অর্থ কী। 'খ্রীষ্ট ধর্মে, সত্যকারের বিশ্বাসে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে ইত্যাদিতে' 'অবস্থানের' কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উগ্রতম আন্দোলন, বিপ্লবে 'অবস্থান করা'? 'বিপ্লব'ও কি তাহলে এক আপ্তবাক্যের ধর্ম মাত্র, যাতে বিশ্বাস রাখতে হবে?

তাছাড়া ম্যুলবের্গার আমাকে এজন্যও ভর্ৎসনা করেছেন যে, তাঁর প্রবন্ধাবলীর সুস্পষ্ট ভাষা উপেক্ষা করে আমি এই উক্তি করেছি যে তিনি বাস-সংস্থান সমস্যাকে শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা বলে জাহির করেছেন।

এইবার ম্যুলবের্গার সত্যই সঠিক কথা বলেছেন। উক্ত অংশটি আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। দৃষ্টি এড়ানোটা আমার অমার্জনীয় দোষ, কেননা এটি তাঁর প্রবন্ধের সামগ্রিক প্রবণতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যসূচক। ম্যুলবের্গার সত্যসত্যই সোজাসুজিভাবেই লিখেছেন:

> 'আমরা বারে বারে ও ব্যাপকভাবে **শ্রেণীনীতি** অনুসরণ করি, **শ্রেণী আধিপত্যের** প্রচেষ্টা করি প্রভৃতি **আজগুবি** অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছি বলে আমরা সর্বপ্রথমে এবং সুস্পষ্টভাবে জোর দিয়ে বলতে চাই যে, বাস-সংস্থান সমস্যা কোনক্রমেই এমন একটি সমস্যা নয়, যেটি শুধু প্রলেতারিয়েতকে স্পর্শ করে; **পরন্তু** এটি এমন এক সমস্যা যা **বিপুল পরিমাণে** ছোট ব্যবসায়ী, পেটি বুর্জোয়া, সমগ্র আমলাতন্ত্র সহ **খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও** স্বার্থসংশ্লিষ্ট ... বাস-সংস্থান সমস্যা সমাজ-সংস্কারের এমনই এক বিষয় যা অন্য যে কোন বিষয় থেকে বেশী পরিমাণে, একদিকে প্রলেতারিয়েতের এবং অন্যদিকে সমাজের **খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির স্বার্থের মধ্যে অন্তর্নিহিত পরম একাত্মতা** প্রকাশ করার উপযোগী বলে মনে হয়। ভাড়াটে বাড়ির শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি প্রলেতারিয়েতের সমপরিমাণে, **হয়ত বা** তার চাইতে **বেশীই**, ক্লিষ্ট হয়... আজকের দিনে সমাজের খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি এই প্রশ্নের সম্মুখীন — নবীন, শক্তিশালী এবং উৎসাহী শ্রমিক পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে, তারা... সমাজের রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করার মত ... শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে কিনা যে রূপান্তরণের **আশীর্বাদ সর্বোপরি তারাই ভোগ করবে।**'

সুতরাং বন্ধুবর ম্যুলবের্গার এখানে এই কথা বলছেন:

১। 'আমরা' কোনো 'শ্রেণী-নীতি' অনুসরণ করি না এবং 'শ্রেণী-আধিপত্যের' চেষ্টা করি না। অথচ জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি নিছক **শ্রমিকদের পার্টি বলেই**, অনিবার্যভাবেই 'শ্রেণী-নীতি', শ্রমিক শ্রেণীর নীতি অনুসরণ করে।

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক পার্টিই যেমন রাষ্ট্রের মধ্যে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টিও তেমনই অনিবার্যভাবেই **তার** শাসন, শ্রমিক শ্রেণীর শাসন, তথা 'শ্রেণী-আধিপত্য' কায়েম করতে সচেষ্ট। তাছাড়া, ইংরেজ চার্টিস্টদের থেকে শুরু করে, **প্রত্যেকটি** সাচ্চা প্রলেতারীয় পার্টিই শ্রেণী-নীতি, প্রলেতারিয়েতের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে সংগঠনের কথা পেশ করেছে সংগ্রামের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে এবং সংগ্রামের আশু লক্ষ্য হিসাবে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রস্তাব করেছে। এই নীতিকে 'আজগুবি' বলে ঘোষণা করে মুল্‌বের্গার প্রলেতারিয়েত আন্দোলনের বাইরে এবং পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের শিবিরে নিজের স্থান করে নিচ্ছেন।

২। বাস-সংস্থান সমস্যার একটা সুবিধা হল এই যে, এটা নিছক শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা নয়; পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীরও এতে 'বিপুল স্বার্থ' এইজন্য যে 'খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী'ও শ্রমিক শ্রেণীর 'সমপরিমাণে, হয়ত বা তার চাইতে বেশীই' এই সমস্যা থেকে ভোগে। যিনি এ কথা বলেন যে, কোন একটি দিক থেকেও পেটি বুর্জোয়া 'হয়ত বা প্রলেতারিয়েতের চাইতেও' বেশী দুর্দশা ভোগ করে, তাঁকে যদি পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীদের অন্যতম বলে গণ্য করা হয় তাহলে তিনি নিশ্চয় অভিযোগ করতে পারেন না। মুল্‌বের্গারের কি তাহলে অভিযোগের কোন ভিত্তি থাকে, যখন আমি বলি:

'শ্রমিক শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর, বিশেষ করে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সমভাবে যেসব দুর্দশা ভোগ করে, পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র, প্রুধোঁ যার অন্তর্গত, প্রধানত ঠিক সেই সকল দুঃখদুর্দশা নিয়ে ব্যাপৃত থাকাটাই পছন্দ করে। তাই আমাদের জার্মান প্রুধোঁপন্থীটি যে বাস-সংস্থান সমস্যাটিই প্রধানত আঁকড়ে ধরেছেন তা মোটেই আকস্মিক নয়; এই সমস্যাটি যে কোনক্রমেই শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা নয়, তা আমরা দেখেছি।'

৩। 'সমাজের খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর' স্বার্থ এবং প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের মধ্যে 'অন্তর্নিহিত পরম একাত্মতা' আছে এবং সমাজের রূপান্তরের আগামী প্রক্রিয়ার 'আশীর্বাদ' প্রলেতারিয়েত নয় সর্বোপরি ভোগ করবে এই খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলিই।

সুতরাং শ্রমিকেরা আগামী সমাজ-বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছে 'সর্বোপরি' পেটি বুর্জোয়াদেরই স্বার্থে। অধিকন্তু পেটি বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের মধ্যে পরম অন্তর্নিহিত একাত্মতা আছে। যদি শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে পেটি বুর্জোয়ার স্বার্থের অন্তর্নিহিত একাত্মতা থেকে থাকে, তবে পেটি বুর্জোয়ার স্বার্থের সঙ্গেও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের অন্তর্নিহিত একাত্মতা আছে। তাহলে, শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির

মতো পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিরও সমানই অধিকার রয়েছে আন্দোলনের মধ্যে বিদ্যমান থাকার; আর এই সমানাধিকারের ঘোষণাকেই পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র বলে।

সুতরাং এটা সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ যে, স্বতন্ত্রভাবে পুনর্মুদ্রিত পুস্তিকার ২৫ পৃষ্ঠায় ম্যুল্‌বেৰ্গার 'সমাজের আসল **স্তম্ভ**' বলে 'ক্ষুদে শিল্পের' মহিমা গান করেছেন, 'কেননা, তা তার প্রকৃতি অনুসারেই তার মধ্যে তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটায়: শ্রম — অর্জন — মালিকানা; এবং এই তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণে ক্ষুদে শিল্প ব্যক্তির বিকাশের ক্ষমতাকে সীমিত করে না।' তিনি স্বভাবতই আধুনিক শিল্পের প্রতি এই কারণে বিশেষ করে দোষারোপ করেন যে তা স্বাভাবিক মানুষ সৃষ্টির এই আঁতুড় ঘরটিকে ধ্বংস করছে এবং 'যে অনবরত নিজেকে পুনরুৎপাদিত করছে এমনই এক প্রাণবান **শ্রেণীর** মধ্য থেকে এমনই এক অচেতন মনুষ্য **স্তূপ** সৃষ্টি করে চলেছে যারা নিজেরাই জানে না তাদের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি কোন দিকে ফেরাবে।' সুতরাং পেটি বুর্জোয়া হল ম্যুল্‌বেৰ্গারের আদর্শ মানুষ এবং ক্ষুদে শিল্পই হচ্ছে তাঁর আদর্শ উৎপাদন-পদ্ধতি। তাহলে তাঁকে পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীদের শ্রেণীভুক্ত করে কি আমি তাঁর মানহানি করলাম?

ম্যুল্‌বেৰ্গার প্রুধোঁ সম্বন্ধে সকল দায়িত্ব বর্জন করেছেন বলে প্রুধোঁর সংস্কার পরিকল্পনার লক্ষ্য যে সমাজের সকল সদস্যকে পেটি বুর্জোয়া ও ক্ষুদে কৃষকে রূপান্তরিত করা, তা এখানে অধিক আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে। পেটি বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের স্বার্থের মধ্যে তথাকথিত একাত্মতা নিয়ে আলোচনাটাও সমভাবেই অপ্রয়োজনীয়। যতটুকু প্রয়োজন, তা 'কমিউনিস্ট ইশতেহারেই' পাওয়া যাবে (লাইপজিগ সংস্করণ, ১৮৭২, ১২ এবং ২১ পৃষ্ঠা)।*

আমাদের এই পর্যালোচনার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি 'পেটি বুর্জোয়া প্রুধোঁর উপকথার' পাশাপাশি পেটি বুর্জোয়া ম্যুল্‌বেৰ্গারের বাস্তব আবির্ভাব।

২

এইবার আমরা একটি প্রধান প্রশ্নে আসছি। ম্যুল্‌বেৰ্গারের প্রবন্ধাবলীতে প্রুধোঁর কায়দায় অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আইনী পরিভাষায় তর্জমা করে তা বিকৃত করা হয়েছে বলে আমি অভিযোগ করেছিলাম। তার উদাহরণ হিসাবে আমি বেছেছিলাম ম্যুল্‌বেৰ্গারের নিম্নলিখিত উক্তিটি:

* প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশের ৩৫, ৩৬, ৪৮, ৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

'ভাড়া হিসাবে বাড়িটির প্রকৃত মূল্যে পর্যাপ্ত পরিমাণেরও বেশী করে মালিককে অনেক আগেই পরিশোধ করে দেওয়া সত্ত্বেও, একবার তৈরী হয়ে যাবার পর থেকে সে বাড়ি সামাজিক শ্রমের একটা নির্দিষ্ট ভগ্নাংশের উপর **চিরস্থায়ী আইনী স্বত্ব** হিসাবে কাজ করে। **এই ভাবেই** যে বাড়ি, ধরা যাক নির্মিত হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে, তা এই সময়ের মধ্যে ভাড়ার আয়ের মারফৎ তার আদি নির্মাণ ব্যয়ের দ্বিগুণ, তিনগুণ, পাঁচগুণ, দশগুণ, এমন কি তারও বেশী উশুল করে নিয়েছে।'

মুলবের্গার এখন অভিযোগ করে বলছেন:

'**বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে** এই **সরল সংযত বিবরণে** এঙ্গেলস আমাকে এই জ্ঞানদানে প্রবৃত্ত হয়েছেন যে বাড়িটি **কী করে** 'আইনী স্বত্বে' পরিণত হল, তা আমার ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল — যে কাজটি আমার কর্তব্যের চৌহদ্দির সম্পূর্ণ বাইরে ... **বর্ণনা দেওয়া** এক কথা, **ব্যাখ্যা করা** আর এক কথা। আমি যখন প্রুধোঁর কথা মতোই বলি যে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবন **অধিকারের ধারণা** দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়া উচিত, তখন আমি বর্তমান সমাজকে এইভাবে **বর্ণনা করছি** যে, এর মধ্যে সর্বপ্রকার অধিকারের ধারণাই অনুপস্থিত তা নয়, কিন্তু **বিপ্লবের অধিকারের ধারণা** অনুপস্থিত: এই সত্য স্বয়ং এঙ্গেলসও স্বীকার করবেন।'

এই মুহূর্তের মতন আমাদের আলোচনাকে একটি তৈরী বাড়ি সম্পর্কেই সীমিত রাখা যাক। ভাড়া দেবার পর থেকে বাড়িটি তার নির্মাতাকে ভূমি-খাজনা, মেরামতি ব্যয়, বাড়ি তৈরীতে নিয়োজিত পুঁজির উপরে সুদ, এবং তার উপরে মুনাফা হিসাবে ভাড়া জুগিয়ে চলে; আর অবস্থাবিশেষে এই ভাড়া ক্রমশ আদায় হতে হতে আদি ব্যয় মূল্যের দ্বিগুণ, তিনগুণ, পাঁচগুণ, এমন কি দশগুণে দাঁড়াতে পারে। বন্ধুবর মুলবের্গার, এই হল 'বাস্তব ঘটনার', একটা **অর্থনৈতিক** বাস্তব ঘটনার 'সরল সংযত বিবরণ'; এই বাস্তব ঘটনার অস্তিত্ব 'কী করে' সম্ভব হল, তা যদি আমরা জানতে চাই, তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই আমাদের অনুসন্ধান চালাতে হবে। যাতে কোন শিশুর পর্যন্ত ব্যাপারটা ভুল বোঝবার অবকাশ না থাকে, তার জন্য তাই এই সম্পর্কে আর একটু গভীরভাবে বিচার করা যাক। একথা সুবিদিত যে, পণ্য বিক্রয় ঘটনাটা হচ্ছে পণ্যের অধিকারী কর্তৃক তার ব্যবহার-মূল্য পরিত্যাগ করে বিনিময়-মূল্য গ্রহণ। বিভিন্ন পণ্যের ব্যবহার-মূল্যের মধ্যেকার অনেকরকম তফাতের মধ্যে একটি হল এই যে, বিভিন্ন পণ্য ভোগ করতে বিভিন্ন মেয়াদের সময় লাগে। একটি পাঁউরুটি একদিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়; একজোড়া পাৎলুন জীর্ণ হতে একবছর লাগে; আর একটি বাড়ির আয়ুষ্কাল, ধরুন, একশো বছর। সুতরাং স্থিতিশীল পণ্যের ক্ষেত্রে তার ব্যবহার-মূল্যকে টুকরো টুকরো করে, প্রতিবারই কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রয় করার সম্ভাবনার উদ্ভব হয়, অর্থাৎ কিনা, তা **ভাড়া দিতে** পারা যায়। তাই এই টুকরো টুকরো করে বিক্রয় করায় বিনিময়-মূল্য পরিশোধ হয় ক্রমিক ধারায়। নিয়োজিত পুঁজি এবং তা থেকে উদ্ভূত

মুনাফা অবিলম্বেই পরিশোধের দাবি পরিত্যাগ করার ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিক্রেতা বর্ধিত মূল্যে পায়, সুদ পায়, যার হার নির্ধারিত হয় অর্থশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, খেয়ালখুশি মত নয়। একশো বছর পরে বাড়িটির ব্যবহার শেষ হয়ে গিয়ে সেটা জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে, বসবাসযোগ্য আর থাকে না। বাড়ির জন্য প্রাপ্ত ভাড়া থেকে তাহলে আমরা যদি ১। আলোচ্য সময়ের মধ্যে তার যে-কোনো সম্ভব বৃদ্ধি সমেত ভূমি-খাজনা, এবং ২। চলতি মেরামতির জন্য ব্যয়িত অর্থ বাদ দিই, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, অবশিষ্টের মধ্যে গড়ে থাকছে: ১। বাড়িটির পিছনে গোড়াতে নিয়োজিত পুঁজি; ২। তার উপরে মুনাফা; এবং ৩। ক্রমশ উশুলযোগ্য পুঁজি ও মুনাফার উপরে সুদ। এখন একথা সত্য যে, এই সময় উত্তীর্ণ হবার পরে ভাড়াটে বাড়িটা পাচ্ছে না, কিন্তু বাড়িওয়ালারও তা থাকছে না। শেষোক্ত জনের শুধু জমি (যদি সেটা তারই সম্পত্তি থেকে থাকে) এবং নির্মাণের মালমসলা থাকবে, কিন্তু তা তো আর বাড়ি নয়। এই সময়ের মধ্যে যদি বাড়ি থেকে 'আদি ব্যয়মূল্যের পাঁচ দশগুণ পরিমাণ' অর্থ উশুল হয়ে থাকে, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, তা হয়েছে শুধুমাত্র ভূমি-খাজনা বৃদ্ধির দরুন। লণ্ডনের মত যেসব মহানগরীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমির ও বাড়ির মালিক দুই ভিন্ন ব্যক্তি, সেখানে একথা কারও অজানা নয়। এই ধরনের দারুণ ভাড়া বৃদ্ধি দ্রুত বর্ধনশীল শহরগুলিতেই ঘটে থাকে; কৃষিজীবী পল্লীতে ঘটে না, যেখানে গৃহনির্মাণের জমির ভূমি-খাজনা কার্যত অপরিবর্তিতই থাকে। আসলে এ সত্য সকলেরই জানা যে, ভূমি-খাজনা বৃদ্ধির কথা বাদ দিলে বাড়িভাড়া থেকে (মুনাফা সমেত) নিয়োজিত পুঁজির উপর বার্ষিক গড়পড়তা শতকরা সাত ভাগের বেশী আয় বাড়িওয়ালার জন্যে আসে না, এবং এই টাকা থেকেও মেরামত ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বাড়িভাড়ার চুক্তি সম্পূর্ণ মামুলী এক পণ্য-বিনিময়ের ব্যাপার, তত্ত্বগতভাবে শ্রমিকের পক্ষে যার তাৎপর্য অন্য কোন পণ্য-বিনিময় অপেক্ষা বেশীও নয়, কমও নয় --- ব্যতিক্রম হল শ্রমশক্তির ক্রয়বিক্রয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পণ্য-বিনিময়; যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাড়িভাড়া চুক্তির সময়ে শ্রমিকদের বুর্জোয়াদের হাজারো প্রতারণাপদ্ধতির মধ্যেই একটির শিকার হতে হয়। এ সম্বন্ধে আমি স্বতন্ত্রভাবে পুনর্মুদ্রিত পুস্তিকার ৪ পৃষ্ঠায়* আলোচনা করেছি। কিন্তু এটাও যে অর্থনৈতিক নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন, সেকথা আমি ওখানে আলোচনা করেছি।

পক্ষান্তরে, মুল্‌বের্গারের মতে বাড়িভাড়ার চুক্তি পুরোপুরি 'খেয়ালখুসি' ছাড়া আর কিছুই নয় (স্বতন্ত্রভাবে পুনর্মুদ্রিত পুস্তিকার ১৯ পৃষ্ঠা) এবং আমি যদি তাঁর

* এই পুস্তকের ২২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

বক্তব্যের উল্টো কথা প্রমাণ করে দিই, তাহলে তিনি অভিযোগ করেন যে, 'আফসোসের ব্যাপার এই যে তাঁর জানা কথাই শুধু' তাঁকে আমি বলছি।

তবু বাড়িভাড়ার ব্যাপারে যতই অর্থনৈতিক গবেষণা করা হোক না কেন, তা দিয়ে ভাড়াটে বাড়ির অবলুপ্তিকে 'বিপ্লবী ধারণার গর্ভে জাত সর্বাধিক ফলপ্রসূ এবং গৌরবময় আকাঙ্খার মধ্যে অন্যতমে' পরিণত করতে আমরা সক্ষম হব না। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে সংযত অর্থশাস্ত্রের সরল তথ্যকে চালান দিতে হবে আইনশাস্ত্রের বাস্তবিকই অনেক বেশী মতাদর্শমূলক ক্ষেত্রে। বাড়িভাড়ার ক্ষেত্রে 'বাড়িটি কায়েমী আইনী স্বত্বের কাজ করে', এবং **'এইভাবে** সম্ভব হয়' যে ভাড়া হিসাবে বাড়ির মূল্য দুই, তিন, পাঁচ বা দশগুণ পরিশোধিত হতে পারে। সত্যিই কী করে এটা 'সম্ভব হয়' সেকথা আবিষ্কার করার ব্যাপারে 'আইনী স্বত্ব' আমাদের বিন্দুমাত্রও সাহায্য করে না। সেইজন্য আমি বলেছিলাম যে, বাড়িটি কী করে আইনী স্বত্ব পায়, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলেই মুলবের্গার উপলব্ধি করতে পারতেন আসলে **কী করে** এটা 'সম্ভব হয়'। শাসক শ্রেণী যে আইনী পরিভাষা দিয়ে বাড়িভাড়াকে অনুমোদন করে, তা নিয়ে ঝগড়া করার পরিবর্তে, আমার মতো বাড়িভাড়ার **অর্থনৈতিক** স্বরূপের অনুসন্ধান করেই মাত্র আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি। কেউ যদি বাড়িভাড়া লোপ করার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করে, তাহলে এটা 'পুঁজির কায়েমী স্বত্বের প্রতি ভাড়াটের সেলামী', বাড়িভাড়া সম্বন্ধে এইটুকুর চাইতে তাকে বেশী জানতে হবে। এর জবাবে মুলবের্গার বলেন যে, 'বর্ণনা দেওয়া এক কথা, ব্যাখ্যা করা আর এক কথা!'

বাড়ি যদিও মোটেই কায়েমী নয়, তবু তাকে বাড়িভাড়া পাওয়ার কায়েমী আইনী স্বত্বে আমরা রূপান্তরিত করে ফেললাম। দেখলাম, যেভাবেই এটা 'সম্ভব হয়' না কেন, এই আইনী স্বত্বের জোরে বাড়িখানা ভাড়া হিসাবে তার আদি মূল্যের কয়েকগুণ অর্থ আমদানি করে। আইনের ভাষায় তর্জমার ফলে আমরা সৌভাগ্যক্রমে অর্থতত্ত্ব থেকে এতখানি দূরে সরে এলাম যে, মোট ভাড়া হিসাবে ক্রমে ক্রমে বাড়িখানার কয়েকগুণ দাম ফেরৎ পাওয়া যেতে পারে, এই ঘটনার চাইতে বেশী কিছু আমরা এখন আর দেখতে পাব না। যেহেতু আমরা এখন আইনের ভাষায় চিন্তা করছি এবং কথা বলছি, তাই এই ঘটনাটিকে আমরা অধিকারের এবং ন্যায়ের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করে দেখতে পাব, যে তা **অন্যায়,** তা 'বিপ্লবের অধিকার সম্বন্ধে ধারণার' সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা সে বস্তুটি যাই হোক না কেন; সুতরাং এই আইনী স্বত্বটা কোনো কাজের নয়। আমরা আরও দেখতে পাই যে, এ কথা সুদভোগী পুঁজি এবং ইজারাকৃত কৃষি-জমি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য; সুতরাং এই ধরনের সম্পত্তিকে অন্যান্য রকম সম্পত্তি থেকে পৃথক করে এদের প্রতি ব্যতিক্রমী বিচারের অজুহাতও পাওয়া গেল। তা দাঁড়াল এইসব দাবিতে: ১। ঘর

ছেড়ে দেবার নোটিস দেবার অধিকার থেকে, সম্পত্তি প্রত্যর্পণের দাবি করার অধিকার থেকে মালিককে বঞ্চিত করা; ২। ইজারাদার, অধমর্ণ বা ভাড়াটেকে তার কাছে হস্তান্তরিত অথচ তার সম্পত্তি নয় এমন সামগ্রী বিনামূল্যে ভোগ করার অধিকার দেওয়া; এবং ৩। মালিককে দীর্ঘদিন ধরে কিস্তিবন্দী হারে বিনাসুদে তার প্রাপ্য শোধ করে দেওয়া। তাতে করে প্রুধোঁবাদী 'নীতিসমূহের' তালিকা এইখানেই শেষ। এটাই হল অবশ্য প্রুধোঁর 'সামাজিক বিলুপ্তিকরণ'।

প্রসঙ্গত, এ কথা স্পষ্ট যে, এই সমগ্র সংস্কার পরিকল্পনার লক্ষ্য হল মোটামুটি শুধুমাত্র পেটি বুর্জোয়া ও ক্ষুদে কৃষকদেরই উপকার, কেননা এতে পেটি বুর্জোয়া ও ক্ষুদে কৃষক হিসাবেই তাদের অবস্থিতি **সংহত হয়**। এর ফলে, ম্যুল্‌বের্গারের মতে যিনি কিংবদন্তীর ব্যক্তি মাত্র, 'সেই পেটি বুর্জোয়া প্রুধোঁ' সহসা এখানে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঐতিহাসিক অস্তিত্ব গ্রহণ করছেন।

ম্যুল্‌বের্গার অতঃপর বলছেন:

'আমি যখন প্রুধোঁর কথা মতোই বলি যে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবন **অধিকারের ধারণা দ্বারা** ব্যাপ্ত হওয়া উচিত, তখন আমি বর্তমান সমাজকে এইভাবে **বর্ণনা করছি** যে, এর মধ্যে সর্বপ্রকার অধিকারের ধারণাই অনুপস্থিত তা নয়, কিন্তু বিপ্লবের অধিকার সম্বন্ধে ধারণা অনুপস্থিত; এই সত্য স্বয়ং এঙ্গেলসও স্বীকার করবেন।'

দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি ম্যুল্‌বের্গারের প্রতি এই অনুগ্রহটুকু করতে অক্ষম। ম্যুল্‌বের্গারের দাবি এই যে অধিকারের ধারণা দ্বারা সমাজের পরিব্যাপ্ত **হওয়া উচিত,** এবং তিনি তাকে বর্ণনা বলে অভিহিত করছেন। আদালত থেকে যদি ঋণ শোধ করার দাবিসহ সমন দিয়ে আমার কাছে পেয়াদা পাঠান হয়, তাহলে ম্যুল্‌বের্গারের মতে সেটা এই **বর্ণনার** চেয়ে বেশী কিছু নয় যে, আমি এমন এক ব্যক্তি যে তার ঋণশোধ করে না! বর্ণনা এক কথা, আর উদ্ধত দাবি আর এক কথা। ঠিক এর মধ্যেই রয়েছে জার্মান বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র ও প্রুধোঁর ভিতর তফাৎ। আমরা অর্থনৈতিক সম্পর্ককে সেটা ঠিক যা এবং যেভাবে বিকশিত হচ্ছে, সেইভাবেই বর্ণনা করি — এবং ম্যুল্‌বের্গার যাই বলুন না কেন, কোন বস্তুর সঠিক বর্ণনাই হল আবার তার ব্যাখ্যা — এবং আমরা কঠোর অর্থনীতিগতভাবেই এই প্রমাণ দিই যে, সে বিকাশ একইসঙ্গে সমাজ-বিপ্লবের উপাদানেরও বিকাশ: একদিকে এমন এক শ্রেণীর অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের বিকাশ, যার জীবনের বাস্তব পরিস্থিতিই আবশ্যিকরূপে তাকে সমাজ-বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়; এবং অন্যদিকে উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশ যা পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোর চৌহদ্দি অতিক্রম করে অবশ্যম্ভাবীরূপে সেই কাঠামোকে চৌচির করে ফেলবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রগতির স্বার্থেই চিরদিনের জন্য শ্রেণী বৈষম্য লোপের উপায় এনে দেবে।

পক্ষান্তরে, প্রুধোঁ বর্তমান সমাজের প্রতি এই দাবিই জানান যে, নিজস্ব অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়ম অনুসারে পরিবর্তিত না হয়ে ন্যায়ের নীতি অনুযায়ী তাকে রূপান্তরিত হতে হবে (**'অধিকারের** ধারণাটা' তাঁর নয়, ম্যুল্‌বের্গারেরই)। আমরা যেখানে প্রমাণ করি, প্রুধোঁ এবং তাঁর পিছু পিছু ম্যুল্‌বের্গার সেখানে **বয়েৎ দেন** ও বিলাপ করেন।

'বিপ্লবের অধিকার সম্বন্ধে ধারণা' বস্তুটি কী তা অনুমান করতে আমি একেবারেই অপারগ। একথা সত্য যে প্রুধোঁ 'বিপ্লবটাকে' প্রায় দেবীতে পরিণত করেছেন, যিনি তাঁর 'ন্যায়ের' আধার এবং বিধাতা; এর ফলে তিনি আগামী প্রলেতারীয় বিপ্লবকে ১৭৮৯-৯৪ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলে এক অদ্ভুত ধরনের বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। তিনি তাঁর প্রায় সকল রচনাতেই, বিশেষ করে ১৮৪৮ সালের পর থেকে, এই ভুল করে আসছেন। উদাহরণ হিসাবে আমি মাত্র একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি: **বিপ্লবের সাধারণ ধারণা** বইটি, ১৮৬৮ সালের সংস্করণ, পৃঃ ৩৯ ও ৪০।* কিন্তু ম্যুল্‌বের্গার যেহেতু প্রুধোঁর দরুন কোনপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, তাই প্রুধোঁ থেকে 'বিপ্লবের অধিকার সম্বন্ধে ধারণা' ব্যাখ্যা করার অনুমতি আমার নেই, সুতরাং মিশরীয় অন্ধকারেই থাকতে হবে।

ম্যুল্‌বের্গার অতঃপর বলছেন:

'প্রুধোঁ বা আমি কেউই কিন্তু বর্তমান অন্যায় অবস্থা **ব্যাখ্যা** করার উদ্দেশ্যে 'চিরন্তন ন্যায়ের' প্রতি আবেদন জানাই না, অথবা এও আশা করি না যে, ন্যায়ের প্রতি আবেদনে সে অবস্থার উন্নতি হবে — এঙ্গেল্‌স আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন।'

ম্যুল্‌বের্গার নিশ্চয় এই ধারণার উপরে নির্ভর করছেন যে, 'জার্মানিতে প্রুধোঁ সাধারণভাবে প্রায় অপরিচিত'। তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় প্রুধোঁ সর্বপ্রকার সামাজিক, আইনী, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিপাদ্যকে 'ন্যায়ের' মানদণ্ড দিয়ে বিচার করেছেন এবং তিনি যাকে 'ন্যায়' বলে অভিহিত করেন তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলে এদের স্বীকার করেছেন, না হলে বর্জন করেছেন। তাঁর 'অর্থনৈতিক অন্তর্বিরোধ'** রচনাতেও এই ন্যায়কে 'চিরন্তন ন্যায়', justice éternelle বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে চিরন্তনতা সম্বন্ধে আর কিছু বলা হয়নি, তবু সেই ভাবধারা মূলত বজায় থেকে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, তার 'খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানে ও বিপ্লবে ন্যায়' গ্রন্থের ১৮৫৮ সালের

* P. J. Proudhon, *Idée Générale de la Révolution du XIX siécle*, Paris, 1868. — সম্পাঃ

** এখানে P. J. Proudhon, *Système des Contradictions économiques ou Philosophie de la Misère* বইটির উল্লেখ করা হয়েছে। — সম্পাঃ

সংস্করণে,* তিনখণ্ডব্যাপী নীতি উপদেশের মূলকথা হল এই নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি (১ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা)।

'সেই বুনিয়াদী নীতিটি কী যে নীতি সমাজের মৌলিক, নিয়ন্তা, সার্বভৌম নীতি; যে নীতি অন্যান্য সকল নীতিকে নিজের পরাধীন করে; যে নীতি কর্তৃত্ব করে, রক্ষা করে, দমন করে, শাস্তিবিধান করে, এমন কি প্রয়োজন হলে বিদ্রোহী উপাদানকে অবদমিত করে? সে নীতি কী, ধর্ম, আদর্শ বা **স্বার্থ**?.. আমার মতে সে নীতি হল **ন্যায়**। ন্যায় জিনিসটা কী? **ন্যায় হল মানবতারই মূল মর্ম**। বিশ্বের আদি থেকে তা কী হয়ে এসেছে? কিছুই না। কী হওয়া উচিত? সব কিছুই।'

যে ন্যায় মানবতারই মর্মমূল, তা **চিরন্তন** ন্যায় ছাড়া আর কী হতে পারে? যে ন্যায় সমাজের মৌলিক, নিয়ন্তা, সার্বভৌম বুনিয়াদী নীতি, আজ অবধি যা কিন্তু কিছুই হল না, অথচ যার সবকিছুই হওয়া উচিত, সেই বস্তু মানুষের কার্যকলাপ বিচারের মানদণ্ড ছাড়া আর কী হতে পারে, কী হতে পারে সকল বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারক ছাড়া? প্রুধোঁ তাঁর অর্থনৈতিক অজ্ঞতা এবং অসহায়তাকে ঢাকবার জন্য সকল অর্থনৈতিক সম্পর্ককে অর্থনৈতিক নিয়ম অনুযায়ী বিচার না করে, তাঁর চিরন্তন ন্যায়ের এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, সেই মানদণ্ড দিয়ে তাকে বিচার করেন — এ কথা ছাড়া আর কিছু কি আমি বলেছিলাম? ম্যুল্‌বের্গার যদি দাবি জানান যে 'আধুনিক সমাজ জীবনের এই সকল পরিবর্তন' ... **'অধিকারের ধারণা** দ্বারা পরিব্যাপ্ত' হওয়া উচিত, 'অর্থাৎ কিনা সর্বক্ষেত্রে **ন্যায়ের কঠোর দাবি** অনুযায়ী পালিত হওয়া' উচিত, তাহলে প্রুধোঁ ও ম্যুল্‌বের্গারের মধ্যে তফাৎ কী? ব্যাপারটা কী — আমি পড়তে জানি না, নাকি, ম্যুল্‌বের্গার লিখতে জানেন না?

ম্যুল্‌বের্গার আরও বলছেন:

'মার্কস এবং এঙ্গেলসের মতনই, প্রুধোঁও জানেন যে মানব-সমাজের বাস্তব চালিকা শক্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, আইনগত সম্পর্ক নয়; তিনি এটাও জানেন যে, জনসাধারণের মধ্যে অধিকারের নির্দিষ্ট ধারণাটা অর্থনৈতিক সম্পর্কের এবং বিশেষ করে উৎপাদন সম্পর্কের অভিব্যক্তি, ছাপ ও ফল... এক কথায়, প্রুধোঁর মতে অধিকার হল ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত অর্থনৈতিক ফল।'

প্রুধোঁ যদি এই সব জানতেনই (ম্যুল্‌বের্গার যে সকল অস্পষ্ট ভাষণ ব্যবহার করেছেন সে সব ছেড়ে দিয়ে তাঁর সদুদ্দেশ্যটাকে আমি সৎকার্যের সামিল বলে ধরে নিচ্ছি), 'মার্কস এবং এঙ্গেলসের মতনই' যদি প্রুধোঁ এ সব কথা জানেন, তাহলে কলহ করবার আর কী থাকে? মুশ্‌কিল হচ্ছে এই যে, প্রুধোঁর জ্ঞানের অবস্থাটা কিছু ভিন্ন ধরনের। কোন একটি নির্দিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আত্মপ্রকাশ করে প্রথমত

* P. J. Proudhon, *De la justice dans la révolution et dans l'église*, T. 1-3, Paris, 1858. — সম্পাঃ

স্বার্থের আকারে। অথচ প্রুধোঁর মূল গ্রন্থ থেকে যে নিবন্ধটি এইমাত্র উদ্ধৃত করা হল, তাতে কিন্তু তিনি হুবহু এই কথাই বলেছেন যে, **স্বার্থ** নয়, **ন্যায়** হচ্ছে 'সমাজের নিয়ন্তা, মৌলিক, সার্বভৌম বনিয়াদি নীতি, যে নীতি অন্য সবকিছুকে নিজের পরাধীন করে।' এবং তিনি তাঁর সমস্ত রচনার সকল গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদে এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন. কিন্তু তাতে মুল্যবের্গারের এই বক্তব্যে বাধা হল না যে:

'... প্রুধোঁ তাঁর 'যুদ্ধ ও শান্তিতে'* সর্বাপেক্ষা গভীরতার সঙ্গে অর্থনৈতিক অধিকারের যে আদর্শ বিকশিত করেছেন তা লাসালের সেই বুনিয়াদী ভাবধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়, — যে ভাবধারা লাসাল **অর্জিত অধিকারের পদ্ধতি** বইটির উপক্রমণিকায় অতি চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন।'

প্রুধোঁর অন্যান্য বহু স্কুলছাত্রসুলভ লেখার মধ্যে 'যুদ্ধ ও শান্তিই' সম্ভবত সর্বাপেক্ষা স্কুলছাত্র পর্যায়ের রচনা আর আমি ভাবতেই পারিনি যে, এই রচনাকে হাজির করা হবে ইতিহাসের জার্মান বস্তুবাদী বোধ সম্বন্ধে প্রুধোঁর তথাকথিত উপলব্ধি প্রমাণের জন্য. যে জার্মান বস্তুবাদী বোধ আলোচ্য কোনো ঐতিহাসিক যুগের জীবনের বৈষয়িক, অর্থনৈতিক অবস্থা দিয়ে তখনকার সর্ববিধ ঐতিহাসিক ঘটনা ও ভাবধারা, সকল রাজনীতি, দর্শন ও ধর্মকে ব্যাখ্যা করে। বইটি এতই কম বস্তুবাদী যে **স্রষ্টার** সাহায্য না নিয়ে সে তার যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা পর্যন্ত খাড়া করতে পারে না:

'সে যাই হোক, স্রষ্টা যখন আমাদের জীবনের এই রূপটি মনোনীত করলেন, তখন তাঁর নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য ছিল।' (২য় খণ্ড, ১০০ পৃষ্ঠা, ১৮৬৯ সালের সংস্করণ)।

বইটির ভিত্তি কী ধরনের ঐতিহাসিক জ্ঞান সেটা এ থেকেই দেখা যাবে যে, এর মধ্যে স্বর্ণযুগের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে:

'গোড়াতে যখন মানবজাতি ভূপৃষ্ঠে বিরলভাবেই ছড়িয়ে ছিল, প্রকৃতি তখন অনায়াসেই তাদের প্রয়োজন মেটাত। সেটা ছিল স্বর্ণযুগ, শান্তি ও প্রাচুর্যের যুগ।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১০২ পৃষ্ঠা)।

তার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হল ইতরতম ম্যালথাসবাদ:

'উৎপাদন দ্বিগুণিত হলে জনসংখ্যাও অচিরে দ্বিগুণিত হবে।' (১০৫ পৃষ্ঠা।)

তাহলে বইটির বস্তুবাদটা কোথায়? এইখানে যে এতে বলা হয়েছে যে যুদ্ধের কারণ চিরকালই ছিল 'নিঃস্বতা', এখনও আছে তাই (দৃষ্টান্ত — ১৪৩ পৃষ্ঠা)। তাহলে ১৮৪৮ সালের বক্তৃতায় যে ব্রেজিগ চাচা** গভীরভাবে এই মহান উক্তি করেছিলেন যে, 'নিদারুণ দরিদ্রতার কারণই হল নিদারুণ দারিদ্র্য' তিনিও বিদগ্ধ বস্তুবাদী ছিলেন।

* P. L. Proudhon, *La guerre et la paix*, T. 1-2, Paris, 1869. — সম্পাঃ

** ব্রেজিগ চাচা — জার্মান বুর্জোয়া হাস্যরসিক ও ঔপন্যাসিক ফ্রিৎস রয়তারের রচনার এক হাস্যাস্পদ চরিত্র। — সম্পাঃ

লাসালের 'অর্জিত অধিকারের পদ্ধতি' বইটিতে শুধু আইনজীবীর নয়, সাবেকী হেগেলপন্থীর মোহজালেরও ছাপ রয়েছে। ৭ম পৃষ্ঠায় লাসাল সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, **'অর্থতত্ত্বে'**ও 'অর্জিত অধিকারের ধারণাই সকল ভবিষ্যৎ বিকাশের চালিকা শক্তি'। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, 'অধিকার হচ্ছে **নিজের মধ্যে থেকেই** বিকাশমান একটা যুক্তিসঙ্গত জীবসত্তা' (সুতরাং অর্থনৈতিক পূর্বসর্ত থেকে তার বিকাশ নয়) (৯ম পৃষ্ঠা)। লাসালের কাছে প্রশ্নটা অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে অধিকার নিষ্কাশন নয়, 'অভিপ্রায়েরই ধারণা থেকে, আইনের দর্শন হল যার বিকাশ ও ব্যাখ্যা মাত্র' (১০ম পৃষ্ঠা)। সুতরাং বইটির কথা এখানে আসছে কোথা থেকে? প্রুধোঁ ও লাসালের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে, শেষোক্তজন ছিলেন সত্যিকারের আইনজীবী এবং হেগেলপন্থী, আর প্রুধোঁ আইনবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই অন্য সব ক্ষেত্রের মতই শুধু ফোঁপরদালাল।

আমি খুব ভালভাবেই জানি যে এই প্রুধোঁ ব্যক্তিটি, যিনি অনবরত স্ববিরোধী উক্তি করার জন্য কুখ্যাত, তিনি মাঝে মাঝে এমনভাবে কথাও বলেছেন যে মনে হয়েছে তিনি যেন তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভাবধারা ব্যাখ্যা করছেন। তাঁর চিন্তাধারার মূল ঝোঁকের পাশাপাশি রেখে বিচার করলে কিন্তু এই সকল উক্তির কোন তাৎপর্য থাকে না; আর তাছাড়া সে ধরনের উক্তি তিনি যেখানে করেছেন, সবক্ষেত্রেই সেগুলি নিদারুণ বিভ্রান্তি ও অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিতে ভরা।

সমাজ বিকাশের নির্দিষ্ট এক অতি আদিম পর্যায়ে সামগ্রীর দৈনন্দিন উৎপাদন, বিতরণ ও বিনিময়কে সাধারণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনবার প্রয়োজন উদ্ভূত হয়, যাতে করে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি যেন উৎপাদন ও বিনিময়ের সাধারণ অবস্থার অধীন হয়। এই নিয়ম প্রথমে ছিল প্রথা, শীঘ্রই তা **আইন** হয়ে দাঁড়ায়। আইন হবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই দেখা দেয় আইন রক্ষার ভারপ্রাপ্ত সংস্থাদি অর্থাৎ সরকারী কর্তৃত্ব, রাষ্ট্র। সমাজের অধিকতর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আইন কমবেশী ব্যাপক আইনী ব্যবস্থায় পরিণত হয়। সেই আইনব্যবস্থা যত জটিল হয়ে দাঁড়ায়, তার প্রকাশের পদ্ধতিটাও সমাজ-জীবনের সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রকাশের ধরন থেকে ততই বেশী দূরে সরে আসে। একটি স্বতন্ত্র মৌল বস্তু হিসাবে তা প্রতীয়মান হয়, এবং তার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা ও পরবর্তী বিকাশের হেতু যেন নির্ভর করতে থাকে অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপরে নয়, পরন্তু নিজস্ব অন্তর্নিহিত ভিত্তির উপর, অথবা, চাইলে বলা যেতে পারে, 'অভিপ্রায়ের ধারণার' উপর। মানুষ যে জন্তুজগৎ থেকে উদ্ভূত সে কথা যেমন লোকে ভুলে থাকে, তেমনই তারা ভুলে যায় যে তাদের অধিকার জীবনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকেই আহৃত। আইন ব্যবস্থা যখন একটা জটিল সুসম্পূর্ণ সামগ্রিকতায় বিকশিত হয়, তখন সমাজে নতুন শ্রমবিভাগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে; পেশাদার আইনজীবীদের এক গোষ্ঠী

তৈরি হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জন্মায় আইনবিদ্যা। এই বিদ্যা পরবর্তী বিকাশের পথে বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন যুগের আইন ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে — বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রতিফলন হিসাবে নয়, এমন সব ব্যবস্থা হিসাবে, যাদের যৌক্তিকতা মিলছে নিজেদের মধ্যেই। তুলনামূলক বিচারে কিছু কিছু একই বক্তব্যের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়; আইনবিদরা তা আবিষ্কার করেন বিভিন্ন আইন ব্যবস্থার মধ্যে যা মোটামুটি এক ধরনের তার সংকলন করে, এবং তার নাম দেন **স্বাভাবিক অধিকার** (natural right)। কোন্‌টা স্বাভাবিক অধিকার, কোন্‌টা নয়, তাই নির্ণয় করার জন্য যে মাপদণ্ড ব্যবহৃত হয়, তা হল অধিকারেরই অতীব অমূর্ত অভিব্যক্তি, অর্থাৎ **ন্যায়**। সুতরাং অতঃপর আইনজ্ঞদের পক্ষে, এবং যারা তাদের কথাকেই চরম সত্য বলে গ্রহণ করে তাদের কাছেও অধিকারের বিকাশ ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্য কিছু নয় — মানুষের অবস্থা আইনের ভাষায় যতটা প্রকাশ করা চলে তাকে ন্যায়ের আদর্শের, **চিরন্তন ন্যায়ের** আদর্শের যতটা নিকটে আনা যায় সেই প্রচেষ্টা মাত্র। এই ন্যায় আবার সর্বদাই হল বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের আদর্শায়িত মহিমান্বিত প্রকাশমাত্র, কখনও রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ থেকে, কখনও বা বিপ্লবী দৃষ্টিকোণ থেকে। গ্রীক ও রোমানদের ন্যায় অনুসারে ক্রীতদাসপ্রথা ন্যায়সঙ্গত ছিল; ১৭৮৯ সালের বুর্জোয়াদের ন্যায়বোধ সামন্ত প্রথাকে অন্যায় বলে তার অবলুপ্তি দাবি করেছিল। প্রুশীয় য়ুঙ্কারদের কাছে তুচ্ছ জেলা অর্ডিন্যান্স* পর্যন্ত চিরন্তন ন্যায়ের পরিপন্থী। সুতরাং চিরন্তন ন্যায়ের ধারণাটা শুধু স্থান এবং কাল অনুসারে পরিবর্তিত হয় না, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনুযায়ীও হয়, এবং এটি সেই ধরনেরই একটা ব্যাপার মুল্‌বের্গার যার সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন যে 'প্রত্যেকেই খানিকটা ভিন্নভাবে তা বুঝে থাকে।' দৈনন্দিন জীবনে যেসব সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা চলে তাতে কোন জটিলতা থাকে না বলে, সামাজিক ব্যাপার সম্পর্কেও ন্যায্য, অন্যায্য, ন্যায় ও অধিকারবোধ প্রভৃতি কথা কোনরূপ ভুল বোঝাবুঝি না ঘটিয়েই চলে। কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্কের কোনরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমরা দেখেছি যে এসব শব্দ গুরুতর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে — যেমনটি সৃষ্টি হত যদি আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের আলোচনায় ফ্লজিস্টন তত্ত্বের পরিভাষা ব্যবহার অব্যাহত থাকত। বিভ্রান্তি আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় যদি কেউ প্রুধোঁর মতো এই সামাজিক ফ্লজিস্টন, 'ন্যায়ে' বিশ্বাসী হয়, অথবা যদি কেউ মুল্‌বের্গারের মতো বলতে থাকে যে ফ্লজিস্টন তত্ত্ব অক্‌সিজেন তত্ত্বের মতোই সমভাবে সঠিক**।

* এঙ্গেলস এখানে ১৮৭৩ সালে প্রাশিয়ায় শাসন সংস্কারের উল্লেখ করছেন, এতে জমিদার কর্তৃক মনোনয়নের পরিবর্তে মোড়ল নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় গোষ্ঠীগুলোকেই। — সম্পাঃ

** অক্‌সিজেন আবিষ্কারের আগে বায়ুমণ্ডলে কোন বস্তুর দাহনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাসায়নিকেরা ধরে নিতেন যে ফ্লজিস্টন (phlogiston) নামে এক বিশেষ ধরনের অগ্নিময় পদার্থ

৩

'বড় বড় মহা নগরীতে শতকরা নব্বইভাগ বা ততোধিক জনসংখ্যার নিজের বলতে কোন বাসস্থান নেই, এই সত্যের চাইতে আমাদের এই প্রশংসিত শতাব্দীর সমগ্র সংস্কৃতির অধিকতর নিদারুণ পরিহাস আর কিছুই হতে পারে না,' ম্যুলবের্গারের এই 'জমকালো' উক্তিকে আমি প্রতিক্রিয়াশীল বিলাপ (jeremiad) আখ্যা দিয়েছি বলে তিনি আর একটি অভিযোগ করেছেন। তা করেছি বৈকি। তিনি যা ভান করছেন সেভাবে যদি শুধু 'বর্তমান সময়ের ভয়াবহতা' সম্পর্কে বর্ণনার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন, তাহলে আমি নিশ্চয়ই 'তাঁর সম্বন্ধে এবং তাঁর বিনয়ী বক্তব্য' সম্পর্কে কোন কটূক্তিই করতাম না। আসলে কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করেছেন। শ্রমিকদের **'নিজের বলতে কোন বাসস্থান নেই'** এই সত্য **থেকেই** সে 'ভয়াবহ' পরিস্থিতির **উদ্ভব** হয়েছে বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। বাড়ির উপরে শ্রমিকদের মালিকানা অবলুপ্ত হয়েছে বলে, অথবা য়ুঙ্কারদের মতো, সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ও গিল্ডগুলির অবসান হয়েছে বলে — যে কারণেই 'বর্তমান সময়ের ভয়াবহতা' সম্বন্ধে কান্নাকাটি করা হোক না কেন কোনক্রমেই তা থেকে একটা প্রতিক্রিয়াশীল কান্নাকাটি, অবশ্যম্ভাবী, ঐতিহাসিক অনিবার্যতার আসন্নতায় বিলাপ ছাড়া আর কিছুই হবে না। এর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রটা ঠিক এইখানে যে ম্যুলবের্গার শ্রমিকদের জন্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান বাসগৃহের ব্যক্তিগত মালিকানা — যা কিনা ইতিহাস দীর্ঘকাল আগেই লোপ করে দিয়েছে, তিনি প্রত্যেকটি শ্রমিককে পুনর্বার তার নিজের বাসগৃহের মালিকে পরিণত করা ছাড়া তাদের মুক্তির অন্য কোন উপায় কল্পনা করতে পারেন না।

আরও আছে:

> 'আমি জোরের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আসল লড়াই লড়তে হবে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে; একমাত্র **তার রূপান্তর থেকেই** বাস-সংস্থান অবস্থার উন্নতি আশা করা যেতে পারে। এঙ্গেলস এ সবকিছুই দেখছেন না... আমি ধরে নিয়েছি যে, ভাড়াটে বাড়ির অবসানের দিকে অগ্রসর হতে হলে সামাজিক প্রশ্নের পূর্ণ সমাধান প্রয়োজন।'

আছে, যেটা দাহন প্রক্রিয়ার সময় নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়: তাঁরা যখন দেখলেন যে পুড়বার পর সাধারণ বস্তুর ওজন পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, তখন তাঁরা বললেন যে, ফ্লজিস্টনের ওজন ঋণাত্মক, যার ফলে ফ্লজিস্টন সহ পদার্থ অপেক্ষা ফ্লজিস্টনহীন পদার্থের ওজন বেশি। এইভাবে অক্সিজেনের সবকটি মূল ধর্মই ক্রমে ক্রমে ফ্লজিস্টনের প্রতি আরোপিত হল, যদিও **বিপরীত** রূপে। দাহন প্রক্রিয়া হচ্ছে অন্য এক পদার্থ অক্সিজেনের সঙ্গে দাহ্য পদার্থটির যৌগিক ক্রিয়া — এই তথ্য এবং অক্সিজেনের আবিষ্কারের ফলে আদি অনুমানটা বিলুপ্ত হয়, অবশ্য সাবেকী রসায়নবিদদের তরফ থেকে দীর্ঘ প্রতিরোধের পরে। (এঙ্গেলসের টীকা।)

দুঃখের বিষয় আমি এখনও এ সবকিছুই দেখতে পাচ্ছি না। যার নামও আমি কখন শুনিনি, তিনি তার মনের গোপন কন্দরে কী ধরে নিয়েছেন তা আমার পক্ষে জানা অসম্ভব। ম্যুল্‌বের্গারের মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি আঁকড়ে থাকাটাই শুধু আমার পক্ষে সম্ভব। এবং তা থেকে আমি আজকেও দেখতে পাচ্ছি (পুনর্মুদ্রিত পুস্তিকার ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠা) যে, ম্যুল্‌বের্গার ভাড়াটে বাড়ির অবসানের দিকে অগ্রসর হবার জন্য ভাড়াটে বাড়ি ছাড়া আর কিছুই ধরে নিচ্ছেন না। কেবল ১৭ পৃষ্ঠাতেই তিনি 'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে কব্জা' করেছেন, কিন্তু সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। এমন কি তাঁর জবাবেও তিনি এ কথাই সমর্থন করছেন এই বলে:

> 'বরং **বর্তমান অবস্থা থেকে** গৃহসংস্থান সমস্যার পূর্ণ রূপান্তর কী করে সম্পন্ন করা যায় সেইটে দেখানোই হল প্রশ্ন।'

'বর্তমান অবস্থা থেকে' এবং 'পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির রূপান্তর (পড়ুন: অবসান) থেকে' কথা দুইটি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার।

শ্রীযুক্ত দলফুস এবং অন্যান্য শিল্পপতিরা শ্রমিকদের নিজস্ব বাসগৃহ অর্জনে সাহায্য করার যে হিতাকাঙ্খী প্রচেষ্টা করেছেন তাকেই আমি প্রুধোঁবাদী প্রকল্পের একমাত্র সম্ভবপর ব্যবহারিক রূপায়ণ বলে গণ্য করাতে ম্যুল্‌বের্গার যে অভিযোগ করেছেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সমাজের পরিত্রাণের জন্য প্রুধোঁর পরিকল্পনা যে **বুর্জোয়া** সমাজের ভিত্তির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল একটা উৎকল্পনা মাত্র একথা যদি তিনি উপলব্ধি করতেই পারতেন তাহলে তিনি স্বভাবতই তো তাতে বিশ্বাস হারাতেন। আমি কখনও তাঁর সদিচ্ছা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিনি। কিন্তু তাহলে ভিয়েনা নগর পরিষদে দলফুসের প্রকল্পনা অনুকরণ করার জন্য ডক্টর রেশাউয়র যে প্রস্তাব করেছিলেন সেজন্য তাকে তিনি প্রশংসা করলেন কেন?

ম্যুল্‌বের্গার অতঃপর বলছেন:

> 'বিশেষ করে শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে, তার অবসান চাওয়া ইউটোপীয় ব্যাপার। এই বৈপরীত্য স্বাভাবিক, অথবা আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে এটা ইতিহাস থেকে উদ্ভূত ... প্রশ্নটা এই বৈপরীত্য **অবসানের** নয়, প্রশ্ন হল এমন ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপ খুঁজে বার করা যার ফলে এই বৈপরীত্য **ক্ষতিকর হবে না** বরং **ফলপ্রসূ** হবে। এইভাবেই একটা শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য, বিভিন্ন স্বার্থের ক্রমিক ভারসাম্য সাধন সম্ভব হবে।'

শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্য অবসান তাহলে ইউটোপীয়, **কেননা** এই বৈপরীত্য স্বাভাবিক অথবা আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে তা ইতিহাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই যুক্তি আধুনিক সমাজের অন্যান্য বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা যাক আমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছব। উদাহরণস্বরূপ:

'বিশেষ করে "পংঁজিপতি ও মজনুরি-শ্রমিকদের মধ্যে" বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে তার অবসান চাওয়া ইউটোপীয় ব্যাপার। এই বৈপরীত্য স্বাভাবিক অথবা আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে এটা ইতিহাস থেকে উদ্ভূত। প্রশ্নটা এই বৈপরীত্য অবসানের নয়, প্রশ্ন হল এমন ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপ খংঁজে বার করা যার ফলে এই বৈপরীত্য **ক্ষতিকর হবে না** বরং **ফলপ্রসূ** হবে। এইভাবেই শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য, বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে ক্রমিক ভারসাম্য সাধন সম্ভব।'

এবং এর ফলে আমরা আবার শনুলৎসে-দেলিচ-এর বক্তব্যেই এসে পেঁছিলাম।

শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্যের অবসানটা একেবারে ঠিক ততটাই ইউটোপীয় যতটা ইউটোপীয় পংঁজিপতি ও মজনুরি-শ্রমিকদের মধ্যে বৈপরীত্যের অবসান। দিনের পর দিন এটা শিল্প ও কৃষি উভয় উৎপাদনের ক্ষেত্রেই ক্রমশ বেশি করে একটা ব্যবহারিক দাবি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। লিবিখের চেয়ে বেশী উৎসাহভরে কেউ এ দাবি তোলেননি; তাঁর কৃষি-রসায়ন সম্পর্কে রচনাবলীতে পহেলা নম্বর দাবি সবসময়ই এই যে মানুষ জমি থেকে যতটা গ্রহণ করে ততটাই তার জমিতে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত; তিনি এ কথাই প্রমাণ করেছেন যে কেবল শহরের বিশেষ করে বড় বড় শহরের অস্তিত্বই এতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এই লন্ডন শহরেই প্রতিদিন বিপনুল অর্থব্যয়ে যে পরিমাণ সার সমনুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, তা সমগ্র সাকসনি রাজ্যের উৎপন্ন সারের চাইতেও বেশী এবং লন্ডনের গোটা শহরকে এই সার যাতে বিষাক্ত করে না তোলে তার জন্য কী বিপনুল নির্মাণ-ব্যবস্থা প্রয়োজন তা দেখলেই শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্য অবসানের ইউটোপিয়াটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবহারিক ভিত্তি পেয়ে যায়। এমন কি তুলনায় অনেক কম গনুরনুত্বপূর্ণ বার্লিন শহরে পর্যন্ত গত ত্রিশ বছরে তার নিজস্ব আবর্জনার দনুর্গন্ধে প্রায় শ্বাসরোধের উপক্রম হয়েছে। পক্ষান্তরে, চাষীকে একই অবস্থায় রেখে বর্তমান বনুর্জোয়া সমাজকে প্রনুধোঁ যে উৎক্ষিপ্ত করতে চান, সেটা হল পরিপূর্ণ ইউটোপীয়। সারা দেশ জনুড়ে যতটা সম্ভব সমানভাবে জনসংখ্যার বিন্যাস, শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের মধ্যে ঘনিষ্ঠসংযোগ, এবং তারজন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন যোগাযোগের প্রসার হলে পরেই — অবশ্য, পংঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি অবসানের ভিত্তিতেই — শনুধনু গ্রামীণ জনসমাজকে সে বিচ্ছিন্নতা এবং হতবনুদ্ধিতা থেকে মনুক্ত করা সম্ভবপর যার ভিতরে হাজার হাজার বছর ধরে সে রোমন্থন করে কাটিয়েছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্য অবসান হলেই কেবল অতীত ইতিহাস যে শৃঙ্খল সৃজন করেছে তার থেকে মানুষের মনুক্তি সম্পূর্ণ হতে পারবে — এই মত পোষণ করা ইউটোপীয় নয়; ইউটোপিয়া তখনই শনুরনু হয় যখন কেউ বর্তমান সমাজের কোন একটা বৈপরীত্য নিরসনের **রূপ** নির্দেশ করতে এগোন 'প্রচলিত অবস্থার মধ্যেই'। বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের জন্য প্রনুধোঁবাদী সূত্র গ্রহণ করে মনুল্‌বের্গার তাই করেছেন।

ম্যুলবের্গার অতপর অভিযোগ করেন যে 'প্রুধোঁর পুঁজি এবং সুদ সম্পর্কে উৎকট মতামতের জন্য' আমি কিছু পরিমাণে তাঁকে দায়িত্বের অংশীদার করেছি; তাই তিনি বলছেন:

'আমি **ধরে নিয়েছি** যে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তনটা **একটা নিষ্পন্ন ঘটনা,** আর সুদের **হার** নিয়ামক অন্তরবর্তী আইনটা উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, সামাজিক টার্নওভার, **সঞ্চালন-সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট**... উৎপাদন-সম্পর্কের বদল, অথবা, জার্মান গোষ্ঠীর ভাষায় আরও সঠিকভাবে যা বলা হয়, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির উচ্ছেদ, সেটা এঙ্গেলস **আমার মুখ দিয়ে যা বলাতে চান,** সেভাবে সুদ অবসানকারী অন্তর্বর্তী আইনের ফলে ঘটে না, ঘটে **শ্রমের সমুদয় যন্ত্রপাতি বাস্তবিক দখল করে,** শ্রমজীবী জনতা কর্তৃক সমগ্র শিল্প দখল করার ফলে। সেই ক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনতা অবিলম্বে মালিকানা উচ্ছেদ করার আগেই দায়মোচনের পূজো করবে(!) কি না তা এঙ্গেলস বা আমার নির্ধারণ করার কথা নয়।'

অবাক হয়ে আমি চোখ রগড়াচ্ছি। ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচনের জন্য 'শ্রমের সমুদয় যন্ত্রপাতি বাস্তবিক দখল, শ্রমজীবী জনতা কর্তৃক সমগ্র শিল্প দখলকে' নিষ্পন্ন ঘটনা হিসাবে তিনি যে ধরে নিয়েছেন, একথা তিনি কোথায় লিখেছেন সেই অংশটি খুঁজে বার করবার জন্য আমি ম্যুল্‌বের্গারের রচনাটি আরেকবার আদ্যোপান্ত পাঠ করলাম, কিন্তু তেমন অনুচ্ছেদ কোথাও পাইনি। তেমন কোনো অনুচ্ছেদ নেই। 'বাস্তবিক দখল' ইত্যাদির কোথাও উল্লেখ নেই; কিন্তু ১৭ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বক্তব্য রয়েছে:

'এবার ধরে নেওয়া যাক যে পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে **সত্যসত্যই কব্জা করা হল,** আজ বা কাল তা তো করতেই হবে, ধরুন এমন **কোন অন্তর্বর্তী আইন মারফৎ যাতে সব পুঁজির সুদকে শতকরা একটাকা হারে নির্দিষ্ট করা যায়;** মনে রাখবেন এই হারকেও ক্রমশ হ্রাস করে শূন্যে নামিয়ে আনার প্রবণতা রেখে... অন্যান্য সকল উৎপন্নের মতন ঘরবাড়িও স্বভাবতই এই আইনের আওতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত... সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচন হল **সাধারণভাবে পুঁজির উৎপাদিকা শক্তির অবলোপের অবশ্যম্ভাবী ফল।**'

ম্যুল্‌বের্গার সম্প্রতি যে সুর পাল্টে ফেলেছেন, তার ঠিক বিপরীত কথাই এখানে সরল ভাষায় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে, নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই তিনি এই বিভ্রান্তিকর কথাটির দ্বারা পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকেই বোঝাতে চান, সত্যসত্যই 'কব্জা করা' যায় সুদ উচ্ছেদের আইনের মাধ্যমে; আর ঠিক এই আইনের জন্য 'ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচন হল সাধারণভাবে পুঁজির উৎপাদিকা শক্তির অবলোপের অবশ্যম্ভাবী ফল।' এখন ম্যুল্‌বের্গার বলছেন তা মোটেই নয়। অন্তর্বর্তী এই আইন '**উৎপাদন**-সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, **সঞ্চালন**-সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।'

গ্যেটের ভাষায় বলতে গেলে 'বিজ্ঞ ও নির্বোধ উভয়ের কাছেই সমভাবে রহস্যময়'* এই স্থূল স্ব-বিরোধিতার দরুন শুধু এইটে ধরে নেওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই যে আমি দুইজন স্বতন্ত্র এবং পৃথক মুলবের্গারকে নিয়ে আলোচনা করছি, যাঁদের একজন সঠিক অভিযোগই করছেন যে আমি তার 'মুখ দিয়ে বলাতে' চেয়েছি এমন কথা যা অপরজন ছাপিয়েছেন।

একথা অবশ্যই সত্য যে শ্রমজীবী জনতা আমাকে বা মুল্‌বের্গারকে, কাউকেই জিজ্ঞাসা করবে না - প্রত্যক্ষ দখলের ক্ষেত্রে তারা 'অবিলম্বে মালিকানা উচ্ছেদের আগেই দায়মোচনের পূজা করবে কি না।' খুব সম্ভব তারা আদৌ 'পূজা' না করাটাই পছন্দ করবে। সে যাই হোক, শ্রমজীবী জনতা কর্তৃক শ্রমের সমুদয় হাতিয়ার প্রত্যক্ষ দখল করা নিয়ে কখনো কোনো প্রশ্ন ছিল না, প্রশ্ন উঠেছে শুধু মুল্‌বের্গারের এই উক্তি নিয়ে (১৭ পৃষ্ঠা): 'বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের সমগ্র বিষয়টাই হল **দায়মোচন** --- এই কথাটির মধ্যেই নিহিত।' এখন যদি তিনি এই দায়মোচনকে অতীব সংশয়ের ব্যাপার বলে ঘোষণা করেন, তাহলে আমাদের দুজনকে এবং আমাদের পাঠকদের এই অযথা হয়রান করার কী অর্থ ছিল?

তাছাড়া, একথাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রমের সমুদয় যন্ত্রপাতির উপর 'বাস্তব দখল', শ্রমজীবী জনতা কর্তৃক সমগ্র শিল্প দখল হচ্ছে প্রুধোঁবাদী 'দায়মোচনের' ঠিক বিপরীত। শেষোক্ত ব্যবস্থায়, **ব্যক্তিবিশেষ শ্রমিক** বাসগৃহ, কৃষিখামার, শ্রমের হাতিয়ারপত্রের মালিকে পরিণত হয়; আর আগের ব্যবস্থায় 'শ্রমজীবী জনতা' বাসগৃহ কারখানা ও শ্রমের হাতিয়ারপত্রের যৌথ মালিক হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্ততঃপক্ষে অন্তর্বর্তীকালে কোন ক্ষতিপূরণ আদায় না করে ব্যক্তিবিশেষ বা সমিতিকে তা ব্যবহার করার অনুমতি দেবে না বললেই চলে। ঠিক যেমন ভূমিমালিকানার অবসান মানে ভূমি-খাজনার অবলোপ নয়, কিছুটা সংশোধিত আকারে হলেও সমাজের হাতে তার হস্তান্তর মাত্র। সুতরাং শ্রমজীবী জনতা দ্বারা শ্রমের সমুদয় হাতিয়ারপত্রের উপরে বাস্তব দখল প্রতিষ্ঠার ফলে ভাড়ার সম্পর্কটা বজায় রাখার সম্ভাবনা একেবারেই নাকচ হয় না।

সাধারণভাবে, প্রশ্ন এই নয় যে, প্রলেতারিয়েত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সোজাসুজি উৎপাদনের হাতিয়ার, কাঁচামাল ও জীবনধারণের সামগ্রী বলপূর্বক দখল করবে, না এই সবের দরুন তৎক্ষণাৎ ক্ষতিপূরণ দেবে বা ছোট ছোট কিস্তিতে এইসব সম্পত্তির দায়মোচন করবে। আগে থাকতেই এবং সর্বক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করা হল ইউটোপিয়া রচনা; সে কাজ আমি অন্যদের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি।

* এঙ্গেলস এখানে গ্যেটের 'ফাউস্ট' প্রথম অংশ ষষ্ঠ দৃশ্য ('ডাইনির রান্নাঘর') থেকে মেফিস্টোফিলিসের উক্তি ঘুরিয়ে বলছেন। — সম্পাঃ

৪

মুলবের্গারের বহুবিধ ঘোরপ্যাঁচ ভেদ করে আসল কথাটায় পোঁছবার জন্যই এতখানি কালি ও কাগজ খরচ করার প্রয়োজন হল যে কথাটা মুলবের্গার তাঁর জবাবে সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন।

মুলবের্গার তাঁর প্রবন্ধে কী কী ইতিবাচক উক্তি করেছিলেন?

প্রথমত, 'বাড়ি, তার জন্য জমি, ইত্যাদির আদি ব্যয় ও বর্তমান মূল্যের যা ব্যবধান', সেটা ন্যায্যত সমাজের প্রাপ্য। অর্থতত্ত্বের ভাষায় এই ব্যবধানকে বলে ভূমি-খাজনা। 'বিপ্লবের সাধারণ ধারণা' বইখানির ১৮৬৮ সালের সংস্করণের ২১৯ পৃষ্ঠা পড়লে দেখা যায় যে, প্রুধোঁও এটা সমাজের তরফ থেকে অধিকার করতে চান।

দ্বিতীয়ত, বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান হল বাসগৃহের ভাড়াটে হওয়ার পরিবর্তে প্রত্যেককে তার মালিকে পরিণত হওয়া।

তৃতীয়ত, বাড়িভাড়ার দরুন দেয় অর্থকে বাসগৃহের ক্রয়মূল্য বাবদ কিস্তি শোধ বলে পরিগণিত করার আইন পাশ করলেই এই সমাধান কাজে পরিণত করা যায়। ২ নং ও ৩ নং বিষয় দুইটি যে প্রুধোঁর কাছ থেকে ধার করা, তা যে কেউ 'বিপ্লবের সাধারণ ধারণা' বইটির ১৯৯ পৃষ্ঠা থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় দেখতে পারেন; ২০৩ পৃষ্ঠায় প্রস্তাবিত আইনের খসড়া পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

চতুর্থত, ভবিষ্যতে আরও হ্রাসসাপেক্ষ সুদের হারকে আপাতত শতকরা এক শতাংশে নামিয়ে আনার অন্তর্বর্তী আইনের মাধ্যমে পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে কব্জা করা হবে। এই বক্তব্যটিও প্রুধোঁর কাছ থেকে নেওয়া, 'সাধারণ ধারণার' ১৮২ থেকে ১৮৬ পৃষ্ঠায় এর বিস্তৃত বিবরণ পড়া যেতে পারে।

এর প্রত্যেকটি বিষয়েই মুলবের্গারের প্রতিলিপির মূলগুলি প্রুধোঁর যে যে অনুচ্ছেদে পাওয়া যায়, তা আমি উদ্ধৃত করেছি। আমি এখন প্রশ্ন করতে চাই যে, সম্পূর্ণরূপে প্রুধোঁবাদী, এবং প্রুধোঁবাদী ছাড়া আর কিছু নয়, এইরূপ মতামতপূর্ণ প্রবন্ধের লেখককে প্রুধোঁপন্থী আখ্যা দেওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হয়েছিল কিনা? তৎসত্ত্বেও মুলবের্গারের সর্বাপেক্ষা তীব্র অভিযোগ এই জন্য যে 'প্রুধোঁ ব্যবহৃত **কয়েকটি কথা** পেয়েছি' বলেই আমি তাঁকে প্রুধোঁপন্থী বলেছি! ঠিক তার বিপরীত। **কথাগুলি'** সবই মুলবের্গারের নিজস্ব, কিন্তু তার **বিষয়বস্তু** প্রুধোঁর। আর আমি যখন প্রুধোঁকে দিয়েই এই প্রুধোঁবাদী গবেষণার পরিপূরণ করি, তখন মুলবের্গার অভিযোগ করেন যে, আমি তাঁর উপর প্রুধোঁর 'উৎকট মতামত' আরোপ করছি।

এই প্রুধোঁবাদী পরিকল্পনার আমি কী জবাব দিয়েছিলাম?

প্রথমত, রাষ্ট্রের হাতে ভূমি-খাজনার হস্তান্তরণ হল জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবলোপের সামিল।

দ্বিতীয়ত, ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচন এবং ভাড়াটে হিসাবে বসবাসকারীর হাতে বাসগৃহের মালিকানা হস্তান্তরণ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে মোটেই স্পর্শ করে না।

তৃতীয়ত, বর্তমানে বৃহদায়তন শিল্প এবং শহরগুলির যা বিকাশ ঘটেছে, তার ফলে এ প্রস্তাব যেমন আজগুবি, তেমনই প্রতিক্রিয়াশীল; এবং নিজ নিজ বাসগৃহের উপর প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মালিকানার পুনঃপ্রবর্তন হবে পশ্চাৎ দিকে পদক্ষেপমাত্র।

চতুর্থত, পুঁজির উপর সুদের হার বাধ্যতামূলকভাবে হ্রাস করাতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে মোটেই আক্রমণ করা হয় না; বরং মহাজনী আইনসমূহ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এ ধারণা যেমন সেকেলে তেমনই অসম্ভব।

পঞ্চমত, পুঁজির উপর সুদ উচ্ছেদ করে কোনক্রমেই বাড়িভাড়ার অবসান করা যায় না।

মুল্যবের্গার এখন ২ নং ও ৪ নং ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন। অন্যান্য বিষয়ের তিনি মোটেই কোন জবাব দেননি। অথচ এইসব কথাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র বিতর্কের অবতারণা। মুল্যবের্গারের জবাবটা কিছু খণ্ডন নয়। জবাবে সমস্ত অর্থনৈতিক প্রশ্ন সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, অথচ এগুলিই হল চূড়ান্ত নির্ধারক। জবাবটা ব্যক্তিগত অভিযোগমাত্র, তার বেশী কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ, তিনি নালিশ করছেন যে, রাষ্ট্রীয় ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ ও ক্রেডিট ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর ঘোষিতব্য সমাধান আমি পূর্বাহ্নেই অনুমান করে বলেছি যে, তা হবে সর্বত্রই একপ্রকার, অর্থাৎ বাড়িভাড়ার প্রশ্নের মতনই — সুদ লোপ, সুদের কিস্তিকে আসলের অংকের কিস্তিশোধে পরিণত করা, এবং সুদছাড়া ঋণ। তাসত্ত্বেও আমি এখনও বাজি ধরতে রাজি যে, মুল্যবের্গারের এই সমস্ত প্রবন্ধ যদি সত্যই প্রকাশিত হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, তার মূল বিষয়বস্তু প্রুধোঁর 'সাধারণ ধারণার' সঙ্গে মিলে গিয়েছে (ক্রেডিট — ১৮২ পৃষ্ঠা; রাষ্ট্রীয় ঋণ — ১৮৬ পৃষ্ঠা; ব্যক্তিগত ঋণ — ১৯৬ পৃষ্ঠা), ঠিক যে রকম বাস-সংস্থান সমস্যার উপরে তাঁর প্রবন্ধাবলী মিলে গিয়েছে সেই একই বই থেকে আমি যে যে অংশ উদ্ধৃত করেছি, তার সঙ্গে।

মুল্যবের্গার এই সুযোগে আমাকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে কর, রাষ্ট্রীয় ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ ও ক্রেডিট আর তার সঙ্গে সম্প্রতি যোগ করা পৌর স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন — এগুলি কৃষকের পক্ষে এবং গ্রামাঞ্চলে প্রচারের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমি বহুলাংশে একমত; কিন্তু ১। এ অবধি কৃষক সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয়নি এবং ২। এই সকল সমস্যার প্রুধোঁবাদী 'সমাধান' তাঁর বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধানের মতোই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমরূপ আজগুবি ও মূলত বুর্জোয়াধর্মী। কৃষকদের আন্দোলনে টানবার

আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে যে **আমি** অক্ষম, ম্যুলবের্গারের এই ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজন আমি দেখছি না। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে তাদের কাছে প্রুধোঁবাদী হাতুড়ে বিদ্যা সুপারিশ করাটা আমি অবশ্যই নির্বুদ্ধিতা বলে বিবেচনা করি। এখনও অবধি জার্মানিতে বড় বড় অনেক ভূসম্পত্তি রয়েছে। প্রুধোঁর তত্ত্ব অনুযায়ী এইগুলিকে ছোট ছোট কৃষিখামারে বিভক্ত করে দেওয়া উচিত, অথচ বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত কৃষিতে এবং ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানিতে ক্ষুদে কৃষকজমির অভিজ্ঞতার পরে এ কাজ নিশ্চিতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হবে। বরং অদ্যাবধি যে সব বড় বড় ভূসম্পত্তি রয়েছে তা সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকগণ কর্তৃক বৃহদায়তন কৃষি পরিচালনার যোগ্য ভিত্তিই জোগায় — একমাত্র এই পদ্ধতিতেই আধুনিক সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সদ্ব্যবহার হতে পারে। এবং এইভাবে ছোট চাষীদের কাছে সঙ্ঘবদ্ধতার ভিত্তিতে বৃহদায়তন চাষের সুবিধা প্রমাণিত হবে। এ ব্যাপারে যারা সর্বাপেক্ষা অগ্রসর, সেই ডেনমার্কের সমাজতন্ত্রীরা কথাটা অনেক আগেই ধরতে পেরেছেন।

শ্রমিকদের বর্তমান জঘন্য বাসস্থান পরিস্থিতিকে আমি যে 'তুচ্ছ খুঁটিনাটি' বলে মনে করি এই ইঙ্গিতের বিরুদ্ধেও আত্মরক্ষা আমি সমভাবে নিষ্প্রয়োজন মনে করি। আমার যতদূর জানা আছে আমিই সর্বপ্রথম জার্মান সাহিত্যে ইংলণ্ডে বিদ্যমান পরিস্থিতির চিরায়ত রূপটি বর্ণনা করি। ম্যুলবের্গারের মতন এটা 'আমার **ন্যায় বোধকে** আঘাত করেছিল' বলে আমি তা করিনি -- যত বাস্তব ঘটনা ন্যায় বোধকে আঘাত করে তাদের সবকিছু নিয়ে যদি বই লিখতে হয়, তাহলে কাজের আর অবধি থাকে না — লেখার কারণটা আমার বই-এর ভূমিকাতেই বর্ণিত আছে। তখন জার্মান সমাজতন্ত্রের সবে উদ্ভব হচ্ছিল, আর ফাঁকা বাক্যজালে সে নিজেকে নিঃশেষ করছিল; আমার বই-এর উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক অবস্থা বর্ণনার মারফৎ এই জার্মান সমাজতন্ত্রের তথ্যগত ভিত্তি জোগানো। অবশ্য তথাকথিত বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান নির্ণয়ের কথা আমার মাথায় কখনই প্রবেশ করেনি, যেমন মনে হয়নি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ **খাদ্য সমস্যার** খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা। বর্তমান সমাজের যা উৎপাদন তা তার সকল সদস্যের খাদ্যসংস্থান করার পক্ষে পর্যাপ্ত এবং যত বাড়ি বর্তমান তা শ্রমজীবী জনসাধারণকে আপাতত প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, এটুকু প্রমাণ করতে পারলেই আমি সন্তুষ্ট। ভবিষ্যৎ সমাজ কী ভাবে খাদ্য এবং বাসস্থান বিতরণ সংগঠন করবে তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা সুরু করলে আমরা সরাসরি **ইউটোপিয়ায়** গিয়ে পৌঁছব। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন উৎপাদন-পদ্ধতির মৌলিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থেকে আমরা বড়জোর এই বক্তব্য পেশ করতে পারি যে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির পতন হলে দখলির যে কতকগুলি বিশেষ রূপ এ যাবৎ চলে আসছে তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এমন কি

অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাও সর্ব ক্ষেত্রে সেই সময়ে বিদ্যমান সম্পর্ক অনুযায়ী হতে হবে। ছোট ছোট ভূসম্পত্তির দেশে সে ব্যবস্থা বড় বড় ভূসম্পত্তির দেশ থেকে তফাৎ হবে, ইত্যাদি। কেউ যদি বাস-সংস্থান সমস্যার মতন তথাকথিত ব্যবহারিক সমস্যা সম্পর্কে আলাদা আলাদা সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করে, তাহলে কোথায় গিয়ে পেঁছতে হয় তা মুলবের্গার স্বয়ং সবচেয়ে ভাল করেই আমাদের দেখিয়েছেন। তিনি প্রথমে ২৮ পৃষ্ঠা জুড়ে ব্যাখ্যা করলেন যে 'বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধানের সমগ্র বিষয়বস্তুটি **দায়মোচন** কথাটির মধ্যে নিহিত আছে' এবং তারপর চারদিক থেকে চাপে পড়ে তিনি বিব্রত হয়ে আমতা আমতা করতে লাগলেন যে ঘরবাড়ির প্রত্যক্ষ দখল নেবার সময় অন্য কোনো কায়দায় মালিকানা উচ্ছেদ করার আগে 'শ্রমজীবী জনতা দায়মোচন পূজা করবে কিনা', এটা আসলে খুবই সংশয়ের কথা।

মুলবের্গার দাবি করছেন যে আমাদের **কাজের লোক** হওয়া উচিত; 'বাস্তব ব্যবহারিক সম্পর্কের সম্মুখীন হয়ে' 'শুধু নিষ্প্রাণ ও বিমূর্ত সূত্র নিয়ে হাজির হওয়ার' পরিবর্তে আমাদের উচিত 'অমূর্ত সমাজতন্ত্রের গণ্ডি অতিক্রম করে **সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সমাজ-সম্পর্কের সন্নিকটে আসা**।' মুলবের্গার যদি নিজে তা করে থাকতেন, তাহলে তিনি সম্ভবত আন্দোলনের প্রভূত উপকার সাধিত করতে পারতেন। সমাজের সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সম্পর্কের সন্নিকট হওয়ার প্রথম ধাপটা নিশ্চয়ই এসব সম্পর্ক কী তা জানা, প্রচলিত অর্থনৈতিক অন্তঃসম্পর্কে তা পরীক্ষা করা। কিন্তু মুলবের্গারের প্রবন্ধাবলীতে আমরা কী দেখতে পাই? দুটি পরো বাক্য যথা:

১। 'পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকের যে সম্পর্ক, বাড়ির মালিক ও ভাড়াটের সম্পর্কটিও ঠিক তাই।'

আমি পুনর্মুদ্রিত লেখাটির ৬ পৃষ্ঠায়* প্রমাণ করেছি যে একথা সম্পূর্ণ ভুল; আর মুলবের্গার জবাবে একটি কথাও বলেননি।

২। 'কিন্তু (সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে) যে ষাঁড়টির শিং ধরে কব্জা করতে হবে তা হল, উদারপন্থী অর্থনীতিবিদের ভাষায়, **পুঁজির উৎপাদিকা শক্তি** — এ বস্তুটির **বাস্তবে কোন অস্তিত্বই নেই**, কিন্তু তার **আপাতদৃশ্য অস্তিত্বটি** বর্তমান সমাজের সর্বপ্রকার অসাম্যের আবরণ হিসাবে কাজ করছে।'

অতএব যাকে শিং ধরে কব্জা করতে হবে সেই ষাঁড়ের **'বাস্তবে কোন** অস্তিত্বই **নেই'**, এবং সুতরাং তার 'শিং'ও নেই। ষাঁড়টি স্বয়ং অমঙ্গল নয়, অমঙ্গল হচ্ছে তার **আপাতদৃশ্য**

---

* এই গ্রন্থের ২৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

অস্তিত্ব। এতদসত্ত্বেও, '(পুঁজির) তথাকথিত উৎপাদিকা শক্তি ঘরবাড়ি ও শহর মন্ত্রজালে সৃষ্টি করতে পারে', যাদের অস্তিত্ব মোটেই 'আপাতদৃশ্য' নয় (১২ পৃষ্ঠা)। যে ব্যক্তি এইভাবে চূড়ান্ত বিভ্রান্তিকর কায়দায় পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্কের বিষয়ে প্রলাপোক্তি করেন, যদিও মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থ নাকি 'তাঁর কাছেও সুপরিচিত', সেই ব্যক্তি জার্মান শ্রমিকদের নূতন এবং শ্রেষ্ঠতর পথ দেখাবার দায় নিচ্ছেন এবং 'ভবিষ্যৎ সমাজের স্থপতি-কাঠামো সম্পর্কে, অন্ততপক্ষে তার মূল রূপরেখা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল' 'ওস্তাদ নির্মাতা' হিসাবে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন!

মার্কস তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থে 'সমাজের সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সম্পর্কের' যতটা সন্নিকটে এসেছেন, তার চাইতে বেশী কেউ 'আসে'নি। তিনি পঁচিশ বছর ধরে বিভিন্ন দিক থেকে এই সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন এবং তাঁর সমালোচনার ফলাফলের মধ্যে সর্বত্রই আজকের দিনে যতখানি সম্ভবপর ততখানি তথাকথিত সমাধানের বীজ আছে। কিন্তু বন্ধুবর ম্যুল্‌বের্গারের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। সেইসব নাকি বিমূর্ত সমাজতন্ত্র, নিষ্প্রাণ ও অমূর্ত সূত্রাবলী মাত্র। 'সমাজের সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সম্পর্ক' অধ্যয়ন করার পরিবর্তে বন্ধুবর ম্যুল্‌বের্গার প্রুধোঁর এমন কয়েক খন্ড রচনা পড়েই তুষ্ট যাতে সমাজের সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সম্পর্কের বিষয় প্রায় কিছুই না থাকলেও তার পরিবর্তে সমস্ত সামাজিক অভিশাপের অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ অলৌকিক দাওয়াই রয়েছে। অতঃপর তিনি সামাজিক পরিত্রাণের আগে থেকেই তৈরী এই পরিকল্পনা, এই প্রুধোঁবাদী **পদ্ধতি** জার্মান শ্রমিকদের উপহার দিচ্ছেন এই অজুহাতে যে, **তিনি 'সব পদ্ধতিকেই** বিদায় জানাতে' চান অথচ আমি 'বিপরীত পন্থা গ্রহণ করছি!' এই ব্যাপারটা বুঝতে হলে আমাকে ধরে নিতে হবে যে আমি অন্ধ এবং ম্যুল্‌বের্গার বধির, সুতরাং আমাদের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কিন্তু থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এই বিতণ্ডায় আর কিছু না হলেও এটুকু মূল্য আছে যে এইসব আত্ম-অভিহিত 'কাজের লোক' সমাজতন্ত্রীর প্রকৃত কর্মকাণ্ডটা আসলে কী বস্তু এটা তার প্রমাণ দিয়েছে। সামাজিক সকল অভিশাপের অবসানের এইসব ব্যবহারিক প্রস্তাব, এই সকল সামাজিক সর্বরোগহর দাওয়াই সর্বদাই এবং সর্বক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর এমন সব প্রতিষ্ঠাতাদের অবদান যারা দেখা দিয়েছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের শৈশব কালে। প্রুধোঁও এদেরই অন্তর্গত। প্রলেতারিয়েতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে এই শিশুর কাঁথা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এই চেতনাই জন্ম লাভ করে যে পূর্বাহ্নে রচিত এবং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই সমস্ত 'ব্যবহারিক সমাধানের' অপেক্ষা কম ব্যবহারিক আর কিছুই হতে পারে না, উপলব্ধি

আসে যে প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক সমাজতন্ত্র হচ্ছে বিভিন্ন দিক থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির নির্ভুল জ্ঞানলাভ। যে শ্রমিক শ্রেণী এই সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অধিকারী, তার মনে কখনও সংশয় জাগবে না কোন্ সামাজিক প্রতিষ্ঠান তার মূল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবে এবং এই আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে কী রূপে।

এঙ্গেলস কর্তৃক ১৮৭২ সালের জুন থেকে ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে লিখিত

১৮৭২-৭৩ সালের *Volksstaat* সংবাদপত্রে প্রথমে মুদ্রিত

এঙ্গেলস কর্তৃক সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ ১৮৮৭ সালে

সংবাদপত্রের পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা ১৮৮৭ সালের সংস্করণ অনুযায়ী মুদ্রিত

জার্মান থেকে অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে

কিছু কিছু সমাজতন্ত্রী, যাকে তাঁরা বলেন **কর্তৃত্বের নীতি**, তার বিরুদ্ধে সম্প্রতি রীতিমত জেহাদ শুরু করে দিয়েছেন। কোনও একটা কাজ **কর্তৃত্বমূলক** এটুকু বললেই তাঁরা সে কাজের নিন্দা করবেন। চটপট রায়-দানের এই পদ্ধতির এতদূর অপপ্রয়োগ হয় যে ব্যাপারটা সম্পর্কে একটু খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করা দরকার হয়ে পড়েছে। যে অর্থে কর্তৃত্ব কথাটি এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে তার মানে দাঁড়ায়: আমাদের ইচ্ছার উপর আরেকজনের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া; অন্যদিকে, কর্তৃত্ব বলতে বশ্যতাও ধরে নেওয়া হয়। শব্দ দুটি অবশ্য শুনতে খারাপ; আর বশীভূত পক্ষের কাছে সম্পর্কটাও অপ্রীতিকর, তাই প্রশ্ন হল যে এর হাত থেকে নিষ্কৃতির কোনও উপায় নির্ধারণ করা যায় কিনা, বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবেশে এমন আরেকটা সমাজ-ব্যবস্থা গড়া যায় কিনা যেখানে এই কর্তৃত্বের আর কোনও দরকার থাকবে না, সুতরাং কর্তৃত্বের অবসান হবে। আজকের দিনের বুর্জোয়া সমাজ যে সব অর্থনৈতিক, শিল্পগত ও কৃষিগত অবস্থার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে সেগুলি পরীক্ষা করলে আমরা দেখি যে, তাদের ঝোঁকই হল বিচ্ছিন্ন কাজের বদলে ক্রমশ আরো বেশী করে নানা লোকের মিলিত কাজের প্রবর্তন। স্বতন্ত্র উৎপাদকদের ছোট ছোট কর্মশালার বদলে এসেছে আধুনিক শ্রমশিল্প তার বড় বড় ফ্যাক্টরি ও মিল নিয়ে, সেখানে শত শত শ্রমিক বাষ্পচালিত জটিল যন্ত্রপাতির তত্ত্বাবধান করছে। রাজপথের গাড়ি ও শকটের জায়গায় এসেছে রেলওয়ে ট্রেন, ঠিক যেমন দাঁড়ওয়ালা অথবা পালতোলা জাহাজের স্থান নিয়েছে বাষ্পচালিত জাহাজ। এমন কি কৃষির উপরও যন্ত্র ও বাষ্পের আধিপত্য ক্রমশ বাড়ছে, ধীরে ধীরে অথচ অনিবার্যভাবে ছোট মালিকদের জায়গায় তা এনে দিয়েছে বড় বড় পুঁজিপতি; ভাড়াটে মজুরদের সাহায্যে তারা বিপুল আয়তনে জমি চাষ করছে। সর্বত্র ব্যক্তির স্বতন্ত্র কার্যকলাপের বদলে আসছে যুক্ত প্রচেষ্টা, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নানা প্রক্রিয়ার জটিলতা। কিন্তু যুক্ত কাজের কথা তুললেই সংগঠনের কথা বলতে হয়; কিন্তু কর্তৃত্ব ছাড়া কি সংগঠন সম্ভব?

ধরা যাক, যে পুঁজিপতিরা আজ সম্পদের উৎপাদন ও সঞ্চালনের উপর কর্তৃত্ব করছে, তারা এক সমাজ-বিপ্লবের ফলে গদিচ্যুত হল। কর্তৃত্ব বিরোধীদের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ধরে নেওয়া যাক যে জমি ও শ্রমের হাতিয়ারপত্র ব্যবহারকারী শ্রমিকদেরই যৌথ সম্পত্তি হয়ে গেল। তাহলেই কি কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে, না, শুধু তার রূপেরই কেবল পরিবর্তন ঘটবে? কথাটা আলোচনা করে দেখা যাক।

উদাহরণ হিসাবে একটা সুতো-কাটার মিলের কথা ধরা যাক। সুতোয় পরিণত হওয়ার আগে তুলোকে অন্ততঃপক্ষে ছটি ক্রমিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আর প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াই প্রধানত হচ্ছে আলাদা আলাদা ঘরে। তাছাড়া যন্ত্রপাতি চালু রাখার জন্য একজন ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন যে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের দেখাশোনা করবে, কয়েকজন মিস্ত্রী প্রয়োজন যারা করবে চলতি মেরামতের কাজ, আরও অনেক শ্রমিক প্রয়োজন যাদের কাজ হবে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি। এইসব শ্রমিকদের, পুরুষ নারী ও শিশু নির্বিশেষে, কাজ শুরু ও শেষ করতে হবে বাষ্পের কর্তৃত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে; সে কর্তৃত্ব কোনও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। সুতরাং শ্রমিকদের প্রথমেই কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে একটা সমঝোতায় আসতে হবে; আর একবার ঘণ্টা নির্ধারিত হয়ে গেলে পর প্রত্যেককেই তা মেনে চলতে হবে বিনা ব্যতিক্রমে। তারপর প্রতি ঘরে প্রতি মুহূর্তেই উৎপাদন-পদ্ধতি, মালমশলার বণ্টন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন ওঠে; সে সব প্রশ্নের সমাধান অবিলম্বে করতে হয় নইলে সমস্ত উৎপাদন তখনই বন্ধ হয়ে যাবে। শ্রমের প্রতিটি শাখার শীর্ষে অধিষ্ঠিত একজন প্রতিনিধির সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই সে সমাধান হোক, বা সম্ভব হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট অনুসারেই সমাধান হোক, ব্যক্তিবিশেষের মতকে সর্বদাই মাথা নত করতে হয়। তার মানেই হল প্রশ্নগুলির সমাধান হচ্ছে কর্তৃত্বের জোরে। শ্রমিক-নিয়োগকারী ছোট পুঁজিপতিরা যতটা স্বেচ্ছাচারী হতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী স্বেচ্ছাচারী হল বড় কারখানার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। অন্ততঃপক্ষে কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে এইসব কারখানার প্রবেশপথে লিখে রাখা যায়: Lasciate ogni autonomia voi che entrate!* মানুষ যদি নিজের জ্ঞান ও উদ্ভাবনী প্রতিভার সাহায্যে প্রকৃতির শক্তিকে জয় করে থাকে, তাহলে সে শক্তি মানুষের উপর এইভাবে প্রতিশোধ নেয় যে মানুষ যেখানে তাকে নিয়োগ করে সেখানে সে মানুষকে এমনই এক খাঁটি স্বেচ্ছাচারের অধীন করে ফেলে যা সকল সামাজিক সংগঠনের ঊর্ধ্বে। বৃহদায়তন শিল্পে কর্তৃত্ব লোপ করতে চাওয়ার মানে হল শিল্পকেই বিলুপ্ত করার ইচ্ছা, সুতোকাটার চরকায় ফিরে যাওয়ার জন্য বাষ্পচালিত তাঁতযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলার ইচ্ছা।

---

* যারা এখানে প্রবেশ করছ তারা পিছনে ফেলে এসো সব স্বাতন্ত্র্য। — সম্পাঃ

আরেকটা উদাহরণ নেওয়া যাক --- রেলপথ। এখানেও অসংখ্য ব্যক্তির সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন, আর যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য এই সহযোগিতা চালাতে হয় কাঁটায় কাঁটায় নির্ধারিত সময়ে। এখানেও কাজের প্রথম শর্ত হল এমন এক অধিপতি ইচ্ছা যা সব অধস্তন প্রশ্নের সমাধান করে দেয় — তা সে ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব একজনমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিই করুক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করার ভারপ্রাপ্ত একটি কমিটিই করুক। উভয় ক্ষেত্রেই কর্তৃত্বের অস্তিত্বটা খুবই স্পষ্ট। উপরন্তু মহামান্য যাত্রীদের উপর রেলকর্মীদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হলে প্রথম যে ট্রেন ছাড়া হবে তার অবস্থা কী দাঁড়াবে?

কিন্তু কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা, এমন কি উদ্ধত কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা, উত্তাল সমুদ্রে জাহাজের উপরে যতটা স্পষ্ট ততটা আর কোথাও নয়। সেখানে বিপদের মুহূর্তে সকলের জীবন নির্ভর করে একজনের ইচ্ছা অবিলম্বে ও পুরোপুরিভাবে প্রত্যেকে মেনে নেওয়ার উপর।

যখনই উগ্রতম কর্তৃত্ববিরোধীদের সামনে আমি এই ধরনের যুক্তি পেশ করি, তখন তারা একমাত্র নিম্নোক্ত উত্তরই দিতে পারে: 'হ্যাঁ, এ সব সত্যি, কিন্তু আমাদের প্রতিনিধিদের উপর এখানে আমরা যা অর্পণ করছি তা কর্তৃত্ব নয়, সে হল **অর্পিত কাজের ভার মাত্র**।' এই সব ভদ্রমহোদয়রা মনে করেন যে নাম বদ্‌লেই তাঁরা আসল জিনিষটাও বদ্‌লে ফেলেছেন। এ ধরনের মহা-মনীষীরা সমগ্র পৃথিবীকে এইভাবেই ব্যঙ্গ করে থাকেন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে একদিকে কিছুটা কর্তৃত্ব, তা সে যেভাবেই অর্পিত হোক না কেন, আর অন্যদিকে কিছুটা বশ্যতা হল এমন জিনিষ যা সকল সামাজিক সংগঠন-নির্বিশেষে আমাদের উপর চাপানো থাকে যে বাস্তব অবস্থায় আমরা উৎপাদন আর উৎপন্ন দ্রব্যের সঞ্চালন করি তার সঙ্গে সঙ্গেই।

আমরা এটাও দেখেছি যে বৃহদায়তন শিল্প ও বিপুলাকার কৃষির সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে উৎপাদন ও সঞ্চালনের বৈষয়িক অবস্থারও বিকাশ ঘটে, এবং তার ঝোঁক ক্রমশঃ এই কর্তৃত্বের পরিসর বাড়িয়ে দেবার দিকে। সুতরাং কর্তৃত্বের নীতিকে পুরোপুরিভাবে খারাপ আর স্বাতন্ত্র্যের নীতিকে পুরোপুরিভাবে ভাল বলাটা অর্থহীন। কর্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্র্য হল আপেক্ষিক বস্তু, সমাজের বিকাশের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সঙ্গে এদের আওতার পার্থক্য ঘটে। স্বাতন্ত্র্যবাদীরা যদি শুধু এইটুকুই বলে সন্তুষ্ট থাকত যে উৎপাদনের শর্তাবলীর ফলে যতটা অনিবার্য হয়ে ওঠে শুধু সেই সীমার মধ্যেই কর্তৃত্বকে সীমিত করে রাখবে ভবিষ্যতের সামাজিক সংগঠন, তাহলে আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারতাম। কিন্তু যে সব ঘটনার দরুন কর্তৃত্ব জিনিসটা প্রয়োজনীয়

হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অন্ধ, অথচ শব্দটার বিরুদ্ধে তারা তীব্র আবেগের সঙ্গে লড়ে চলে।

কর্তৃত্ববিরোধীরা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোয় সীমাবদ্ধ থাকে না কেন? সব সমাজতন্ত্রী এ বিষয়ে একমত যে আগামী সমাজবিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, আর তার সঙ্গে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে; অর্থাৎ সরকারী কার্যকলাপের রাজনৈতিক চরিত্র বিলুপ্ত হবে আর তা পরিণত হবে সমাজের প্রকৃত স্বার্থ দেখাশোনা করার সরল ব্যবস্থাপনায়। কিন্তু কর্তৃত্ববিরোধীরা দাবি করে যে, যে-সামাজিক পরিস্থিতির ফলে কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল তার বিলোপ সাধনের আগেই এক আঘাতেই সেই রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করতে হবে। তারা দাবি করে যে সমাজবিপ্লবের প্রথম কাজই হবে কর্তৃত্বের বিলোপ সাধন। এই ভদ্রমহোদয়রা কি কখনও কোনও বিপ্লব দেখেছেন? কর্তৃত্বমূলক যত ব্যাপার আছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই সবচেয়ে কর্তৃত্বপ্রধান হল বিপ্লব। বিপ্লব হল এমন এক কর্ম যাতে জনসংখ্যার এক অংশ কর্তৃত্বাশ্রয়ী উপায় আদৌ যা আছে সেই বন্দুক, বেয়নেট ও কামানের মাধ্যমে জনসংখ্যার অপর অংশের উপর নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়। আর বিজয়ী দল যদি নিজেদের সংগ্রাম ব্যর্থ হতে দিতে না চায় তাহলে তাদের নিজেদের শাসন বজায় রাখতে হবে অস্ত্রের সাহায্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে ভীতি সঞ্চার করেই। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনগণের এমন কর্তৃত্ব কাজে না লাগালে কি প্যারিস কমিউন একদিনও টিকতে পারত? বরং সে কর্তৃত্ব যথেষ্ট অসংকোচে প্রয়োগ না করার জন্যই কি তাকে আমাদের তিরস্কার করা উচিত নয়?

সুতরাং দুটোর একটা: হয় কর্তৃত্ববিরোধীরা জানে না তারা কী বলছে, সে ক্ষেত্রে তারা সৃষ্টি করছে শুধু বিভ্রান্তি; নয়তো তারা কী বলছে জানে, আর সে ক্ষেত্রে তারা প্রলেতারিয়েতের আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য তারা সাহায্য করছে প্রতিক্রিয়াকেই।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

১৮৭২ সালের অক্টোবর মাসে এঙ্গেলসের লেখা
১৮৭৪ সালের *Almanacco Repubblicano* সংকলনে প্রকাশিত

সংকলনের পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত
ইতালীয় থেকে অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

'জার্মানির কৃষকযুদ্ধ' গ্রন্থের মুখবন্ধ

১৮৫০ সালের গ্রীষ্মকালে, সদ্যসমাপিত প্রতিবিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে লণ্ডনে নিম্নলিখিত লেখাটি রচিত হয়েছিল; প্রকাশিত হয়েছিল কার্ল মার্কস সম্পাদিত 'Neue Rheinishe Zeitung. রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আলোচনী' পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যায়, ১৮৫০ সালে হামবুর্গে। জার্মানিস্থ আমার রাজনৈতিক বন্ধুদের ইচ্ছা যে এটি পুনর্মুদ্রিত হোক। খুবই খেদের ব্যাপার যে লেখাটি আজও সময়োপযোগী; তাই তাঁদের ইচ্ছা আমি মেনে নিলাম।

নিজস্ব গবেষণা থেকে সংকলিত মালমশলা সরবরাহের কোনও দাবি এ লেখা করে না। বরং, কৃষক অভ্যুত্থানগুলো ও টমাস মুন্‌ৎসার সম্পর্কে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সমস্তটাই নেওয়া হয়েছে ত্‌সিমেরমানের কাছ থেকে। জায়গায় জায়গায় কিছু ফাঁক থাকলেও তথ্যের দিক থেকে তাঁর বইটি এখনও সবচেয়ে সমৃদ্ধ। তাছাড়া, বুড়ো ত্‌সিমেরমান তাঁর আলোচ্য বিষয়টি খুবই পছন্দ করতেন। যে বিপ্লবী প্রবৃত্তি তাঁকে এখানে সর্বত্র অত্যাচারিত শ্রেণীর সমর্থক করে তুলেছে, তারই ফলে পরে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্তে চরম বামপন্থীদের শ্রেষ্ঠ একজন হয়ে দাঁড়ান। অবশ্য একথা সত্য যে তারপর শোনা যায় তিনি কিছুটা বুড়িয়ে গেছেন।

তবুও যদি ত্‌সিমেরমানের উপস্থাপিত বক্তব্যে অন্তর্নিহিত পারস্পরিক যোগাযোগগুলির অভাব থাকে; যদি তাঁর লেখা সে যুগের ধর্মীয় রাজনৈতিক বিতর্কগুলিকে সমসাময়িক শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতিবিম্ব হিসাবে ফুটিয়ে তুলতে না পেরে থাকে; যদি এই শ্রেণী-সংগ্রামে শুধু অত্যাচারী ও অত্যাচারিত, ভাল লোক ও খারাপ লোক এবং খারাপ লোকদের চূড়ান্ত বিজয়ই দেখানো থাকে; যে সামাজিক অবস্থা সে সংগ্রামের উদ্ভব ও পরিণতি নির্ধারণ করেছিল সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি যদি খুবই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে; তাহলে সে সব হল যে যুগে এই বইটি লেখা হয় তারই দোষ!* বরং সে যুগের তুলনায় বইখানি লেখা হয়েছিল খুবই বাস্তবানুগভাবে,

* ডব্লিউ ত্‌সিমেরমানের লেখা 'কৃষক মহাযুদ্ধের সাধারণ ইতিহাস' (Allgemeine Geschichte des grossen Banernkrieges) তিন খণ্ড, ১৮৪১-৪৩ সালে প্রথম প্রকাশিত। — সম্পাঃ

ইতিহাস সম্পর্কে জার্মান ভাববাদীদের রচনার মধ্যে এটি একটি প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম।

আমি বক্তব্যের মধ্যে, এই সংগ্রামের ঘটনাস্রোতের শুধু সামান্য রূপরেখাটুকু দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি কৃষকযুদ্ধের উৎপত্তির কারণ; এতে যে বিভিন্ন দল অংশ নিয়েছিল তাদের অবস্থান; যেসব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদের সাহায্যে এই দলগুলি নিজেদের অবস্থান উপলব্ধি করতে চেয়েছিল সেই সব মতবাদ; এবং সর্বশেষে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলির সামাজিক জীবনের ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অবস্থার অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই সংগ্রামের ফলাফল; অর্থাৎ দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, সে যুগের জার্মানির রাজনৈতিক কাঠামো, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহগুলো এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদসমূহ জার্মানির কৃষি, শিল্প, স্থলপথ ও জলপথ, পণ্যদ্রব্য ও অর্থ ব্যবসায়ের বিকাশের তৎকালীন স্তরটার ফল মাত্র, কারণ নয়। ইতিহাসের এই যে একমাত্র বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, এর স্রষ্টা আমি নই, মার্কস। ঐ আলোচনীতে, ১৮৪৮-৪৯ সালের ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর যে সব লেখা বেরিয়েছিল তাতে এবং 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থে এর পরিচয় পাওয়া যাবে।

১৫২৫ সালের জার্মান বিপ্লবের সঙ্গে ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবের মিল এত স্পষ্ট যে সে সময়ে তাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা চলত না। তবু বিভিন্ন স্থানীয় বিদ্রোহ একই রাজকীয় বাহিনীর হাতে একের পর এক যে দমিত হল, ঘটনাবলীর এই সমতা সত্ত্বেও, উভয় ক্ষেত্রে পৌরজনের (city burghers) ব্যবহারে অনেক সময় হাস্যকর সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, পার্থক্যটাও পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট।

'১৫২৫ সালের বিপ্লবে কার লাভ হয়েছিল? **রাজাদের**। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে কার লাভ হল? **বড়** রাজাদের, অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার। ১৫২৫ সালে ছোট রাজাদের পিছনে ছিল ক্ষুদে পৌরজন, — করের শৃঙখলে নিজেদের সঙ্গে এরা তাদের বেঁধে রেখেছিল। ১৮৫০ সালে বড় রাজাদের পিছনে, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার পিছনে রয়েছে আধুনিক বৃহৎ বুর্জোয়া — রাষ্ট্রঋণের মাধ্যমে এরা তাদের দ্রুত নিজের অধীনে আনছে। আবার বৃহৎ বুর্জোয়ার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী।'*

দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে এই অনুচ্ছেদে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি বড় বেশী সম্মান দেখানো হয়েছিল। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া দুই দেশেই এই শ্রেণী 'রাষ্ট্রঋণের মাধ্যমে' রাজতন্ত্রকে 'দ্রুত নিজের অধীনে আনার' সুযোগ পেয়েছিল; কোথাও আর কখনো সে এই সুযোগকে কাজে লাগায়নি।

---

* ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'জার্মানির কৃষকযুদ্ধ'। — সম্পাঃ

১৮৬৬ সালের যুদ্ধের ফলে ভাগ্যের দানের মতো বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে এসে পড়েছিল অস্ট্রিয়া। কিন্তু এ বুর্জোয়ারা শাসন করতে জানে না, তারা শক্তিহীন, কোনো কিছু করতেই অক্ষম। শুধু একটা কাজই তারা করতে পারে: শ্রমিকেরা চঞ্চল হতে শুরু করালেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের বর্বরভাবে আক্রমণ। হাঙ্গেরীয়দের প্রয়োজন ছিল বলেই শুধু এই শ্রেণী নেতৃত্বে থেকে গেছে।

আর প্রাশিয়াতে? সত্য বটে রাষ্ট্র-ঋণ লাফ দিয়ে বেড়ে গেছে, ঘাটতি একটা চিরস্থায়ী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, রাষ্ট্রীয় ব্যয় বছরে বছরে বেড়ে চলেছে, কক্ষে বুর্জোয়া শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, আর তাদের সম্মতি ব্যতীত করও বাড়ানো চলে না বা নূতন ঋণও ছাড়া যায় না — কিন্তু রাষ্ট্রের উপর তাদের ক্ষমতা কোথায়? মাত্র কয়েক মাস আগে যখন আবার ঘাটতি পড়েছিল তখন তাদের অবস্থা দাঁড়ায় খুবই সুবিধাজনক। শুধু সামান্য একটু চেপে বসে থাকলেই তারা চমৎকার অনেক সুবিধা জোর করে আদায় করে নিতে পারত। কিন্তু তারা কী করল? শুধু এক বছরের জন্য নয়, না, না, প্রতি বছরেই, আর চিরকাল ধরে বাৎসরিক নব্বই লক্ষের মত মুদ্রা সরকারের পায়ে সঁপে দেওয়ার অনুমতি পাওয়াটাই তারা যথেষ্ট সুবিধা বলে গণ্য করল।

কক্ষের বেচারী 'জাতীয় উদারনীতিকদের' আমি তাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দোষ দিতে চাই না। আমি জানি যে তাদের পিছনে যারা আছে, তারা অর্থাৎ ব্যাপক বুর্জোয়া-জনেরা বিপদের মুখে তাদের পরিত্যাগ করে গেছে। এই বুর্জোয়া-জনেরা শাসন করতে চায় না। ১৮৪৮ সাল এখনও রয়ে গেছে এদের মজ্জার মধ্যে।

জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী যে কেন এমন উল্লেখযোগ্য কাপুরুষত্ব দেখায় তা পরে আলোচনা করা হবে।

অন্যান্য দিকে অবশ্য উপরোক্ত বক্তব্যটি পুরোপুরি সমর্থিত হয়েছে। ১৮৫০ থেকে শুরু করে ছোট ছোট রাজ্যগুলি ক্রমশ আরও স্পষ্টভাবে পিছনে সরে গিয়ে এখন শুধু প্রুশীয় বা অস্ট্রীয় চক্রান্তের হাতল হিসাবে কাজ করছে; অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার মধ্যে এক কর্তৃত্বের জন্য লড়াই ক্রমশ আরও প্রচন্ড হয়ে উঠছে; সবার উপরে রয়েছে ১৮৬৬ সালের জবরদস্তি নিষ্পত্তি যার ফলে অস্ট্রিয়া তার নিজের প্রদেশগুলি হাতে রাখল, প্রাশিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুরো উত্তরটা দখল করে নিল, আর দক্ষিণ-পশ্চিমের তিনটি রাজ্যকে আপাতত বাইরে ফেলে রাখা হল।

এই বিরাট রাষ্ট্রীয় খেলার সমস্তটার মধ্যে একমাত্র যে ব্যাপার জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তা হল:

প্রথমত, সর্বজনীন ভোটাধিকার শ্রমিকদের আইন সভায় সাক্ষাৎ প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এনে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ভগবানের অনুগ্রহে লালিত অন্য তিনটি রাজমুকুট গ্রাস করে প্রাশিয়া সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ভগবানের অনুগ্রহে যে রাজমুকুটের অধিকারী বলে সে আগে দাবি করত, এখনও, এই কার্যকলাপের **পরেও**, যে সেই নিষ্কলঙ্ক মুকুট তার থেকে গেল এ কথা এমন কি জাতীয় উদারনীতিকেরাও বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়ত, এখন জার্মানিতে বিপ্লবের গুরুতর শত্রু শুধু **একটিই** রইল -- প্রুশীয় সরকার।

আর চতুর্থত, শেষ পর্যন্ত এখন জার্মান-অস্ট্রিয়ানদের নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে তারা কী হতে চায়, জার্মান না অস্ট্রিয়ান, কার সঙ্গে যুক্ত থাকার ইচ্ছা তাদের, জার্মানির সঙ্গে না তাদের জার্মান-বহির্ভূত লেইতা-পারের* (Transleithanian) লেজুড়দের সঙ্গে। বহুদিন থেকেই একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এর মধ্যে তাদের একটাকে ছাড়তে হবে। কিন্তু পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র ক্রমাগত প্রশ্নটা চাপা দিয়ে গেছে।

১৮৬৬ সংক্রান্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যত বিতর্ক তখন থেকে একদিকে 'জাতীয় উদারনীতিকেরা' আর অন্যদিকে 'জনতা পার্টি' ন্যক্কারজনকভাবে (ad nauseam) চালিয়ে এসেছে, তার সম্বন্ধে বলা যায় যে আগামী কয়েক বছরের ইতিহাস সম্ভবত দেখিয়ে দেবে যে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি একই সংকীর্ণ মনোভাবের দুইটি প্রান্ত বলেই তাদের মধ্যে বিরোধ এমন তিক্ত।

১৮৬৬ সাল জার্মানির সামাজিক অবস্থায় প্রায় কোনও পরিবর্তন আনেনি। সামান্য কয়েকটি বুর্জোয়া সংস্কার — সর্বত্র একই ওজন ও মাপের প্রচলন, গতিবিধির স্বাধীনতা, পেশার স্বাধীনতা ইত্যাদি সবই ছিল আমলাতন্ত্রের গ্রহণযোগ্য সীমারই মধ্যে। পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী বহুকাল ধরে যে সব অধিকার ভোগ করে এসেছে এগুলি তার কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছয়নি, আর আসল ব্যাধি অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক অভিভাবকত্বের প্রথাটাকে স্পর্শও করেনি। পুলিশের প্রচলিত কাণ্ডকারখানার ফলে আবার গতিবিধির স্বাধীনতা, আইনসিদ্ধ উপায়ে নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার, ছাড়পত্র বিলোপ ইত্যাদি সম্পর্কে সকল বিধানই প্রলেতারিয়েতের পক্ষে মায়ায় পর্যবসিত হয়।

১৮৬৬ সালের বিরাট রাষ্ট্রীয় খেলের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল ১৮৪৮ থেকে জার্মান শিল্প ও বাণিজ্যের, রেলপথের, টেলিগ্রাফের ও সমুদ্রগামী বাষ্পচালিত জাহাজ ব্যবস্থার অগ্রগতি। এই একই পর্বে ইংলণ্ডের বা এমন কি ফ্রান্সের তুলনায় এ প্রগতি যতই সামান্য হোক না কেন, জার্মানির ক্ষেত্রে এর তুলনা মেলে না; পূর্ববর্তী এক গোটা শতাব্দীতে যা হয়েছিল তার থেকে বেশী সাধিত হল কুড়ি বছরে।

* লেইতা — অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির একটি নদী, দুনাই-এর দক্ষিণ উপনদী। — সম্পাঃ

শুধুমাত্র এতদিনে জার্মানি গুরুত্বসহকারে ও চিরকালের মতন **বিশ্ববাণিজ্যে** জড়িত হল। শিল্পপতিদের পুঁজি খুব দ্রুত তালে বেড়ে উঠেছে; সেই অনুযায়ী বৃদ্ধি পেয়েছে বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক পদমর্যাদা। শিল্প সমৃদ্ধির সবচেয়ে নিশ্চিত লক্ষণ — **জুয়াচুরি** — অবাধ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আর তার বিজয়ী রথের চাকায় বেঁধে নিয়েছে কাউণ্ট ও ডিউকদের। জার্মান পুঁজি এখন রুশ ও রুমানীয় রেলপথ গড়ছে — আহা, তাদের যেন ভাগ্যে বিপত্তি না আসে। অথচ মাত্র পনেরো বছর আগে পর্যন্ত জার্মান রেলপথকেই ইংরেজ শিল্পোদ্যোক্তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে হয়েছিল। তাহলে বুর্জোয়া শ্রেণী যে রাজনৈতিক ক্ষমতাটাও দখল করে নিল না, সরকার সম্পর্কে সে যে এমন কাপুরুষোচিত ব্যবহার করে চলে তা সম্ভব হয় কী করে?

জার্মানির বুর্জোয়া শ্রেণীর দুর্ভাগ্য এই যে জার্মানদের অভ্যস্ত প্রথানুযায়ী সে বড় দেরিতে এসে পৌঁছেছে। তার যখন সমৃদ্ধির যুগ, তখন পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক অধোগতি শুরু হয়ে গেছে। যে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করে তবেই ইংলণ্ডে বুর্জোয়া শ্রেণী তার সত্যিকারের প্রতিনিধি ব্রাইটকে সরকারে ঢোকাতে পেরেছিল তার অনিবার্য ফল হবে সমগ্র বুর্জোয়া শাসনেরই অবসান। ফ্রান্সে যে বুর্জোয়া শ্রেণী সামগ্রিকভাবে শ্রেণী হিসাবে মাত্র দু বছর অর্থাৎ ১৮৪৯ ও ১৮৫০ সালে শাসনক্ষমতা ভোগ করেছিল, — তারা লুই বোনাপার্ট ও সৈন্যবাহিনীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে তবেই নিজেদের সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। আর সবচেয়ে উন্নত তিনটি ইউরোপীয় দেশের পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এত বেশী বেড়ে গেছে যে যখন ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক শাসনের উপযোগিতা শেষ হয়ে গেল, তখন আজকের দিনে বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে আর জার্মানিতে স্বচ্ছন্দ রাজনৈতিক শাসনে জাঁকিয়ে বসাটা সম্ভব নয়।

পূর্ববর্তী সকল শাসক শ্রেণীর বিপরীতে বুর্জোয়া শ্রেণীরই বিশেষত্ব হল যে তার বিকাশের ধারা একটা বিন্দুতে পেঁৗছোনের পর তার ক্ষমতার উপায়, সুতরাং মূলত তার পুঁজি, যত বাড়তে থাকে, রাজনৈতিক আধিপত্যের পক্ষে সে ততই অক্ষম হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখায়। **'বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে প্রলেতারিয়েত।'** বুর্জোয়া শ্রেণী তার শিল্প, তার বাণিজ্য ও তার যোগাযোগ ব্যবস্থার যতই বিকাশ সাধন করতে থাকে সেই অনুপাতে সে সৃষ্টি করে যায় প্রলেতারিয়েতকে। আর বিশেষ একটা বিন্দুতে [illegible]য়ে সে লক্ষ্য করতে শুরু করে যে তার এই প্রলেতারীয় জুড়ি তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে — অবশ্য সর্বত্র একই সময়ে বা বিকাশের একই স্তরে তা ঘটে না। সেই মুহূর্ত থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী একচ্ছত্র রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি হারাতে থাকে; সে চারিদিকে এমন মিত্র খুঁজতে থাকে যার সঙ্গে সে একজোটে শাসন ভাগাভাগি করে নেয়, অথবা পরিস্থিতি অনুযায়ী যার হাতে নিজের শাসন পুরোটাই ছেড়ে দেয়।

জার্মানিতে ১৮৪৮ সালের মধ্যেই বুর্জোয়া শ্রেণী মোড় ফেরার এই বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছল। অবশ্যই, জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী জার্মান প্রলেতারিয়েতকে যত না ভয় পেয়েছিল তার চেয়ে বেশী ভয় পেল ফরাসী প্রলেতারিয়েতকে দেখে। ১৮৪৮ সালে প্যারিসে জুন সংগ্রাম বুর্জোয়া শ্রেণীকে দেখিয়ে দিল তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে। সেই একই ফসলের বীজ যে ইতিমধ্যে জার্মানির মাটিতেও পোঁতা হয়ে গেছে ঠিক সে কথাটুকু প্রমাণ করার মতই তখন যথেষ্ট অশান্ত হয়ে উঠেছিল জার্মান প্রলেতারিয়েত। তাই ঠিক সেদিন থেকে বুর্জোয়া রাজনৈতিক কাজকর্মের সব ধারটুকু নষ্ট হয়ে গেল। বুর্জোয়া শ্রেণী মিত্র খুঁজতে লাগল চারপাশে, মূল্যের দিকে নজর না রেখে নিজেকে তাদের কাছে বিকিয়ে দিল — আর আজও সে এক পা এগোতে পারেনি।

এই মিত্রদের সবারই প্রকৃতি প্রতিক্রিয়াশীল। এদের মধ্যে রয়েছে রাজতন্ত্র তার সৈন্যবাহিনী আর আমলাবর্গ নিয়ে; রয়েছে বৃহৎ সামন্ত অভিজাত শ্রেণী; রয়েছে ক্ষুদে নগণ্য য়ুঙ্কারেরা আর আছে এমন কি পুরোহিতরাও। শুধু নিজের গায়ের বহুমূল্য চামড়াটি বাঁচানোর জন্যই বুর্জোয়া শ্রেণী এদের সঙ্গে চুক্তি ও কারবার করে এসেছে, শেষ পর্যন্ত বিনিময় করার মতন তার আর কিছুই হাতে থাকেনি। আর প্রলেতারিয়েত যতই বেশী বিকশিত হয়েছে, তার শ্রেণী বোধ ও শ্রেণী-কর্ম যত শুরু হয়েছে, বুর্জোয়া শ্রেণী ভয় পেয়ে গেছে ততই বেশী। যখন সাদোভাতে প্রুশীয়দের আশ্চর্য রকম খারাপ রণকৌশল অস্ট্রীয়দের আরও বেশী আশ্চর্য রকম খারাপ রণকৌশলকে পরাজিত করল, তখন সাদোভাতে যে প্রুশীয় বুর্জোয়াদেরও হার হয়, সেই প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী, অথবা অস্ট্রীয় বুর্জোয়ারা, কে গভীরতর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল তা বলা শক্ত।

১৫২৫ সালের মাঝারি বার্গাররা যে রকম আচরণ করত আমাদের ১৮৭০ সালের বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী এখনও অবিকল তাই করছে। আর পেটি বুর্জোয়া, কারিগর ও দোকানের মালিকদের সম্পর্কে বলা চলে যে তারা চিরকাল একরকমই থাকবে। তারা আশা রাখে যে ওপরে বেয়ে উঠে, জুয়াচুরি করে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ঢুকে পড়তে পারবে; তাদের ভয় এই যে তাদের প্রলেতারিয়েতের মধ্য পড়ে যেতে হবে। এই ভয় ও আশার মধ্যে দোদুল্যমান হয়ে তারা লড়াই-এর সময় নিজেদের গায়ের বহুমূল্য চামড়াটি বাঁচিয়ে চলবে, আর লড়াই শেষ হয়ে গেলে যোগ দেবে বিজয়ীদের দলে। তাদের স্বভাবই হল এই।

প্রলেতারিয়েতের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ ১৮৪৮ সাল থেকে শিল্পের অভ্যুত্থানের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। আজকের দিনে জার্মান শ্রমিকেরা তাদের ট্রেড ইউনিয়নে, সমবায় সমিতিতে, রাজনৈতিক সঙ্ঘে ও সভায়, নির্বাচনে এবং তথাকথিত

রাইখস্টাগে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, শুধু তাতেই যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে প্রমাণ হয় গত বিশ বছরে অলক্ষ্যে জার্মানির কী রূপান্তর ঘটেছে। জার্মানির শ্রমিকদের খুবই কৃতিত্বের কথা যে **একমাত্র তারাই** শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের এবং স্বয়ং শ্রমিকদেরও পাঠাতে পেরেছে পার্লামেণ্টে, ফরাসী বা ইংরেজরা এখন পর্যন্ত সে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

কিন্তু ১৫২৫ সালের সঙ্গে যে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছিল, প্রলেতারিয়েতও এখন পর্যন্ত তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সারা জীবন যে শ্রেণীকে পুরাপুরিভাবে মজুরির উপর নির্ভর করে থাকতে হয় তাদের পক্ষে জার্মান জনগণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয়ে উঠতে এখনও অনেক দেরী। কাজেই এই শ্রেণীকেও মিত্র খুঁজতে হয়। একমাত্র পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী, শহরের **লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত**, ক্ষুদে চাষী এবং কৃষি মজুরদের মধ্যেই সে মিত্রের খোঁজ মেলে।

পেটি বুর্জোয়াদের কথা আগেই বলেছি। কোনও ব্যাপারে জয়লাভের পর যখন বিয়ারখানায় তাদের হুল্লোড়ের সীমা থাকে না, সেই সময়টুকু ছাড়া তারা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। তবু তাদের মধ্যে খুব ভাল অনেকে আছে, যারা নিজের থেকেই শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেয়।

লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত হল সম্ভাব্য সব মিত্রের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ, সব শ্রেণীর অধঃপতিত অংশের গাঁজ (scum) এরা, বড় বড় শহরে সদরঘাঁটি গেড়ে থাকে। আজেবাজে এই লোকগুলি পুরাপুরি অর্থলিপ্সু এবং পুরাপুরি লজ্জাহীন। প্রত্যেক বিপ্লবের সময়েই যদি ফরাসী শ্রমিকেরা ঘরবাড়ির গায়ে লিখে রেখে থাকে: Mort aux voleurs (চোরেরা নিপাত যাক!) এবং এদের কয়েকজনকে যদি গুলিও করে থাকে, তাহলে সম্পত্তি রক্ষার উৎসাহে তারা এ কাজ করেনি, সঠিকভাবেই তারা মনে করেছে যে এই দঙ্গলটাকে দূরে রাখাই সব চাইতে দরকার। যদি কোনও শ্রমিকনেতা এই দুর্বৃত্তদের রক্ষিবাহিনী হিসাবে কাজে লাগায় বা এদের সমর্থনের উপরই নির্ভর করে, তাহলে শুধু তার থেকেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে আন্দোলনের প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

ক্ষুদে চাষীরা — বড় কৃষকেরা অবশ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে পড়ে — নানা রকমের হয়:

তারা হয়ত **সামন্ত কৃষক** হতে পারে, এবং এখনও বাধ্য হয় তাদের দয়ালু প্রভুর জন্য বেগার (corvée) খেটে যেতে। বুর্জোয়া শ্রেণী এদের ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্ত করার কর্তব্য যখন পালন করতে পারেনি, তখন এদের বোঝাতে অসুবিধা হবে না যে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকেই তারা উদ্ধারলাভের আশা রাখতে পারে।

'নয়ত' বা তারা **খাজনাদায়ী কৃষক** (tenant farmers)। সেক্ষেত্রে অবস্থাটা প্রধানত আয়র্ল্যাণ্ডেরই মতো। খাজনা এত বাড়িয়ে তোলা হয়েছে যে স্বাভাবিক ফসল হলেও কৃষক আর তার পরিবার কোনওক্রমে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাটুকু করতে পারে; ফসল যখন খারাপ হয় তখন সে প্রায় উপবাসে থাকে, খাজনা দিতে পারে না, আর ফলে হয়ে পড়ে পুরোপুরিভাবে জমিদারের কৃপার মুখাপেক্ষী। একমাত্র বাধ্য হলে তবেই বুর্জোয়া শ্রেণী এই ধরনের লোকদের জন্য কিছু করে। শ্রমিক ছাড়া তবে আর কাদের কাছ থেকেই এরা উদ্ধার লাভের আশা করবে?

বাকি থাকে সেই সব কৃষক যারা **নিজস্ব ছোট ক্ষেত** চাষ করছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা মর্গেজে এমনই জর্জরিত যে খাজনা-দেওয়া চাষী যেমন জমিদারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে এদেরও তেমনই নির্ভর করতে হয় মহাজনের উপর। এদের জন্যও অবশিষ্ট থাকে সামান্য পারিশ্রমিক মাত্র, উপরন্তু সব বছর ফসল সমান না হওয়াতে সেটার পরিমাণও খুবই অনিশ্চিত। বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছ থেকে কোনও কিছু পাওয়ার আশা এদের সবচেয়ে কম, কারণ এই বুর্জোয়ারা, এই পুঁজিপতি মহাজনেরাই এদের রক্ত শুষে খাচ্ছে। তবু, এই কৃষকদের বেশির ভাগই প্রাণপণে তাদের সম্পত্তি আঁকড়ে থাকে, যদিও আসলে সে সম্পত্তি তাদের নয়, মহাজনদেরই। তাহলেও এদের হৃদয়ঙ্গম করাতে হবে যে জনগণের উপর নির্ভরশীল কোনও সরকার যখন সমস্ত মর্গেজকে রাষ্ট্রের কাছে ঋণে রূপান্তরিত করবে এবং ফলে সুদের হার কমিয়ে ফেলবে, একমাত্র তখনই এরা মহাজনের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। আর সে কাজ সম্পন্ন করতে পারে শুধু শ্রমিক শ্রেণীই।

যেখানেই মাঝারি ও বড় আকারের আবাদ-মহাল রয়েছে সেখানেই গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী হল **ক্ষেত-মজুরেরা**। উত্তর ও পূর্বজার্মানি জুড়ে সর্বত্রই এই ব্যবস্থা। আর **এখানেই** শহরের শিল্প-শ্রমিকেরা তাদের **সবচেয়ে সংখ্যাবহুল ও সবচেয়ে স্বাভাবিক মিত্রের** খোঁজ পায়। পুঁজিপতি যেমনভাবে শিল্প-শ্রমিকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তেমনভাবে ক্ষেত-মজুরদের মুখোমুখি রয়েছে ভূস্বামী বা বড় জোতদার। যে ব্যবস্থায় প্রথমোক্তদের উপকার হয় অন্যদেরও নিশ্চয় তাতে উপকার হবে। শিল্পরত শ্রমিকেরা বুর্জোয়াদের পুঁজিকে অর্থাৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও প্রাণধারণের উপকরণকে সামাজিক সম্পত্তিতে, নিজেদের দ্বারা একযোগে ব্যবহৃত নিজস্ব সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেই নিজেদের মুক্ত করতে পারে। ঠিক সেইভাবে একমাত্র তখনই ক্ষেত-মজুরেরা তাদের ভয়াবহ দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাবে যখন সর্বপ্রথমেই তাদের শ্রমের মূল উপায় অর্থাৎ জমি বৃহৎ কৃষকদের ও বৃহত্তর সামন্ত প্রভুদের ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং চাষ হবে ক্ষেত-মজুরদের সমবায় সমিতির দ্বারা একযোগে। এখানেই আমরা আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষদের

বাস্‌ল্‌ কংগ্রেসের সেই বিখ্যাত সিদ্ধান্তে এসে পড়ি: ভূমি মালিকানাকে সাধারণ জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করাই সমাজের স্বার্থ। যেসব দেশে বৃহৎ ভূমি মালিকানা আছে এবং যেখানে সেই সূত্রে এই বৃহৎ আবাদ মহালগুলি একজন প্রভু ও বহু মজুরের মাধ্যমে চালানো হয়, মূলত সেইসব দেশ সম্পর্কেই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। তবুও সামগ্রিকভাবে জার্মানিতে এখনো এই ব্যবস্থারই প্রাধান্য দেখা যায়। কাজেই ইংলণ্ডের পরই, **ঠিক জার্মানির পক্ষেই** এ সিদ্ধান্ত ছিল **সবচেয়ে সময়োপযোগী**। রাজাদের সৈন্যবাহিনীর প্রধান অংশ সংগৃহীত হয় কৃষি প্রলেতারিয়েত, ক্ষেত-মজুর-শ্রেণীরই মধ্য থেকে! সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে এই শ্রেণীই পার্লামেণ্টে পাঠায় বহুসংখ্যক সামন্ত প্রভু ও য়ুঙ্কারদের, কিন্তু আবার এই শ্রেণীই হল শহরের শিল্প-শ্রমিকদের নিকটতম, এরা তাদের মতন অবস্থাতেই জীবনধারণ করে, তাদের চেয়েও গভীর দুর্দশায় ডুবে থাকে। বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত বলেই এই শ্রেণী অক্ষম, কিন্তু এদের সুপ্ত শক্তির কথা সরকার ও অভিজাতবর্গের এতটা ভালভাবে জানা আছে যে যাতে এরা অজ্ঞ হয়ে থাকে সেইজন্য তারা ইচ্ছা করেই স্কুলগুলি নষ্ট হয়ে যেতে দিচ্ছে। এই শ্রেণীর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে এদের আন্দোলনে টেনে আনাই হল জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের সবচেয়ে আশু জরুরী কর্তব্য। যেদিন থেকে ক্ষেত-মজুর জনগণ তাদের নিজেদের স্বার্থ বুঝতে শিখবে সেদিন থেকে জার্মানিতে অসম্ভব হয়ে উঠবে প্রতিক্রিয়াশীল — সামন্ত, আমলাতান্ত্রিক অথবা বুর্জোয়া — সরকারের অস্তিত্ব।

* * *

উপরের লাইন কয়টি লিখেছিলাম চার বছরেরও বেশী আগে। আজও কিন্তু কথাগুলি সত্য। সাদোভা ও জার্মানি বিভাগের পর যা সত্য ছিল তা আবার প্রমাণিত হচ্ছে সেদান এবং প্রুশীয় জাতির পবিত্র জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর। তথাকথিত উচ্চ রাজনীতির ক্ষেত্রে 'পৃথিবী কাঁপানো' বিরাট বিরাট রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ঐতিহাসিক গতি এত সামান্যই বদলাতে পারে।

পক্ষান্তরে বিরাট রাষ্ট্রীয় এই অনুষ্ঠানগুলি যা করতে পারে তা হল সে গতি দ্রুততর করা। এবং এ ব্যাপারে উপরোক্ত 'পৃথিবী কাঁপানো ঘটনাবলীর' নায়কেরা অনিচ্ছাকৃত সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁদের নিজেদের কাছে সে সাফল্য নিশ্চয়ই খুবই অবাঞ্ছনীয়, কিন্তু ভাল হোক বা মন্দ হোক, সেগুলো গ্রহণ করতেই হয়।

১৮৬৬ সালের যুদ্ধ ইতিপূর্বেই পুরানো প্রাশিয়ার ভিতে নাড়া দিয়েছিল। ১৮৪৮ সালের পর পশ্চিম প্রদেশগুলির বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয়, শিল্পসংশ্লিষ্ট উভয় ধরনের বিদ্রোহী ব্যক্তিদের আবার পুরাতন শৃঙ্খলার বশে আনতে বেশ বেগ পেতে হয়; তবুও কাজটা সম্পন্ন হল আর সৈন্যবাহিনীর স্বার্থের পরই, পূর্ব প্রদেশগুলির য়ুঙ্কারদের

স্বার্থটাই আবার হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্রের শাসক স্বার্থ। ১৮৬৬ সালে প্রায় সমস্ত উত্তর-পশ্চিম জার্মানি হয়ে গেল প্রুশীয়। ভগবানের আশীর্বাদে অর্জিত আর তিনটি রাজমুকুট গ্রাস করার ফলে ভগবানের আশীর্বাদে অর্জিত প্রুশীয় রাজমুকুটের অপূরণীয় নৈতিক ক্ষতি হওয়া ছাড়াও রাজশক্তির ভারকেন্দ্র এখন পশ্চিমের দিকে অনেকখানি সরে যায়। প্রত্যক্ষ রাজ্যগ্রাসের ফলে চল্লিশ লক্ষ জার্মান এবং তারপর উত্তর-জার্মান মৈত্রীর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ষাটলক্ষ জার্মান যুক্ত হওয়ার ফলে শক্তি বৃদ্ধি হল পঞ্চাশ লক্ষ রাইনল্যান্ডার ও ভেস্তফালিয়ানদের। ১৮৭০ সালে আবার আরও আশি লক্ষ দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মান এসে যোগ দিল। ফলে 'নবীন সাম্রাজ্যে' এককোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পুরাতন প্রাশিয়ার (এরা পূর্ব এলবীয় ছটি প্রদেশের লোক, তাছাড়া আবার এদের মধ্যে কুড়ি লক্ষ পোলও আছে) মুখোমুখি দাঁড়াল প্রায় আড়াই কোটি এমন মানুষ যারা পুরানো প্রুশীয় যুঙ্কার সামন্ততন্ত্র বহুদিন কাটিয়ে উঠেছে। এইভাবে প্রুশীয় সৈন্যবাহিনীর জয়লাভের ফলেই সরে যায় প্রুশীর রাষ্ট্রীয় সংগঠনের গোটা ভিত্তিটা; এমন কি সরকারের পক্ষেও এখন যুঙ্কারদের আধিপত্য আরও বেশী অসহনীয় হয়ে উঠল। অবশ্য ঠিক একই সঙ্গে অতি দ্রুত শিল্পোন্নতির ফলে **যুঙ্কার** ও বুর্জোয়াদের মধ্যেকার রেশারেশিকে ছাপিয়ে উঠল বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের সংগ্রাম। এর ফলে আভ্যন্তরীণভাবেও পুরানো রাষ্ট্রের সামাজিক ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। ১৮৪০ সাল থেকেই ধীরে পচনোন্মুখ রাজতন্ত্রের মৌলিক পূর্বশর্ত ছিল অভিজাত ও বুর্জোয়ার মধ্যেকার লড়াই, যার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করত রাজতন্ত্র। যে মুহূর্তে বুর্জোয়া শ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিজাতবর্গকে রক্ষা করার প্রশ্নের বদলে শ্রমিক শ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে সকল সম্পত্তিবান শ্রেণীকে রক্ষা করার প্রশ্ন এসে দাঁড়াল, সেই মুহূর্ত থেকেই পুরানো একচ্ছত্র রাজতন্ত্র পুরাপুরি গ্রহণ করতে বাধ্য হল বিশেষ করে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিকল্পিত রূপটা, অর্থাৎ **বোনাপার্টীয় রাজতন্ত্রের** রূপ। বোনাপার্টতন্ত্রে প্রাশিয়ার এই রূপান্তরণের কথা আমি ইতিপূর্বে অন্যত্র আলোচনা করেছি ('বাস-সংস্থান সমস্যা', দ্বিতীয় ভাগ, ২৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি)*। সেখানে যে কথার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন হয়নি, অথচ এখানে যেটা খুব দরকার তা হল এই যে, আধুনিক বিকাশের দিক থেকে প্রাশিয়া এত পিছিয়ে ছিল যে এই রূপান্তরই হল ১৮৪৮ সালের পর থেকে প্রাশিয়ার **সবচেয়ে বড় অগ্রগতি**। অবশ্য প্রাশিয়া নিশ্চয়ই তখনও আধা-সামন্ত রাষ্ট্র অথচ বোনাপার্টতন্ত্র অন্ততঃপক্ষে রাষ্ট্রের একটা আধুনিক রূপ, যাতে ধরে নেওয়া হয় যে সামন্ত ব্যবস্থা লুপ্ত হয়েছে। সুতরাং প্রাশিয়াকে তার সামন্ত ব্যবস্থার অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ বিলুপ্ত করার, যুঙ্কারতন্ত্রই বিসর্জন দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে। স্বভাবতই কাজটা চলেছে যতটা সম্ভব নরম ধাঁচে এবং

---

* এ খণ্ডের ২৭৭-২৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

Immer langsam voran!* এই প্রিয় গানের তালে। যেমন ধরা যাক কুখ্যাত জেলা অর্ডিন্যান্সটা। এতে নিজস্ব জমিদারিতে য়ুঙ্কারের ব্যক্তিগত সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ অধিকার লোপ করা হয়; অথচ সঙ্গে সঙ্গে সেই অধিকারের পুনর্প্রতিষ্ঠা হল সমগ্র জেলার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে বৃহৎ ভূস্বামীবর্গের হাতে। সারবস্তুটা একই রইল, শুধু অনুবাদ হল সামন্ত থেকে বুর্জোয়া উপভাষায়। পুরানো প্রুশীয় য়ুংকার বাধ্য হয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে ইংরেজ স্কোয়ারের** মতো এক বস্তুতে; এতখানি প্রতিরোধের তার কোনোই কারণ ছিল না, কারণ উভয়েই সমান নির্বোধ।

প্রাশিয়ার অদ্ভুত ভাগ্যলিপিটাই হল এই যে ১৮০৮ থেকে ১৮১৩ সালে শুরু হওয়া এবং ১৮৪৮ সালে আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়া তার বুর্জোয়া বিপ্লবকে সমাধা করতে হল শতাব্দীর শেষে বোনাপার্টতন্ত্রের প্রীতিকর রূপের ভিতর। যদি সবকিছু ভাল মতো চলে, আর পৃথিবীটা থাকে বেশ শান্তশিষ্ট, আমরাও যদি যথেষ্ট বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই - ধরা যাক ১৯০০ সালে -- দেখে যেতে পারি যে প্রুশীয় সরকার সত্যিসত্যি সামন্ত বিধিব্যবস্থা বিলুপ্ত করে দিয়েছে, অর্থাৎ ১৭৯২ সালেই ফ্রান্স যেখানে পৌঁছেছিল প্রাশিয়া শেষ পর্যন্ত সেই বিন্দুতে এসে পড়েছে।

ইতিবাচক রূপে প্রকাশ পেলে সামন্ততন্ত্রের বিলোপের মানে দাঁড়ায় বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। অভিজাতবর্গের বিশেষ অধিকার লোপের সঙ্গে সঙ্গে আইনব্যবস্থা ক্রমশ বেশি বুর্জোয়া হয়ে উঠতে থাকে। আর এইখানেই আমরা সরকারের সঙ্গে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পর্কের মূলকথাটায় এসে যাই। আমরা দেখেছি যে সরকার এই ধীরগতি সামান্য সংস্কারগুলি প্রবর্তন করতে **বাধ্য হচ্ছে**। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে সে এইগুলিকে দেখায় বুর্জোয়াদের খাতিরে **স্বার্থত্যাগ** হিসাবে, রাজার কাছ থেকে বহুকষ্টে অর্জিত দাবি আদায় হিসাবে, যার বদলে বুর্জোয়া শ্রেণীরও উচিত সরকারের জন্য কিছুটা আত্মত্যাগ করা। আর, আসল অবস্থাটা বুর্জোয়াদের কাছে যথেষ্ট পরিষ্কার হলেও তারা নিজেরা বোকা সাজতে রাজী হয়। যে অব্যক্ত বোঝাপড়া বার্লিনে রাইখস্টাগ এ প্রাদেশিক কক্ষের (Chamber) সব বিতর্কের নির্বাক ভিত্তি, তার উৎপত্তি হল এইখানে: একদিকে, সরকার বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে শামুকের গতিতে আইনের সংস্কার করে; শিল্পের পথে সামন্ততান্ত্রিক বাধা, তথা বহুসংখ্যক ক্ষুদে রাজ্যের অস্তিত্বজনিত বাধা অপসারিত করে; সকল অঞ্চলে এক মুদ্রাব্যবস্থা, এক ওজন ও এক মাপের ব্যবস্থার প্রচলন এবং পেশার স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে; যাতায়াতের স্বাধীনতা মঞ্জুর

* সব সময়ে ধীরে এগোও! — সম্পাঃ

** স্কোয়ার — ইংরেজ নিম্ন অভিজ্ঞাতদের উপাধি। — সম্পাঃ

করে জার্মানির শ্রমশক্তিকে পুঁজির অবাধ কর্তৃত্বের অধীনে এনে দেয়; আর ব্যবসা এবং জুয়াচুরির আনুকূল্য করে। অন্যদিকে, বুর্জোয়া শ্রেণী সত্যিকারের সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়ে দেয় সরকারের হাতে; কর, ঋণ ও সৈন্য সংগ্রহের পক্ষে ভোট দেয়; এবং সমস্ত নতুন সংস্কার আইন এমনভাবে রচনা করতে সাহায্য করে যাতে অবাঞ্ছিত লোকজনের উপর পুলিশের পুরানো ক্ষমতাটা থাকে অব্যাহত। নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতার আশু পরিহারের বিনিময়ে বুর্জোয়া শ্রেণী তার ধীরগতি সামাজিক মুক্তি ক্রয় করছে। স্বভাবতই যে প্রধান কারণে এইরকম একটা বোঝাপড়া বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে তা সরকারের সম্বন্ধে ভয় নয়, তা হল প্রলেতারিয়েতের সম্পর্কেই ভয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের বুর্জোয়া শ্রেণী যতই শোচনীয় মূর্তি ধরুক না কেন, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সে তার কর্তব্য করছে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় শিল্প ও বাণিজ্যের যে উদ্দাম উন্নতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তা পরবর্তী পর্বে বিপুলতর উদ্দীপনার সঙ্গে বিকাশলাভ করেছে। ১৮৬৯ সালের পর থেকে এই ব্যাপারে রাইন-ভেস্তফালিয়ান শিল্পাঞ্চলে যা ঘটেছে জার্মানির ক্ষেত্রে তার কোনও তুলনা মেলে না, বরং মনে পড়ে এই শতাব্দীর গোড়ায় ইংলণ্ডের কারখানা অঞ্চলে যে জোয়ার দেখা দিয়েছিল তার কথা। স্যাক্সনি ও উচ্চ সিলেসিয়া, বার্লিন, হানোভার ও সমুদ্র-উপকূলবর্তী শহরগুলি সম্পর্কেও নিশ্চয় একই কথা প্রযোজ্য। শেষ পর্যন্ত একটা বিশ্ববাণিজ্য, সত্যিকারের বৃহৎ শিল্প ও প্রকৃত আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণী পাওয়া গেছে বটে। কিন্তু তার বদলে আমাদের ভাগ্যে একটা সত্যসত্যই বিপর্যয় জুটেছে এবং খাঁটি শক্তিশালী এক প্রলেতারিয়েতও দেখা দিয়েছে।

ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদের কাছে জার্মান প্রলেতারিয়েতের নিরহংকার ও ধীর অথচ অবিরামগতি বিকাশের তুলনায় জার্মানির ইতিহাসে স্পিখার্ন, মারস-লা-তুর ও সেদানের রণক্ষেত্রে হুঙ্কার এবং তৎসংক্রান্ত সকল ব্যাপারের গুরুত্ব হবে অনেক কম। ১৮৭০ সালেই জার্মান শ্রমিক শ্রেণীকে কঠিন এক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল: সে পরীক্ষা হল বোনাপার্টীয় যুদ্ধ-প্ররোচনা ও তার স্বাভাবিক ফল, অর্থাৎ জার্মানিতে ব্যাপক জাতীয় উত্তেজনা। জার্মান সমাজতন্ত্রী শ্রমিকেরা নিজেদের একমুহূর্তের জন্যও বিভ্রান্ত হতে দিল না। তাদের মধ্যে উগ্রজাতিবাদের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। বিজয়ের চরম উন্মাদনার মধ্যেও তারা শান্ত থেকে দাবি করেছিল 'ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ন্যায়ের ভিত্তিতে শান্তি স্থাপন করা হোক; কোনও দেশ দখল চলবে না'। এমন কি সামরিক আইনও পারল না তাদের নীরব রাখতে। কোনো রণ গৌরব, জার্মান 'সাম্রাজ্যের বিভূতির' কোনও বুলি তাদের মনে রেখাপাত করতে পারেনি। তাদের একমাত্র লক্ষ্য থেকে গেল ইউরোপের সমগ্র প্রলেতারিয়েতের মুক্তি। নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে

পারি যে আর কোন দেশে শ্রমিকেরা এমন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি এতটা সগৌরবে।

যুদ্ধকালীন সামরিক আইনের পর মামলা এল দেশদ্রোহিতার জন্য, রাজ মানহানির (lèse majesté) জন্য, কর্মচারীদের অপমান করার জন্য: আর সঙ্গে সঙ্গে এল ক্রমবর্ধমান শান্তিকালীন পুলিশী ঠগবাজি। *Volksstaat* পত্রিকার তিন বা চারজন সম্পাদক সাধারণত একই সঙ্গে জেলে আটক থাকতেন; অন্যান্য কাগজের অবস্থা ছিল একই অনুপাতে। পার্টির প্রত্যেক খ্যাতনামা বক্তাকেই বছরে অন্তত একবার আদালতে হাজির হতে হত, আর প্রায় সবক্ষেত্রেই তারা দোষী সাব্যস্ত হত। শিলাবৃষ্টির মতন একের পর এক চলতে থাকল নির্বাসনদণ্ড, বাজেয়াপ্তকরণ এবং মিটিং ভাঙা, কিন্তু সবই হল বিফল। একজন গ্রেপ্তার বা নির্বাসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গা নিত আর একজন; একটা মিটিং ভেঙে দিলে তার জায়গায় ডাকা হত দুটো নতুন মিটিং; আর এইভাবে সহ্যশক্তি ও একাগ্র আইনানুবর্তিতার মাধ্যমেই একের পর এক এলাকায় পুলিশের স্বেচ্ছাচারী শক্তি ক্ষয়ে যেতে লাগল। এত অত্যাচারের যা উদ্দেশ্য, ফল দাঁড়াল ঠিক তার বিপরীত। শ্রমিকদের পার্টি ভেঙে যাওয়া বা নুয়ে পড়ার বদলে, এতে করে নতুন কর্মী এসে পার্টিতে যোগ দিল, সংগঠন হল আরও মজবুত। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিগতভাবে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সংগ্রামে শ্রমিকেরা দেখিয়ে দিল যে তারা বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিকতার দিক দিয়ে উন্নততর। বিশেষ করে তথাকথিত 'কর্মদাতা'দের অর্থাৎ মালিকদের সঙ্গে বিরোধে তারা প্রমাণ করল যে, তারা মজুরেরাই এখন শিক্ষিত শ্রেণী, আর পুঁজিপতিরা হল গণ্ডমূর্খ। তারা আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এমন রসবোধ নিয়ে লড়াই চালায় যে এতে করেই সবচেয়ে ভালভাবে প্রমাণ হয়ে যায় যে তারা তাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে কতটা নিশ্চিত, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কতটা সচেতন। ইতিহাসের তৈরী মাটিতে সংগ্রাম এইভাবে চালানো হলে তার ফল মহান হতে বাধ্য। আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে জানুয়ারি নির্বাচনের সাফল্য তুলনাহীন, এর ফলাফল সারা ইউরোপে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে তা একান্তই সঙ্গত।

ইউরোপের বাকি অংশের শ্রমিকদের তুলনায় জার্মান শ্রমিকদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা আছে। প্রথমত, তারা ইউরোপের সবচেয়ে তাত্ত্বিক জাতির অংশ, আর জার্মানির তথাকথিত 'শিক্ষিত' শ্রেণীগুলি তত্ত্বের যে বোধটুকু প্রায় পুরোপুরি হারিয়ে বসেছে, এরা তাকে রক্ষা করে চলছে। পূর্বগামী জার্মান দর্শন ছাড়া, বিশেষত হেগেলের দর্শন ব্যতীত বৈজ্ঞানিক জার্মান সমাজতন্ত্র — যা হল একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র — তার কখনও সৃষ্টি হত না। শ্রমিকদের মধ্যে তত্ত্বের একটা বোধ না থাকলে, এই বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র তাদের অস্থিমজ্জায় যতখানি জড়িয়ে গেছে তা কখনই সম্ভব হত না। এই সুবিধা যে কতটা অপরিসীম তা একদিকে বোঝা যায় ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর সর্ববিধ

তত্ত্ব সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের ভিতর, পৃথক ইউনিয়নগুলির চমৎকার সংগঠন সত্ত্বেও তাদের আন্দোলন এত ধীরগতিতে এগোবার যেটা হল অন্যতম মূল কারণ, অন্যদিকে বোঝা যায় প্রুধোঁবাদের আদিরূপে ফরাসী ও বেলজিয়ানদের মধ্যে, এবং বাকুনিন কর্তৃক তার হাস্যকর বিকৃতি স্পেনীয় ও ইতালীয়দের মধ্যে যে ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তার ভিতর।

দ্বিতীয় সুবিধা হল এই যে তারিখ হিসাবে জার্মানেরাই প্রায় সবচেয়ে শেষে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। যেমন জার্মানদের তত্ত্বগত সমাজতন্ত্র কোনদিন ভুলবে না যে তার প্রতিষ্ঠা হল সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে এবং ওয়েনের উপর — এঁদের কল্পনাবিলাসী নানা ধারণা ও ইউটোপীয়বাদ সত্ত্বেও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে এই তিনজনের স্থান রয়েছে, এঁদের প্রতিভা এমন বহু ব্যাপারের সন্ধান পেয়েছিল যার যাথার্থ্য আমরা এখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করছি, ঠিক তেমনই জার্মান শ্রমিকদের ব্যবহারিক আন্দোলনের কোনদিন ভোলা উচিত নয় যে ইংরেজ ও ফরাসী আন্দোলনের ভিত্তির উপরই তার বিকাশলাভ ঘটেছে, এদের বহুমূল্যে অর্জিত অভিজ্ঞতাই তারা শুধু কাজে লাগাতে পেরেছে, এবং এদের এমন অনেক ভুল এড়াতে পেরেছে যা এড়ানো সে যুগে প্রায় অসম্ভব ছিল। পূর্বগামী ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নগুলির দৃষ্টান্ত এবং ফরাসী শ্রমিকদের রাজনৈতিক লড়াই ব্যতীত, প্যারিস কমিউন বিশেষ করে যে বিরাট প্রেরণা জোগাল তা ছাড়া আমাদের অবস্থা এখন কী দাঁড়াত?

জার্মান শ্রমিকদের এই কৃতিত্বটুকু স্বীকার করতেই হবে যে তারা নিজেদের পরিস্থিতির সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে এমন বোধ শক্তি নিয়ে যা নিতান্ত দুর্লভ। শ্রমিক আন্দোলনের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে এই প্রথম সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় রেখে, ধারাবাহিকভাবে চালানো হচ্ছে আন্দোলনের তিনটি দিকই — তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, এবং ব্যবহারিক অর্থনৈতিক (পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ)। বলতে গেলে ঠিক এই অনুকেন্দ্রিক আক্রমণের মধ্যেই নিহিত আছে জার্মান আন্দোলনের শক্তি ও অপরাজেয়তা।

একদিকে এই সুবিধাজনক পরিস্থিতির ফলে, এবং অন্যদিকে ইংরেজ আন্দোলনের দ্বীপবদ্ধ বৈশিষ্ট্যের দরুন আর ফরাসী আন্দোলন বলপূর্বক দমিত হওয়াতে এই মুহূর্তে জার্মান শ্রমিকেরা এসে দাঁড়িয়েছে প্রলেতারীয় সংগ্রামের পুরোভাগে। ঘটনাস্রোত কতদিন তাদের এই সম্মানিত পদ অধিকার করে থাকতে দেবে তা আগের থেকে বলা যায় না। কিন্তু আশা করা যাক যে যতদিন তারা এই পদে থাকবে ততদিন তারা যোগ্যতার সঙ্গে পদভার বহন করবে। তার জন্য লড়াই ও প্রচারের প্রতিক্ষেত্রে তৎপরতা দ্বিগুণ বাড়াবার প্রয়োজন। বিশেষত নেতাদের কর্তব্য হবে সকল তাত্ত্বিক প্রশ্ন সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করা; পুরানো জগতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত

চিরাচরিত বুলির প্রভাব থেকে নিজেদের ক্রমশ আরও মুক্ত করে তোলা; এবং সব সময়ে মনে রাখা যে সমাজতন্ত্র বিজ্ঞান হয়ে ওঠার পর থেকে তার দাবি এই যে বিজ্ঞান হিসাবেই তাকে চর্চা করতে হবে, অর্থাৎ তাকে অধ্যয়ন করতে হবে। কর্তব্য হবে, এইরূপে আয়ত্ত স্বচ্ছতর দৃষ্টিভঙ্গিটাকে বর্ধিত উদ্দীপনার সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন উভয়ের সংগঠন আরও দৃঢ়সংবদ্ধ করে তোলা। জানুয়ারি মাসে সমাজতন্ত্রীদের দিকে যত লোক ভোট দিয়েছিল তারা রীতিমতো একটা বাহিনী হয়ে দাঁড়ালেও শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হয়ে উঠতে এখনও তাদের অনেক দেরি; তাছাড়া গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচারকার্যের সাফল্য যতই হোক না কেন, ঠিক এই ক্ষেত্রেই এখনও অজস্র কাজ বাকি পড়ে আছে। সুতরাং আমাদের নজর রাখতে হবে যে, সংগ্রামে যেন ঢিলে না পড়ে, শত্রুর হাত থেকে যেন একটা পর একটা শহর, একটার পর একটা নির্বাচনী জেলা জিতে নেওয়া যায়। প্রধান কথা হল কিন্তু খাঁটি অন্তর্জাতিক প্রেরণা বজায় রাখা, যে মনোভাব কোনও দেশপ্রেমিক উগ্রজাতিবাদের প্রশ্রয় দেয় না, আর, যে জাতিরই হোক না কেন, প্রলেতারীয় আন্দোলনের প্রতিটি অগ্রগতিকে যা সানন্দে স্বাগত জানায়। জার্মান শ্রমিকেরা যদি এইভাবে এগোতে থাকে তাহলে তারা আন্দোলনের ঠিক নেতৃত্বে থাকবে না — কোনও একটা বিশেষ দেশের শ্রমিকেরাই নেতৃত্বে থাকবে এটা আন্দোলনের দিক থেকে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় — বরং সংগ্রামী সারিতে তাদের থাকবে সম্মানের স্থান। আর, অপ্রত্যাশিত গুরুতর পরীক্ষা অথবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী যদি তাদের কাছ থেকে বর্ধিত সাহস, বর্ধিত সংকল্প ও শক্তি দাবি করে তাহলে সংগ্রামের জন্য অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দাঁড়াবে তারা।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১লা জুলাই, ১৮৭৪

এঙ্গেলসের লেখা, প্রথম অংশ ১৮৭০ সালে, এবং দ্বিতীয় অংশ ১৮৭৪-এর ১লা জুলাই

'জার্মানির কৃষকযুদ্ধ' গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশিত লাইপজিগ, ১৮৭০ ও ১৮৭৫

তৃতীয় সংস্করণের পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজী ভাষ্যের ভাষান্তর

বিষয় সূচি

চ

জ

ট

ত

দ

ধ

ন

প

ভ

ম

য

র

ল

শ

স

হ

নামের সূচি

ফ

ব